মহাত্মা গান্ধী

প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
'আমাদের জওহরলাল', 'আমাদের লালবাহাদুর',
'ভারতরত্ন জওহরলাল', 'দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ'
প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ :

২রা অক্টোবর : ১৯৬০

প্রকাশক :

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা ১২

মুদ্রা র :

শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক

সাধারণ প্রেস

১৫এ ক্ষুদিরাম বোস রোড

কলিকাতা ৬



প্রার্থনারত গান্ধীজী

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতন, ১৯৪৫

আশীর্বাদ

মো. ক. গান্ধী

১২ই আগষ্ট ইং ১৯৪৭ সাল

সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠান আশ্রম

'নোয়াখালিতে মহাত্মা' গ্রন্থের জন্য
লেখককে গান্ধীজীর বাংলাভাষায় প্রদত্ত
আশীর্বাণী

শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত

শ্রীচরণেষু—

যাঁর অকৃপণ স্নেহচ্ছায়ায় আমার রাজনৈতিক
কেন, সমগ্র জীবন, অতিবাহিত হয়েছে
সেই তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের
প্রথম সর্বাধিনায়ক ত্যাগীশ্রেষ্ঠ
অজাতশত্রু চিরকুমার আচার্যদেবের
উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস
উৎসর্গীকৃত হ'লো

নিবেদন

১৯৩০ সাল। সবে কৈশোরে পদার্পণ করেছি, গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের তূর্যনিনাদে আবার আসমুদ্রহিমাচল ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন গৃহ ও বিদ্যালয়ের চতুষ্প্রাচীরে নিজেকে আটকে রাখতে পারিনি। তাঁর সেই উদাত্ত আহ্বানে ভারতের অগণিত নরনারীর মতো আমিও ঘরছাড়া হয়েছিলাম। তারপর গেছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের যুগ। এই সংগ্রামে একজন অনুগত সৈনিকের মতোই নিজেকে নিয়োজিত করেছি। আগস্ট বিপ্লবের সময়ে তমলুকে যে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতেও বয়ঃকনিষ্ঠ মন্ত্রীরূপে কাজ করেছি। গান্ধীজীর সান্নিধ্যের সুযোগ পেয়েছি বোম্বাই, পুনা, সোদপুর, কলিকাতা ও মহিষাদল প্রভৃতি স্থানে। সেই দিনগুলি আমার জীবনে আজও উজ্জ্বলতম হয়ে আছে।

জাতির জনক মহাত্মাজীর কাছে জাতির ঋণ অপরিসীম। পিতৃঋণ অপরিশোধ্য। সারা দেশে গান্ধী-জন্মশতবার্ষিকী পালন ক'রেও সে ঋণের কণামাত্র যে শোধ হবে না, বলাই বাহুল্য। সন্তান পিতার উদ্দেশে তর্পণ করে নিজের তৃপ্তির জন্য। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসও তা-ই।

সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জন্যই গান্ধীজীর এই জীবনালেখ্য রচনা করেছি। এই গ্রন্থখানি তাঁদের কাজে লাগলেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

আমার জীবনই আমার বাণী।

মো. ক. গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

এক

বংশ ঃ জন্ম ঃ শৈশব ঃ বাল্যকাল

ভারতের সেই চিরপবিত্র স্থান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি গুজরাট। আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধীর জন্মের ফলে গুজরাট ভারতীয়দের কাছে পবিত্রতর হয়ে উঠেছে। গুজরাটের সমুদ্রতীরে পোরবন্দর শহর। এর আর এক নাম সুদামপুরী। শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত অসংখ্য গৃহে পূর্ণ এই শহরটিকে বলা হয় White City বা শ্বেত নগরী। সমুদ্র এই শহরের পদতল ধৌত ক'রে প্রবাহিত হচ্ছে। বরদা শৈলশ্রেণী দূরে দাঁড়িয়ে যেন এই শহরের প্রহরায় রত। মনোরম নিসর্গ শোভা।

পোরবন্দর শহরটিকে কেন্দ্র ক'রে পোরবন্দর দেশীয় রাজ্য। পোরবন্দর শহরের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ব্যবসায়। এরা সমুদ্রযাত্রায় নিপুণ। তাই এখানকার অসংখ্য মানুষ সুদূর আরব ও আফ্রিকার সঙ্গে বহুকাল ধরে ব্যবসায়-বাণিজ্যে জড়িত।

কয়েক পুরুষ ধ'রে গান্ধী-পরিবার পোরবন্দর শহরে বসবাস করছেন। এঁদের জীবিকা ছিল ব্যবসায়; এঁরা জাতিতে গন্ধ-বণিক; গন্ধবণিক থেকেই সম্ভবত গন্ধী বা গান্ধী পদবির উৎপত্তি। গান্ধী-পরিবারের আদিবাস ছিল গুজরাটের জুনাগড় দেশীয় রাজ্যের কুটিয়ানায়। গান্ধী-পরিবারের এক ব্যক্তি, হরজীবন গান্ধী, ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পোরবন্দরে একটি বাড়ি কেনেন এবং এখানেই তাঁর ছেলেরা ছোটখাটো ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন।

হরজীবনের এক পুত্র, উত্তমচাঁদ, ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। ব্যবসায়-বাণিজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর প্রভাব অন্যতর ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করলো। তাঁর বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে

পোরবন্দরের রাজা রানা খিমাজী উত্তমচাঁদকে তাঁর দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। পোরবন্দর শহরে গান্ধী-পরিবারের সম্মান ও প্রতিপত্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেলো। উত্তমচাঁদ শাসনকার্যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখালেন। উত্তমচাঁদ উতা গান্ধী নামেও পরিচিত ছিলেন। উতা গান্ধীর চরিত্র ছিল হীরকের মতো দৃঢ় ও উজ্জ্বল। অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি নিজের স্বার্থ বিপন্ন ক'রেও মাথা তুলে দাঁড়াতেন। পোরবন্দরের রাজা রানা খিমাজী অল্প-বয়সেই মারা যান। তখন তাঁর স্ত্রী নাবালক কুমারের অভিভাবিকা হন। একবার নাবালক রাজার অভিভাবিকা পোরবন্দরের মহারানী একটি গরীব কর্মচারীর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। উত্তমচাঁদ জানতেন কর্মচারীটি নির্দোষ ; তাই তিনি তাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিলেন। মহারানী ঐ কর্মচারীকে তাঁর হাতে প্রত্যর্পণ করতে হুকুম করলে উত্তমচাঁদ তা অগ্রাহ্য করলেন। দেওয়ানের এই অপ্রত্যাশিত দৃঢ় মনোভাবে মহারানী বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন এবং ঐ কর্মচারীকে ধ'রে আনবার জন্যে সিপাহীদের পাঠালেন। উত্তমচাঁদ তাঁর বাড়ির দ্বার রুদ্ধ ক'রে সিপাহীদের প্রতিরোধ করলেন। সিপাহীরা কামানের গোলায় উত্তমচাঁদের গৃহটি ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করলো। বহু বছর এই কামানের গোলার দাগ উত্তমচাঁদের বাসভবনের প্রস্তর-প্রাচীরে দেখতে পাওয়া যেত। ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট (দেশীয় রাজ্যে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের আবাসিক প্রতিনিধি) এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন। ফলে উত্তমচাঁদের বাসভবনটি মহারানীর রোষবহ্নি থেকে রক্ষা পায়। উত্তমচাঁদ পোরবন্দর ত্যাগ ক'রে গান্ধী-পরিবারের আদিবাসস্থান জুনাগড়ের গ্রামে ফিরে যান।

জুনাগড়ও ছিল একটি দেশীয় রাজ্য। জুনাগড়ের নবাব উত্তমচাঁদের বুদ্ধি ও প্রশাসনিক দক্ষতার কথা অনেক শুনেছিলেন তিনি সাদরে উত্তমচাঁদকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন।

উত্তমচাঁদ জুনাগড়ের দরবারে এসে নবাবকে বাম হাতে সেলাম করলে সকলে বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। নবাবও বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি এই অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তমচাঁদ বললেন, তাঁর ডানহাতটি তিনি আগেই পোরবন্দরকে দিয়ে ফেলেছেন। উত্তমচাঁদ দরবারের রীতি ভঙ্গ করায় নবাব তাঁকে রোদে দশমিনিট খালিপায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার আদেশ দিলেন। কিন্তু উত্তমচাঁদকে এই দণ্ড ভোগ করতে হ'লো না। পোরবন্দরের রাজার প্রতি উত্তমচাঁদের এই বিশ্বস্ততায় নবাব মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি দণ্ডদানের সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ড মকুব করলেন ও গান্ধী-পরিবারের সকলকেই কুটিয়ানা গ্রামে বিনা-শুল্কে ব্যবসায় করবার অধিকার দিলেন।

ইতিমধ্যে পোরবন্দর রাজ্যে মহারানীর শাসনকাল শেষ হ'লো এবং কুমার বিক্রমজিৎ পোরবন্দরের রানা হলেন। রানা বিক্রমজিৎ তাঁর দেওয়ানরূপে উত্তমচাঁদকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। কিন্তু উত্তমচাঁদ তাতে রাজী হলেন না। তিনি তাঁর পুত্র করমচাঁদকে তাঁর পরিবর্তে দেওয়ানরূপে নিতে রাজাকে বললেন। করমচাঁদ বা কাবা গান্ধীর বয়স তখন মাত্র পঁচিশ বৎসর। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে করমচাঁদ পোরবন্দরের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ২৮ বছর তিনি এই রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। তিনিও ছিলেন তাঁর পিতা উত্তমচাঁদের মতোই নির্ভীক ও ন্যায়পরায়ণ। পিতার মতোই করমচাঁদ শাসনবিষয়ে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার কথা কেবল গুজরাটের দেশীয় রাজ্যগুলিতে নয়, রাজস্থানের দেশীয় রাজ্যগুলিতেও সকলের কাছে সুবিদিত ছিল। তিনি রাজস্থানিক কোর্টের একজন সদস্যও ছিলেন। এই কোর্টে রাজপুত সর্দারদের সঙ্গে তাদের গোষ্ঠীর রাজপুতদের বিবাদের বিষয় মীমাংসা হ'তো। যাই হ'ক, কালক্রমে পোরবন্দরের রানার সঙ্গে করমচাঁদের মতান্তর দেখা দিলো। ফলে করমচাঁদ পোরবন্দরের

দেওয়ানের পদ ত্যাগ ক'রে রাজকোট রাজ্যে চ'লে এলেন। তাঁর স্থলে পোরবন্দরের দেওয়ান হলেন তাঁর ভাই তুলসীদাস গান্ধী। 'করমচাঁদ রাজকোটের দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। তিনি পোরবন্দর ত্যাগ করলেও পোরবন্দরের রাজপরিবারের প্রতি তাঁর আনুগত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। একবার রাজকোর্টের ইংরেজ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল এজেণ্ট পোরবন্দরের রানা সম্পর্কে অপমানজনক উক্তি করলে করমচাঁদ তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল এজেণ্ট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং করমচাঁদকে গ্রেপ্তার ক'রে আটক রাখেন। কিন্তু তাতেও করমচাঁদ নিজের উক্তি প্রত্যাহার বা মার্জনা ভিক্ষা করেন না।

করমচাঁদ চারবার বিয়ে করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন তিনি তাঁর চতুর্থ পত্নী পঞ্চদশবর্ষীয়া পুতুলীবাঈকে বিয়ে করেন। ইতিপূর্বেই তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের গর্ভে তাঁর দুই কন্যা হয়েছিল। একটি পুত্রসন্তানলাভের বাসনাই ছিল করমচাঁদের এতোগুলি বিয়ের কারণ।

পুতলীবাঈ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি কঠোর ব্রতানুষ্ঠানগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তিনি প্রায়ই উপবাসে থাকতেন; চাতুর্মাস্য ব্রতের সময়ে চারমাস তিনি প্রতিদিন একবেলা অনাহারে থাকতেন এবং একদিন অন্তর উপবাস করতেন। গান্ধী-পরিবার ছিলেন বৈষ্ণব। পুতুলীবাঈ রোজই বৈষ্ণবদের মন্দির হাভেলিতে যেতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য পুতুলী-বাঈকে রাজপ্রাসাদে মহিলারা সকলেই সম্মান করতেন। রাজমাতাও প্রায়ই তাঁর পরামর্শ নিতেন।

পুতুলীবাঈয়ের গর্ভে করমচাঁদের এক কন্যা (রলিতাবাঈ) ও তিন পুত্র (লক্ষ্মীদাস, করষণদাস ও মোহনদাস) জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠপুত্র মোহনদাস, পরবর্তীকালের মহাত্মা গান্ধী, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন।

মোহনদাস তাঁর ধর্মপ্রাণা জননীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

মোহনদাসের শৈশব পোরবন্দরেই অতিবাহিত হয়। করমচাঁদ রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী হ'লেও গান্ধী-পরিবারের জীবনযাত্রা ছিল অতি সরল ও অনাড়ম্বর। করমচাঁদ তাঁর পাঁচ ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে একত্র তাঁদের ত্রিতল পৈতৃক ভবনে বাস করতেন। তিনি সপরিবারে নিচের তলার একাংশে বাস করতেন। এই অংশে তুখানি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ, একটি ক্ষুদ্র রন্ধনশালা ও একটি অলিন্দ ছিল। মোহনদাস শৈশবে এক সুবৃহৎ পরিবারে অসংখ্য খুড়তুত-জ্যেঠতুত ভাইবোনদের সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন।

এখানেই মোহনদাসকে একটি পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়েছিল। মোহনদাস খুব তীক্ষ্ণধী ছাত্র না হ'লেও তিনি নিয়মিত স্কুলে যেতেন। শৈশবে তিনি খুব একগুঁয়েও ছিলেন। এই একগুঁয়েমিই সম্ভবতঃ তাঁকে তাঁর পরবর্তী জীবনে সংকল্পে অটল দৃঢ়তা দিয়েছিল।

মোহনদাসের বয়স যখন সাত বছর, তখন তাঁর পিতা পোরবন্দর ত্যাগ ক'রে রাজকোটে গিয়েছিলেন। রাজকোট পোরবন্দর থেকে ১২০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ঐ সময়ে দেশীয় রাজ্যগুলি শিক্ষার দিক্ থেকে অত্যন্ত অনগ্রসর হ'লেও রাজকোটে একটি হাই স্কুল ছিল। রাজকোটে ঐ সময়ে ইংরেজ সরকারের পলিটিক্যাল এজেন্সির (রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের) প্রধান কার্যালয় থাকায় রাজকোট অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের তুলনায় অনেকটা অগ্রসর ছিল। ফলে মোহনদাসের শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা হয়েছিল।

মোহনদাসও রাজকোটে এসে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। বারো বছর বয়সে তাঁকে অ্যালফ্রেড হাই স্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'লো। ঐ বৎসরই তাঁর সঙ্গে পোরবন্দরের

ব্যবসায়ী গোকুলদাস মাকানজীর কন্যা কস্তুরবাঈয়ের বিয়ে হয়। ঐ একই দিনে তাঁর দাদা করষণদাসের ও অন্য এক খুড়তুত ভাইয়েরও বিয়ে হয়েছিল। পোরবন্দরে বিবাহগুলি খুব সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিয়ের ফলে মোহনদাসের স্কুলে একটি বছর নষ্ট হ'লো। পরে অবশ্য একবার ডবল-প্রমোশন পেয়ে এই ক্ষতি তিনি পূরণ ক'রে নেন। তাঁর দাদাদের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনো শেষ হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মোহনদাসের ক্ষেত্রে তা হয় নি।

মোহনদাস তীক্ষ্ণধী ছাত্র হিসাবে কখনও গণ্য না হ'লেও তিনি শিক্ষকের তিরস্কার এড়াবার জন্যে প্রতিদিন স্কুলে যেতেন ও যথাসাধ্য পাঠ তৈরি করতেন। স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া অন্য কোন বই তিনি পড়তেন না। স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর পর থেকে ইংরেজীর মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হ'তো। তাই পড়াশুনো করতে তাঁর বেশ অসুবিধা হ'তো। মুখস্থ করতেও তাঁর ভালো লাগতো না। তাই সংস্কৃতে তিনি যথেষ্ট দুর্বল ছিলেন। গণিতেও তিনি দুর্বল ছিলেন। তবে জ্যামিতি তাঁর খুব ভালো লাগতো। ঐটি গণিতে পাস করবার জন্যে তাঁর পক্ষে খুবই সহায়ক ছিল। বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র ব'লে মোহনদাসের পরিচয় না থাকলেও সৎ ও সত্যবাদী ছাত্ররূপে তাঁর সুনাম ছিল। এই সুনাম রক্ষা করবার জন্যে বালক মোহনদাস সর্বদাই চেষ্টা করতেন। শিক্ষকদের সামান্য ভর্ৎসনাতেও তাঁর চোখে জল আসত।

স্কুলে খেলাধুলো তিনি পছন্দ করতেন না; ফুটবল ও ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার প্রতি তিনি অন্যান্য ছেলেদের মতো আকর্ষণ বোধ করতেন না। কিন্তু বিদ্যালয়ে খেলাধুলো ছাত্রদের পক্ষে আবশ্যিক হ'লে পর তিনি বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন ঠিকমতো মেনে চলবার জন্যে খেলাধুলোয় অংশ নিতেন। আশৈশব তিনি লাজুক ছিলেন। খেলাধুলোয় অংশ না নেওয়ার তাও ছিল একটা কারণ। তিনি

একাকী ভ্রমণ করতে খুবই ভালোবাসতেন, এবং প্রায়ই দীর্ঘপথ ভ্রমণ করতেন।

বাল্যকালে তিনি "শ্রবণের পিতৃভক্তি" নামে একটি নাটক পড়েছিলেন। শ্রবণের পিতৃভক্তি, অন্ধ মাতাপিতাকে ভারে বসিয়ে কাঁধে ক'রে নিয়ে তার তীর্থ-দেখানোর ঘটনা, শ্রবণের মৃত্যুতে তার পিতামাতার করুণ বিলাপ বালক মোহনদাসের মনে যে রেখাপাত করেছিল, তা চিরস্থায়ী হয়েছিল। এই বইখানিতে তিনি অনুসরণ করবার মতো অনেক দৃষ্টান্ত পেয়েছিলেন এবং পিতৃ-আদেশ পালন করা তাঁর কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়ে তিনি "হরিশ্চন্দ্র" নামে একটি নাটকের অভিনয়ও দেখেন। হরিশ্চন্দ্রের সত্যপালনের জন্যে সর্বস্বত্যাগ তাঁকে অভিভূত করেছিল। মানুষ কেন হরিশ্চন্দ্রের মতো সত্যপালন করে না, তা বালক মোহনদাস প্রায়ই ভাবতেন আর জীবনে হরিশ্চন্দ্রের মতো সত্যবাদী হ'তে ও সত্যপালন করতে সংকল্প করেছিলেন।

শৈশবে তাঁর পিতামাতার চরিত্র বিশেষভাবে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর মা ছিলেন যেমন স্নেহময়ী, তেমন সরল ও সৎ। সাজসজ্জা ও অলংকার সম্পর্কে তাঁর সামান্য দুর্বলতাও ছিল না। গৃহকর্মে, মন্দিরে এবং অনেক সময়ে রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন পুত্র মোহনদাস। মা প্রায় নিরক্ষর হ'লেও তাঁর ধর্মবিশ্বাস এতোই দৃঢ় ছিল যে, মোহনদাস তাঁকে নিঃসংশয়-চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। মোহনদাসেব পরবর্তী জীবনে ধর্ম যে এমন একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তার পশ্চাতে ছিল তাঁর সেই স্নেহময়ী মায়ের প্রভাব। স্বামী সন্তান ও পরিজনদের নিরলস সেবা ছিল পুতলীবাঈয়ের জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। পরবর্তী-কালে সেবাধর্ম মোহনদাসকে এতোই যে আকৃষ্ট করেছিল, তাও তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মার কাছেই। মোহনদাসের পিতা করমচাঁদ শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন না সত্য। কিন্তু

মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল অসামান্য। গান্ধীজী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি ছিলেন স্বজনপ্রিয়, সত্যবাদী, সাহসী ও উদারহৃদয়—"a lover of his clan, truthful, brave and generous." অর্থসঞ্চয়ের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না; এমন কি নিজের সন্তানদের জন্যেও তিনি যথেষ্ট ধনসম্পত্তি রেখে যাননি। তিনিও ধর্মভীরু ছিলেন; রামায়ণ-মহাভারত নিয়মিত পড়তেন, জৈন, পার্শী ও মুসলমান সাধুসন্তদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। তবে ধর্মের ব্যাপারে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত পুত্রের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। তাই বাষট্টি বছর বয়সে গান্ধীজী বলেছিলেন, "আমার মধ্যে যেটুকু বিশুদ্ধতা দেখছ, তা আমি আমার বাবার কাছ থেকে নয়, মার কাছ থেকেই পেয়েছি।"

মোহনদাস বিয়ের পরেই, তখনও তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, শেখ মেহতাব নামে তাঁর এক দাদার বন্ধু ও সহপাঠীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। শেখ মেহতাব তাঁকে কিছুটা বিপথে চালিত করেছিল। শেখ মেহতাবের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর মা ও স্ত্রী বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি তার সঙ্গে মিশতেন। তাঁদের ঘনিষ্ঠতা এতোই নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে, ফটোগ্রাফি সেই সবেমাত্র এদেশে আমদানি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা একসঙ্গে ফটো তুলেছিলেন। ঐ সময়ে রাজকোটের তরুণদের মধ্যে ইংরেজদের অনুকরণের একটি প্রবল স্পৃহা দেখা দিয়েছিল। তারা কেবল বেশভূষায় নয়, খাদ্যেও ইংরেজদের অনুসরণ করার চেষ্টা করছিল। তারা বলতো, "ইংরেজরা মাংস খায়, তাই তারা পাঁচ হাত লম্বা, গায়েও এমন জোর; আর ভারতীয়রা মাংস খায় না, তাই তারা খুদে ও দুর্বল। এ জন্যেই তো ইংরেজরা ভারতবাসীকে শাসন করে। যদি ভারতবাসীরা সকলে মাংস খেতে শুরু করে, তবে তাদেরও দেহ হবে দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, তারা ইংরেজদের তাড়াতে পারবে।" শেখ মেহতাবও ঐ যুক্তি দেখিয়ে মোহনদাসকে মাংস-

ভক্ষণের উপযোগিতার কথা বোঝালো। কিন্তু গান্ধী-পরিবার ছিলেন বৈষ্ণব, তাঁরা মাংসাহারের ঘোর বিরোধী। তাই শেখ মেহতাবের সাহায্যে মাংসাহারের ব্যবস্থাটা মোহনদাসকে গোপনেই করতে হ'তো। মাংসাহারের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গান্ধীজী পরে বলেছেন, "যেন একটা জীবন্ত ছাগল আমার মধ্যে ক্রমাগত ডাকছিল।" মাংসাহারের এই নিরীক্ষা তাঁদের বছর-খানেক চলেছিল। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে পাঁচদিনের বেশি এই ধরনের গোপন ভোজের সুযোগ তাঁদের হয় নি। মাংস খেয়ে এসে প্রতিদিনই মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলতে হ'তো। এটা বালক মোহনদাসের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। তিনি মাংস খান জানলে তাঁর পিতামাতা ও পরিজনরা সকলেই যে অত্যন্ত আঘাত পাবেন, তাও তিনি জানতেন। তাই যখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন হবেন, যখন তাঁকে এইভাবে গোপনতা ও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে না, তখনই তিনি মাংস খাবেন স্থির ক'রে মোহনদাস আপাততঃ মাংসভক্ষণ মুলতুবি রাখলেন। অবশ্য, ঘটনাচক্রে আর কখনও তিনি মাংস স্পর্শ করেন নি।

এই বন্ধুটি তাঁকে একবার বেশ্যালয়েও নিয়ে গেল। কিন্তু ঘৃণায় তিনি তৎক্ষণাৎ সে পাপ স্থান ত্যাগ ক'রে চলে এলেন। এই সময়ে তিনি গোপনে ধূমপান করতেও আরম্ভ করেন। বিড়ি কিনবার জন্যে তাঁকে এমন কি চাকরদের পকেট থেকেও পয়সা চুরি করতে হ'তো। একবার তিনি তাঁর ও তাঁর দাদার মাংস-ভক্ষণের ভোজে চাঁদা দেওয়ার জন্যে এক টুকরো সোনা চুরি করলেন। কিন্তু এই ব্যাপারটিতে তাঁর বিবেকের দংশন এতোই তীব্র হয়ে উঠলো যে, তিনি বাবাকে একটি পত্রে নিজের অপরাধের কথা লিখে জানালেন এবং মার্জনা ভিক্ষা করলেন। স্নেহময় পিতা পুত্রের এই সততায় অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং পুত্রকে বুকে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

এই বন্ধুটি মোহনদাসের মনে তাঁর কিশোরী স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে নানাভাবে সংশয় জাগাবার চেষ্টা করেছিল। মোহনদাস সহজেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন এবং বালিকা বধূকে নানা বিধিনিষেধের নিগড়ে বাঁধতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বালিকা হ'লেও কস্তুরবাঈ ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়। স্বামীর এইসব জুলুমকে তিনি হাসিমুখে উপেক্ষা করতেন তাতে। কিশোর স্বামী ক্রুদ্ধ হ'লেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতেন। গান্ধীজী পরবর্তীকালে বলেছিলেন, এ ছিল তাঁর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা; তাঁর জুলুম ও জবরদস্তি তাঁর বালিকা বধূর নীরব ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কাছে ব্যর্থ হ'তো। এইভাবে কস্তুরবাঈই মোহনদাসকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শিক্ষা দিয়েছিলেন— "and in the end she became my teacher in non-violence."

কৈশোরের দিনগুলিতে মোহনদাসের যে বিচুতি ও বিভ্রান্তি ঘটেছিল, তা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। তৎকালীন তরুণদের মধ্যে এসব দোষ প্রায়ই দেখা যেত। মোহনদাসের মধ্যে অসামান্য যা ছিল, এসব ভুল-ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে অবিরাম চেষ্টা ও দৃঢ়সংকল্প। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনের দৃঢ়তা যে কতো ছিল, তা এই সময়কার একটা ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়। একবার বাড়িতে আম খাওয়ার জন্যে অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। একজন যুবককে নিমন্ত্রণ করবার ভার ছিল মোহনদাসের উপর। মোহনদাসের ভুলে ঐ যুবককে ঠিকমতো নিমন্ত্রণ করা হয় নি, তাই যুবকটি ভোজে যোগ দিতে আসে নি। তাঁর ত্রুটির ফলেই এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে যখন দশ বছরের বালক মোহনদাস জানতে পারলেন, তখনই তিনি এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে ঐ মরসুমে একেবারে আম খাবেন না ব'লে শপথ করলেন। তাঁর বাবা ও ঐ যুবকটি তাঁকে এ বিষয়ে নানাভাবে বোঝালেও তিনি নিজের

সংকল্পে অটল রইলেন, যদিও আম খেতে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। যে সংকল্পের দৃঢ়তা, ত্যাগের শক্তি ও আত্মনিগ্রহের কথা একদিন জগৎকে বিস্মিত করেছিল, তার আভাস মোহনদাসের বাল্যকালেই আমরা পাই।

এই সময়ে অনুসন্ধিৎসা এবং ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বিচারশক্তিও এই বালকের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। ঐ সময়ে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুধর্মের যে পুনরুজ্জীবন চলছিল, তার প্রভাব থেকে রাজকোট মুক্ত ছিল না। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। গান্ধী-পরিবারে উকা নামে একজন মেথর পায়খানা সাফ করতো। উকাকে মোহনদাস যাতে ছুঁয়ে না ফেলেন, সেজন্যে তাঁর মা তাঁকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। মোহনদাসের বয়স তখন মাত্র বারো বছর। তিনি মাকে বলেছিলেন, "অস্পৃশ্যতা মেনে চলবার কথা শাস্ত্রে নেই। তা যদি থাকতো তবে রামচন্দ্রকে একজন অস্পৃশ্য কিভাবে তার নৌকোয় গঙ্গা পার ক'রে দিয়েছিল?" অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন গান্ধীজীকে চিরজীবন ব্যাকুল করেছিল। এর অঙ্কুরও আমরা দেখি তাঁর বাল্যকালেই।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর মোহনদাসের পিতা অসুস্থ ছিলেন। এই সময়ে মোহনদাস সযত্নে পিতার সেবা করতেন। তাঁর বয়স যখন ষোল বছর, তখন ৬২ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। তাঁর পিতার মৃত্যুর কয়েকদিন বাদেই কস্তুরবাঈ ও মোহনদাসের একটি সন্তান-লাভ ঘটে। কিন্তু তিন চার দিনের মধ্যে ঐ শিশুর মৃত্যু হয়।

১৮ বছর বয়সে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, মোহনদাস আমেদাবাদ কেন্দ্র থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও পরীক্ষায় পাস করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস ক'রে তিনি ভাবনগরে শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু কলেজে ইংরেজীর মাধ্যমেই সব পড়াশুনো হওয়ায় তিনি খুবই অসুবিধা বোধ করতে থাকেন

এবং এক বছর প'ড়েই কলেজ ছেড়ে বাড়ি চলে আসেন। গান্ধী-পরিবারে উচ্চশিক্ষার চলন ছিল না। মোহনদাসের পিতা ও পিতামহ যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া নিয়েই একাধিক দেশীয় রাজ্যের দেওয়ানি ক'রে গিয়েছিলেন। কিন্তু দিনকাল বদলেছে। পিতা-পিতামহের সম্মানজনক পদ পেতে হ'লে উচ্চশিক্ষার যে খুবই দরকার তা পরিবারের সকলেই বোধ করছিলেন। তাঁরা সকলেই মোহনদাসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আশা পোষণ করতেন। কিন্তু মোহনদাস কলেজ ছেড়ে চলে আসায় সকলে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তাঁদের পরিবারের জনৈক হিতৈষী বন্ধু মাবজি দাবে বললেন, এই অবস্থায় মোহনদাসকে বিলাতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টারি পড়িয়ে আনা উচিত। তিনি বললেন, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে ডিগ্রি পেতে হ'লে যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হয়, তা বিচার ক'রে দেখলে বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পড়িয়ে আনা বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির দামই বা কি? ওতে বড়োজোর স্কুলমাস্টারি কি কেরানীগিরি জুটতে পারে। মোহন যদি ব্যারিস্টার হয়ে আসতে পারে, তবে সে সহজেই তার পিতা-পিতামহের মতো দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান হ'তে পারবে।

এই প্রস্তাবে মোহনদাস খুবই উৎসাহী হয়ে উঠলেন। আর্থিক দিক্ থেকে অসুবিধা বোধ করলেও তাঁর দাদাও এতে রাজী হলেন। কিন্তু মা সহজে রাজী হ'তে পারলেন না, সুদূর অজ্ঞাত দেশে অনাত্মীয়ের মাঝে বালক পুত্রকে পাঠাতে তিনি ভয় পেলেন। মোহনের উৎসাহ দেখে তিনি তাকে দৃঢ়ভাবে বাধা দিতেও সাহস পেলেন না। তাই তিনি মোহনকে গান্ধী-পরিবারের সর্ববয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে পরামর্শ নেওয়ার জন্যে পোরবন্দরে পাঠালেন। মোহনদাস গোরুর গাড়ি ও উটের পিঠে চড়ে পোরবন্দরে পৌঁছলেন। কিন্তু পরিবারের প্রবীণতম ব্যক্তিটি এই ধরনের সমাজবিরোধী কাজে উৎসাহ দিলেন না। মোহনদাস পোরবন্দরের ব্রিটিশ

প্রশাসক মিঃ লেভির সঙ্গে দেখা ক'রে বিদেশে পড়বার জন্যে একটি স্কলারশিপের জন্যে আবেদন করলেন। লেভি সাহেব রুক্ষভাবেই তাঁকে জানালেন যে, তাঁর উচিত আগে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ডিগ্রি নেওয়া, তারপর স্কলারশিপের জন্যে আবেদন করা। মোহনদাস মুসড়ে পড়লেন। তিনি শেষ পর্যন্ত বিলাত যাওয়ার জন্যে তাঁর স্ত্রীর গহনাগাঁটি বিক্রি ক'রে টাকা সংগ্রহ করবার কথা ভাবলেন। কিন্তু দাদা নিজেদের শত অসুবিধা সত্ত্বেও অর্থসংগ্রহের ভরসা দেওয়ায় সে পথ মোহনদাসকে নিতে হ'লো না। মা কিন্তু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তিনি বেচারজী স্বামী নামে এক জৈন সাধুর কাছে পরামর্শ নিলেন। জৈন সাধু বললেন, মোহন যদি মদ্য মাংস ও নারী স্পর্শ করবে না এই প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে সে ইংলণ্ডে যেতে পারে। মোহনদাস সানন্দে মায়ের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মায়ের অনুমতি আদায় করলেন।

এদিকে আরও অন্তরায় দেখা দিলো। গান্ধীরা ছিলেন মোধ-বানিয়া সম্প্রদায়ের লোক। মোধ-বানিয়া সম্প্রদায়ের মোড়লরা এক মজলিসে মোহনদাসকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, ইংলণ্ডযাত্রা ধর্মবিরোধী, সুতরাং তাঁর ইংলণ্ড যাওয়া চলবে না। উনিশ বৎসরবয়স্ক মোহনদাস অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির হ'লেও মোড়লদের সঙ্গে তর্ক করতে পশ্চাদ্‌পদ হলেন না। এতে মোড়লরা আরও ক্রুদ্ধ হলেন এবং মোহনদাসকে সমাজচ্যুত ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাতেও মোহনদাসকে বিরত করা গেল না। তাঁদের এই আদেশ কার্যকর হওয়ার আগেই তিনি মা, এক শিশুর জননী পত্নী কস্তুরবাঈ, দাদা ও আত্মীয়পরিজনের কাছে বিদায় নিয়ে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাই থেকে জাহাজযোগে ইংলণ্ড রওনা হলেন।

দুই

ছাত্রাবস্থায় ইংলণ্ডে

মোহনদাস রাজকোটের একটি সংকীর্ণ সমাজ ও পরিবেশ থেকে ইংলণ্ডগামী একটি জাহাজের বিশ্বজনীন পরিবেশের মধ্যে এসে পড়লেন। পাশ্চাত্যদেশীয় পোশাক, চালচলন, রীতিনীতি রপ্ত করা সহজ ব্যাপার ছিল না। স্কুল-কলেজে তিনি যেটুকু ইংরেজী শিখেছিলেন, দেখা গেল, তা কথাবার্তা বলার পক্ষে কার্যকর হচ্ছে না। কথা বলবার সময়ে তিনি কেবলই বোধ করতেন যে, ইংরেজী ভুল হচ্ছে, ফলে কথা না ব'লে চুপ ক'রে যেতেন। তারপর খাদ্যের ব্যাপারেও নানা অসুবিধা দেখা গেল। তিনি নিরামিষ আহারের যে অঙ্গীকার ক'রে এসেছিলেন তা পালনের জন্যে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতেন। কোন্ খাবার কি দিয়ে তৈরী তা জানবার জন্যে ইংরেজীতে প্রশ্ন করতে হবে দেখে তিনি কয়েকদিন নিজের সঙ্গে আনা কিছু মিষ্টি ও ফল খেয়েই কাটালেন। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে খাদ্য সম্পর্কে অযাচিত উপদেশ দিতে লাগলেন। একজন হিতৈষী বললেন, এডেন পার হ'লে মাংস না খেয়ে থাকা যাবে না। এডেন নিরাপদে পার হওয়া গেল। কিন্তু তখনই হিতৈষীটি বললেন, লোহিত সমুদ্র পার হওয়ার পরই মাংসাহার অপরিহার্য হয়ে পড়বে। মদ্যপান সম্পর্কেও তিনি ঐ রকম ভয়ংকর ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে লাগলেন। ভূমধ্যসাগর পার হ'লে হিতৈষীটি জানালেন যদিও মোহনদাস এতোদিন মদমাংস ছাড়া কোনরকমে কাটিয়েছেন, বিস্কে উপসাগরে পড়লে মদমাংস ছাড়া বাঁচাই দুরূহ হয়ে উঠবে। কিন্তু মদমাংস ছাড়াই বিস্কে উপসাগরও পার হওয়া গেল। অঙ্গীকার ভঙ্গ না ক'রেই মোহনদাস সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি ইংলণ্ডে নামলেন।

জাহাজে তিনি একটি কালো রংয়ের স্যুট পরতেন। তিনি জাহাজ থেকে নামলেন সাদা রংয়ের ফ্লানেলের স্যুট পরে। বেশ শীত

পড়েছিল। তাই অন্যান্য যাত্রীরা সকলেই উপযুক্ত গরম পোশাক পরেছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে এরকম হালকা পোশাক একমাত্র মোহনদাসই পরেছিলেন।

মোহনদাস ইংলণ্ডবাসী বারোজন ভারতীয়ের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছিলেন। এঁরা ছিলেন গান্ধী-পরিবারের হিতৈষী বন্ধু ডাঃ পি. জে. মেহ্‌তা, মিঃ দলপতরাম শুক্ল, বিখ্যাত ক্রিকেটার কুমার রণজিৎ সিংজী এবং দেশবরেণ্য দাদাভাই নওরোজী। দাদাভাই নওরোজীকে যে মারাঠী ভদ্রলোক চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে দাদাভাইয়ের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং তিনি যে-কোন ভারতবাসীকে যে সানন্দে সাহায্য করবেন, এই স্থির বিশ্বাসের ফলেই এই ভদ্রলোক চিঠি দিতে সাহস করেছিলেন।

গান্ধীজী লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া হোটেলে এসে উঠলেন। তিনি হোটেলে এসে উঠবার পর ডাঃ মেহ্‌তা তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করলেন। ডাঃ মেহ্‌তা একটি রেশমী টপ হ্যাট মাথায় দিয়ে এসেছিলেন। মোহনদাস এই বস্তুটি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এবং হাত বুলিয়ে টুপিটি দেখতে লাগলেন। উল্টোদিকে হাত বুলোনোর ফলে টুপিটির ফারগুলি উস্‌কোখুস্‌কো হয়ে গেল। ফলে ডাঃ মেহ্‌তা বিরক্ত হলেন এবং নবাগত তরুণকে কয়েকটি অপরিহার্য উপদেশ দিলেন। বললেন, "কারও জিনিসে হাত দিও না। আমরা দেশে যেমন করি সেভাবে প্রথম পরিচয়েই কারও নামধাম পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন ক'রো না। দেশে যেমন আমরা সাহেবদের 'স্যার' বলি, তেমনটি ক'রো না ; কারণ, এখানে বাড়ির ঝি-চাকর ও অধস্তন কর্মচারীরা ছাড়া কেউ কাউকে 'স্যার' বলে না।"

এখানে চারদিকে ঐশ্বর্যের জাঁকজমক দেখে মোহনদাসের চোখ ঝলসে গেল। বৈদ্যুতিক আলো, লিফ্‌ট প্রভৃতি বিজ্ঞানের নবোদ্ভাবিত কীর্তিগুলি তাঁকে অবাক করলো। কিন্তু এতো

আড়ম্বর ও সুখসুবিধার ঢালাও ব্যবস্থা সত্বেও তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন। কেবলই রাজকোটের সেই অনাড়ম্বর গৃহকোণ, স্নেহময়ী জননী, বালিকা-বধূ, শিশুপুত্র, দাদা, আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে পড়তে লাগলো।

মোহনদাস এই হোটেলে মাত্র বারোদিন ছিলেন। রোজ এখানে এক পাউণ্ড ক'রে লাগতো। এতো টাকা তাঁর স্নেহশীল দাদার পক্ষে জোগানো যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল, তা তিনি জানতেন। তাই তিনি হোটেল ছেড়ে অল্পখরচের একটি বোর্ডিং-হাউসে উঠে গেলেন। এই বোর্ডিং-হাউসের মালিক ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। এখানে প্রায়ই মোহনদাসকে অনাহারে কাটাতে হ'তো। তিনি আমিষ-খাদ্য কিছুই খেতেন না, আর নিরামিষ খাদ্য যা জুটতো, তাও ছিল মুখে দেওয়ার অযোগ্য। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে বেন্টামের 'থিওরি অব ইউটিলিটি' পড়তে দিলেন। বইখানা তাঁর কাছে দুর্বোধ লাগলো। তিনি তাঁর বন্ধুকে বললেন, "স্বীকার করি, মাংস খাওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি আমার শপথ ভাঙতে পারি না।" তাই তাঁকে খাদ্যের দিক থেকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হ'লো। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি হাতে স্বর্গ পেলেন। নিরামিষ খাদ্যের সন্ধানে শহরের পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ফ্যারিংডন স্ট্রীটে একটি অদ্ভুত ধরনের রেস্তোরাঁ দেখতে পেলেন। রেস্তোরাঁয় কেবল নিরামিষ খাদ্যই সরবরাহ করা হয় না, নিরামিষ আহারের বিষয়ে প্রচারও চালানো হয়। এখানে তিনি অনেক দিন পরে পেট ভ'রে নিরামিষ খাদ্য খেলেন এবং সল্টের লেখা Plea for Vegetarianism (নিরামিষ আহারের সমর্থনে যুক্তি) নামে প্রচার-পুস্তিকা এক কপি কিনলেন। বইখানা তিনি আগাগোড়া পড়লেন এবং নিরামিষ আহারের সমর্থনে যেসব যুক্তি দেখানো হয়েছিল, সেগুলি তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করলো। এতোদিন তিনি মাংসাহারের উপযোগিতায় বিশ্বাসী

ছিলেন এবং মায়ের কাছে নিজের অঙ্গীকাররক্ষার জন্যেই নিরামিষ খেতেন। কিন্তু এখন তিনি স্বেচ্ছায় নিরামিষাশী হয়ে উঠলেন এবং নিরামিষ আহারের উপযোগিতার কথা প্রচারই তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে উঠলো। তিনি এখন থেকে নিয়মিত এই রেস্তোরাঁয় খেতে লাগলেন এবং নিরামিষ আহারের সমর্থক বহু বিশিষ্ট ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠলেন। এখন থেকে তিনি খাদ্য সম্পর্কে নিজে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। তিনি মিষ্টান্ন খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলেন, চা ও কফির বদলে কোকো খেতে লাগলেন। এক-এক সময় তিনি একাদিক্রমে কিছুদিন শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য স্পর্শ করলেন না, কিছুদিন বা একটানা কেবল রুটি ও ফল খেয়ে থাকলেন, আবার কখনও বা একটানা দুধ ডিম ও পনির খেয়ে কাটালেন।

মদমাংস স্পর্শ না করায় এবং খাদ্যের ব্যাপারে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকায় অনেকেই তাঁকে ছিটগ্রস্ত মনে করতে লাগলেন, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ-সভ্যতার দিক্ থেকে নিতান্ত অনগ্রসর ভাবলেন। তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার জন্যে মোহনদাস পোশাক-পরিচ্ছদে ও আদবকায়দায় পুরোদস্তুর ইংরেজ হয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। তিনি নামকরা দর্জির দোকানে পোশাক তৈরি করালেন, বণ্ড্ স্ট্রীট থেকে ইভনিং স্যুট, এমন কি টপ হ্যাটও কিনলেন। খোঁচা খোঁচা চুলগুলিকে সুবিন্যস্ত করতে ও ঠিকমতো টাই বাঁধতে তাঁর রোজই বেশ খানিকটা সময় আয়নার সামনে কাটলো। তিনি পকেটঘড়িতে ডবল সোনার চেন লাগালেন। তিনি ফরাসী ভাষা শিখলেন, নির্ভুল উচ্চারণ ও বাক্পটুতা অর্জনের জন্যে ক্লাস করতে লাগলেন। নাচ ও গানের পাঠ নিতেও শুরু করলেন। নিখুঁত ইংরেজ ভদ্রলোক হওয়ার জন্যে তিনি অর্থ ও সময়ের দিক থেকে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করলেন না।

কিন্তু আত্মসমীক্ষার যে অভ্যাস তাঁর বাল্যকাল থেকে গড়ে

উঠেছিল, তা এ ক্ষেত্রেও নিষ্ক্রিয় রইলো না। খাঁটি ইংরেজ ভদ্রলোক ব'নে লাভটা কি হবে, এ প্রশ্ন শীঘ্রই তাঁর মনে জাগলো। তাছাড়া, তাঁর দাদা কিভাবে অর্থসংগ্রহ ক'রে তাঁকে জোগান দিচ্ছেন, হয়তো সংসারে অনটন দেখা দিয়েছে, হয়তো দাদা ঋণভারে জর্জরিত হচ্ছেন,—ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁকে শীঘ্রই ব্যাকুল করলো। তাই তিনি নিখুঁত ইংরেজ ভদ্রলোক সাজবার লোভ সংবরণ ক'রে যথাসম্ভব ব্যয়-সংকোচের জন্য সচেষ্ট হলেন। ব্যয়-সংকোচের দিকটাও আবার চূড়ান্ত আকার ধারণ করলো। তিনি প্রতিটি ফার্দিং খরচের হিসাব রাখতে লাগলেন। তিনি বাসা বদল ক'রে আরও অল্পভাড়ার ঘরে গেলেন, নিজেই নিজের খাদ্য প্রস্তুত ক'রে নিলেন, বাস-ভাড়া বাঁচাবার জন্যে রোজ আট-দশ মাইল হাঁটতে লাগলেন। তিনি যখন লণ্ডনে নেমে হোটেলে উঠেছিলেন, তখন তাঁর রোজ খরচ হচ্ছিল এক পাউণ্ড, এখন তিনি দু পাউণ্ডেই সারা মাসের খরচ চালাতে সমর্থ হলেন। তাঁর দাদা ও পরিবারের উপর থেকে চাপ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে ফেলতে পারায় তাঁর আনন্দের সীমা রইলো না। অবশ্য, এই ধরনের কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁর শরীর ভেঙে পড়বে ব'লে তাঁর বন্ধুরা অনেকেই ভীত হলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে বাইরে একটি সামঞ্জস্য সাধিত হ'লো, তিনি মানসিক শান্তি লাভ করলেন। তিনি তিন মাস নিখুঁত ইংরেজ ভদ্রলোক সাজবার চেষ্টা ক'রে সেদিকে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছিলেন। ফলে যাঁরা তাঁকে ইংরেজ ভদ্রমহলে চলাফেরার অযোগ্য মনে করেছিলেন, তাঁরাও এখন মত পাল্টালেন।

ইংরেজ ভদ্রমহলে তিনি যে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারেন, শীঘ্রই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। তিনি ইংরেজ মহিলাদের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করতে সমর্থ হলেন যে, কোনও কোনও ইংরেজ তরুণী-ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের মতো তিনি গোড়ার দিকে নিজের বাল্যবিবাহ সম্পর্কে

নীরব থাকতেন। ফলে তাঁর এক মহিলা-বন্ধু তাঁর সঙ্গে একজন তরুণীর বাগ্‌দানের ব্যবস্থাও ক'রে ফেললেন। কিন্তু মোহনদাস অন্যান্য অনেক তরুণের মতো আর নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি একটি পত্র লিখে তাঁর মহিলা-বন্ধুটিকে জানালেন যে, তিনি বিবাহিত ও সন্তানের পিতা। তাঁর এই সততায় ও সৎ সাহসে তাঁর মহিলা-বন্ধু ও তরুণীটি দুজনেই খুবই আনন্দিত হলেন এবং তাঁদের বন্ধুত্ব অম্লান রইলো।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তিনি ব্যারিস্টার হওয়ার জন্যে ইনার টেম্পলে ভর্তি হলেন। পরীক্ষার জন্যে তাঁকে তিন বৎসর ইংলণ্ডে থাকতে হবে। পরীক্ষা সোজা; প্রত্যেক টার্মে অন্তত দুটি ডিনারে যোগ দিতে হবে। পরীক্ষা সোজা হ'লেও মোহনদাস কিন্তু বিনা পড়াশুনোয় ব্যারিস্টার হ'তে চাইলেন না। তিনি ল্যাটিন ভাষায় Roman Law, ব্রুম-রচিত Common Law, স্নেল-রচিত Equity, হোয়াইট ও টিউডর-লিখিত Leading Cases, উইলিয়ামস্ ও এডোয়ার্ড-রচিত Real Property, গুডিভ-রচিত Personal Property, মেইন-রচিত Hindu Law প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থগুলি মনোযোগের সঙ্গে পড়লেন। ইতিমধ্যে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও পাস ক'রে নিতে চাইলেন। পরীক্ষায় তিনি ফরাসী, ইংরেজী ও রসায়নে পাস করলেও ল্যাটিনে ফেল করলেন। কিন্তু তাতেও তিনি দমলেন না, ছমাস বাদে আবার পরীক্ষা দিলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

মোহনদাস যখন ভারতে ছিলেন, তখন তিনি খবরের কাগজ পড়তেন না। এখানে এসে রোজই ডেলি-টেলিগ্রাফ, ডেলি-নিউজ ও পলমল গেজেটের মতো শীর্ষস্থানীয় কাগজগুলি পড়তে লাগলেন। তিনি লণ্ডনে দুবার থিয়েটারও দেখলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি দুজন থিওজফিস্টের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এঁদের সঙ্গেই তিনি সর্বপ্রথম গীতা পড়েন। ঐ থিওজফিস্ট

বন্ধুরা এডুইন আর্নল্ডের গীতার ইংরেজী অনুবাদ The Song Celestial পড়ছিলেন। তাঁরা ঐ সঙ্গে তাঁকে মূল গীতা পড়ে শোনাতে বললেন। গীতা মোহনদাসের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো এবং তাঁর জীবনের অন্যতম চিরসঙ্গী হয়ে উঠলো। অল্পদিন বাদেই তিনি আর্নল্ড-রচিত ইংরেজী বুদ্ধচরিত Light of Asia পড়লেন। এই বইখানিও তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। আর্নল্ডও ছিলেন নিরামিষাশী, নিরামিষ আহারের সমর্থক ও প্রচারক। মোহনদাস আর্নল্ডের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য গড়ে উঠলো। তাঁর থিওজফিস্ট বন্ধুরা দুজন সুবিখ্যাত থিওজফিস্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন—একজন রুশ-মহিলা মাদাম ব্লাভাত্স্কি, এবং অন্যজন মিসেস্ অ্যানী বেসাণ্ট। থিওজফিস্টদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তিনি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তবে তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দিলেন না।

গান্ধীজী যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন ইংলণ্ডে চিন্তার জগতে নানা আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সিডনি ওয়েব, বিয়াট্রিস ওয়েব, জর্জ বার্নার্ড শ-র নেতৃত্বে ফেবিয়ান সোসাইটি সমাজতন্ত্রের প্রচার করছিল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বার্নার্ড শ-র Fabian Essays প্রকাশিত হয়েছিল। ম্যাক্স্মুলার, এডুইন আর্নল্ড প্রভৃতির রচনায় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সুপ্রাচীনতা ও শ্রেষ্ঠতা ইউরোপীয়দের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছিল। ভারত সম্পর্কে এক নব-চেতনা দেখা দিয়েছিল ইংরেজ তথা ইউরোপীয়দের মনে। ১৮৮৮ ও ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দুজন বিশিষ্ট ইংরেজ—জর্জ ইউল ও স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন এবং ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মুক্তকণ্ঠে ইংরেজ শাসকদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক,

মনীষী ও নাস্তিক্যবাদী ব্র্যাডল-ও ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। ব্র্যাডল ছিলেন ভারতপ্রেমিক; ভারতীয় বিষয় নিয়ে তিনি প্রায়ই আলোচনা করতেন; তাই তিনি দেশে Member for India নামে পরিচিত হয়েছিলেন। মোহনদাস ব্র্যাডলর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ব্র্যাডলর নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কে তিনি কিছুদিন কৌতূহলী হয়ে উঠলেও তা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে ব্র্যাডলর মৃত্যু হ'লে মোহনদাস ইংলণ্ডের কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে ব্র্যাডলর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "অপরের ক্ষেত্রে ভগবান্ যে স্থান অধিকার করেন, ব্র্যাডলর মতো নাস্তিকদের ক্ষেত্রে সত্য সেই স্থান অধিকার করে।" ঐ সময়ে মোহনদাস শ্রমিক-আন্দোলন সম্পর্কেও কৌতূহলী ছিলেন। শ্রমিকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ডক-শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল। কার্ডিন্যাল ম্যানিং ধর্মঘটীদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাই মোহনদাস তাঁর একজন ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে কার্ডিন্যাল ম্যানিংকে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছিলেন।

মোহনদাস নানা বিষয়েই কৌতূহলী ও উৎসাহী হ'লেও তাঁর সর্বাধিক উৎসাহ দেখা দিয়েছিল নিরামিষভোজনের সমর্থন ও প্রচার সম্পর্কে। আমিষ আহারের সঙ্গে জীবহত্যা ও হিংসার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং পরবর্তীকালের অহিংসার মন্ত্রসাধক গান্ধী যে নিরামিষ আহার সম্পর্কে এতই উৎসাহী হয়ে উঠবেন, তাতে আশ্চর্য কি?

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মোহনদাস লণ্ডন ভেজিটারিয়ান সোসাইটিতে যোগ দিলেন এবং শীঘ্রই এর কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হয়ে উঠলেন। তিনি এই সোসাইটির ব্যাজ উদ্ভাবনেও সহায়তা করলেন। তিনি নিজের বাসস্থানের কাছে বেজওয়াটারে একটি ভেজিটারিয়ান

ক্লাবও প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি নিজে এই ক্লাবের সেক্রেটারি হলেন এবং এডুইন আর্নল্ড হলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তবে তিনি শীঘ্রই বাসা বদল করায় ঐ ক্লাবটি উঠে যায়। এই নিরামিষভোজন আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি ইংলণ্ডের বহু মনীষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন—যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ, থিওজফি, জন্ম-শাসন প্রভৃতি বিষয়ে ছিলেন দিক্‌পাল। নিরামিষ আহার প্রসঙ্গে মোহনদাস 'ভেজিটারিয়ান' পত্রিকায় হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহার ও খাদ্য-পানীয় সম্পর্কে ন'টি নিবন্ধ লেখেন।

'ভেজিটারিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ জোসিয়া ওল্ডফীল্ড মোহনদাসের সঙ্গে একই কক্ষে থাকতেন। তিনি মোহনদাসকে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে কৌতূহলী ক'রে তোলেন। তাঁর অনুরোধে মোহনদাস বাইবেল পড়েন। বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট অংশ, বিশেষভাবে 'সারমন অন দি মাউণ্ট' তাঁকে মুগ্ধ করে। মোহনদাস গির্জার উপাসনাতেও বহুবার যোগ দেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কথা তিনি বারেকের জন্যও চিন্তা করেন নি। গীতা, লাইট অব এশিয়া ও সারমন অন দি মাউণ্ট তাঁর ধর্মীয় চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাস করলেন এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন বারে তাঁর ডাক পড়লো। পরদিন হাইকোর্টে তাঁর নাম লিপিবদ্ধ হ'লো।

মোহনদাস অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রস্তুত হলেন। তিনি লণ্ডনত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর নিরামিষভোজী বন্ধুদের হলবর্ন্ রেস্তোরাঁয় একটি নিরামিষ ভোজে আপ্যায়িত করেন। বন্ধুরা তাঁকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি ধন্যবাদ জানানোর বেশি কিছুই বলতে পারলেন না। ভেজিটারিয়ান পত্রিকায় তাঁর ফটোসহ একটি পূর্ণপৃষ্ঠা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হ'লো। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন মোহনদাস জাহাজযোগে ভারতে রওনা হলেন।

তিন

স্বদেশে : মক্কেলহীন ব্যারিস্টার

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার বার-এ্যাট্‌-ল জাহাজ থেকে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করলেন। তিনি ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছেন; তিনি মার কাছে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন; সুতরাং পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গেই তিনি স্বদেশে ফিরছেন। কিন্তু একটি মর্মান্তিক বেদনাময় সংবাদ যে তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করছে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

তাঁকে নেওয়ার জন্যে তাঁর দাদা এসেছিলেন বোম্বাইয়ে। গান্ধীজী তাঁর কাছে শুনলেন, তিনি যখন লণ্ডনে ছিলেন, তখন তাঁর মা পরলোক গমন করেছেন। বিদেশে তাঁকে তাঁরা এই দুঃসংবাদ দেন নি। গান্ধীজী এতোবড়ো আঘাতের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তবু অতুলনীয় স্থৈর্যের সঙ্গে তিনি এই শোক সহ্য করলেন। ইংলণ্ডযাত্রার প্রাক্কালে মোধ-বানিয়া সম্প্রদায়ের মোড়লরা তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল। তাই তাঁর দাদা ঐ মোড়লদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নাসিকে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে গোদাবরীতে স্নান করিয়ে শুদ্ধি করালেন। গোদাবরীতে স্নান করায় মোধ-বানিয়া সম্প্রদায়ের একাংশ শান্ত হ'লো; তবে অন্যরা এতে সন্তুষ্ট হ'লো না; তারা গান্ধীজীকে সমাজচ্যুত ক'রেই রাখলো। গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে কোনও বাদ-প্রতিবাদ করলেন না। যারা তাঁর প্রতি এই কঠোর আচরণ করেছিল, তাদের প্রতি তিনি কোন প্রকার ক্ষোভ বা ক্রোধ প্রকাশ করলেন না। কালক্রমে তাদের কঠোরতাও হ্রাস পেয়েছিল এবং পরবর্তীকালে গান্ধীজীর সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনে সমগ্র মোধ-বানিয়া সম্প্রদায় তাঁকে অনুসরণ করেছিল।

গান্ধীজী ব্যারিস্টারি পাস করলেও একটি সংশয় তাঁকে ক্রমাগত বিব্রত করছিল। তিনি আইন তো পড়লেন, আইনের ব্যবসা করতে পারবেন তো? তিনি লাজুক-প্রকৃতির, ছোট-খাটো মজলিসেই তাঁর বাক্‌স্ফূর্তি হয় না, তিনি কি আদালতে বাক্‌যুদ্ধ করতে পারবেন? স্যার ফিরোজ শাহ্‌ মেহ্‌তা প্রভৃতি বিখ্যাত আইনজীবীদের কথা তিনি শুনেছিলেন। তাঁদের তুলনায় নিজেকে তাঁর অত্যন্ত শক্তিহীন মনে হ'লো। তিনি কিভাবে নিজেকে নিজ-ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক'রে তুলতে পারেন, সে বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ আইনজীবীদের পরামর্শ নিতে চাইলেন। ইংলণ্ডে তিনি বিখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ্‌ দাদাভাই নওরোজীর পরামর্শ নেবেন, স্থির করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার মতো সাহস তিনি সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারেন নি। এ বিষয়ে অবশ্য একজন ইংরেজ আইনজীবী তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি প্রচুর পড়াশুনো করতে ও লোকচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে বলেছিলেন।

দেশে ফিরেই গান্ধীজী এবার অর্থোপার্জনের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত মনে করলেন। কারণ, এ বিষয়ে তাঁর সাফল্যের উজ্জ্বল আশা নিয়েই তাঁর দাদা অত্যন্ত আর্থিক অনটন সত্ত্বেও নিঃসংকোচে অর্থব্যয় করেছেন। কিন্তু বিলাতে লব্ধ ব্যারিস্টারি ডিগ্রির মধ্যে এমন কোনও জাদুমন্ত্র নেই, যাতে তিনি তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের আশানুরূপ অর্থ ও যশ লাভ করতে পারেন। তাছাড়া তিনি দেখলেন, ভারতীয় আইনের তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না। রাজকোটের সাধারণ উকিলরাও হিন্দু ও মুসলিম আইন তাঁর চেয়ে অনেক ভালো জানে এবং তারা দু-চার টাকাতেই মক্কেলের কাজ করে দেয়। সুতরাং রাজকোটে প্র্যাকটিস করতে বসা অর্থহীন। তাই তিনি বোম্বাই যেতে মনঃস্থ করলেন। এখানে তিনি ভারতীয় আইন পড়াশুনো করবেন, হাইকোর্ট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, পেলে দু-একজন মক্কেল যোগাড়

করবেন। গান্ধীজী তখনও অনভিজ্ঞ যুবক; তাঁর বয়স বড় জোর বাইশ।

গান্ধীজী গিরগাঁও অঞ্চলে একটি বাসা নিলেন এবং রোজই দু'মাইল হেঁটে হাইকোর্টে যেতে লাগলেন। তিনি ভালো ক'রে Evidence Act, Hindu Law, Civil Procedure Code প্রভৃতি পড়তে লাগলেন। বাসায় রান্নার জন্যে একজন ব্রাহ্মণ রেখেছিলেন। লোকটা ছিল যেমন মূর্খ ও নির্বোধ, তেমনি নোংরা। তিনি তার সঙ্গে প্রভুর মতো ব্যবহার করতেন না। সকল কাজেই তার সঙ্গে অংশ নিতেন এবং তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলতে চেষ্টা করতেন।

আইনকানুন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বাড়লেও তাঁর উপার্জন বাড়বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মামলা যোগাড়ের জন্যে দালালদের দালালি দেওয়া একটা সুপ্রচলিত রীতি। কিন্তু গান্ধীজী এই ব্যবস্থাটাকে নীতিবিরুদ্ধ এবং একজন ব্যারিস্টারের পক্ষে মর্যাদা-হানিকর মনে করতেন। সুতরাং মামলা প্রায় তাঁর কাছে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো। অবশেষে তিনি মামিবাঈ নামে এক দরিদ্র স্ত্রীলোকের একটি মামলা পেলেন এবং এই মামলার জন্যে তিনি ত্রিশ টাকা ফি দাবি করলেন। বিচার হচ্ছিল স্মল কজেস কোর্টে। তিনি একজন সাক্ষীকে জেরা করতে উঠে ঘাবড়ে গেলেন, কি জিজ্ঞাসা করবেন না করবেন, সবই ঘুলিয়ে ফেলে বসে পড়লেন এবং মক্কেলকে তাঁর ফি ফেরত দিয়ে তাকে অন্য উকিল নিয়োগ করতে বললেন। এই ধরনের লজ্জাকর ঘটনার পরে গান্ধীজী আইনব্যবসার আশা ছেড়ে আদালতে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন।

এখন তিনি এমন দুরবস্থায় পড়লেন যে, তিনি বোম্বাই হাই স্কুলে একটি পার্ট-টাইম শিক্ষকের পদের জন্যেও উমেদার হলেন। শিক্ষকতার জন্যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাস করলেও কোন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তাঁর ছিল না। ফলে চাকরি জুটলো না। তবে তিনি শীঘ্রই আবিষ্কার করলেন যে, আদালতে মামলা চালাবার কাজে তিনি অসমর্থ হ'লেও আইন ও ইংরেজী দুটোই ভালো জানায় দরখাস্ত, স্মারকলিপি প্রভৃতির মুসাবিদা করতে পটু; এ কাজে তিনি জীবিকা অর্জনও করতে পারবেন। তাই তিনি বোম্বাই থেকে রাজকোটে চলে এলেন এবং সেখানে দরখাস্ত, স্মারকলিপি ইত্যাদির খসড়া লিখে মাসে গড়ে তিনশ টাকা রোজগার করতে লাগলেন। এই কাজ যোগাড় ক'রে দিতেন আদালতের উকিলরা। তাঁদের দালালি দিতে হ'তো। গান্ধীজী এটা নীতিবিরুদ্ধ মনে করলেও দাদার অনুরোধে এতে রাজী হয়েছিলেন।

কিন্তু রাজকোটেও থাকা তাঁর পক্ষে শীঘ্রই কঠিন হয়ে উঠলো। পোরবন্দরের রানা সাহেব গদিতে বসবার আগে গান্ধীজীর দাদা লক্ষ্মীদাস তাঁর সেক্রেটারি ও উপদেষ্টা ছিলেন। ঐ সময়ে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে লক্ষ্মীদাসের কলহ হয়েছিল। রাজকোটে ছিল ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্সির সদর দপ্তর। লক্ষ্মীদাস এখানেই মোক্তারের কাজ করতেন। ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে বিবাদ থাকায় নানাদিক্ থেকে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল। গান্ধীজী যখন বিলাতে ছিলেন, তখন এই ইংরেজ ভদ্রলোক ছুটিতে স্বদেশে গিয়েছিলেন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সামান্য পরিচয় হয়েছিল। বিলাতে গান্ধীজী ইংরেজদের কাছে যে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছিলেন, তাতে এই ইংরেজ ভদ্রলোক সম্পর্কেও তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে যেসব ব্রিটিশ রাজপুরুষ অতিশয় ভদ্রলোক তাঁরা যে ভারতে পদার্পণ করবার সময়ে হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হন, সে ধারণা তাঁর ছিল না। গান্ধীজী তাই দাদার অনুরোধে দাদা সম্পর্কে এই ইংরেজ ভদ্রলোককে প্রসন্ন করবার জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। ইংরেজ ভদ্রলোক ইংলণ্ড-ফেরত এই তরুণ ব্যারিস্টারকে স্বাগত জানানো দূরের কথা, তাঁকে

বেহারা দিয়ে অফিস থেকে বের ক'রে দিলেন। গান্ধীজী অপমানে ও ক্ষোভে এই অভদ্রোচিত আচরণের জন্যে ইংরেজ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে মামলা করবার জন্যে বোম্বাই ছুটলেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের তৎকালীন সুবিখ্যাত আইনজীবী ও কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি স্যার ফিরোজ শাহ্ মেহ্তা গান্ধীজীকে জানালেন ভারতীয় উকিল-ব্যারিস্টারদের এরকম অভিজ্ঞতা হামেশাই হয়ে থাকে। গান্ধীজী সদ্য ইংলণ্ড থেকে ফিরেছেন এবং তাঁর রক্ত এখনও গরম। যদি তিনি এদেশে কিছু রোজগার করতে ও শান্তিতে থাকতে চান, তবে তাঁকে এসব হজম ক'রে চলতে হবে।

ভারতে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র এবং ভারতীয়দের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজী প্রথম সচেতন হলেন। ব্রিটিশ আমলাদের সামান্য অপ্রসন্নতাও যে কোন শক্তিশালী ভারতীয় তরুণের জীবনকে পঙ্গু ক'রে দিতে পারে, তা জেনে তাঁর বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা রইলো না। এই সাহেবের অপ্রসন্নতা গান্ধীজীর প্র্যাক্‌টিসের পক্ষে শীঘ্রই অন্তরায় হয়ে উঠলো; কারণ, তাঁর অধিকাংশ কাজই এই ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের আদালতেই ছিল। গান্ধীজীর চোখের সামনে তাঁর সমগ্র ভবিষ্যৎ বিবর্ণ হয়ে গেল।

এই অবস্থায় ভারত ছেড়ে পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে যেতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। সেরকম একটি সুযোগও এলো। দাদা আবদুল্লা অ্যাণ্ড কোম্পানির বিরাট কারবার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাঁদের চল্লিশ হাজার পাউণ্ড নিয়ে একটি মামলা চলছিল। এই মামলার কাজে তাঁকে উপদেষ্টা রূপে নিয়োগের একটি প্রস্তাব এলো। জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের খরচ সহ ১০৫ পাউণ্ড দক্ষিণা। পারিশ্রমিক যাই হ'ক, গান্ধীজী তাঁর এই মানসিক অবস্থায় সহজেই রাজী হয়ে গেলেন।

তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পত্নী, পুত্র ও পরিজনদের ফেলে একাকী দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি দিলেন।

চার

দক্ষিণ আফ্রিকায় ঃ অবাঞ্ছিত আগন্তুক

গান্ধীজী জাহাজে প্রথমশ্রেণীর যাত্রী হ'লেও অজ্ঞাত কারণে তাঁকে একজন অফিসারের কেবিনে একটু স্থান সংকুলান ক'রে দেওয়া হ'লো। জাহাজের কাপ্তেন ভদ্রলোক এই তরুণ ব্যারিস্টারের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহারই করলেন। তিনি গান্ধীজীকে দাবা খেলতে শেখালেন এবং যাত্রাপথে লামু ও জাঞ্জিবারে নামিয়ে তাঁকে দর্শনীয় দৃশ্যাদি দেখালেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের শেষাশেষি জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে পৌঁছলো। নাটালের অন্যতম বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী ও গান্ধীজীর মক্কেল আবদুল্লা শেঠ তাঁকে নিতে এলেন। গান্ধীজীর গায়ে ছিল একটি ফ্রক কোট, গলায় শক্ত কলার ও টাই, মাথায় পাগড়ি ও পায়ে ফ্যাশনদস্তুর জুতো। জামার নীচে তুলসীর মালা। এই মালাটি তাঁকে তাঁর মা দিয়েছিলেন, এটি তিনি সযত্নে ব্যবহার করতেন।

গান্ধীজী ডারবানে সপ্তাহকাল ছিলেন। এই সপ্তাহকালের মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এখানে শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয়দের অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখে। আবদুল্লা শেঠ তাঁকে ডারবান আদালত দেখাবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পাগড়ি মাথায় দিয়ে আদালতে প্রবেশ করলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে পাগড়ি খুলে ফেলতে হুকুম করলেন। গান্ধীজী পাগড়ি খুলতে অসম্মত হয়ে দ্রুত আদালত ত্যাগ করলেন এবং এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিটি হঠাৎ ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে দিলো। সংবাদপত্রে তাঁকে 'অবাঞ্ছিত আগন্তুক'—unwelcome visitor—ব'লে বর্ণনা করা হ'লো। গান্ধীজী এখানে এসে দেখলেন, ভারতীয়দের একটা নাম "কুলী"। তাদের অধিকাংশই এখানে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত, তাই শ্বেতাঙ্গরা

ভারতীয়দের বলে "কুলী" বা "সাম্মী"। এখানে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা হলেন "কুলী ব্যবসায়ী", গান্ধীজী হলেন "কুলী ব্যারিস্টার"।

ভারতীয়দের এই অসম্মানজনক অবস্থা গান্ধীজীকে অত্যন্ত পীড়িত করলো। কিন্তু তিনি তার চেয়ে বেশি পীড়িত হলেন আর একটি ব্যাপার দেখে। এখানে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য দূরের কথা, সামাজিক যোগাযোগও নেই, তারা সকলে নিজেদের ভারতীয় ব'লে পরিচয়ও দেয় না। এখানে পার্শী কেরানীরা নিজেদের পরিচয় দেয় পারসিক ব'লে; মুসলমান ব্যবসায়ীরা নিজেদের আরব ব'লে পরিচয় দিয়ে আনন্দ পায়। বুদ্ধিজীবী হিন্দুরা নিজেদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার লোক ব'লে পরিচয় দেয়। এই তিন শ্রেণীর সংখ্যার তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেশী। তারা এসেছে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের দরিদ্রতম শ্রেণী থেকে। এদের সঙ্গে কাজকর্মের সম্পর্ক ছাড়া ধনী ও মধ্যবিত্ত ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান, কারও সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। তাছাড়া দরিদ্র শ্রমিকরাও বহু দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত, অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিবাদ-কলহ হিংসা-দ্বেষেরও অন্ত নেই।

সপ্তাহকাল ডারবানে থাকার পর গান্ধীজী প্রিটোরিয়া রওনা হলেন—এই প্রিটোরিয়াতেই তাঁদের মামলা চলছে। গান্ধীজী যাচ্ছিলেন ট্রেনে। তাঁর প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল। নাটালের রাজধানী মারিৎস্বার্গে ট্রেন এসে পৌছলে ট্রেনের একজন কর্মচারী তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে মালবাহী কামরায় যেতে হুকুম করলো। এই অন্যায় আদেশ পালন করতে গান্ধীজী অসম্মত হ'লে কর্মচারীটি পুলিসের সাহায্যে তাঁকে মালপত্রসহ ট্রেন থেকে টেনে নামিয়ে দিল। ট্রেন চ'লে গেল। গান্ধীজী শীতের রাত্রিতে স্টেশনের প্রতীক্ষাগারে কোনরকমে কাটালেন। আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা যে এমন শোচনীয় এবং বর্ণবিদ্বেষ যে এতো ভয়ংকর, এর আগে গান্ধীজী ঠিকমতো বুঝতে পারেন নি।

প্রতীক্ষাগারে একজন ইংরেজ যাত্রী ছিল। গান্ধীজী তার সঙ্গে কথা বলবেন কিনা ভেবে পেলেন না। তিনি ভাবতে লাগলেন, তিনি কি দেশে ফিরে যাবেন, না তাঁর কপালে যা থাক, তিনি ভগবানের উপর ভরসা রেখে এগিয়ে চলবেন? শেষ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় পন্থাই গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই থাকবেন, এবং অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে সকল নির্যাতন সহ্য করবেন।

পরদিন গান্ধীজী মারিসংবার্গের ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর কাছে নিজেদের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। গান্ধীজী রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে একটি সুদীর্ঘ তারবার্তা পাঠালেন। এতে কোনও সুফল হ'লো না, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মচারীর কার্যের সমর্থন ক'রেই জবাব দিলো।

সন্ধ্যায় গান্ধীজী আবার ট্রেনে চড়লেন—এবার একটি সংরক্ষিত বার্থে। পরদিন সকালে তিনি চার্লস্‌টাউনে গিয়ে পৌঁছলেন। চার্লস্‌টাউন থেকে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে যেতে হবে। পথে ঘোড়ার গাড়িটি রাত্রি কাটাবে স্ট্যাণ্ডারটনে। পরদিন স্ট্যাণ্ডারটন থেকে আবার যেতে হবে ঘোড়ার গাড়িতে।

গান্ধীজী অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে গাড়ির ভেতরেই আসন নিয়েছিলেন। কিন্তু স্ট্যাণ্ডারটন যাওয়ার পথে গাড়ির কণ্ডাক্টর তাঁকে গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে কোচোয়ানের পাশে বসতে বললো। অনর্থক ঝামেলা এড়াবার জন্যে গান্ধীজী এই অন্যায় আবদার স্বীকার ক'রে নিলেন এবং কোচোয়ানের পাশে বসলেন; কণ্ডাক্টর গিয়ে বসলো গাড়ির ভেতরে যাত্রীদের সঙ্গে। গাড়ি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ কণ্ডাক্টরের ধূমপানের ইচ্ছা হ'লো এবং সে কোচোয়ানের পাশে বসতে চাইলো। সে কোচোয়ানের কাছ থেকে একটা ছেঁড়া চট সংগ্রহ ক'রে সেটাকে পাদানিতে মিলে

দিয়ে সেখানেই গান্ধীজীকে বসতে বললো। গান্ধীজী আসন ছেড়ে গাড়ির ভেতরে নিজের জায়গায় গিয়ে বসতে চাইলেন। এতে কণ্ডাক্টর চটে গিয়ে গান্ধীজীকে চড় কিল ঘুষি লাগাতে লাগলো এবং গান্ধীজীকে তাঁর আসন থেকে টেনে নামাতে চেষ্টা করলো। গান্ধীজী প্রাণপণে একটি রেলিং ধ'রে ঝুলে রইলেন। কণ্ডাক্টর প্রচণ্ড বেগে তাঁকে একটি ঘুষি মারলে তিনি প্রায় নিচে গড়িয়ে পড়ছিলেন, এমন সময় ভেতরের যাত্রীরা কণ্ডাক্টরকে নিরস্ত করলো। ফলে কণ্ডাক্টর পরে দেখে নেবে ব'লে শাসিয়ে ভেতরে গিয়ে আসন নিলো। স্ট্যাণ্ডারটনে গাড়ি পৌঁছলে গান্ধীজী গাড়ি বদলে অন্য গাড়িতে উঠলেন। বাকী পথটুকু তিনি নিরাপদেই গেলেন। অবশেষে পরদিন রাত্রিতে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন জোহানেসবার্গে।

রাত্রিতে গান্ধীজী আশ্রয়ের আশায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে গেলেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে স্থান দেওয়া হ'লো না। গান্ধীজী জনৈক মুসলিম ব্যবসায়ীর গৃহে গিয়ে রাতটুকু কাটালেন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক গান্ধীজীর পথের অপ্রীতিকর ঘটনাবলীর বিবরণ শুনে হাসলেন। বললেন, "এরকম জায়গায় কেবল আমরাই বাস করতে পারি; কারণ, টাকা রোজগারের জন্যে আমরা এ ধরনের অপমান হজম ক'রে নিই। কিন্তু আপনাদের মতো লোকের পক্ষে এ দেশে থাকা অসম্ভব।" পরদিন গান্ধীজী একটি ট্রেনে ক'রে প্রায় সন্ধ্যা আটটায় প্রিটোরিয়া পৌঁছলেন। একজন আমেরিকান নিগ্রো তাঁকে রাতটুকু থাকবার মতো একটি হোটেল যোগাড় ক'রে দিল।

পরদিন সকালে গান্ধীজী অ্যাটর্নির সঙ্গে দেখা করলেন। অ্যাটর্নি মিঃ বেকার গান্ধীজীকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন যে, ব্যারিস্টার হিসাবে গান্ধীজীকে তাঁরা কোনও কাজ দিতে পারবেন না। কারণ, তাঁরা এখানকার সবচেয়ে সেরা একজন কৌঁসুলীকে মামলার জন্যে নিয়োগ করেছেন। তবে প্রয়োজনীয়

খোঁজখবর সংগ্রহের জন্য গান্ধীজীকে তাঁদের দরকার হবে। মিঃ বেকার অ্যাটর্নি হ'লেও তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তিনি গান্ধীজীকে এক গরীব পাঁউরুটিওয়ালার বাড়িতে সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ শিলিং ব্যয়ে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তিনি গান্ধীজীকে নিজেদের পারিবারিক গির্জায় উপাসনায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। গান্ধীজীও প্রায়ই উপাসনাগুলিতে যোগ দিতেন। মিঃ বেকার গান্ধীজীকে বাইবেলসহ কিছু খ্রীষ্টধর্মীয় পুঁথিপত্রও দিলেন। গান্ধীজী খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করবেন, এইরকম আশা মিঃ বেকারের ছিল।

গান্ধীজী প্রিটোরিয়ায় তাঁর অবস্থানের প্রথম সপ্তাহেই প্রিটোরিয়ায় ভারতীয় অধিবাসীদের নিয়ে একটি সভা করলেন। প্রিটোরিয়ায় হিন্দুর সংখ্যা কম হওয়ায় এই সভা প্রধানত মুসলমান ব্যবসায়ীদের নিয়েই হ'লো। গান্ধীজী উপস্থিত ব্যবসায়ীদের তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করতে বললেন। কারণ, সামান্যসংখ্যক ভারতীয়ের চরিত্র দিয়েই সমস্ত ভারতীয়ের চরিত্র সম্পর্কে বিদেশীদের মনে ধারণা গড়ে ওঠে। তিনি ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, এই ধরনের পার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ হ'তে এবং নিজেদের ভারতীয় ব'লেই চিন্তা করতে বললেন। তিনি ভারতীয়দের স্বাস্থ্যসম্মত রীতিনীতি মেনে চলতে এবং পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতেও উৎসাহ দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি ভারতীয়দের একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা ক'রে সেই সংঘের মারফত ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া ও অভিযোগগুলি সরকারের কাছে তুলে ধরবার প্রস্তাব করলেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর সাধ্যমত সাহায্য করতেও প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সভায় গান্ধীজীর ঘরোয়া আলোচনাই প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর জনসভায় প্রথম ভাষণ।

গান্ধীজী লক্ষ্য করলেন, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে

অতি সামান্য সংখ্যক লোকই ইংরেজী জানেন। তিনি তাঁদের সকলকে কিছু কিছু ইংরেজী শিখতেও উপদেশ দিলেন। প্রয়োজন হ'লে এ বিষয়ে তিনি তাঁদের সাহায্য করতেও রাজী হলেন।

এর পর গান্ধীজী নিয়মিতভাবে প্রতি মাসেই একবার ক'রে সভা করতেন। প্রিটোরিয়ায় অবস্থানকালে তিনি ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের অধিবাসী ভারতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে উঠলেন। তিনি জানতে পারলেন যে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের সম্পর্কে একটি কঠোর আইন পাস হয়, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি সংশোধিত আইন অনুসারে প্রত্যেকটি ভারতীয়কে ট্রান্সভালে প্রবেশের ফী রূপে মাথাপিছু তিন পাউণ্ড ক'রে দিতে হয়। তাদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভিন্ন অন্য কোথাও তারা জমিজমা কিনতে পারে না। অশ্বেতাঙ্গদের কোনপ্রকার ভোটাধিকার নেই। এই আইন অনুসারে ভারতীয়রাও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। অনুমতিপত্র ছাড়া ভারতীয়রা ট্রান্সভালে রাত নটার পর বাড়ির বাইরে চলাফেরা করতে পারে না। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন ক'রে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের ভারতীয়দেরও সকলপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

গান্ধীজী প্রায়ই রাত্রিতে তাঁর এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেরুতেন এবং প্রায়ই রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতেন না। এজন্য সরকারের কাছ থেকে তাঁকে একটি বিশেষ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়েছিল। কিন্তু এই অনুমতিপত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁকে একদিন বিপদে পড়তে হ'লো। তিনি প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ প্রহরারত একজন পুলিস তাঁকে কোনপ্রকার জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রেই প্রহার করতে লাগলো এবং রাস্তা থেকে ঠেলে ফেলে দিল। গান্ধীজীর ইংরেজ-বন্ধু তাঁকে ঐ লোকটার বিরুদ্ধে মামলা করতে বললেন। কিন্তু গান্ধীজী

বললেন, "আমার ব্যক্তিগত কোন অভিযোগ নিয়ে আমি কখনও কোনও আদালতে যাব না ব'লে স্থির করেছি।" তবে এইসব ঘটনা গান্ধীজীকে ভারতীয়দের দুর্বহ অবস্থা সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন ক'রে তুললো এবং কিভাবে এর প্রতিকার করা যায় তাই এখন থেকে তাঁর একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠলো।

গান্ধীজী এই সময়ে ধর্ম সম্পর্কেও খুবই অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তিনদিন ওয়েলিংটন কন্‌ভেন্‌শনে (ধর্ম-সভায়) যোগ দেন এবং খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেন। তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করাবার জন্য খ্রীষ্টান বন্ধুরা খুবই উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁর অনেক মুসলমান বন্ধুও তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। গান্ধীজী কোরান পড়েন। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে নিজের নানা প্রশ্ন ও সংশয় সম্পর্কে ভারতে ও ইংলণ্ডে তাঁর বহু বন্ধুকে পত্রে জানান। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তিনি খুবই শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন বটে, কিন্তু সেজন্য হিন্দুধর্মের নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তা ত্যাগ করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। এই সময়ে তিনি প্রচুর পড়াশুনো করেন। এক বছরে তিনি আশিখানি বই পড়েন। বিখ্যাত রুশ লেখক লেও টলস্টয়-রচিত The Kingdom of God is Within You বইখানি তাঁকে সর্বাধিক মুগ্ধ ও অভিভূত করে। এই বইখানি সম্পর্কে গান্ধীজী পরে লিখেছেন, "আমি এ পর্যন্ত হিংসায় বিশ্বাসী ছিলাম। এই পুস্তকখানি পড়ে আমার সকল সংশয় দূর হয় এবং আমি অহিংসায় দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে উঠি।"

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝলেন যে, ভারতীয়দের যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে হয়, তবে তাদের নিজেদের সকল কলহবিবাদ ত্যাগ ক'রে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। তাই তিনি দাদা আবদুল্লা শেঠ ও তাঁর বিরোধী পক্ষ তায়েব শেঠের মধ্যে মামলাটি যাতে আপসে মীমাংসা হয়, সেজন্য

সচেষ্ট হলেন। তিনি উভয়কে বোঝালেন, যদি এই মামলা তাঁরা চালিয়ে যেতে চান, তবে উভয়েই ধ্বংস হবেন। মামলাটি দুই পক্ষই শেষ পর্যন্ত সালিসে দিতে রাজী হলেন। প্রকৃত ঘটনা ও আইনের দিক্ থেকে দাদা আবদুল্লার জেতাই সুনিশ্চিত ছিল। সালিসে দাদা আবদুল্লাই তাঁর স্বপক্ষে রায় পেলেন। এই রায় অবিলম্বে কার্যকর হ'লে তায়েব শেঠ দেউলে হয়ে যেতেন। গান্ধীজীর চেষ্টায় দাদা আবদুল্লা সহজ কিস্তিতে টাকা নিতে রাজী হলেন। এই মামলাটি যেমন জটিল ছিল, তেমনি হিসাবপত্রও ছিল পর্বতপ্রমাণ। কিন্তু গান্ধীজী কঠোর পরিশ্রম ক'রে সেগুলি আগাগোড়া নিজে দেখেন। এই মামলার কাজ ক'রে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়, তাতে আইনব্যবসায় সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

গান্ধীজী এই মামলার ব্যাপারেই দক্ষিণ আফ্রিকা এসেছিলেন। এখন মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় তিনি ভারতে ফিরবার জন্যে প্রস্তুত হলেন এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি আবার ডারবানে ফিরে এলেন। ডারবানের ভারতীয়রা তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানাবার জন্যে একটি সভায় মিলিত হলেন। কিন্তু এই সভাতেই 'নাটাল মার্কারি' কাগজের একটি কপি গান্ধীজীর হাতে পড়লো। তিনি তাতে পড়ে দেখলেন, নাটাল সরকারও ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট সরকারের মতোই ভারতীয়দের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে একটি বিল আনছে। এ-ও তিনি বুঝলেন, নাটাল সরকার ভারতীয়দের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রেই ক্ষান্ত হবে না, তাদের নিগ্রহের জন্যে অন্যান্য নানা বিলও একে একে আসবে। তিনি সভায় উপস্থিত ভারতীয়দের এই বিপজ্জনক সংবাদটি জানিয়ে তাঁদের এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সংঘবদ্ধ হ'তে আহ্বান জানালেন। সেই সঙ্গে তিনি বললেন, তাঁরা যদি এই বিলের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হ'তে না পারেন, তবে নাটাল থেকে তাঁদের

উচ্ছেদ অনিবার্য। উপস্থিত ভারতীয়রা সকলেই চমকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা কেউ ভালো ইংরেজী জানতেন না, তাই এসব খবর তাঁরা নিজেরা জানতে পারতেন না; আর জানলেও এ নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ আবেদন-নিবেদন করাও ছিল তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তাই তাঁরা সকলেই গান্ধীজীকে ভারতযাত্রা স্থগিত রেখে এ বিষয়ে তাঁদের পথপ্রদর্শন করতে বললেন। সকলেই বললেন, "গান্ধী ভাইকে আটকাও।" আবদুল্লা শেঠ বললেন: "গান্ধী ভাই যাতে চ'লে না যান, সেজন্যে সকলে তাঁকে অনুরোধ করো। তবে তাঁর ফীর কি ব্যবস্থা হবে?"

গান্ধীজী বললেন, "ফীর প্রশ্ন ওঠে না। জনহিতকর কাজের কোনও পারিশ্রমিক নেই। যদি আমি থাকতে পারি, তবে আপনাদের সেবক রূপেই থাকব। আমি আরও একমাস থাকতে পারি। তবে একটি কথা। আমাকে কোনও পারিশ্রমিক দিতে হবে না। কিন্তু এই ধরনের কাজ করার জন্যে কিছু টাকা দরকার। তাছাড়া, একজন কেউ এ ধরনের কাজ করতে পারে না। এ জন্যে অনেক লোকও চাই।"

"আমরা টাকা দেব, লোক দেব। গান্ধী ভাই, আপনি শুধু থাকতে রাজী হ'ন।" সমবেত সকলে একবাক্যে ব'লে উঠলেন।

গান্ধীজী আরও একমাস থাকতে রাজী হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি আশু কর্মসূচী রচনা করলেন। এইভাবে গান্ধীজীর বিদায়-সভা ভারতীয়দের রাজনৈতিক সভায় পরিণত হ'লো এবং গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ বছর।

সেদিনই গান্ধীজী ডারবানের বিশিষ্ট লোকদের নিয়ে দাদা আবদুল্লার গৃহে সমবেত হলেন এবং নাটাল আইনসভার কাছে

পাঠাবার জন্যে বিলের প্রতিবাদে একটি আবেদনপত্র রচনা করলেন। নাটালে প্রচলিত আইন অনুসারে কোনও ব্রিটিশ প্রজা পঞ্চাশ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হ'লে বা দশ পাউণ্ড বার্ষিক কর দিলে, তবেই ভোটদাতার তালিকায় তার নাম থাকতো। ফলে নাটালে মাত্র ২৫০ জন ভারতীয় ভোটদাতা ছিল। সে তুলনায় শ্বেতাঙ্গ ভোটদাতার সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সুতরাং ভারতীয়দের ভোটাধিকার থাকার ফলে শ্বেতাঙ্গদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হওয়ার সামান্যতম আশঙ্কাও ছিল না। তাই ভারতীয়দের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবার একমাত্র কারণ ছিল বর্ণবিদ্বেষ।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় তরুণরা জনহিতকর কাজের জন্যে এই সর্বপ্রথম মিলিত হ'লো। তাদের যারা কিছু ইংরেজী জানতো, তারা সারা রাত জেগে আবেদনপত্রগুলির কতিপয় অনুলিপি প্রস্তুত করলো। ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ গাড়িতে ক'রে ভারতীয়দের দ্বারে দ্বারে গিয়ে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন। সবই একরাত্রির মধ্যে করতে হ'লো। আবেদনপত্রটি পাঠানো হ'লো ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে। পরদিন সংবাদপত্রগুলিতে আবেদনপত্রটির সারমর্ম ছাপা হ'লো। অনেক পত্রিকা আবেদনের সমর্থনে মন্তব্যও করলো। গান্ধীজী ইংলণ্ডে দাদাভাই নওরোজীকে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনসমূহ জানিয়ে পত্র দিলেন এবং তাঁর উপদেশ-পরামর্শ প্রার্থনা করলেন।

প্রতিপত্তিশালী ভারতীয় ব্যবসায়ী হাজী আদমকে সভাপতি ক'রে একটি কমিটিও গঠিত হ'লো। হাজী আদমের নামে নাটাল আইনসভার স্পীকারের কাছে বিলের আলোচনা স্থগিত রাখার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে একটি টেলিগ্রাম পাঠানো হ'লো। অনুরূপ একটি টেলিগ্রাম পাঠানো হ'লো নাটালের প্রধান মন্ত্রীর কাছে। বিলের আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের

একটি বিলের কোনরূপ প্রতিবাদ ভারতীয়দের কাছ থেকে এ পর্যন্ত না আসায় ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনা নেই এবং তারা যে ভোটাধিকারের অযোগ্য, তাই প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু এখন হঠাৎ প্রতিবাদ আসায় সকলেই সচকিত হ'লো এবং বিলের আলোচনা দু দিনের জন্য স্থগিত রইলো। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা একটি অভিনব উদ্দীপনা ও উত্তেজনা অনুভব করলেন।

যাই হ'ক, শেষ পর্যন্ত আইনসভায় বিলটি পাস হয়ে গেল। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধতার আস্বাদ পেলেন। এখন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াই স্থির হ'লো। স্থির হ'লো, সমগ্র নাটাল থেকে ভারতীয়দের স্বাক্ষর সংগ্রহ ক'রে ইংলণ্ডের উপনিবেশ সচিব লর্ড রিপনের কাছেও আবেদনপত্র পাঠানো হবে। এই আবেদনপত্রে গান্ধীজী যুক্তি দেখালেন যে, ভারতে ভারতীয়দের যে ধরনের ভোটাধিকার আছে, নাটালেও ভারতীয়দের সেই ধরনের ভোটাধিকার ছিল। ভোটাধিকারী ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, সুতরাং এই ভোটাধিকার রাখাই সমীচীন। সমগ্র নাটাল থেকে ভারতীয়দের স্বাক্ষর সংগ্রহ সহজ ছিল না। প্রতিদিন নাটালের বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি ক'রে ভারতীয়দের বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো হ'লো এবং স্বাক্ষর সংগৃহীত হ'লো। সভাগুলিতে জনসমাবেশ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। দলে দলে কাজের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক এলো। চাঁদা উঠতে লাগলো। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখে প্রায় দশহাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্রটি উপনিবেশ সচিব লর্ড রিপনের কাছে পাঠানো হ'লো। যাতে মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে এই আইন নাকচ করেন সেজন্যে তাঁকে পরামর্শ দিতেও এই আবেদনে উপনিবেশ সচিবকে অনুরোধ করা হ'লো। আবেদনপত্রটি এক হাজার কপি ছাপিয়ে বিতরণ করা হ'লো। ইংলণ্ডের 'টাইমস্' পত্রিকার মতো প্রভাবশালী কাগজও ভারতীয়দের দাবির সমর্থন জানালো।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের শোচনীয় অবস্থার কথা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডেও আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

এখন গান্ধীজী দেশে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু ভারতীয়রা তাঁকে ছাড়তে চাইলেন না। সকলেই বললেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে যদি উপনিবেশ সচিবের পত্র আসে, তখন কি হবে? গান্ধীজী ভারতীয়দের যুক্তির গুরুত্ব বুঝলেও তিনি তাঁর অবস্থার কথাও বুঝিয়ে বললেন। তিনি জনহিতকর কোনও কাজের জন্যে পারিশ্রমিক নেবেন না। তিনি যদি ব্যারিস্টারের মতো স্টাইলে না থাকেন, তবে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁর গুরুত্ব থাকবে না। অথচ ব্যারিস্টারের মতো থাকতে হ'লে বছরে অন্তত ৩০০ পাউণ্ড লাগবে। এই অবস্থায় ভারতীয় ধনী ব্যবসায়ীরা যদি তাঁকে মামলার কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য কিছু কিছু পারিশ্রমিক দেন, তবেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে পারেন। গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে বিশজন ধনী ব্যবসায়ী সানন্দে রাজী হলেন। এখন গান্ধীজী নাটালেই রয়ে গেলেন এবং নাটালের সুপ্রীম কোর্টে একজন অ্যাডভোকেট রূপে যোগদানের জন্যে অনুমতি চেয়ে আবেদন করলেন। নাটাল ল সোসাইটি এর তীব্র বিরোধিতা করলেও উর্ধ্বতন আদালত এই বিরোধিতা উপেক্ষা ক'রে গান্ধীজীকে সুপ্রীম কোর্টে আইনজীবী রূপে যোগদানের অনুমতি দিলেন—সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি গান্ধীজীকে শপথ গ্রহণের পর তাঁর পাগড়ি খুলে ফেলতে এবং পরিচ্ছদের ব্যাপারে আদালতের রীতিনীতি মেনে চলতে নির্দেশ দিলেন। গান্ধীজী তা মেনে নিলেন। কারণ, বৃহত্তর সংগ্রামের জন্যে তাঁর সুপ্রীম কোর্টে ব্যারিস্টারি করা অপরিহার্য ছিল। নাটাল ল সোসাইটির প্রতিবাদ ও তার ব্যর্থতা গান্ধীজীকে নাটালে আরও সুপরিচিত ক'রে তুললো। ভারতীয়দের কাছে তাঁর যেমন সম্মান প্রতিপত্তি আরও বাড়লো, তেমনি কিছু কিছু শ্বেতাঙ্গ তাঁকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলো। অবশ্য, সংবাদপত্রে

তাঁর দাবির সমর্থন জানানো হ'লো এবং সোসাইটির প্রতিবাদকে ঈর্ষা-প্রণোদিত ব'লে বর্ণনা করা হ'লো।

ইতিমধ্যে গান্ধীজীর সেই লাজুকতা কেটে গিয়েছিল। তিনি আইন বিষয়েও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এখন আইন ব্যবসায়ে তাঁর সাফল্যের কোন অন্তরায় ছিল না। কিন্তু আইন ব্যবসায়টা তাঁর কাছে ছিল গৌণ। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের জন্যে ভারতীয়দের মধ্যে থাকবার উপায় মাত্র।

ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য গান্ধীজী একটি স্থায়ী সংস্থা গ'ড়ে তুলতে চাইলেন। এ বিষয়ে সকলেই তাঁকে সমর্থন করলেন। ঐ সময়ে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। গান্ধীজী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এর অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি নাটালের ভারতীয়দের এই স্থায়ী সংস্থার নাম দিলেন নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট তারিখে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হ'লো। মিঃ আবদুল্লা হাজী আদম এর সভাপতি এবং গান্ধীজী এর অবৈতনিক সম্পাদক হলেন। বৎসরে যাঁরা তিন পাউণ্ড চাঁদা দেবেন, তাঁরাই এর সভ্য হ'তে পারবেন। দুজন বিশিষ্ট ধনী বছরে ২৪ পাউণ্ড ক'রে এবং গান্ধীজী নিজে ১২ পাউণ্ড ক'রে চাঁদা দিতেন। প্রথম মাসেই প্রায় দু শ ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খ্রীষ্টান নাটাল কংগ্রেসের সদস্য হলেন। দূর গ্রামাঞ্চলে গিয়েও সদস্য-সংগ্রহ করা চললো। সদস্য-সংগ্রহই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, ভারতীয়দের নিজেদের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। প্রতি মাসেই অন্ততঃ একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হ'তো এবং তাতে ভারতীয়দের স্বার্থসংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচিত হ'তো। গুজরাটের মেমন সম্প্রদায়ের লোকই সংখ্যায় সর্বাধিক হওয়ায় গুজরাটী ভাষায় আলোচনা চলতো।

নাটাল কংগ্রেস ভারতীয়দের সংস্থা রূপে গড়ে উঠলেও শ্রমিক ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা কিন্তু এর বাইরে ছিল। গান্ধীজী এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের অবস্থা যে অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায় আরও ভয়াবহ, তার পরিচয় পেলেন শীঘ্রই। মাত্র মাস চারেক হ'লো তিনি এখানে ব্যারিস্টারি শুরু করেছেন। একদিন একজন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর কাছে এসে পড়লো। লোকটির নাম বালসুন্দরম্। যে প্রতিপত্তিশালী শ্বেতাঙ্গের কাছে সে কাজ করে, সে তাকে প্রহার ক'রে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়েছে। বালসুন্দরম্ গান্ধীজীর কথা শুনেছিল, তাই তাঁর কাছে প্রতিকারের আশায় ছুটে এসেছে। সে গান্ধীজীকে দেখে ভয়ে ও সম্ভ্রমে তার মাথার পাগড়ি খুলে ফেলেছিল। গান্ধীজী তাকে তার মাথায় পাগড়ি বাঁধালেন এবং তাকে ভাইয়ের মতো সমাদর করলেন। তিনি একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের জন্যে একজন ডাক্তার আনালেন এবং বালসুন্দরমের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করলেন। গান্ধীজী শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের শাস্তি দাবি করলেন না, তিনি চাইলেন বালসুন্দরম্‌কে ঐ শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে মুক্ত করতে। গান্ধীজী সফল হলেন এবং তিনি বালসুন্দরম্‌কে তার মালিকের কাছ থেকে ছাড়িয়ে অন্য মালিকের কাছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বালসুন্দরমের এই ঘটনাটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের কানে গেল, তারা এখন গান্ধীজীকে দেবতার মতো ভক্তি করতে লাগলো এবং দলে দলে তারা গান্ধীজীর কাছে আসতে লাগলো। গান্ধীজী চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা ও সমস্যা বুঝতে হ'লে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তখন তারা বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমির মালিক হয়েছিল।

আর এই জমি কৃষিকার্যের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। তাই ইউরোপীয়রা এখানে শীঘ্রই চা, কফি, আখ প্রভৃতির বড় বড় বাগিচা গড়ে তুলতে চাইলো। কিন্তু সেজন্যে লোকের দরকার ছিল—স্থানীয় নিগ্রো শ্রমিকদের দ্বারা ঐকাজ ঠিকমতো না হওয়ায় নাটালের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশকারীরা ভারত সরকারের কাছে ভারত থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সরবরাহের জন্যে অনুরোধ জানান। যারা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংগ্রহ করতে আসে, তারা দরিদ্র ভারতীয়দের কাছে একটি আশার চিত্র তুলে ধরে। পাঁচ বছরের জন্য চুক্তি ক'রে গেলে শ্রমিকরা বিনা খরচায় যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার খরচ এবং প্রথম বছর মাসে দশ শিলিং ক'রে মজুরি পাবে। প্রতি বছর এক শিলিং ক'রে মজুরি বাড়বে। পাঁচ বছর পরে চুক্তির মেয়াদ শেষ হ'লে শ্রমিকরা নূতন ক'রে চুক্তি করতে পারবে, কিংবা ইচ্ছে করলে বিনা খরচে দেশে ফিরে আসতে পারবে বা দক্ষিণ আফ্রিকায় তারা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারবে। দরিদ্র অশিক্ষিত ভারতীয় কৃষকদের কাছে এই চিত্রটি খুবই আকর্ষণীয় ছিল। তাই দলে দলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে থাকে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের প্রথম দলটি ডারবানে নামে। ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে। শ্রমিক-সংগ্রহকারীরা যে রঙীন চিত্রই তুলে ধরুক না কেন, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা ছিল প্রকৃতপক্ষে আধা-ক্রীতদাস। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের মালিক বদল করবার উপায় ছিল না। সমস্ত মালিক হৃদয়হীন না হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। চুক্তির মেয়াদ শেষ হ'লেও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা সহজে রেহাই পেতো না। তারা নানাভাবে এমন জালে জড়িয়ে পড়তো যে, তাদের আবার চুক্তি না ক'রে উপায় থাকতো না। যারা এভাবে জড়িয়ে

না পড়তো, তারাও দেশে ফিরতো না। কারণ দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে যেতো। তারা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই স্থায়িভাবে বসবাস করতো। তারা সামান্য একটু জমি কিনে তাতে সামান্য চাষ-আবাদ করতো, ছেলেমেয়েদের মানুষ করতো। এইভাবে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ছাড়া এক শ্রেণীর স্বাধীন শ্রমিক গ'ড়ে উঠেছিল। এরা অনেক সময় অসামান্য শ্রম ও মিতব্যয়িতার দ্বারা জমি ও বাড়ির মালিক হ'তো, ব্যবসা-বাণিজ্য করতো, ছেলেদের লেখাপড়াও শেখাতো। এটা শ্বেতাঙ্গদের সহ্য হ'তো না। তারা চাইতো, ভারতীয়রা আধা-ক্রীতদাসের মতো চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরূপেই থাক; তারা যে স্বাধীনভাবে এখানে বসবাস করে, শ্বেতাঙ্গরা তা চাইতো না। শ্বেতাঙ্গ মালিকরা এই চুক্তিমুক্ত শ্রমিকদের ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্মে ক্রমাগত আন্দোলনও করছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নাটাল সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে এই প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, হয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের চুক্তির মেয়াদ শেষে আবার নূতন ক'রে চুক্তি করতে হবে, নয় তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনতে হবে। যদি তারা ভারতে ফিরে আসতে না চায়, তবে তাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসের জন্মে মাথা পিছু ২৫ পাউণ্ড ক'রে কর দিতে হবে। দশ শিলিং ক'রে যে শ্রমিক মাসে মাইনে পায়, চুক্তির মেয়াদ শেষে তার পক্ষে তার পরিবারের প্রত্যেকের জন্মে মাথাপিছু ২৫ পাউণ্ড ট্যাক্স দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং তাকে হয় নূতন ক'রে চুক্তি করতে হবে, নয় ভারতে ফিরতে হবে। তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড এলগিন। তিনি মাথা পিছু ২৫ পাউণ্ড কর অত্যধিক মনে করেন এবং মাথা পিছু তিন পাউণ্ড ট্যাক্স মেনে নেন। এই ট্যাক্সের পরিমাণ যথেষ্ট দুর্বহ হ'লেও অনেক চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক মেয়াদ শেষে ট্যাক্স দিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে থাকে।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে একদল ভারতীয় ব্যবসায়ী দক্ষিণ

আফ্রিকায় এসেছিল। তারা ভারতীয় শ্রমিক ও নিগ্রোদের সহজেই খদ্দেররূপে পেয়েছিল। তারা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের তুলনায় খদ্দেরদের সঙ্গে অনেক বেশি সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতো এবং লাভের পরিমাণও কম রাখতো। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বণিকরা বড় বড় ব্যবসায় ফেঁদে বসলো। এটা শ্বেতাঙ্গ বণিকদের অসহ্য হ'লো। এইসব ব্যবসায়ীরাই ভোটাধিকারী ছিল। নাটাল সরকার ভারতীয়দের ভোটাধিকার লোপের জন্যে যে বিল এনেছিল, ভারতীয় ব্যবসায়ীরাই ছিল তার লক্ষ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রকৃত অবস্থার কথা দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজরা, ইংলণ্ডের ইংরেজরা বা ভারতবাসীরা কেউ জানতো না। গান্ধীজী সবাকেই তা জানাবার জন্যে সচেষ্ট হলেন। তিনি The Indian Franchise: An Appeal to Every Briton in South Africa এবং An Open Letter নামে দুটি পুস্তিকা রচনা ক'রে এবিষয়ে প্রচার করলেন। এই প্রচারের ফলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হ'লো এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি বহির্জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো। গান্ধীজীর চেষ্টায় দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের দুরবস্থা সম্পর্কে ভারতবাসীরাও সচেতন হয়ে উঠলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সদস্য অ্যালফ্রেড ওয়েবের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হ'লো যে, "উপনিবেশ সরকার ভারতীয়দের ভোটাধিকার-লোপের জন্য যে বিল আনিয়াছে তাহা বাতিল করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকান উপনিবেশসমূহের অধিবাসী মহারানীর ভারতীয় প্রজাগণ মহারানীর সরকারের নিকট যে আবেদন করিয়াছে, তাহা মঞ্জুর করিবার জন্য এই কংগ্রেস আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাইতেছে।" অবশেষে সংবাদ এল যে, ইংলণ্ডের উপনিবেশ সচিব লর্ড রিপন্ ভারতীয়দের ভোটাধিকার লোপ বিলটি বাতিল ক'রে দিয়েছেন। এই

সংবাদে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলো।

এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর এক বৎসর কাটলো। ইতিমধ্যে তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয়রা তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির আস্বাদ পেয়েছিল। গান্ধীজীর সম্মান প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আইন ব্যবসায়ের দিক থেকেও তিনি যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছিলেন। তাই এখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই স্থায়িভাবে থাকবার কথা ভাবলেন। তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের আনবার জন্যে ভারতে রওনা হলেন।

পাঁচ

ভারতে কয়েক মাস

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরতে জাহাজে একমাস লাগে। জাহাজে তিনি একজন অফিসারের সঙ্গে তামিল ও উর্দু ভাষা শেখেন এবং অপর একজন অফিসারের সঙ্গে রোজ একঘণ্টা দাবা খেলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে পুস্তিকাও লেখেন। তিনি জাহাজে ক'রে কলকাতা বন্দরে এসে নামেন। কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ের পথে রাজকোট রওনা হন। পথে তিনি এলাহাবাদে 'পাইওনিয়ার'-সম্পাদক মিঃ চেস্‌নির সঙ্গে দেখা করেন। পাইওনিয়ার পত্রিকা উপনিবেশবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মন্তব্য করেছে ব'লে গান্ধীজী শুনেছিলেন। মিঃ চেস্‌নি গান্ধীজীর বক্তব্য খুবই মনোযোগের সঙ্গে শোনেন এবং তিনি এ বিষয়ে লিখতে প্রতিশ্রুতি দেন।

রাজকোটে পৌঁছে গান্ধীজী তাঁর অধিকাংশ সময় The Grievances of the British Indians in South Africa নামে পুস্তিকাটির রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনায় ব্যয় করেন। সবুজ মলাটে মোড়া এই পুস্তিকাটি দশ হাজার কপি ছাপা হয় এবং সকল সংবাদপত্রের ও ভারতীয় নেতাদের কাছে পাঠানো হয়। এটি পরে 'সবুজ পুস্তিকা' নামে সুপরিচিত হয়েছিল। এই পুস্তিকায় দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ এক লক্ষ ভারতীয়ের অবস্থার কথা বর্ণনা ক'রে সকলের কাছে আবেদন জানানো হয়। 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা সর্বপ্রথম এই পুস্তিকা সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করে। সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রয়টার এই পুস্তিকা সম্পর্কে একটি বিকৃত সংবাদ পাঠায়, ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা গান্ধীজীর ওপর খুব চটে যায়।

গান্ধীজী যখন রাজকোটে ছিলেন, তখন সেখানে প্লেগের মহামারী

দেখা দেয়। জনসাধারণ অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। গান্ধীজী অবিলম্বে ত্রাণকার্যে অবতীর্ণ হন। ঐ সময়ে মহারানীর শাসন-কালের হীরক-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছিল। গান্ধীজী রাজকোটে হীরক-জয়ন্তী উৎসব-অনুষ্ঠান কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি এই অনুষ্ঠানের পেছনে অত্যধিক বাগাড়ম্বর লক্ষ্য করেন। ফলে তিনি আবার দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের প্রশ্ন নিয়ে মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

তিনি বোম্বাই গিয়ে রাণাড়ে ও বদ্রুদ্দিন তায়েবজীর মতো দেশবরেণ্য নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরা সরকারী কর্মচারী, তাই তাঁদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া বা সভাসমিতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব হওয়ায় তাঁরা গান্ধীজীকে ফিরোজ শাহ্ মেহ্তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন। গান্ধীজী ফিরোজ শাহ্ মেহ্তার সঙ্গে দেখা করেন এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাইয়ে স্যার কোয়াসজী জাহাঙ্গীর ইন্স্টিটিউট হলে একটি জনসভার ব্যবস্থা হয়। এই সভায় ফিরোজ শাহ্ মেহ্তা সভাপতিত্ব করেন। গান্ধীজী তাঁর ভাষণটি লিখে এনেছিলেন। এই সুবৃহৎ জনসভায় ভাষণদানে তিনি অসুবিধা বোধ করায় তাঁর লিখিত ভাষণটি অন্য একজন পাঠ ক'রে দেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ সমগ্র ভাষণটি শোনেন। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁর আবেদনটি সকলকেই অভিভূত করে।

বোম্বাই থেকে গান্ধীজী পুণা যান। পুণায় তিনি বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে দেখা করেন। তিলক সর্বতোভাবে গান্ধীজীকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সভার সভাপতিত্ব করবার জন্যে রাজনৈতিক দলবহির্ভূত কোন লোককে নির্বাচিত করতে বলেন ও সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ ভাণ্ডারকরের নাম প্রস্তাব করেন। গান্ধীজী ভাণ্ডারকরের সঙ্গে দেখা করলে ডাঃ ভাণ্ডারকর তাঁর সঙ্গে

স্নেহশীল বৃদ্ধ পিতার মতো ব্যবহার করেন এবং সভায় সভাপতিত্ব করতে সম্মত হন। গান্ধীজী গোখেলের সঙ্গেও দেখা করেন।

পুণা থেকে গান্ধীজী যান মাদ্রাজে। মাদ্রাজেই ছিল চুক্তিবদ্ধ সেই নির্যাতিত শ্রমিক বালসুন্দরমের বাড়ি। এখানে শ্রোতারা গান্ধীজীর বক্তব্য অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শোনেন এবং তাঁর সবুজ পুস্তিকাটির চাহিদা সর্বাধিক দেখা যায়। গান্ধীজীকে ঐ পুস্তিকা আবার ছাপতে হয়। মাদ্রাজে ম্যাড্রাস স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক পরমেশ্বরম্ পিল্লাই ও হিন্দু পত্রিকার সুব্রহ্মণ্য আয়ার গান্ধীজীকে বিশেষভাবে সাহায্য ও সমর্থন করেন।

মাদ্রাজ থেকে গান্ধীজী আসেন কলকাতায়। কলকাতায় কারো সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকায় তিনি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ওঠেন। তিনি সর্বপ্রথমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন: "তোমার এই কাজে এখানকার লোকে খুব একটা উৎসাহী হবে মনে করি না। কারণ এখানেই আমাদের নানা অসুবিধা ও অভিযোগ আছে।" গান্ধীজী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বঙ্গবাসী' কাগজের সম্পাদকের সঙ্গেও দেখা করেন। কিন্তু তাঁদের কাছেও তিনি যথেষ্ট উৎসাহ পান না। কিন্তু 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকরা গান্ধীজীকে সোৎসাহে গ্রহণ করেন। ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ সণ্ডার্স গান্ধীজীকে তাঁর কাগজ ও অফিস ইচ্ছামতো ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ দেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে লেখা তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইচ্ছামত সংশোধন ও সংযোজন সাধনের অধিকারও গান্ধীজীকে দেন। কলকাতায় গান্ধীজী একটি জনসভারও ব্যবস্থা করতে থাকেন। কিন্তু এই জনসভা হয়ে ওঠে না। অকস্মাৎ তিনি নাটাল থেকে একটি টেলিগ্রাম পান: জানুয়ারিতে আইনসভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে; তাড়াতাড়ি আসুন। গান্ধীজী সংবাদপত্রে তাঁর অকস্মাৎ কলকাতা ত্যাগের কারণ জানিয়ে বোম্বাই গেলেন এবং সেখানে

জাহাজে যাত্রার ব্যবস্থা করলেন। তিনি পুণায় ১৬ই নভেম্বর ডাঃ ভাণ্ডারকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ দিলেন। তিলক এই সভায় একটি প্রস্তাব আনলেন। এই প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানানো হ'লো এবং ডাঃ ভাণ্ডারকর, তিলক, গোখেল ও অপর ছজনকে নিয়ে গঠিত কমিটিকে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের দুরবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠাবার ক্ষমতা দেওয়া হ'লো।

গান্ধীজী পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হলেন। এবার তাঁর সঙ্গে গেলেন তাঁর পত্নী কস্তুরবাঈ, দুই পুত্র এবং এক ভাগিনেয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে 'কুরল্যাণ্ড' জাহাজটি বোম্বাই থেকে ছাড়লো।

ছয়

দক্ষিণ আফ্রিকায় : শ্বেতাঙ্গদের আক্রমণ : সেবাধর্ম

গান্ধীজীর তখনও ধারণা ছিল যে, সভ্যভব্য দেখাবার জন্যে ইউরোপীয় আদবকায়দা ও পরিচ্ছদ অনুকরণ চাই। তাই তাঁর স্ত্রীর জন্যে পার্শীদের ধরনে শাড়ি এবং ছেলেদের ও ভাগিনেয়ের জন্যে ট্রাউজার ও শার্ট-কোটের ব্যবস্থা হ'লো। সকলের পায়েই জুতো মোজা। সকলকেই গান্ধীজী ছুরি-কাঁটা দিয়ে খেতে শেখালেন জাহাজ ডারবানে পৌঁছলো ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে। ঐদিন আরও একটি জাহাজ এলো। দুটি জাহাজকেই স্বাস্থ্যবিভাগ বেশ কিছুদিন 'কোয়ারান্টিন্‌ড্‌' বা সংক্রামক রোগের জন্য আটক ক'রে রাখলো অথচ জাহাজের কারও কোনও সংক্রামক রোগ ছিল না। এই দুটি জাহাজ একসঙ্গে বন্দরে ঢোকায় এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে গান্ধী দু জাহাজ লোক এনেছে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসের জন্যে। ইতিমধ্যে গান্ধীজী ভারতীয়দের নিয়ে যাতে না ডারবানে নামতে পারেন, সে ব্যবস্থা করবার জন্যে প্রস্তুতি চলছিল এবং একটি বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শনের বন্দোবস্ত হয়েছিল। ৪ঠা জানুয়ারি (১৮৯৭) তারিখে টাউন হলে প্রায় দু হাজার শ্বেতাঙ্গের একটি সভা হ'লো। এই সভায় গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করা হ'লো এবং স্থির হ'লো যে, গান্ধীজীকে ও তাঁর সঙ্গী ভারতীয়দের কোনক্রমেই দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নামতে দেওয়া হবে না। সেজন্যে প্রয়োজন হ'লে বলপ্রয়োগও করা হবে। সমগ্র ডারবানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। ডারবানের ভারতীয় অধিবাসীরা সব সময় হাঙ্গামা বাধবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে রইলো। আটক জাহাজ দুটি থেকে সরকারের কাছে অনুযোগ-অভিযোগ এলো; কিন্তু তার কোনও জবাব পাওয়া গেল না। জাহাজে ভারতীয় যাত্রীদের ভয় দেখিয়ে চিঠি আসতে লাগলো: "তোমরা ফিরে যাও। নইলে

তোমাদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে। তোমরা যদি ফিরে যেতে চাও, তবে তোমাদের ফিরে যাওয়ার ভাড়াও দেওয়া হবে।" জাহাজ থেকে সংক্ষিপ্ত জবাব এলো: "যাত্রীরা ফিরে যেতে অসম্মত।"

গান্ধীজী জাহাজে যাত্রীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যাত্রীরা সকলেই ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। অবশেষে ২৫ দিন বাদে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে জাহাজ ছুটিকে বন্দরে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'লো এবং যাত্রীদের অবতরণের অনুমতি এলো।

অ্যাটর্নি-জেনারেল মিঃ হ্যারি এস্‌কোম একটি নৌকোয় ক'রে 'কুরল্যাণ্ড' জাহাজের পাশে পাশে যাচ্ছিলেন। তিনি যাত্রীদের জানালেন যে, তারা নাটাল সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তারপর তিনি তীরে উঠে সমবেত জনতার উদ্দেশে একটি ভাষণ দিয়ে তাদের শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে যেতে বললেন। তিনি আইনসভার আসন্ন অধিবেশনে এই বিষয়ে ব্যবস্থাগ্রহণের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। প্রায় পাঁচ হাজার শ্বেতাঙ্গের জনতাটি স্থানত্যাগ করলো। যাত্রীরা এখন নৌকোয় ক'রে নামতে লাগলো। গান্ধীজীকে অবশ্য যাত্রীদের সঙ্গে না নেমে রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হ'লো। গান্ধীজী এই পরামর্শ গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু বিকালের দিকে একজন ইউরোপীয় আইনজীবী ও গান্ধীজীর বন্ধু মিঃ লটন এসে বললেন, "গান্ধীজীর রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত নামা ঠিক হবে না। তাঁকে উপযুক্ত মানুষ ও রাজনৈতিক নেতার মতো যা কিছু আসুক তার সম্মুখীন হ'তে হবে।" গান্ধীজীও এটিকেই সমুচিত পন্থা মনে করলেন এবং স্ত্রী ও ছেলেদের পৃথক-ভাবে জাহাজ থেকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজ দায়িত্বে জাহাজ থেকে নামলেন। গান্ধীজী তীরে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ছোকরা তাঁকে চিনতে পারলো। তারা 'গান্ধী। গান্ধী।' 'ওকে ধরো।'

'ওকে ধরো।' ব'লে চীৎকার ক'রে ছুটতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ভীড় জমে গেল। লটন একটি রিক্‌শ করলেন। কিন্তু জুলু রিক্‌শওয়ালা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল। গান্ধীজী ও লটন এগিয়ে চললেন। তাঁদের ঘিরে ক্রমেই ভীড় বাড়তে লাগলো। অবশেষে আর এগুনো সম্ভব হয়ে উঠলো না। ভীড়ের চাপে ও গুঁতোগুঁতিতে লটন ছিটকে পড়লেন এবং গান্ধীজীর উপর ইঁট-পাটকেল, মাছ, পচা ডিম ইত্যাদি বর্ষিত হ'তে লাগলো। কেউ তাঁর পাগড়ি ছিনিয়ে নিলো। কেউ তাঁকে প্রহার করতে লাগলো। গান্ধীজী একটি বাড়ির রেলিং ধ'রে কোনরকমে নিজেকে ঠিক রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর ওপর ঘুষি, লাথি ক্রমাগত পড়তে লাগলো।

এই সময়ে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের স্ত্রী মিসেস্ আলেকজাণ্ডার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি নিজের ছাতা খুলে তা দিয়ে ইঁট-পাটকেল ইত্যাদি ঠেকালেন এবং গান্ধীজী ও জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রহারের হাত থেকে রক্ষা করতে লাগলেন। ফলে উন্মত্ত জনতা থমকে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে একজন ভারতীয় ছোকরা "ওরা গান্ধীকে মেরে ফেললে।" ব'লে চীৎকার করতে করতে পুলিশের কাছে গিয়েছিল। ফলে কয়েকজন কনস্টেবল ঘটনাস্থলে এসে পড়লো এবং গান্ধীজীকে জনতার হাত থেকে রক্ষা ক'রে থানায় নিয়ে গেল। থানায় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাঁকে আশ্রয় দিতে চাইলেন, কিন্তু গান্ধীজী বললেন, "আমি ওদের সৎবুদ্ধিতে বিশ্বাস রাখি। ওরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেই শান্ত হবে।"

গান্ধীজীর স্ত্রী ও ছেলেদের আগেই নাটালের অন্যতম ধনী পার্শী ব্যবসায়ী রুস্তমজীর বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। গান্ধীজীকে পুলিশ-পাহারায় সেখানে পাঠানো হ'লো। গান্ধীজীর সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। একজন ডাক্তার সেগুলির চিকিৎসায়

ব্যবস্থা করলেন। রাত্রি হ'লো। শ্বেতাঙ্গরা দলে দলে রুস্তমজীর বাড়ির চারদিকে জড় হ'তে লাগলো। তারা গান্ধীকে তাদের হাতে দেওয়ার দাবিতে চীৎকার করতে লাগলো। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গান্ধীজীকে ব'লে পাঠালেন, গান্ধীজী যদি তাঁর বন্ধুর গৃহ ও ধনসম্পত্তি ও নিজের স্ত্রী-পুত্রদের রক্ষা করতে চান, তবে তিনি যেন ছদ্মবেশে রুস্তমজীর গৃহ ত্যাগ করেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরামর্শমতো গান্ধীজী একজন ভারতীয় কনস্টেবলের ছদ্মবেশ নিলেন এবং মাথায় পাগড়ির তলায় একটি ধাতুনির্মিত পাত্র দিলেন। দুজন গোয়েন্দা তাঁর সঙ্গে গেল। তিনি নিরাপদে রুস্তমজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাছের একটি দোকানে পৌঁছলেন। তারপর অলিগলি ঘুরে, বেড়া ও রেলিং টপকে থানায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এদিকে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জনতাকে নানাভাবে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন। এমন কি তিনি "Hang old Gandhi in the sour apple tree" গানটিও রচনা ক'রে শোনালেন। গান্ধীজী নিরাপদে থানায় পৌঁছলে জনতাকে গান্ধীজীর পলায়নের সংবাদ দেওয়া হ'লো। জনতা হতাশ হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

গান্ধীজীর প্রতি আক্রমণের এই সংবাদ ইংলণ্ডেও পৌঁছলো। তৎকালীন উপনিবেশ-সচিব মিঃ জোসেফ চেম্বারলেন গান্ধীজীর আক্রমণকারীদের বিচারের জন্য নাটাল সরকারকে নির্দেশ দিলেন। গান্ধীজী কিন্তু আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা আনতে নাটাল সরকারকে নিষেধ করলেন। বললেন: "যারা আমাকে আক্রমণ করেছিল, তাদের আমি দোষ দিই না। কারণ আমি ভারতে গিয়ে নাটালের শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বিবৃতি দিয়েছি ও তাদের নিন্দা করেছি, এই সংবাদ তাদের দেওয়া হয়েছিল। যদি কারো দোষ থাকে, তা শ্বেতাঙ্গ নেতাদের। আমি কাউকে অভিযুক্ত করতে চাই না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা যখন আসল ব্যাপার জানতে পারবে, তখন তারা নিজেদের কাজের জন্য দুঃখিত হবে।"

সংবাদপত্রগুলিতে গান্ধীজীকে নির্দোষ ও জনতাকে অপরাধী ঘোষণা ক'রে মন্তব্য করা হ'লো। শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণও নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো। তিন-চার দিন বাদেই গান্ধীজী স্বগৃহে ফিরে গেলেন।

এদিকে আইনসভার অধিবেশন শুরু হ'লো। আইনসভায় দুটি ভারতীয়বিরোধী বিল. আনা হ'লো। একটিতে ভারতীয় বণিকদের স্বার্থহানির, অন্যটিতে নাটালে ভারতীয়দের আগমনরোধ করবার চেষ্টা করা হ'লো। গান্ধীজী এই বিলগুলির অর্থ ভারতীয়দের বুঝিয়ে দিলেন এবং প্রতিবাদে ভারতীয়দের মধ্যে আন্দোলন গ'ড়ে তুললেন। বিল দুটি অগ্রাহ্য করবার জন্যে উপনিবেশ-সচিবের কাছে আবেদনও করলেন। কিন্তু আবেদন ব্যর্থ হ'লো; বিল দুটি আইনে পরিণত হ'লো। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য তিনি প্রস্তুত হ'তে আহ্বান জানালেন। নাটাল কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগলো।

শহরের উপকণ্ঠে একটি ছোট্ট বাড়িতে গান্ধীজী থাকতেন। বাড়িতে একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ছিল। গান্ধী পরিবারের আহার অতি সাধারণ হ'লেও গান্ধী প্রায়ই তাঁর ইংরেজ বন্ধু ও ভারতীয় সহকর্মীদের নিমন্ত্রণ করতেন। তিনি ছেলেদের ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরাই উচিত মনে করতেন। তাদের তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা দেওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে তাদের পড়াশুনোর অসুবিধা থাকায় তিনি তাদের জন্যে একজন ইংরেজ গভর্নেস নিযুক্ত করলেন এবং নিজে মাতৃভাষা গুজরাটীতে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ফলে গান্ধীজীর সাংসারিক ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক বাড়লো।

কিন্তু এই বিলাস ও সচ্ছলতার জীবন দীর্ঘায়ু হ'লো না। ইংলণ্ডে যেমনটি ঘটেছিল, আবার তেমনটি ঘটলো। শুরু হ'লো আত্মসমীক্ষা। তিনি সাংসারিক ব্যয় হ্রাস করবার জন্য ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়া বন্ধ করলেন। কাপড় কাচা সম্পর্কে

একটি বই কিনে কস্তুরবাঈকে কাপড় কাচা শেখালেন। বাজার থেকে কাঁচি ও ক্লিপার কিনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুল নিজে ছাঁটতে শুরু করলেন। গৃহকর্মের ভার পড়লো কস্তুরবাঈয়ের ওপর। কেবল গৃহকর্ম নয়, অনেক সময় তাঁকে অপরের পায়খানার পাত্রও পরিষ্কার করতে হ'তো। কস্তুরবাঈ মুখ বুঝে সব করতেন। একবার এক অস্পৃশ্য পঞ্চমা এলো গান্ধীজীর বাড়িতে। এখানে যে যার পায়খানার পাত্রগুলি নিজেরাই সাধারণত সাফ করতো। ঐ লোকটি তা না জানায় কস্তুরবাঈকেই তা সাফ করতে হ'লো। তিনি অপরের পাত্র অনেক সময় সাফ করেছেন, তা ব'লে একজন অস্পৃশ্য পঞ্চমার পায়খানার পাত্রও তাঁকে সাফ করতে হবে? কস্তুরবাঈয়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। গান্ধীজী তা দেখে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। এমন কি তাঁকে টানতে টানতে গেটের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন কস্তুরবাঈ ব'লে উঠলেন, "তোমার লজ্জা ব'লেও কি কিছু নেই? আমি কোথায় যাব?" গান্ধীজী লজ্জিত হলেন।

সেবাধর্ম গান্ধীজীর মনকে কিছুদিন আলোড়িত করছিল। একবার এক কুষ্ঠরোগী তাঁর বাড়িতে এলে তাকে তিনি আশ্রয় দিলেন। তার ক্ষত তিনি ধুইয়ে দিলেন, নিজেই তার সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। পরে তিনি তাকে একটি হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দিলেন। রোজই কিছু সেবার কাজ করবার জন্যে তাঁর মন কেবলই ব্যাকুল হ'তো। তাই তিনি রোজ এক ঘণ্টা ক'রে একটি ছোট হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। এই কাজে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকদের পরিচয় পেলেন। শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। এইভাবে দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে গান্ধীজী অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করলেন। তাঁর এই প্রভাব তাঁর পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে খুবই কার্যকর হয়েছিল।

সাত

বুয়ার যুদ্ধে

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ওলন্দাজরাই সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই ওলন্দাজরা 'বুয়ার' নামে পরিচিত ছিল। পরে ইংরেজরা দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করলো। দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে ইংরেজদের এবং ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে বুয়ারদের আধিপত্য ছিল। বুয়াররা ভারতীয় বিদ্বেষে ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী উগ্র ছিল। ট্রান্সভালের বুয়ার প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার প্রকাশ্যেই ঘোষণা করতেনঃ এশিয়াবাসীরা ইসমেলের সন্তান, সুতরাং জন্মসূত্রে তারা এসাউয়ের সন্তানদের দাসত্ব করতে বাধ্য। উপনিবেশে আধিপত্য নিয়ে বুয়ার ও ইংরেজদের মধ্যে দীর্ঘকালীন বিবাদ ও রেষারেষি ছিল। অবশেষে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিরঙ্কুশ অধিকার নিয়ে বুয়ারদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধলো। এই যুদ্ধ 'বুয়ার যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

যুদ্ধে ঘটনাগুলি ক্ষিপ্রগতিতে ঘটতে লাগলো। ভারতীয়দের অধিকাংশই এই দুই শ্বেতাঙ্গজাতিকে পরস্পরের রক্তক্ষয় করতে দেখে আনন্দিত হ'লো। গান্ধীজীর অহিংসা-সংক্রান্ত মতবাদ তখনও গ'ড়ে ওঠেনি। তিনি মনে মনে বুয়ারদের প্রতিই সহানুভূতি বোধ করতেন। কারণ ইংরেজরা বুয়ারদের স্বাধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। তিনি তা সত্ত্বেও ইংরেজদের সমর্থন করা শ্রেয় মনে করলেন। ভারতীয়রা যদি নাটালে নাগরিক অধিকার দাবি করে, তবে তাদের নাগরিক কর্তব্যও আছে। এই যুদ্ধে বুয়াররা জিতবে; যদি নাটালের ভারতীয়রা বুয়ারদের সমর্থন করে, তবে তারা বুয়ারদের কাছে সহানুভূতি পাবে,—এইরকম যুক্তি যারা দেখালো, তাদের তিনি ভীরু ও স্বার্থপর ব'লে নিন্দা করলেন। তিনি বললেন, ভারতীয়রা

একই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা, নাটালের ভারতীয়দের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য থাকা উচিত, ইত্যাদি। সহজেই গান্ধীজী নাটালের ভারতীয়দের স্বমতে আনতে সমর্থ হ'লেন। তিনি এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করবার জন্যে ভারতীয়দের এগিয়ে আসতেও আহ্বান জানালেন। কিন্তু নাটালের ইংরেজ সরকার এতে বিশেষ উৎসাহ দেখালো না। নাটাল আইন পরিষদের অন্যতম সদস্য মিঃ জেমসন বললেন: "ভারতীয়রা যুদ্ধের কিছুই জানে না। তারা যুদ্ধে সহায়ক না হয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর বোঝা হয়ে উঠবে।" গান্ধীজী বললেন, "ভারতীয়রা এই যুদ্ধে কি হাসপাতাল প্রভৃতিতে সাধারণ পরিচারকের ভূমিকাও নিতে পারে না?" জেমসন বললেন, "তাতেও শিক্ষার দরকার।"

কিন্তু ইংরেজরা কতিপয় যুদ্ধে বুয়ারদের কাছে বিপর্যস্ত হ'লো। ইংরেজ জেনারেল বুলারের বাহিনী তুগেলা নদীর তীরে যুদ্ধে চরম বিপদের সম্মুখীন হ'লো, বহু ইংরেজ যুদ্ধে ক্রমাগত হতাহত হ'তে লাগলো। তখন ইংরেজরা গান্ধীজীর প্রস্তাব গ্রহণ করলো এবং একটি 'ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স কোর' গঠনের অনুমতি দিল। ১১০০ ভারতীয় নিয়ে এই অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠিত হ'লো। ভারতীয় অ্যাংলিক্যান মিশনের ডাঃ বুথ ভারতীয়দের শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত ক'রে তুললেন। গান্ধীজী এই বাহিনীর সংগঠক হ'লেও তাঁর ওপর একটি দলের ভার ছিল। ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স কোরের লোকেরা বেহারার সামান্য বেতন মাত্র পেতো। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাদের পোশাক ও আহার্যাদি জোগাতেন।

১০ই নভেম্বর বুয়াররা কলেন্সো অধিকার করলো। এখানে বহু ইংরেজ সৈন্য হতাহত হ'লো। বহু ইংরেজ বন্দী হ'লো। বন্দীদের মধ্যে ইংলণ্ডের পরবর্তীকালের প্রধান মন্ত্রী ও তৎকালে তরুণ উইনস্টন চার্চিল-ও ছিলেন। কলেন্সোতে যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স কোরের ডাক এলো। এখানে অ্যাম্বুলেন্স কোর

রণক্ষেত্রে জীবন তুচ্ছ ক'রেও হতাহত ইংরেজ সৈনিকদের বইবার কাজে আত্মনিয়োগ করলো। কলেন্সোর যুদ্ধের পরে তাদের ডাক পড়লো স্পিয়নকপের রণক্ষেত্রে। ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স কোর এখানে প্রায় তিন সপ্তাহ কাজ করলো। সাধারণতঃ অ্যাম্বুল্যান্স কোরের কাজ ছিল আহত সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বয়ে বাইরে নিয়ে আসা এবং বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে তাদের পৌঁছে দেওয়া। গোলা-গুলীর রেঞ্জের মধ্যে তাদের যাওয়ার কথা না হ'লেও ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর অনেকেই অনেক সময় জীবন তুচ্ছ ক'রে গোলাগুলীর রেঞ্জের মধ্যে যেতো এবং অসমসাহসের সঙ্গে আহত সৈনিকদের উদ্ধার করতো। জেনারেল বুলার তাঁর ডেসপ্যাচগুলিতে ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স কোরের কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন এবং এই কোরের ৩৫ জন নেতা পরে বীরত্বের জন্যে পুরস্কার পেয়েছিলেন। গান্ধীজীও অসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। জেনারেল উডগেট মারাত্মকভাবে আহত হ'লে তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ভার গান্ধীজী ও তাঁর দলের ওপর দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী অতিশয় সন্তর্পণে এই মুমূর্ষু জেনারেলকে প্রায় ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর এই সাহস ও সেবা ব্রিটিশ সরকারের কাছে অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাঁর সততা, সাহস ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তৎকালীন একনিষ্ঠ আনুগত্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদের কাছে তাঁকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। তাঁর এই মর্যাদা তাঁর পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজরা পর পর জয়লাভ করতে থাকলে ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স কোর ভেঙে দেওয়া হ'লো। বলা হ'লো, প্রয়োজন হ'লে ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স কোর পুনরায় গঠন করা হবে। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হ'লো না। যুদ্ধ আরও দু বছরের বেশি সময় চলে। অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে

বুয়াররা আত্মসমর্পণ করে, এবং ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটেও ইংরেজদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বুয়ার যুদ্ধে ভারতীয়রা ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করায় এবং ব্রিটিশ শাসক ও সামরিক মহল এবং সংবাদপত্রগুলি তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করায় ভারতীয়রা বিজয়ী ইংরেজদের কাছে উদার ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ আশা করেছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লখ্নৌ কংগ্রেসে এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার দাবি ক'রে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ঐ সময় ইংলণ্ডের সমরসচিব ছিলেন লর্ড ল্যান্সডাউন। লর্ড ল্যান্সডাউন আগে ভারতের বড়লাট ছিলেন। তিনি বললেন যে, ট্রান্সভালে বুয়াররা ভারতীয়দের ওপর এতোদিন যে নির্যাতন চালিয়েছে, তা তাঁকে যতোখানি ক্ষুব্ধ করেছে, এমন কিছুই তাঁকে ক্ষুব্ধ করেনি। এইভাবে নানা কারণেই বিজয়ী ইংরেজদের কাছ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা ন্যায়বিচার ও সদয় ব্যবহার আশা করেছিল। গান্ধীজীও অনুরূপ আশা পোষণ করতেন। ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স কোর ভেঙে দেওয়ার পর গান্ধীজী নানাপ্রকার জনহিতকর ও সেবামূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গরা প্রায়ই অপরিচ্ছন্নতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ-সৃষ্টির অভিযোগ ক'রে থাকে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যাও ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সমান নাগরিক অধিকারলাভের যোগ্য হ'তে হ'লে ভারতীয়দের যে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি গ'ড়ে তোলা দরকার, তা তিনি ভারতীয়দের বোঝান এবং তাদের সকলকেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি অনুশীলন করতে উদ্‌বুদ্ধ করেন। একবার শহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা দেখা দিলে, শহরের পৌরসভার পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগ প্রতিরোধের জন্যে ব্যবস্থা করা হয়। এতে পৌরসভা ভারতীয়দের সহযোগিতা চাইলে গান্ধীজী অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সানন্দে এগিয়ে আসেন।

গান্ধীজী এক বৎসরের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর ছু বছর কেটে গেল। ভারতীয়রা ইংরেজ উপনিবেশ সরকারের কাছে এখন সুবিচার পাবে এই আশা তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল। তাই তিনি এখন দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে ভারতে ফিরে যেতে চাইলেন। তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুরা তাতে সহজে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী এক বৎসরের মধ্যে যদি কোন প্রয়োজন হয়, তখন ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের সম্মতি পেলেন।

নাটালে বহু স্থানে গান্ধীজীকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হ'লো। সব জায়গাতেই তিনি বহু মূল্যবান্ উপহার পেলেন। সেগুলির মধ্যে সোনারূপার ও হীরার জিনিসও ছিল। একটি ছিল প্রায় পঞ্চাশ গিনি মূল্যের সোনার হার। হারটি কস্তুরবাঈয়ের জন্যে বন্ধুরা দিয়েছিলেন। গান্ধীজী এইসব মূল্যবান্ উপহার নিয়ে উভয়-সমস্যায় পড়লেন। তিনি নিজেকে ও তাঁর স্ত্রীপুত্রদের সরল অনাড়ম্বর জীবনের জন্যে ধীরে ধীরে প্রস্তুত ক'রে তুলেছিলেন। এখন মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগই ছিল তাঁদের লক্ষ্য ও আদর্শ। তবে এই সোনার হার, হীরার আংটি, সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, এসব নিয়ে তিনি কি করবেন? অথচ হাজার হাজার টাকার জিনিস, বিশেষত প্রিয়জনদের দেওয়া উপহার, সহজে ত্যাগ করাও কঠিন ছিল। তিনি সহজে ত্যাগ করতে পারলেও তাঁর স্ত্রী যে সহজে রাজী হবেন, এমন আশা খুবই কম ছিল। তাই গান্ধীজী অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হলেন। রাত্রিতে তিনি ঘুমুতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ছেলেদের কাছেই পরামর্শ চাইলেন। বালকরা পিতার আদর্শে শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। এসব জিনিস তারা ফিরিয়ে দিতে বললো। বললো, যদি কখনও এসব জিনিস আমাদের দরকার হয়, তখন আমরা সহজেই কিনে নিতে পারব। তখন গান্ধীজী তাদের মাকে বোঝাবার ভার ছেলেদের হাতেই দিলেন।

ছেলেরা বললো, মা তো গয়না পরেন না; এসব জিনিস তিনি রাখতে চাইলে আমাদের জন্যেই রাখবেন। আমরা যখন রাখতে চাই না, তখন মা অমত করবেন কেন? কিন্তু কাজে কাজে দেখা গেল, মায়ের ভীষণ অমত।

কস্তুরবাঈ গান্ধীকে বললেন, "তোমার এসবে দরকার নেই জানি। তোমার ছেলেরা তো তোমার কথাতেই নাচবে। ধরলাম, তাদেরও দরকার নেই। তুমি আমাকে গয়না পরতে দাও না, সেটা বুঝি। কিন্তু তা ব'লে আমার ছেলেদের বৌরাও গয়না পরবে না, এ কেমন কথা? তাছাড়া মানুষের কখন কি ঘটে কে জানে? আমি কখনও এসব জিনিস হাতছাড়া করতে পারব না।"

গান্ধীজী বললেন, "ছেলেদের বউ হ'তে অনেক দেরি। আমরা তাদের বাল্যবিবাহ দেব না। তারা বড় হ'লে নিজেদের কথা নিজেরা ভাবতে পারবে। তাছাড়া, গয়না না হ'লে চলবে না, এমন বউই বা ঘরে আনব কেন? আর যদি গয়না তাদের দিতেই হয়, আমি তো আছি।"

"তুমি আছ! আমি তোমাকে বেশ জানি। তুমি তাদের গয়না দেবে! তুমি ছেলেদের এখন থেকে সন্ন্যাসী ক'রে তুলতে চাইছ। তাছাড়া, অন্য জিনিস সম্পর্কে তুমি যাই বল, সোনার হার তো আমাকে দিয়েছে। তা ফিরিয়ে নেওয়ার তোমার কি অধিকার আছে?"

গান্ধীজী বললেন, "হারটা যে দিয়েছে, তা তোমার কাজের জন্যে, না আমার কাজের জন্যে?"

কস্তুরবাঈ বললেন, "হ'তে পারে তোমার কাজের জন্যে। কিন্তু তোমার জন্যে দিনরাত খেটে মরে কে? সেটা কি কাজ নয়? তুমি আমাকে বাঁদীর বেহদ্দ করেছ।"

কিন্তু গান্ধীজী ও তাঁর ছেলেরা অবিচলিত রইলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী কস্তুরবাঈয়ের কাছ থেকেও সম্মতি পেলেন।

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের পক্ষে একটি ট্রাস্ট তৈরি ক'রে এইসব মূল্যবান জিনিস তিনি তার হাতেই তুলে দিলেন। পার্শী রুস্তমজী ও অন্যান্য কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন ট্রাস্টি। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৮৯৬ থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যতকিছু মূল্যবান উপহার পেয়েছিলেন, সবই তিনি ঐ ট্রাস্টকে দান করলেন। একটি ব্যাঙ্কে তা জমা রইলো। দলিলে বলা হ'লো যে, গান্ধীজীর বা ট্রাস্টিদের ইচ্ছানুসারে দক্ষিণ ভারতীয়দের হিতার্থে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

গান্ধীজী সপরিবারে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ ক'রে ভারতে ফিরলেন।

আট

ভারতে এক বৎসর

গান্ধীজী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে পৌঁছলেন। ঐ সময় কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল। ঐবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ডি. ই. ওয়াচা। গান্ধীজী বোম্বাই থেকে স্যার ফিরোজ শাহ্ মেহ্তা ও ডি. ই ওয়াচার সঙ্গে একই ট্রেনে কলকাতা এলেন। পথে গান্ধীজী স্যার ফিরোজ শাহ্ মেহ্তার সঙ্গে তাঁর সেলুনে দেখা করলে তিনি বললেন, "গান্ধী, তোমার জন্যে বিশেষ কিছু করতে পারব, মনে হয় না। তবে তোমার প্রস্তাবটি যাতে কংগ্রেসে পাস হয়, তার চেষ্টা করব। আমরাই বা ভারতবর্ষে কি এমন অধিকার ভোগ করছি?"

গান্ধীজী কলকাতায় এলে লোকমান্য তিলক ও কংগ্রেসের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে রইলেন। তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্যে কিছু কাজকর্ম করতে চাইলে তাঁকে লেখাজোখার কিছু কাজ দেওয়া হ'লো। তাছাড়া তিনি প্রতিনিধিদের পায়খানা পরিষ্কার করা প্রভৃতি কিছু কাজ স্বেচ্ছায় নিলেন।

বিডন স্কোয়ারে সুসজ্জিত বিশাল মণ্ডপে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। গান্ধীজীকে গোখেল কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী-কমিটির একটি অধিবেশনে নিয়ে গেলেন। গোখেলের চেষ্টায় গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ লক্ষাধিক ভারতীয়দের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করবার সুযোগ পেলেন। এ বিষয়ে তাঁকে মাত্র পাঁচ মিনিট বলতে দেওয়া হয়। ফলে তিনি যে বক্তৃতাটি লিখে এনেছিলেন, তা না প'ড়ে সংক্ষেপে কিছু বলতে চান। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে প্রায় কিছু না বলবার আগেই নির্বাচিত সময় শেষ হয় ও ঘণ্টা বেজে ওঠে। গান্ধীজী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ব'সে পড়েন। তবে তাঁর

প্রস্তাবটি, অন্যান্য সকল প্রস্তাবের মতই, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী গোখেল, তিলক, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। কিন্তু কংগ্রেসের কার্যকলাপে তিনি খুব খুশী হ'তে পারেন নি। বছরে তিন দিনের জন্যে এই সংস্থাটির অধিবেশন বসে, কয়েকটি নিরীহ প্রস্তাব ইংরেজী ভাষায় গৃহীত হয়, তারপর সারা বৎসর সংস্থাটি নিদ্রামগ্ন থাকে। কংগ্রেসের সংগঠন বলতে কিছু নেই; স্বেচ্ছাসেবকদেরও ঠিকমতো শিক্ষিত ক'রে তোলা হয় না।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পরও গান্ধীজী মাসখানেক কলকাতায় কাটান। ঐ সময় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। কলকাতায় গোখেল তাঁকে বহু নেতার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। কিছুদিন গান্ধীজী ইণ্ডিয়া ক্লাবে থাকেন, তারপর থাকেন গোখেলের সঙ্গে গোখেলের বাসায়। গোখেলের বাসার পাশেই থাকতেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। গোখেল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ করিয়ে দেন। প্রফুল্লচন্দ্রের অনাড়ম্বর জীবন গান্ধীজীকে মুগ্ধ করে। এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাসে ৮০০ টাকা রোজগার করেন, অথচ নিজের জন্যে মাত্র ৪০ টাকা রেখে বাকী টাকা জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন। গান্ধীজী এই সময়ে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সারদা মিত্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান এখানেও চলে। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। ঐ সময়ে মহর্ষির সঙ্গে সকল প্রকার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ থাকায় তিনি দেখা করবার সুযোগ পান না। তবে মহর্ষির বাসভবনে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের একটি উৎসব-অনুষ্ঠানে তিনি অতিথিরূপে যোগ দেন। ঐ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়

মঠে ছিলেন। গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করেন এবং বেলুড় মঠে যান। কিন্তু স্বামীজী অসুস্থ থাকায় তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হয় না। গান্ধীজী ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। তিনি কালীঘাটে কালীমন্দিরে যান। এখানে ভিক্ষুকের ভীড় দেখে তিনি বিস্মিত হন। কালীমন্দিরে বলিদানের ফলে প্রবাহিত ছাগ-রক্তস্রোত দেখে তিনি কাতর ও বিচলিত হন।

তিনি কয়েকদিনের জন্যে ব্রহ্মদেশ ভ্রমণেও যান। তখন ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। গান্ধীজী এখানে স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা ও কর্মতৎপরতা দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। কিন্তু পুরুষদের অলস জীবনও তাঁকে পীড়িত করে। এখানে ভারতীয়রা ইংরেজদের বর্মীদের শোষণে সাহায্য করছে দেখে তিনি খুবই বেদনা বোধ করেন।

গান্ধীজী তৃতীয় শ্রেণীতে ট্রেনে ক'রে ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান। তৃতীয় শ্রেণীতে গান্ধীজীর ভ্রমণের কথা শুনে গোখেল হাসেন। গান্ধীজী বারো আনা দিয়ে একটি ক্যানভাসের ব্যাগ ও একটি ভারতীয় মোটা পশমে তৈরী লম্বা কোট কেনেন। ব্যাগে ঐ কোট, একখানা ধুতি, একটি জামা, একখানা তোয়ালে তিনি সঙ্গে নেন। আর নেন একটি কম্বল ও একটি লোটা। গোখেল তাঁকে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসেন। গান্ধীজী এই সময়েই স্থির করেছিলেন যে, শিক্ষিত শ্রেণীর তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করা উচিত। তাঁদের উচিত বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের কদভ্যাসগুলি পরিবর্তন করানো। যখন প্রয়োজন হবে, তখনই রেলের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করাও তাঁদের কর্তব্য। গান্ধীজী মেইল ট্রেনে ভ্রমণের চেয়ে প্যাসেঞ্জার গাড়িতে ভ্রমণই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি পথে বেনারস, আগ্রা, জয়পুর ও পালানপুর হয়ে রাজকোট যাবেন স্থির করেছিলেন। প্রত্যেকটি শহরে তিনি

একদিন ক'রে কাটান এবং সাধারণ তীর্থযাত্রীর মতো হয় ধর্মশালায় নয় পাণ্ডাদের আশ্রয়ে থাকেন। রেলভাড়া সমেত তাঁর খরচ হয় মাত্র একত্রিশ টাকা। এখন থেকে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রা করেন।

বারাণসীতে তিনি গঙ্গাস্নান ক'রে বিশ্বনাথের মন্দির পরিদর্শন করেন। এখানে সমগ্র পরিবেশ তাঁর বিশ্রী লাগে। পুরোহিতদের দক্ষিণার জন্যে ঝুলোঝুলি ও পীড়াপীড়ির আপত্তিস্বরূপ তিনি মাত্র এক পাই দক্ষিণা দিলে পুরোহিতরা তারস্বরে তাঁকে অভিশাপ দিতে থাকে। এখানে রোগভোগের পর মিসেস্ অ্যানি বেসাণ্ট বিশ্রামলাভ করছিলেন। গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে স্বল্পক্ষণের জন্যে সাক্ষাৎ করেন।

গান্ধীজী রাজকোটে এসে সেখানে কয়েকমাস প্র্যাক্‌টিস করেন। তিনি জামনগরে একটি মামলায় জিতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বোম্বাই গিয়ে হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিসের জন্যে উৎসাহিত করেন। গোখেলেরও ইচ্ছা ছিল যে, গান্ধীজী বোম্বাইয়ে গিয়ে থাকেন, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন এবং অবসরসময়ে তাঁকে কংগ্রেসের কাজে সাহায্য করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি গান্ধীজী রাজকোট ছেড়ে বোম্বাই যান। তিনি গিরগামে বাসা নেন এবং সপরিবারে সেখানে গিয়ে থাকেন।

বোম্বাইয়ে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজীর মেজো ছেলে মণিলাল টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন, সেই সঙ্গে তাঁর নিউমোনিয়াও দেখা দেয়। ডাক্তার মণিলালের জন্য ডিম ও মুরগীর জুস পথ্যরূপে ব্যবস্থা করলে গান্ধীজী তাতে অসম্মত হন। তিনি বলেন, "আমাদের বাঁচবার উপায়েরও একটা সীমা থাকা দরকার। আমি ধর্ম জিনিসটাকে যেমন বুঝেছি, তাতে এমন কি এই অবস্থাতেও আমাকে আমার পরিবারের কাউকে আমি মাংস বা ডিম খেতে দিতে পারি না। সুতরাং এতে যে বিপদের ঝুঁকির কথা আপনি বলছেন, সেই বিপদের ঝুঁকিও আমাকে অবশ্যই নিতে

হবে।" এই সময়ে গান্ধীজী বিখ্যাত জার্মান জলচিকিৎসক লুইস কুহ্‌নের জলচিকিৎসা-পদ্ধতির অনুসরণে মণিলালের চিকিৎসা করতে থাকেন। প্রথমে কোন সুফল না দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু ক্রমেই মণিলাল আরোগ্যের পথে যান এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। গান্ধীজী জলচিকিৎসায় ও স্বভাব-আরোগ্যে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। মণিলালের আরোগ্যলাভের পর গিরগামের স্বল্পালোক ও স্যাঁতসেঁতে বাসাটি ছেড়ে তিনি সাণ্টা ক্রুজে একটি বাংলোতে উঠে আসেন।

গান্ধীজী বোম্বাইয়ে আশাতীত পসার জমিয়ে ফেলেন, অবশ্য হাইকোর্টে এখনও তিনি কোন কাজ পান না। নূতন ব্যারিস্টারদের মতো তিনি হাইকোর্টে নিয়মিত মামলাগুলি শুনতে এবং লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করতে থাকেন। গোখেল এই সময়ে সপ্তাহে দু-তিন বার তাঁর সময়মতো গান্ধীজীর চেম্বারে চ'লে আসতেন এবং বহু বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে গান্ধীজীর পরিচয় করিয়ে দিতেন।

গান্ধীজী যে স্থায়িভাবে বোম্বাইয়ে বসছেন, এ বিষয়ে কারও কোন সংশয় ছিল না। তাঁর নিজেরও না। কিন্তু ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি হঠাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটি তারবার্তা এসে পৌঁছলো: "চেম্বারলেন আসছেন। অনুগ্রহ ক'রে অবিলম্বে আসুন।" গান্ধীজী তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁকে বড়জোর ছ মাস থাকতে হ'তে পারে, ভাবলেন। তাই তিনি বাসাটি ছাড়লেন না, স্ত্রীপুত্রদেরও সঙ্গে নিলেন না। তবে গান্ধী-পরিবারের তিন-চারজন যুবককে তিনি সঙ্গে নিলেন। ওরা সকলে গৃহকোণ ছেড়ে বহির্জগতে বেরিয়ে এসে নিজ নিজ জীবনের পথ ক'রে নিক্, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এই যুবকদের অন্যতম ছিলেন মগনলাল গান্ধী।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, ঠিক একবছর পরে, আবার গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী এক বছরের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকে আট বছর থাকতে হয়েছিল। এবার তিনি ছমাসের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হলেন। তখন কে জানতো যে, এবার ঘটনাচক্রে তাঁকে বারো বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে হবে!

নয়

আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছলেন। বুয়ার যুদ্ধের পর বিজয়ী ইংরেজদের কাছ থেকে যে সুবিচার ও সহানুভূতি পাওয়ার আশা নিয়ে গান্ধীজী স্বদেশে ফিরেছিলেন, এসে দেখলেন তা মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। বুয়ার যুদ্ধে আগে ট্রান্সভালে প্রবেশের জন্যে ভারতীয়দের কোন অনুমতিপত্র বা ছাড় লাগতো না। কিন্তু ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা ট্রান্সভাল অধিকারের পর সেখানে একটি এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্ট খোলা হয়েছিল। এই এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্ট সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গদের থেকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা। গান্ধীজী যাতে ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে পারেন, সেজন্যে তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু ডারবানের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেকজাণ্ডারের সাহায্যে একটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করলেন।

উপনিবেশ-সচিব মিঃ জোসেফ চেম্বারলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন ইংরেজ ও বুয়ারদের মধ্যে হৃদ্যতা-স্থাপনের উদ্দেশ্যে। ভারতীয়দের সম্পর্কে বুয়ারদের উগ্র মনোভাবের কথা তিনি জানতেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে যখন নাটালের ভারতীয় প্রতিনিধি-দল মিঃ চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করলেন, তখন মিঃ চেম্বারলেন সোজা তাঁদের ব'লে দিলেন: "আপনারা জানেন, স্বায়ত্তশাসনশীল এই উপনিবেশগুলির ওপর ব্রিটিশ সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণাধিকার নেই।" এই উত্তরের জন্যে ভারতীয় প্রতিনিধিদল প্রস্তুত ছিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ ভারতীয়রা সামান্য সুবিচার পাবে, এটুকু আশা তাঁদের ছিল।

মিঃ চেম্বারলেন নাটাল থেকে ট্রান্সভালে গেলেন। ট্রান্সভালের ভারতীয় প্রতিনিধিদল যাতে মিঃ চেম্বারলেনের কাছে তাঁদের বক্তব্য

ঠিকভাবে রাখতে পারেন, সেজন্য গান্ধীজী দ্রুত ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়ায় গেলেন। গান্ধীজী যাতে ট্রান্সভালে ঢুকতে না পারেন, সে চেষ্টা সরকার করছিল। কিন্তু গান্ধীজী ট্রান্সভালে প্রবেশ করেছেন এবং প্রিটোরিয়ায় পৌঁছে গেছেন দেখে তারা অবাক হ'লো। তারা ট্রান্সভালে প্রবেশের অপরাধে অভিযুক্ত করতে গিয়ে দেখলো যে, গান্ধীজী উপযুক্ত অনুমতিপত্র নিয়েই ট্রান্সভালে প্রবেশ করেছেন। তখন এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্ট থেকে তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে অত্যন্ত অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করা হ'লো, এবং জানানো হ'লো যে, ভুলক্রমে তাঁকে এই অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছে। তিনি যেন অবিলম্বে ট্রান্সভাল ত্যাগ করেন। গান্ধীজী তাতে সম্মত না হ'লে তাঁকে জানানো হ'লো যে, তিনি নাটালে মিঃ চেম্বারলেনের সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে সাক্ষাৎ করেছেন, সুতরাং ট্রান্সভালে পুনরায় তাঁকে সাক্ষাতের অধিকার দেওয়া হবে না। গান্ধীজীকে ভারতীয় প্রতিনিধিদল থেকে বাদ দেওয়ার এই আপ্রাণ চেষ্টা ভারতীয়দের কাছে উপনিবেশ সরকারের দুরভিসন্ধি সুস্পষ্ট ক'রে তুললো। তবু গান্ধীজীর পরামর্শে ভারতীয় প্রতিনিধিদল চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করলেন।

মিঃ চেম্বারলেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যেই গান্ধীজী সুদূর ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। কারণ, ইংরেজদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল। এখন সেই সাক্ষাৎকার মূষিকপ্রসব করলো দেখে তিনি বুঝলেন, এই ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন। সুতরাং এই সংগ্রাম চালাবার জন্যে তিনি যতোদিন প্রয়োজন ততোদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাই স্থির করলেন।

ট্রান্সভালের জোহানেসবার্গ শহরেই বেশী ভারতীয়ের বাস। তাই তিনি জোহানেসবার্গে দু-কামরার একটি বাসা নিলেন। তিনি ট্রান্সভাল হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের অনুমতিও পেলেন। ভারতীয়রা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত নাগরিক, সুতরাং ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে তাদের নাগরিক অধিকারলাভের পূর্ণ অধিকার আছে—এই দাবিতে ভারতীয়দের সংগ্রাম চালাবার জন্যে তিনি সংকল্প করলেন।

যতো অসাধু সরকারী কর্মচারীর আস্তানা হয়েছিল জোহানেসবার্গে। তারা ভারতীয়, চীনা ও অন্যান্য বিদেশীদের স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে নানা অজুহাতে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছিল এবং অশ্বেতাঙ্গ বিদেশীদের জীবন দুঃসহ ক'রে তুলেছিল। গান্ধীজী এই ব্যাপারের মূলোচ্ছেদ করবার জন্যে প্রচুর সাক্ষ্য সংগ্রহ ক'রে পুলিস কমিশনারের কাছে অভিযোগ আনলেন। পুলিস কমিশনার দুজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করলেন। তাদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণপত্র থাকা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ জুরী তাদের নির্দোষ ব'লে খালাস দিলো। কিন্তু এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট তাদের বরখাস্ত করলো।

অন্যান্য নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও অল্পদিনের মধ্যেই গান্ধীজীর আইনব্যবসা জমে উঠলো। জোহানেসবার্গে চারজন কেরানি নিযুক্ত ক'রেও তাঁকে সব কাজ ক'রে উঠতে বেগ পেতে হ'ত। কেরানীরা ইংরেজী ভাল না জানায় তিনি নিজেই টাইপরাইটিং করতেন। অবশেষে তিনি ১৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং মাসিক বেতনে একজন মহিলা টাইপিস্ট নিয়োগ করলেন। গান্ধীজী আইনব্যবসায় প্রচুর অর্থোপার্জন করলেও তাঁর জীবনদর্শন যে রূপগ্রহ করতে থাকে, তাতে অর্থ সম্পর্কে তিনি একটি অসামান্য নিরাসক্তি লাভ করেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি ছিল। তিনি তাঁর অফিসে নিজের টেবিলের সামনে দেয়ালে যিশু খ্রীষ্টের একটি ছবি টাঙিয়ে রাখতেন। কাজ করতে করতে মুখ তুললেই তাঁর চোখে এই ছবিটি পড়তো, এবং মানবতার জন্যে আত্মদানের এক অপূর্ব আদর্শ তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করতো। জোহানেসবার্গে তাঁর সঙ্গে থিওজফিস্টদের নিবিড় বন্ধুত্ব গ'ড়ে ওঠে। তিনি বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং পতঞ্জলির 'যোগসূত্র'-ও পড়েন। তিনি এখন নিয়মিত ভাবে গীতা পড়তে

শুরু করেন। তিনি প্রাতঃস্নানের সময়ে রোজই গীতার দু-তিনটি ক'রে শ্লোক মুখস্থ করতেন। এইভাবে তাঁর সমস্ত গীতা কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। গীতার 'অপরিগ্রহ', 'সমভাব' প্রভৃতি শ্লোকগুলি তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। কর্মেই অধিকার, ফলে অধিকার নেই, গীতার এই বাণীও তাঁর জীবনের প্রধান আদর্শ হয়ে উঠছিল। এ থেকে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মানুষের ধনার্জনের অধিকার আছে, কিন্তু সে ধন ব্যক্তিগত ভোগের জন্যে ব্যবহার না ক'রে সকলের হিতার্থে ব্যবহারের জন্যে ন্যাসরক্ষকের মতো সতর্কভাবে রক্ষা করতে হবে।

গান্ধীজী ইতিপূর্বেই জলচিকিৎসায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি জাস্ট্-রচিত Return to Nature বইখানা প'ড়ে মৃত্তিকা-চিকিৎসাতেও বিশ্বাসী হন। তিনি এই সময়ে কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতিতে ভুগছিলেন। তিনি মৃত্তিকাচিকিৎসার পদ্ধতি অনুসারে রোজ শোবার আগে পরিষ্কার মাটিকে জলে ভিজিয়ে নিয়ে পাতলা কাপড়ের উপর লাগিয়ে সেই কাপড়টি পুলটিশের আকারে পেটে দিয়ে রাখতেন। কিছুদিন এই রকম করার পর তিনি কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে চিরদিনের জন্য সুস্থ হয়ে ওঠেন। আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর নিরামিষ আহার সম্পর্কে উৎসাহ আরও বাড়ে। তিনি জোহানেসবার্গের দুটি নিরামিষ রেস্তোরাঁকে টাকা দিয়েও সাহায্য করেন। খাদ্যের পরিমাণও তিনি ক্রমেই হ্রাস করেন। তিনি রোজ তিনটি প্রধান আহার ও অপরাহ্নে চা পান করতেন। আহারের সময়ে নানা মুখরোচক পদও খেতেন। কিন্তু মাঞ্চেস্টারের "প্রাতরাশ নয় সংঘ" (No Breakfast Association) নামে একটি সংঘের কথা তিনি পড়েন। এর পর তিনি অনাবশ্যকবোধে প্রাতরাশ ত্যাগ করেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে অত্যধিক বৃষ্টি হয় এবং একটানা সতের দিন জোহানেসবার্গ শহর বৃষ্টিতে ভিজে থাকে। ফলে

ফুসফুসের প্লেগ (Pneumonic Plague) দেখা দেয়। পৌর-কর্তৃপক্ষ এই রোগনির্ণয়ে অসমর্থ হন। গান্ধীজী ভারতে এই ধরনের প্লেগ দেখেছিলেন। তাই তিনি পৌর-কর্তৃপক্ষকে সতর্ক ক'রে দেন। কিন্তু পৌর-কর্তৃপক্ষ তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না। বিভিন্ন অঞ্চলে এই জাতীয় প্লেগ দেখা দেয়। ১৮ই মার্চ তারিখে গান্ধীজী জানতে পারেন যে, খনি থেকে প্লেগরোগে আক্রান্ত মুমূর্ষু বা মৃত ভারতীয়দের ভারতীয় পল্লীগুলিতে আনা হচ্ছে। তিনি তখনি সাইকেলে ক'রে ছুটলেন ভারতীয় মহল্লাগুলিতে। তিনি পাঁচজন ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে একটি শূন্য গুদাম ভেঙে খুললেন এবং চোখের নিমিষে সেটিকে একটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করলেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে ২৩ জন রোগীকে এনে চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন। ভারতীয়রা একটি জনসভা ক'রে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করলেন। পরদিন সকালে পৌর-কর্তৃপক্ষ পুরাতন শুল্ক-ভবনটিতে একটি সাময়িক হাসপাতালের ব্যবস্থা করলেন। অনেকদিন পরিত্যক্ত থাকায় বাড়িটি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ছিল। ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকরা সেটিকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করলেন। এখানে প্রায় ত্রিশ জন রোগীকে রাখবার ব্যবস্থা হ'লো। পৌরসভা এই হাসপাতালের জন্যে একজন নার্স ধার দিলো। নার্সটি হাসপাতালের জন্য কিছু সাজসরঞ্জাম ও কিছু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এলো। সে সকলকে প্লেগ রোগের প্রতিষেধকরূপে ব্র্যাণ্ডি খাওয়াতে লাগলো। গান্ধীজীকেও ব্র্যাণ্ডি খেতে বললো। গান্ধীজী নিজে তো ব্র্যাণ্ডি খেলেন না, প্রতিষেধকরূপে ব্র্যাণ্ডির উপযোগিতায় তিনি বিশ্বাস করলেন না। ডাঃ গডফ্রের উপর ছিল হাসপাতালের ভার। গান্ধীজী তাঁর অনুমতি নিয়ে গুদামের তিনজন রোগীকে নিজে মৃত্তিকা-চিকিৎসার পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা করতে লাগলেন। তিনি তাদের মাথায় ও বুকে কাদা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। এই

তিনজন রোগীর দুজন সেরে গেল এবং একজনের মৃত্যু হ'লো। বাকী বিশজন গুদামে মারা গেল। নার্সটিও মারা গেল। গান্ধীজী পৌরসভাকে পল্লীগুলি থেকে লোক সরাতে সাহায্য করলেন। লোকগুলিকে খোলা জায়গায় এনে তিন সপ্তাহ ক্যাম্পে রাখা হ'লো। তারপর বসতিগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'লো।

গান্ধীজী এই সময়ে ডারবান থেকে একটি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ শুরু করেন। ডারবানে বোম্বাইয়ের জনৈক স্কুল শিক্ষক একটি ছাপাখানা চালাচ্ছিলেন। গান্ধীজী এই ছাপাখানাটির জন্য বেশির ভাগ টাকাই দিয়েছিলেন। এখান থেকে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে সাপ্তাহিকটি বেরুতে শুরু করে। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের প্রথম সম্পাদক হন মনসুখলাল নাজার। কাগজটিতে তামিল, গুজরাটী, হিন্দী ও ইংরেজীতে সংবাদ ও রচনাদি প্রকাশিত হ'তো। ইংরেজী রচনাগুলি লেখার ভার গান্ধীজী নিজে নিয়েছিলেন। কাগজটিতে কিন্তু লোকসান হ'তে লাগলো। প্রথম বছরে নিজের আয় থেকে তিনি এই কাগজের পেছনে দু হাজার পাউণ্ড ঢাললেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন, হয় কাগজটি বন্ধ ক'রে দিতে হবে, নয় কাগজের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাঁকে নিজেকেই নিতে হবে। গান্ধীজী কাগজটি নিজের হাতে নেওয়াই ঠিক করলেন। তিনি তাঁর বন্ধু মিঃ অ্যালবার্ট ওয়েস্টের ওপর ছাপাখানার দায়িত্ব দিলেন। মিঃ ওয়েস্ট দেখলেন ছাপাখানার অবস্থা আর্থিক দিক থেকে সঙ্গীন। গান্ধীজীকে তিনি একথা জানালে গান্ধীজী অবিলম্বে ডারবান গেলেন।

গান্ধীজীর আর একজন শ্বেতাঙ্গ বন্ধু মিঃ পোলক গান্ধীজীকে জোহানেসবার্গ স্টেশন তুলে দিতে এসেছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে ইংরেজলেখক রাস্কিনের লেখা Unto This Last বইখানি দিলেন। জোহানেসবার্গ থেকে ডারবান যেতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে বইখানি প'ড়ে শেষ করলেন।

রাস্কিনের কোনও রচনা এর আগে তিনি পড়েন নি। এই বইখানি তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে ফেললো। ট্রেন ডারবানে সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলো। কিন্তু সারারাত গান্ধীজী ঘুমোতে পারলেন না। এই বইখানি তাঁর জন্মেরও আগে, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে, লেখা হয়েছিল। বইখানির চিন্তাধারা তাঁর মনে অভাবিত আলোড়নের সৃষ্টি করলো। এইসব চিন্তার অনেকগুলিই তাঁর মনে পূর্বেই আভাসে ইঙ্গিতে অঙ্কুরিত হয়েছিল। সেগুলি এখন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করলো। সকলের মঙ্গলেই ব্যক্তির মঙ্গল; একজন ব্যারিস্টারের কাজের ও একজন নাপিতের কাজের মূল্য ও মর্যাদা সমান। শ্রমিক ও কৃষকের জীবন যথার্থই মূল্যবান্। গান্ধীজী এই চিন্তাধারাকে নিজের জীবনে রূপায়িত করতে চাইলেন।

গান্ধী-পরিবারের যেসব যুবক তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা থাকতেন টনগাটে। গান্ধীজী পরদিন তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাদের দোকানটি তাঁর ভালোই লাগলো। কিন্তু সব-চেয়ে ভালো লাগলো দোকানের পেছনের মাঠটি। মাঠটিতে ফলের কিছু গাছও ছিল। গান্ধীজীর মনে হ'লো, তাঁর আত্মীয় যুবকরা দোকান না ক'রে যদি এই মাঠে চাষ-আবাদ করতো, তবেই ভালো করতো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে একটি পরিকল্পনা এলো। তিনি তাঁর বন্ধু মিঃ ওয়েস্টকে এই পরিকল্পনার কথা জানালেন: তিনি ছাপাখানাটিকে গ্রামাঞ্চলে একটি খামারে নিয়ে যেতে চান। সকলেই সেই খামারে কাজ করবে। অবসর সময়ে তারা কাজ করবে ছাপাখানায়। প্রত্যেক কর্মীই সমান, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে মাসে তিন পাউণ্ড ক'রে হাতখরচা পাবে। খামার থেকে যে আয় হবে, তাতে সকলের ভরণপোষণ চলবে।

পরিকল্পনাটি মিঃ ওয়েস্টের খুবই ভালো লাগলো। তিনিও উৎসাহী হয়ে উঠলেন। গান্ধীজী দশ দিনের মধ্যেই এক হাজার পাউণ্ড দিয়ে ডারবান থেকে ১৪ মাইল ও ফিনিক্স স্টেশন থেকে

আড়াই মাইল দূরে একশ একর জমি কিনলেন। জমিটিতে একটি ছোট্ট সুন্দর প্রস্রবণ ছিল; আর ছিল একটি ভাঙা কুঁড়ে ও প্রচুর আম ও কমলার গাছ। এই জমিটি দীর্ঘকাল অনাবাদী পড়ে থাকায় সেখানে ঝোপঝাড় বনজঙ্গল ছিল প্রচুর। ঐসব ঝোপঝাড়ে ছিল বিষধর সাপের বাস। গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা এখানে কিছুদিন ক্যাম্প ক'রে রইলেন। ভারত থেকে গান্ধীজীর যেসব আত্মীয় ও বন্ধুরা দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন, তাঁদেরও গান্ধীজী এখানে আনলেন। ধনী ব্যবসায়ী পার্শী রুস্তমজী গান্ধীজীকে কিছু পরিমাণ পুরাতন করিউগেটেড টিন এবং বাড়ি-তৈরির মাল-মসলা দিলেন। গান্ধীজী কিছুসংখ্যক ভারতীয় ছুতার ও রাজমিস্ত্রীর সাহায্যে একমাসের মধ্যেই পঁচাত্তর ফুট লম্বা ও পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটি চালা তৈরি করালেন। এটিতে ছাপাখানা বসাবার ব্যবস্থা হ'লো। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে ফিনিক্স খামারটিতে কাজ শুরু হ'লো। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজও ডারবান থেকে ফিনিক্সে চলে এলো। অল্পসংখ্যক ভারতীয় ও ইউরোপীয় আদর্শবাদীদের নিয়েই এখানে কাজ শুরু হয়েছিল। কিছুসংখ্যক কর্মী ছিল যাদের বেতন দেওয়া হ'তো। বাকী সবাইকে ছাপাখানার আশেপাশে তিন একর ক'রে জমি দেওয়া হ'লো। ছোট ছোট কুটির বা ছোট পাকার ঘর তৈরি করবার পরিকল্পনা ছিল গোড়াতে। কিন্তু টাকার অভাবে টিনের চালা তৈরি ক'রে নেওয়া হয়েছিল। এই উপনিবেশটি যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে, সেজন্যে জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা হয়েছিল। উপনিবেশটির কাছেপিঠে কোনও গ্রাম বা লোকালয় ছিল না। প্রায় দু মাইল দূরে ছিল এখানকার আদিবাসী জুলুদের কয়েকটা ছোট খামার। স্টেশন ও উপনিবেশটির মাঝে ছিল প্রায় হাজার একর বিস্তৃত একটি আখের বাগিচা। রেল-স্টেশনের কাছে একটি ছোট দোকান ছাড়া এ অঞ্চলে কোন

দোকান-পাট ছিল না। তাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব ডারবান থেকেই আনাতে হ'তো।

ছ মাসের মধ্যেই এখানে আটটি ছোটখাটো টিনে-ছাওয়া বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। গান্ধীজীর বাড়িটিও ঐ একরকম ছিল, শুধু চেহারায় ছিল একটু বড়। প্রত্যেক বাড়িতে একটি বড় ঘর ছিল। সেটি বসবার ও খাওয়ার ঘর রূপে ব্যবহৃত হ'তো। আর ছিল দুটি ক'রে শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর ও একটি স্নানের ঘর।

প্রতি সপ্তাহেই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নিয়মিত প্রকাশিত হ'তো। সম্পাদক মনসুখলাল নাজার ডারবানেই থাকতেন। এখন হিন্দী ও তামিল অংশ বাদ দিয়ে কাগজটি কেবল ইংরেজী ও গুজরাটীতেই বেরুতো।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হ'লো, তাতে হেনরি কটন সভাপতিত্ব করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সরকার যে প্রাক্তন বুয়ার সরকারের ভারতীয়বিরোধী আইনগুলিকে চালু করেছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানালো কংগ্রেস। স্যার হেনরি কটনও ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির তীব্র নিন্দা করলেন।

গান্ধীজী কিন্তু ফিনিক্সে বেশিদিন থাকতে পারলেন না। তিনি জোহানেসবার্গ ছেড়ে আসায় তাঁর মক্কেলদের খুবই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি জোহানেসবার্গে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। গান্ধীজী আইনজীবী রূপে ইতিমধ্যে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। অন্যান্য আইনজীবী ও আদালতের বিচারপতিদের কাছে তাঁর মর্যাদা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। গান্ধীজী আইনব্যবসায়েও সর্বদা কঠোরভাবে সততার পথে চলতেন। তিনি মিথ্যা মামলা কখনও নিতেন না। তিনি তাঁর মক্কেলদের ব'লে দিতেন, যদি মামলার কোনও পর্যায়ে তিনি জানতে পারেন যে, মক্কেলরা তাঁকে মিথ্যা বলেছেন, তবে তখনি সে মামলা তিনি ত্যাগ করবেন। তিনি

তাঁর মক্কেলদের সর্বদাই আদালতের বাইরে মামলা আপসে মিটিয়ে নিতে পরামর্শ দিতেন। তিনি গরীব মক্কেলদের কাছে কম ফী নিতেন, খুব গরীবদের কাছে অনেক সময় একেবারেই ফী নিতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি মাসে গড়ে তিন শ পাউণ্ড রোজগার করতেন। তাঁর কাছে এতো মক্কেল আসতো যে, সব কাজ একা ক'রে উঠতে পারতেন না। তাই তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্যে তিনি মিঃ পোলককে এবং মিঃ রিচকে আমন্ত্রণ জানালেন।

গান্ধীজী নানাদিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে তিনি যে এখন দেশে ফিরতে পারবেন এমন আশা ছিল না। তাই তিনি ভারত থেকে কস্তুরবাঈ ও ছেলেদের আনবার ব্যবস্থা করলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কস্তুরবাঈ তাঁর মেজো, সেজো ও ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে পৌঁছলেন। তখন মেজ ছেলে মণিলালের বয়স ১২, সেজো ছেলে রামদাসের ৮ ও ছোট ছেলে দেবদাসের ৫। গান্ধীজী শহরের উপকণ্ঠে একটি মধ্যবিত্ত পল্লীতে নূতন বাসা নিলেন। গান্ধী পরিবারের সঙ্গে মিঃ পোলকও রইলেন। কিছু দিন বাদে মিসেস পোলক ও মিসেস ওয়েস্টও গান্ধীর বাড়িতে এসে থাকলেন। একজন ভারতীয় আশ্রিতও তাঁর বাড়িতে থাকতো। গান্ধীজী ছিলেন এই বৃহৎ পরিবারের কর্তা। ছেলেরা তাঁকে 'বাপু' ব'লে ডাকতো। তাঁর বন্ধুদের কাছেও তিনি আদরের 'বাপু' নামে পরিচিত হলেন।

কস্তুরবাঈ ছাড়া বাড়ির সকলেই ইউরোপীয় পোশাক পরতেন। ফিনিক্সে গান্ধীজী যে জীবনাদর্শকে কার্যকর করতে চেয়েছিলেন, তার প্রভাব এখানেও পড়লো। গান্ধীজী সংসারের ব্যয়বাহুল্য হ্রাস করলেন এবং সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্যে সকলকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। সকলেই যাতে কায়িক শ্রম করে, সে বিষয়েও তিনি উৎসাহী হলেন। তিনি একটি হাতে-চালানো

গম ভাঙবার কল কিনলেন। তাঁরা সকলে মিলে সকালে ঐ কলটি চালিয়ে গম পিষতেন। তা থেকে বাড়িতেই সকলের রুটি বানানো হ'তো।

গান্ধীজীর চেম্বারটি বাসা থেকে ছিল প্রায় ছ মাইল দূরে। গোড়ার দিকে তিনি সাইকেলে ক'রে বাসা থেকে চেম্বারে যেতেন। কিন্তু কায়িক শ্রমের নেশা তাঁকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে, তিনি রোজ ছ মাইল পথ পায়ে হেঁটেই যেতেন। মানুষকে দিয়ে পশুর মতো গাড়ি টানানো হয়, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি কখনও রিক্সায় চড়তেন না।

সকাল সাড়ে সাতটায় তিনি প্রাতরাশ না ক'রেই বাড়ি থেকে চেম্বারে যেতেন। সেখানে পৌঁছতেন ৯টায়। তিনি সাড়ে দশটা পর্যন্ত চেম্বারে থাকতেন। সেখান থেকে যেতেন আদালতে। তিনি ৩টায় চেম্বারে ফিরে মধ্যাহ্ন ভোজন করতেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে তিনি শুকনো ও টাটকা ফল খেতেন। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চেম্বারে থাকতেন। তারপর বাড়ি ফিরতেন আবার পায়ে হেঁটে সন্ধ্যায়। তারপর পরিবারের সকলকে নিয়ে নৈশ আহার সারতেন। নৈশাহারের জন্য থাকতো রুটি, বাদাম, মাখন, কাঁচা ও রাঁধা শাকসবজি, দুধ, ফল। তারপর কফি বা লেমোনেড। হালকা আলাপে ও ঠাট্টাপরিহাসে নৈশাহারের সময়টি কাটতো। তারপর পরিবারের সকলে এসে একত্র বসতেন। গান্ধীজী গীতার শ্লোক আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন, মিঃ পোলক পড়ে শোনাতেন ইংরেজীতে গীতার অনুবাদ The Song Celestial; আরও অনেক আধ্যাত্মিক আলাপ-আলোচনা চলতো।

গান্ধীজী তাঁর বালক পুত্রদের জন্যে নিয়মিত কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা করলেন না। তিনি তাদের স্কুলেও দিলেন না। তাদের জন্য গৃহ-শিক্ষকও রাখলেন না। তিনি প্রতিদিন তাদের সঙ্গে নিয়ে চেম্বারে যেতেন এবং সঙ্গে নিয়ে চেম্বার থেকে ফিরতেন

যাতায়াতের পথে তিনি মুখে মুখে তাদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ঐ সময়ে তাঁদের কথাবার্তা গুজরাটীতেই হ'তো। পরিবারে কয়েকজন ইংরেজ থাকায় এবং তাঁরা সকলে ইংরেজ উপনিবেশে বাস করায় ছেলেরা সহজেই ইংরেজী শিখেছিল। তারা যাতে তাদের মাতৃভাষাও সহজে শিখতে পারে সেজন্য গান্ধীজী গুজরাটীতেই তাদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং আলোচনা করতেন গুজরাটীতে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তথাকথিত জুলু বিদ্রোহ দেখা দিল। তখনও গান্ধীজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি বুয়ার যুদ্ধের সময়ের মতো একটি ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স কোর গঠনের প্রস্তাব করলেন সরকারের কাছে। সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। গান্ধীজী তাঁর পরিবারকে নাটালে তাঁদের ফিনিক্স উপনিবেশে পাঠিয়ে দিয়ে ২৪ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স বাহিনী গঠন করলেন। গান্ধীজীকে সামরিকভাবে সার্জেণ্ট-মেজর পদ দেওয়া হ'লো। অ্যাম্বুল্যান্স বাহিনী এবার সরকার থেকেই পোশাক পেলো। অবিলম্বে তাদের 'রণাঙ্গণে' পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো।

তথাকথিত রণাঙ্গণে পৌঁছে গান্ধীজী বুঝলেন, প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহই নয়, খাজনাবন্ধের আন্দোলন মাত্র। এখন তাঁর সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে পড়লো "বিদ্রোহী" জুলুদের দিকে। আহত জুলুদের সেবা-শুশ্রূষার ভার পেয়ে তিনি আনন্দিতই হলেন। তাঁকে ও তাঁর অ্যাম্বুল্যান্স বাহিনীকে অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে স্ট্রেচার নিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হ'তো, অনেক সময় রোজ চল্লিশ মাইল। তাঁরা যেসব আহত জুলুর ভার পেতেন, তারা যুদ্ধে আহত হয় নি; তারা নিরীহ জুলু মাত্র। বিদ্রোহী হয়েছে এই সন্দেহে তাদের নির্মমভাবে চাবকানো হয়েছে এবং চাবুকের ঘায়েই তারা আহত হয়েছে। জুলু বিদ্রোহে অ্যাম্বুল্যান্স

বাহিনী গঠন ক'রে গান্ধীজী একটি মূল্যবান শিক্ষা পেলেন, সেটা আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে। শ্বেতাঙ্গরা জুলুদের নির্মমভাবে চাবকে তাদের পিঠের চামড়া ছিঁড়ে ফেলতো। আঘাতের ফলে তাদের দেহে যে ক্ষত হ'তো সেগুলি ফুলে উঠতো, পচে যেতো। কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা সেদিকে লক্ষ্যও করতো না। অ্যাম্বুল্যান্স কোরের ভারতীয়রাও যে জুলুদের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করে, তাও তারা পছন্দ করতো না। গান্ধীজী ও তাঁর বাহিনীর লোকেরা কিন্তু আহত জুলুদের সযত্নে সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করতেন। ফলে গান্ধীজী ও ভারতীয়দের প্রতি জুলুদের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না।

জুলাই মাসে "জুলু বিদ্রোহের" অবসান হ'লো। সরকার ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স কোরের কাজের উচ্চ প্রশংসা করলেন এবং তাদের প্রত্যেককে পদক দিয়ে সম্মানিত করলেন। ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স বাহিনী ভেঙে দেওয়া হ'লো। গান্ধীজী দ্রুত ফিনিক্সে ফিরে এলেন। জুলু বিদ্রোহের সময়ে সেবাকার্যকালে দুটি ধারণা তাঁর মনে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। এক, সেবাকার্যের জন্যে অবিবাহিত জীবন চাই; দুই, সেবাকার্যের জন্যে ধনার্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করতে হবে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি ব্রহ্মচর্য পালনের কথা চিন্তা করছিলেন। এখন এই চিন্তা তাঁর মনে প্রবলতর হয়ে উঠলো এবং এই সময় থেকেই তিনি পত্নী কস্তুরবাঈয়ের সঙ্গে আলোচনা ক'রে তাঁর সম্মতি নিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলেন।

গান্ধীজী ফিনিক্সে মাত্র কয়েকদিন ছিলেন। ক্রমাগত জোহানেস্-বার্গ থেকে তাঁর কাছে চিঠি ও তার আসতে লাগলো। তাই তিনি তাঁর পরিবারকে ফিনিক্সে রেখে দ্রুত জোহানেস্‌বার্গে চলে গেলেন।

জোহানেস্‌বার্গে এসে তিনি শহরের দূর উপকণ্ঠে একটি ছোট

বাসা নিলেন। বাসায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভিন্ন কোনও আসবাব-পত্র রাখলেন না। বাড়িতে দুটি ছোট শোবার ঘর। চাকরদের জন্যে একটি অতিরিক্ত কামরা ও একটি রান্নাঘর। বাড়িটির সামনে ছিল একটি উন্মুক্ত মাঠ। ভৃত্যদের কক্ষটিতে একজন ভারতীয় কর্মী থাকতেন। পরে মিঃ পোলক ও মিসেস পোলকও গান্ধীজীর সঙ্গে এসে বাস করতে থাকেন। বাড়িতে কোন ভৃত্য ছিল না। তাই সকলেই নিজ হাতে প্রয়োজনমতো গৃহকর্মগুলি সেরে নিতেন। গান্ধীজী এখানে তাঁর খাদ্য সম্পর্কে আবার নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। অনেক সময় তিনি নুন মসলা না দিয়েও মাসের পর মাস খাদ্য প্রস্তুত করলেন। আবার কখনও বা একটানা কিছুদিন চিনির ব্যবহার বন্ধ রাখলেন। অনেক সময় শাকসবজি ও ফল খেয়েই রইলেন। রক্ত-পরিষ্কারক হিসাবে তিনি রোজই পেঁয়াজ খেতেন। পরে পেঁয়াজ উত্তেজক ব'লে পেঁয়াজ খাওয়া তিনি ছেড়ে দিলেন। দুধও উত্তেজনা বাড়ায় ভেবে তিনি কিছুকাল দুধ খাওয়া ছেড়ে দেন।

২২শে আগস্ট তারিখে ট্রান্সভাল সরকারের অতিরিক্ত গেজেটে ভারতীয় বসবাসকারীদের স্বার্থবিরোধী একটি নূতন অর্ডিন্যান্স প্রকাশিত হ'লো। এই অর্ডিন্যান্সে বলা হ'লো যে, প্রত্যেক আট বা তদূর্ধ্ব বৎসর বয়স্ক ভারতীয়, আরব ও তুর্কীকে ট্রান্সভালে বাস করতে হ'লে তাদের নাম এশিয়াটিকস অফিসে রেজিস্টারভুক্ত করাতে হবে। রেজিস্টারভুক্ত করাবার জন্যে প্রত্যেককে তার দেহের পরিচয়সূচক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ ও আঙ্গুলের ছাপ দিতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এইভাবে যে নিজেকে রেজিস্টারভুক্ত না করবে, তার ট্রান্সভালে বাসের অধিকার থাকবে না, তার ১০০ পাউণ্ড জরিমানা বা তিন মাসের কারাদণ্ড, এমন কি বহিষ্কারও হ'তে পারবে। রেজিস্টারভুক্ত হওয়ার সার্টিফিকেট পুলিস অফিসার দেখতে চাইলেই দেখাতে হবে। এই সার্টিফিকেট

দেখবার জন্যে পুলিস অফিসার যেকোন বাড়িতে ঢুকতে পারবে। কেউ সার্টিফিকেট দেখাতে অস্বীকার করলে তার জরিমানা বা কারাদণ্ড হবে।

এই অর্ডিন্যান্স যদি পাস হয় আর তা যদি ভারতীয়রা নির্বিবাদে স্বীকার ক'রে নেয়, তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গান্ধীজী এই কথা বুঝে এই অর্ডিন্যান্সটির তাৎপর্য কি তা ভারতীয়রা যাতে বুঝতে পারেন, সেজন্য তিনি অর্ডিন্যান্সটি গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ ক'রে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন কাগজে ছাপলেন। তারপর বিশিষ্ট ভারতীয়দের একটি সভা ডেকে তিনি ওই অর্ডিন্যান্সের ভয়াবহতা বুঝিয়ে দিলেন। ভারতীয়রা সকলেই এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল উপনিবেশ সচিবের সঙ্গে দেখা করলেন। উপনিবেশ সচিব আশ্বাস দিলেন যে, সরকার ভারতীয়দের বক্তব্য বিচার ক'রে দেখবেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিলটি আইনসভায় উত্থাপিত হ'লো। ১১ই সেপ্টেম্বর ট্রান্সভালের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রায় তিন হাজার ভারতীয় প্রতিনিধির এক বিশাল জনসভা হ'লো। এই সভায় স্থির হ'লো যে, ভারতীয়রা এই আইন মানবে না এবং সেজন্যে তারা যে কোন দণ্ডের সম্মুখীন হবে। এরপর রাজ্যের সর্বত্র ভারতীয়রা সভা-সমিতি ক'রে ঐ সংকল্পই ঘোষণা করতে লাগলেন। ভারতীয়রা এই কালো আইনের বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে যে আন্দোলন গ'ড়ে তুললেন, গান্ধীজী তার নাম দিলেন Passive Resistance—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

গান্ধীজী প্রথমে ট্রান্সভাল সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করলেন। মেয়েদের রেজিস্টারভুক্ত হওয়ার অংশটা সরকার বিল থেকে বাদ দিলে। কিন্তু আর কিছুই করলে না। আইনসভা অর্ডিন্যান্সটিকে হুবহু পাস করলো। ট্রান্সভাল তখন বৃটিশ

সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। সেই জন্যে বিল আইনে পরিণত হ'তে গেলে বৃটিশ সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হ'ত। গান্ধীজী তাই এ ব্যাপারে ইংলণ্ডে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাতে চাইলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়দের একটি দল ৩রা অক্টোবর ইংলণ্ড গেল। গান্ধীজী অবশ্য এই প্রতিনিধি দলের সাফল্য সম্পর্কে ভারতীয়দের বিন্দুমাত্র আশা পোষণ করতে নিষেধ করলেন এবং তাঁদের এই আইনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে বললেন।

গান্ধীজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌছলেন। তৎকালীন উপনিবেশ সচিব লর্ড এল্‌গিনের কাছে পেশের জন্যে একটি স্মারকলিপি তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রচনা করেছিলেন। লণ্ডনে নেমে অশীতিপর বৃদ্ধ দাদাভাই নওরোজীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটির সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন। তারপর তিনি স্যার মাঞ্চেরজী ভাওনাগরী ও স্যার লেপেল গ্রিফিনের সঙ্গেও দেখা করলেন। স্যার লেপেল গ্রিফিন পূর্বে ভারত সরকারের প্রশাসন বিভাগে কাজ করতেন। তিনি ভারতবর্ষে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ৮ই নভেম্বর স্যার লেপেলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল লর্ড এলগিনের সঙ্গে দেখা করলেন। এই প্রতিনিধি দলে গান্ধীজী, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত মিঃ আলি, এবং লর্ড স্ট্যান্‌লি, স্যার জর্জ বার্ডউড, মিঃ জে. ডি. রীস. স্যার হেনরি কটন, মিঃ হ্যারল্ড ফক্স ও দাদাভাই নওরোজী ছিলেন। লর্ড এল্‌গিন প্রতিনিধি দলের বক্তব্য সহানুভূতির সঙ্গে শুনলেন। তবে এ বিষয়ে তিনি তাঁর নিজের অসুবিধার কথাও জানালেন। ঐ প্রতিনিধি দল ভারত সচিব মিঃ মর্লে'র সঙ্গেও দেখা করলেন। তিনিও তাঁদের বক্তব্য

সহানুভূতির সঙ্গে শুনলেন। অতঃপর গান্ধীজী তৎকালীন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী স্যার হেনরি ক্যাম্বেল ব্যানারম্যানের সঙ্গেও দেখা করলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও ভারত-প্রেমিক স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন হাউস অব কমনসের ভারত-বিষয়ক কমিটির একশত সদস্যের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাতের সুযোগ ক'রে দিলেন। গান্ধীজী ইংলণ্ডে প্রায় দেড় মাস ছিলেন। এই দেড় মাসের প্রতিটি মুহূর্তই তিনি দক্ষিণ ভারতীয়দের সমস্যা উদারভাবাপন্ন ইংরেজদের বোঝাতে ব্যয় করলেন। বহু ইংরেজ তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করতেও এগিয়ে এলেন। বেশীর ভাগ সংবাদপত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকলে বা তাদের প্রতি বৈরিভাব দেখালেও 'দি টাইমস', 'ট্রিবিউন', 'মর্নিং লীডার', 'সাউথ আফ্রিকা' প্রভৃতি কাগজগুলি সহানুভূতিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করলো। গান্ধীজী ইংলণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সমর্থনে প্রচারকার্য চালাবার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটিশ ভারত কমিটি নামে একটি সংস্থা-ও গঠন করলেন। স্যার মাঞ্চেরজী ভাওনাগরী এর সভাপতি ও মিঃ রিচ্ এর সম্পাদক হলেন।

গান্ধীজী ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড থেকে ফিরলেন। তিনি জাহাজে থাকাকালেই সংবাদ পেলেন যে, উপনিবেশ সচিব লর্ড এল্গিন এই এশিয়াটিক অর্ডিন্যান্সে সম্মতি না দেওয়ার জন্যে ইংলণ্ডের রাজাকে পরামর্শ দিয়েছেন। এই সংবাদে গান্ধীজী আনন্দিত হলেন। অবশ্য, এ কথাও তিনি জানতেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই ট্রান্সভাল স্বায়ত্তশাসনশীল উপনিবেশে পরিণত হবে। তখন সে বিনা বাধায় এই ঘৃণ্য আইনটি সহজেই পাস করতে পারবে। তাই ইংলণ্ডের বর্তমান উদারনৈতিক সরকার এই ঘৃণ্য আইন পাস করবার কলঙ্ক নিতে চাইছে না।

এই ডিসেম্বর মাসেই (১৯০৬) দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে

কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে হচ্ছিল। লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ক'রে বাংলাদেশে তথা ভারতে যে বিক্ষোভের আগুন জ্বেলেছিলেন, এই কংগ্রেসে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল। কলকাতা কংগ্রেসেই সভাপতি দাদাভাই নওরোজী সর্বপ্রথম ভারতের জন্যে 'স্বরাজের' দাবী তুললেন। 'স্বরাজ' কথাটি যেন তড়িৎ সঞ্চার করলো সারা সম্মেলনে। সম্মেলন থেকে তা ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। কংগ্রেসে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ও স্বদেশী ব্যবহারের নীতি সমর্থন ক'রে প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। অন্যান্য বারের কংগ্রেসের মতো এবারও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হ'লো।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখেই ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ উপনিবেশগুলি স্বায়ত্তশাসনাধিকার পেল। এর কয়েকদিন বাদেই ট্রান্সভালের আইনসভা পূর্ব বৎসরের অননুমোদিত এশিয়াটিক বিল-টিকে হুবহু পাস করলো। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এই বিল আইনে পরিণত হ'লো। ১লা জুলাই থেকে এই আইন কার্যকর হবে ব'লে ঘোষিত হ'লো এবং ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে ভারতীয়দের রেজিস্টারভুক্ত হ'তে নির্দেশ দেওয়া হ'লো। ভারতীয়রা এই আইন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্যে গান্ধীজী প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স অ্যাসোসিয়েন নামে একটি সংস্থা গ'ড়ে তুললেন। সারা রাজ্যে সভাসমিতি ক'রে ভারতীয়দের পরিস্থিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো হ'লো এবং ভারতীয়রা দলে দলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের শপথ নিলেন।

প্রিটোরিয়ায় ভারতীয়দের সংঘবদ্ধতা অল্প অনুমান ক'রে সরকার সেখানেই সর্বাগ্রে, ১লা জানুয়ারি, একটি রেজিস্টারভুক্ত করবার অফিস খুললেন। ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভারতীয়দের বোঝালেন এই রেজিস্ট্রেশনের অর্থ কি, এবং

ভারতীয়দের সকল বিপদ্ তুচ্ছ ক'রে এই আইন অমান্য করবার জন্যে শপথ গ্রহণ করালেন। গান্ধীজী স্বেচ্ছাসেবকদের সতর্ক ক'রে দিলেন যে, তাঁদের নিষেধ সত্ত্বেও যারা রেজিস্টারভুক্ত হবে, তাদের প্রতি যেন কোনরূপ রূঢ় আচরণ করা না হয়। রেজিস্ট্রি অফিস বর্জন প্রায় পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত হ'লো, ১৫০০ ভারতীয়ের মধ্যে মাত্র ১০০ জন নিজেদের রেজিস্টারভুক্ত করলো। ট্রান্সভালের অন্যান্য জেলাতেও রেজিস্ট্রি অফিস খোলা হয়েছিল। সর্বত্রই অনুরূপ অবস্থা দেখা গেল। ৩১শে জুলাই ছিল রেজিস্ট্রেশনের শেষ দিন। ঐ দিন প্রিটোরিয়ায় এক জনসভা ডাকা হ'লো। এই জনসভায় ট্রান্সভালের ত্রিশ হাজার ভারতীয়ের পক্ষ থেকে প্রায় দু হাজার প্রতিনিধি যোগ দিলেন। এই জনসভায় সরকারের পক্ষ থেকেও একজন বক্তা, মিঃ হস্‌কেন, উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "ভারতীয়রা এই আইনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের সাহস ও পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এখন তাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন এই আইন পাস হয়েছে, তখন তাদের এই আইনের প্রতি আনুগত্য দেখানো উচিত। এই আইন সম্পর্কে ট্রান্সভাল সরকার দৃঢ় মানোভাব পোষণ করেন। তবে আপনাদের প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ছোটখাটো কিছু সংশোধন করা যায় কিনা তা জেনারেল স্মাট্‌স্ বিবেচনা ক'রে দেখবেন।" গান্ধীজী মিঃ হস্‌কেনের বক্তৃতাটি নিজেই অনুবাদ ক'রে দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি শ্রোতাদের সতর্ক ক'রে দিয়ে জানালেন যে, এই আইনেই শেষ নয়, এই আইনের পরেই ভারতীয়দের এক-একটি অঞ্চলে পৃথকভাবে রাখা ও শেষ পর্যন্ত এ দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা হবে।

জেনারেল স্মাট্‌স্ কিন্তু মিঃ হস্‌কেনের চেয়েও রূঢ় ও সুস্পষ্ট ভাষায় ভারতীয়দের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, "যদি ভারতীয়দের প্রতিরোধের ফলে অপ্রীতিকর কিছু

ঘটে, তবে তার দায়িত্ব ভারতীয়দের নেতাদের। যে ভারতীয় নির্ধারিত তারিখের মধ্যে রেজিস্টারভুক্ত না হবে, তাকে ট্রান্সভাল থেকে বিতাড়িত করা হবে; তাদের ব্যবসায়ের লাইসেন্স দেওয়া হবে না; তাদের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে। সরকার এই দেশকে শ্বেতাঙ্গদের দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এ ব্যাপারে যতোই বাধা আসুক না, সরকার তাতে পশ্চাদ্‌পদ হবে না।”

এইসব শাসানি সত্ত্বেও ভারতীয়রা ও চীনারা নিজেদের রেজিস্টারভুক্ত করতে চাইলো না। সরকার রেজিস্টারভুক্ত হওয়ার সময়সীমা প্রথমে একমাস এবং পরে আরো একমাস বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু তাতেও কোন ফলোদয় হ'লো না। শেষ তারিখ ৩০শে নভেম্বরে দেখা গেল, ট্রান্সভালের ১৩০০০ ভারতীয়ের মধ্যে মাত্র ৫১১ জন রেজিস্টারভুক্ত হয়েছে।

এই ব্যাপক আন্দোলন ও সংগ্রামকে গান্ধীজী Passive Resistance আখ্যা দিয়ে সন্তুষ্ট হলেন না। তাছাড়া এই ইংরেজী নামটাও তাঁর পছন্দ সই ছিল না। এই প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয়ও ছিল না। তাই এই সংগ্রামকে গান্ধীজী নূতনতর একটি আখ্যা দিতে চাইলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে একটি উপযুক্ত নাম চেয়ে পুরস্কারও ঘোষণা করলেন। মগনলাল গান্ধী “সদাগ্রহ” (সৎ+আগ্রহ) নামটি প্রস্তাব করলেন। এই নামটি গান্ধীজীর ভালো লাগলেও এটিতে যেন এই সংগ্রাম সম্পর্কে সমগ্র ধারণাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে না ব'লে তাঁর মনে হ'লো। তাই “সদাগ্রহ” কথাটি একটু পরিবর্তন ক'রে তিনি এর নাম দিলেন “সত্যাগ্রহ”।

ইতিমধ্যে, ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে, ট্রান্সভাল সরকার ভারতীয় বিরোধী আর একটি আইন পাস করলো। আইনটির নাম বসবাসের জন্য প্রবেশ নিরোধক আইন বা Immigration Restriction Act. এই আইনটিও যে এশিয়াটিক অর্ডিন্যান্সের

মতো তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হবে, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। এই বিরোধিতার মূলে যে গান্ধীজী ও তাঁর কিছুসংখ্যক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী রয়েছেন, সে বিষয়ে সরকার নিঃসংশয় ছিল। তাই জেনারেল স্মাট্‌স্ গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে অভিযুক্ত করতে সিদ্ধান্ত করলেন। গান্ধীজী ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ট্রান্সভালের পুলিস কমিশনারের কাছ থেকে এই মর্মে একটি টেলিফোন পেলেন যে, গান্ধীজী যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজী পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি জানালেন যে, সরকার গান্ধীজী ও অপর ২৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছে। ঐ ২৪ জন ব্যক্তির মধ্যে চীনাদের নেতা মিঃ কিন্‌ও আছেন। গান্ধীজী ও অপর ২৪ জন ব্যক্তি, তাঁরা সকলেই পরদিন সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলে কমিশনার গান্ধীজীকে বিদায় দিলেন।

ঐ দিন সন্ধ্যায় ভারতীয়দের এক সভায় সংগ্রামের নবপর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। পরদিন গান্ধীজী ও তাঁর সহ-কর্মীরা আদালতে গেলেন। যে আদালতে তিনি কৌঁসুলিরূপে বহুবার গেছেন, সেখানেই তাঁকে কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হ'লো। গান্ধীজী প্রথমে ঈষৎ সংকোচ বোধ করলেও শীঘ্রই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, অপরের জন্যে এই দুঃখবরণের মধ্যে মহত্ত্ব ও মর্যাদাই আছে। আদালতে তিনি কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করলেন যে, তিনি রেজিস্টারভুক্ত হন নি। কেন রেজিস্টারভুক্ত হননি, যে সম্পর্কে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করতে চাইলে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তিনি রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে চান না। তিনি জানতে চান, যে আইন হয়েছে, সেই আইন তিনি লঙ্ঘন করেছেন কিনা। ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীজীকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ট্রান্সভাল ত্যাগের আদেশ দিলেন। গান্ধীজীর সহকর্মীদের উপরও ঐরকম আদেশ দেওয়া হ'লো। বিচার-শেষে গান্ধীজী ভারতীয়, চীনা ও ইউরোপীয়দের এক জনতার সম্মুখে

বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, "আমার বা অন্য কারো ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। যদি ভগবানের নির্দেশ পাই যে, আমি ভুল করেছি, তবে আমিই নিজের ভুল স্বীকার ক'রে আপনাদের কাছে মার্জনা চেয়ে নেব। কিন্তু জানি ঐরকম কোন নির্দেশের সম্ভাবনা নেই। নিজের আত্মসম্মান ও মর্যাদা হারাবার চেয়ে এই উপনিবেশ ত্যাগ করাই শ্রেয়। আমাদের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, এ যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত আমরা চালিয়ে যাব।" অন্যান্য বহু জায়গাতেও সভাসমিতি হ'লো। ঐসব সভায় গান্ধীজী সরকারকে তাঁদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, এবার আমাদের ও ইংরেজদের ভিন্ন পথে চলবার সময় এসেছে। ইংলণ্ডকে এখন ভারতবর্ষ ও তার উপনিবেশসমূহের মধ্যে বেছে নিতে হবে।"

গান্ধীজী ট্রান্সভাল ত্যাগের আদেশ অমান্য করায় ১০ই জানুয়ারি (১৯০৮) আদালতে আবার তাঁর বিচার হ'লো। তিনি অপরাধ স্বীকার ক'রে বললেন, তিনি শুনেছেন, এইরূপ আদেশ অমান্য করবার জন্যে প্রিটোরিয়ায় তাঁর সহকর্মীদের তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়েছে, দণ্ডদানকালে তাঁর প্রতি যেন কোনও সদয় ব্যবহার না করা হয়। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীজীকে দু মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

গান্ধীজীকে আদালত থেকে সরাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়রা কৃষ্ণপতাকা হস্তে একটি শোভাযাত্রা বার ক'রে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো। পুলিস তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদের অনেককে চাবুক দিয়ে প্রহার করলো। ভারতীয়রা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৪ই জানুয়ারি ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রধান থাম্বি নাইডু ও চীনা নেতা মিঃ কিন্ কারাগারে গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিত হলেন। ২৯শে জানুয়ারির মধ্যে ১৫৫ জন সত্যাগ্রহী কারাবরণ করলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কারাগারগুলিতে দুটি ভাগ ছিল—শ্বেতাঙ্গদের জন্য ও অশ্বেতাঙ্গদের জন্য অংশ। গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীদের নিগ্রোদের সঙ্গেই রাখা হ'লো। নিগ্রোদের মতোই তাঁদের খাদ্য দেওয়া হ'লো। যাঁরা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদের নিজ নিজ পোশাক পরতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা স্বেচ্ছায় নিগ্রো কয়েদীদের পোশাক পরলেন। গোড়ার দিকে গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা নিগ্রোদের খাদ্যই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পক্ষকাল পরে তাঁরা নিজেদের খাদ্য নিজেদের মতো প্রস্তুত ক'রে নেওয়ার ব্যবস্থা করালেন। চীনাদের প্রতি ভারতীয়দের চেয়েও দুর্ব্যবহার করা হ'তো। গান্ধীজী চীনাদের প্রতি ভারতীয়দের মতো ব্যবহার করবার ব্যবস্থা করালেন। কারাগারে আহারের কয়েকটি নিয়ম গান্ধীজী পরবর্তী জীবনেও মেনে চলতেন। কারণ, এগুলি তাঁর কাছে স্বাস্থ্যকর মনে হয়েছিল। তিনি চা-পান ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালেও তাঁর দিনের প্রধান আহার সূর্যাস্তের আগেই শেষ করতেন।

জেলে সত্যাগ্রহীদের জন্যে টেবিল ও লেখার জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী ঐ সময়ে কার্লাইল, বেকন, টলস্টয়, রাস্কিন, সক্রেটিস প্রভৃতি মনীষীদের রচনাগুলি পাঠ করেন। অনেক রচনা তিনি বার বার পড়েন। তিনি সকালে গীতা ও মধ্যাহ্নে ইংরেজীতে অনূদিত কোরান পড়তেন। সন্ধ্যায় তিনি চীনা খ্রীষ্টানদের বাইবেল প'ড়ে শোনাতেন। তিনি কার্লাইল ও রাস্কিনের রচনা গুজরাটীতে অনুবাদ করতেও শুরু করেছিলেন। কারাগার থেকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তিনি মুক্তি পান। তাই তাঁর এই কাজগুলি অসমাপ্ত রয়ে যায়।

ভারতে ও ইংলণ্ডে সত্যাগ্রহীদের কারাদণ্ডাদেশে বিক্ষোভ দেখা দিল। জেনারেল স্মাট্স্ মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে ঘনঘন মিটিং করতে লাগলেন, পক্ষকাল বাদে 'ট্রান্সভাল লীডার' কাগজের সম্পাদক

অ্যালবার্ট কার্টরাইটকে গান্ধীজীর সঙ্গে আপোস-মীমাংসার সূত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্যে পাঠালেন। মীমাংসা-সূত্ররূপে সরকার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হ'লো যে, আইনের দ্বারা বাধ্য হয়ে নয়, স্বেচ্ছায় ভারতীয়রা নিজেদের রেজিস্টারভুক্ত করবে এবং সার্টিফিকেটে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হবে, তা ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ ক'রেই স্থির করা হবে। ভারতীয়দের অধিকাংশ যদি স্বেচ্ছায় রেজিস্টারভুক্ত হয়, তবে এই আইন বাতিল করা হবে। গান্ধীজীর সহকর্মীরা বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার গান্ধীজীর উপর ছেড়ে দিলেন। ৩০শে জানুয়ারি গান্ধীজীকে জোহানেস্‌বার্গ থেকে প্রিটোরিয়ার জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হ'লো। জেনারেল স্মাট্‌স্ ভারতীয়দের অধিকাংশ স্বেচ্ছায় রেজিস্টারভুক্ত হ'লে এই ঘৃণ্য আইন বাতিল ক'রে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলে গান্ধীজী মীমাংসায় রাজী হলেন। প্রিটোরিয়ায় গান্ধীজীকে মুক্ত ক'রে দেওয়া হ'লো। গান্ধীজী ছিলেন কপর্দকহীন। তিনি জেনারেল স্মাট্‌সের সেক্রেটারির কাছে রেলের ভাড়া ধার নিয়ে ঐদিন রাত নটায় জোহানেস্‌বার্গে ফিরলেন এবং দুপুর রাতে প্রায় এক হাজার ভারতীয়ের এক সভায় এই আপোসের যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা ক'রে বললেন।

গান্ধীজী বক্তৃতা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন পাঠান তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলো : "তুমিই তো বলেছিলে আঙুলের ছাপ কেবল দাগী আসামীদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়। তুমিই বলেছিলে, এই লড়াই চলছে এই আঙুলের ছাপ দেওয়া নিয়ে। আজ যা বলছ, তার সঙ্গে ঐসব কথার মিল কোথায় ?" গান্ধীজী বললেন, "আইনের বলে আমাদের আঙুলের ছাপ কেন, আমাদের সই নিলেও, তা আমরা দেব না। কিন্তু যদি আইনের বলে না হয়, তবে আমরা স্বেচ্ছায় সই বা আঙুলের ছাপ দিতে পারি। কেউ আমাদের নমস্কার করিয়ে নিতে চাইলে, আমরা মাথা নোয়াবো না ;

কিন্তু সৌজন্য প্রকাশের জন্যে আমরা মাথা নোয়াতে পারি।" পাঠানটি রূঢ়ভাবে ব'লে উঠলো : "আমরা শুনেছি, জেনারেল স্মাট্‌স্ তোমাকে পনের হাজার পাউণ্ড দিয়েছে। তুমি আমাদের বিকিয়ে দিচ্ছ। আমরা আঙুলের ছাপ দেব না, কাউকে দিতে দেব না। আল্লার কসম্ যে প্রথম দেবে, তাকে আমি খুন করব।" গান্ধীজী বললেন, "যারা আঙুলের ছাপ দেবে না ব'লে শপথ নিয়েছে, তাদের আঙুলের ছাপ দিতে হবে না। এ বিষয়ে তিনি সাহায্য করবেন।" তারপর তিনি বললেন, "আমার বন্ধুটি আল্লার নামে খুন করবার যে ভয় দেখাচ্ছে, তা আমি পছন্দ করি না। আল্লার নামে কেউ কাউকে খুন করবার শপথ নিতে পারে, তা আমি বিশ্বাস করি না। আমিই এই আপোসের জন্যে প্রধানত দায়ী এবং আমি ভারতীয় সম্প্রদায়ের লোক; তাই আমারই উচিত প্রথমে আঙুলের ছাপ দেওয়া। রোগে বার্ধক্যে মরবার চেয়ে ভাইয়ের হাতে মরা অনেক সুখের।"

ট্রান্সভালে প্রায় জন পঞ্চাশেক পাঠান ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল গান্ধীজীর মক্কেল। তারা সকলেই এই সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল; তাদের কেউই এ পর্যন্ত নিজেকে রেজিস্টারভুক্ত করে নি। সহজ সরল এই মানুষগুলিকে বিভ্রান্ত করা সহজ ছিল। সম্ভবত দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হয়ে কেউ তাদের বিভ্রান্ত করেছিল। গান্ধীজী রাত তিনটায় বাড়ি ফিরলেন। পরদিন সকাল সাতটায় তিনি জেলে ফিরে গেলেন এবং এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের আনুষ্ঠানিকভাবে কারামুক্ত ক'রে দেওয়া হ'লো। জেলের গেটে ভারতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের অভিনন্দন জানালেন এবং একটি সভার আয়োজন ক'রে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে তাঁদের সংবর্ধিত করলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের সময়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে তাঁর সহকর্মীরা রেজিস্ট্রেসন অফিসে সই দিতে চললেন।

মীর আলম নামে একটি বলিষ্ঠ পাঠানের নেতৃত্বে আটজন পাঠান তাঁদের পিছু পিছু চললো। গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা রেজিস্ট্রেসন অফিসের কাছে গেলে মীর আলম তাঁদের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "তোমরা কোথা যাচ্ছ?" গান্ধীজী বললেন, "সার্টিফিকেট নিতে। তোমরাও যদি আসতে চাও, তবে তোমাদেরও বিনা আঙুলের ছাপে সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা ক'রে দেব।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই মীর আলম তার মোটা লাঠি দিয়ে তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত করলো। লাঠিটা তাঁর শিরদাঁড়ায় লাগলে শিরদাঁড়া ভেঙে যেতো। গান্ধীজী 'হে রাম' ব'লে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে মূর্ছা গেলেন। পাথরের আঘাতে তাঁর কপাল ও ভুরু কেটে গেল, ঠোঁট ছিঁড়ে গেল, একটি দাঁত নড়ে গেল। মীর আলম ও তার সঙ্গীরা গান্ধীজীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চড় কিল লাথি মারতে লাগলো। গান্ধীজীকে প্রহারের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর সহকর্মী ইসপ মিঞা ও থাম্বি নাইডুও চড় কিল লাথি খেলেন। গোলমাল শুনে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ছুটে এলো। মীর আলম ও তার সঙ্গীরা ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা তাদের ধ'রে ফেলে পুলিসের হাতে দিলো। গান্ধীজীকে তুলে ধরাধরি ক'রে একটি শ্বেতাঙ্গের অফিসে নিয়ে যাওয়া হ'লো। সেখানে তাঁর সংজ্ঞা ফিরলে তাঁকে রেভারেণ্ড জোসেফ ডোক একটি গাড়িতে ক'রে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। গান্ধীজী ঐ অবস্থাতেই রেজিস্ট্রেসন অফিসারকে কাগজপত্র এনে তাঁর আঙুলের ছাপ নিতে বললেন। অফিসার তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললে, তিনি বললেন, "আমিই প্রথম সার্টিফিকেট নেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সে প্রতিশ্রুতি ভগবানের ইচ্ছায় আমাকে রাখতে দিন্।" অফিসার কাগজপত্র আনলে গান্ধীজী তাঁর দশ আঙুলের ছাপ দিলেন। তাঁর এই সত্যপালনের দৃশ্য শ্বেতাঙ্গ দর্শকদেরও অভিভূত করলো।

ডাক্তার এসে গান্ধীজীর ক্ষতস্থানগুলি সেলাই ক'রে দিলেন, এবং সেলাইগুলি না কাটা পর্যন্ত তাঁকে কথা বলতে নিষেধ করলেন। তিনি গান্ধীজীকে এক সপ্তাহ পূর্ণ বিশ্রাম নিতে ও দুমাস কোনও শারীরিক শ্রম করতে নিষেধ করলেন।

রোগশয্যা থেকেই গান্ধীজী ট্রান্সভালের এটর্নি-জেনারেলের কাছে টেলিগ্রাম ক'রে মীর আলম ও অন্যান্য আক্রমণকারীদের তাঁকে আক্রমণের জন্যে অভিযুক্ত না করতে ও তাদের ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানালেন। তিনি ভারতীয়দের উদ্দেশেও জানালেন যে, আক্রমণ-কারীরা মুসলমান ব'লে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। তাঁর যে রক্তপাত হয়েছে, তা দিয়েই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য দৃঢ় হয়ে উঠুক। গান্ধীজীর অনুরোধ অবশ্য এটর্নি-জেনারেল রাখতে পারলেন না। মীর আলম ও তার একজন সঙ্গী তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লো।

রেভারেণ্ড ডোক, মিসেস ডোক ও তাঁদের কন্যার নিরলস সেবা-যত্নে গান্ধীজী দ্রুত সেরে উঠলেন। মাত্র একবৎসর পূর্বে গান্ধীজীর সঙ্গে রেঃ ডোকের পরিচয় হয়েছিল। এখন রেঃ ডোক গান্ধীজীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে উঠলেন। তিনি ভারতীয়দের নানাভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। এক সময় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজের সম্পাদনার ভারও নিয়েছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গান্ধীজীর একটি জীবনীও রচনা করেন। দশদিন বাদে গান্ধীজীকে রেঃ ডোকের বাড়ি থেকে মিঃ পোলকের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। গান্ধী-পরিবারের সকলে ফিনিক্সে ছিলেন। তাঁদের অর্থাভাবে জোহানেস্‌-বার্গে আসা সম্ভব হয় নি। গান্ধীজী সুস্থ হয়ে তাঁদের সঙ্গে ফিনিক্সে গিয়ে দেখা করলেন। তিনি এপ্রিল মাসে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ট্রান্সভালের ভারতীয়দের সম্পর্কে নাটালের ভারতীয়দের আগ্রহী ক'রে তোলার জন্যে এখন তিনি বার বার ট্রান্সভাল ও নাটালে যাতায়াত করতে লাগলেন। ডারবানে একটি সভায় একজন পাঠান

তাঁকে লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে। কিন্তু সহকর্মীদের তৎপরতায় তিনি রক্ষা পান। গান্ধীজীর সহকর্মীরা তাঁকে একজন দেহরক্ষী সঙ্গে রাখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গান্ধীজী অসম্মত হন। তবু নাটালের একজন মাদ্রাজী যুবক ও মুষ্টিযোদ্ধা মিঃ জ্যাক মুদালে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সর্বদা থাকতেন। গান্ধীজীর নিদ্রাকালেও এই যুবক তাঁকে পাহারা দিতেন।

৯ই মে ছিল রেজিস্ট্রারভুক্ত হওয়ার শেষ দিন। ঐ দিন পর্যন্ত প্রায় ৮০০০ লোক রেজিস্টারভুক্ত হওয়ার জন্যে আবেদন করে। এইভাবে গান্ধীজীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। এখন ট্রান্সভাল সরকারের পালা—ঘৃণ্য এশিয়াটিক আইন ভারতীয়দের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ক'রে সংশোধন করবার কথা। কিন্তু জেনারেল স্মাট্‌স্ নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না ক'রে এক ঘোষণায় বললেন যে, তিনি এশিয়াটিক আইন রদ বা সংশোধনের কোন প্রতিশ্রুতিই গান্ধীজীকে দেন নি। গান্ধীজী তখন জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে আপোসকালীন মূল পত্রটি প্রকাশ করতে বললেন। স্মাট্‌স্ তাতে অসম্মত হলেন। এখন গান্ধীজী ও জেনারেল স্মাট্‌সের মধ্যে পত্রযুদ্ধ শুরু হ'লো। কিন্তু কোন ফল হ'লো না।

আবার সত্যাগ্রহ শুরু হ'লো। ভারতীয়রা তাঁদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত রেজিস্ট্রেশনের আবেদনগুলি ফেরত চাইলেন। সেই সঙ্গে ট্রান্সভালে প্রবেশ নিরোধক আইন অমান্যেরও ব্যবস্থা হ'লো। সোরাবজী সাপুরজী নামে গান্ধীজীর জনৈক পার্শী বন্ধু প্রথম সত্যাগ্রহীরূপে পূর্বে সরকারকে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে নাটাল থেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করলেন। সোরাবজী জোহানেসবার্গে পৌঁছে তাঁর উপস্থিতির কথা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানালেন। ৮ই জুলাই তাঁকে কোর্টে হাজির হওয়ার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হ'লো। সোরাবজীকে আদালত সাতদিনের মধ্যে ট্রান্সভাল ত্যাগের আদেশ দিলো। কিন্তু সোরাবজী ঐ আদেশ মানতে সম্মত হলেন না।

২০শে জুলাই তাঁকে একমাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'লো।

গান্ধীজী ট্রান্সভাল সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে, যদি আপোসের শর্ত অনুযায়ী সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এশিয়াটিক আইন রদ না করেন, তবে ভারতীয়রা যেসব সার্টিফিকেট নিয়েছে, সেগুলি পুড়িয়ে ফেলবে। ভারতীয় নেতারা এখন বিনা লাইসেন্সে ফেরিওয়ালা হয়ে মাল বিক্রি করতে শুরু করলেন। এজন্য প্রায় একশত ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হ'লো এবং বিচারে তাঁদের জরিমানা হ'লো। তাঁরা জরিমানা দিতে অস্বীকার করলে তাঁরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এখন দলে দলে লোকে এইভাবে সত্যাগ্রহ করতে লাগলো। এতো লোককে জেলে রাখা অসম্ভব দেখে সরকার ফেরিওয়ালাদের জিনিসপত্র বিক্রি ক'রে জরিমানা উসুল করলে। অনেক গরীব ফেরিওয়ালা কারারুদ্ধ হয়েছিল। তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ২৩শে জুলাই ট্রান্সভালে ভারতীয়রা তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখলো। গান্ধীজী এইভাবে তাঁর জীবনে প্রথম ধর্মঘট সংগঠন করলেন।

ভারতীয়রা ট্রান্সভাল সরকারকে এশিয়াটিক আইন রদ বা সংশোধনের জন্যে যে সময়-সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন, ১৬ই আগস্ট ছিল তার শেষ দিন। জোহানেস্‌বার্গের হামিদিয়া মসজিদে বিকাল ৪টায় এক সভার আয়োজন হ'লো। এখানে ভারতীয়রা তাঁদের সার্টিফিকেটগুলি পোড়াবার জন্যে সমবেত হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে একটি বিরাট পাত্র সংগৃহীত হয়েছিল। সভার কাজ শুরু হ'তে যাচ্ছে, এমন সময় একজন স্বেচ্ছাসেবক সাইকেলে ক'রে একটি টেলিগ্রাম নিয়ে এসে পৌঁছলো। টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছে নাটাল সরকার। তাতে সরকার এশিয়াটিক আইন রদ করবার অক্ষমতা জানিয়েছে। গান্ধীজী সংবাদটি সমবেত জনতাকে পড়ে শোনালেন। জনতা হর্ষধ্বনি দিয়ে সংবাদটিকে অভিনন্দন

জানালো। কারণ সার্টিফিকেটগুলি পোড়াতে আর তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা রইলো না। গান্ধীজী আগাগোড়া সমস্ত অবস্থাটি সমবেত সকলকে বোঝালেন। তারপর তিনি বললেন, যাঁরা সার্টিফিকেট পোড়াতে দ্বিধা করছেন, তাঁরা তাঁদের সার্টিফিকেট ফিরে নিতে পারেন। কারণ, সত্যাগ্রহে কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা হয় না।

কেউ সার্টিফিকেট ফিরিয়ে নিলেন না। মীর আলম ইতি-মধ্যে জেল থেকে খালাস পেয়েছিল। সেও সভায় উপস্থিত ছিল। সে বললো, সে গান্ধীভাইয়ের ওপর অবিচার করেছে। সে-ও নিজের সার্টিফিকেটটি পোড়াবার জন্যে দিলো। গান্ধীজী মীর আলমকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তার বিরুদ্ধে তাঁর কোনও ক্ষোভ নেই ও ছিল না ব'লে তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন। দু-হাজারেরও বেশী সার্টিফিকেট সংগৃহীত হ'লো। সেগুলিকে বিরাট পাত্রটিতে রেখে তেলে ভিজিয়ে আগুন দেওয়া হ'লো। সার্টিফিকেটগুলি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো এবং জনতা ক্রমাগত হর্ষধ্বনি দিয়ে আকাশ বিদীর্ণ করতে লাগলো।

ভারতীয়দের দৃঢ় মনোভাব দেখে জেনারেল স্মাট্‌স্ চিন্তিত হলেন এবং ১৮ই আগস্ট তারিখে তিনি গান্ধীজীকে আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ হ'লো না। ২৩শে আগস্ট আরও বহু সার্টিফিকেট পোড়ানো হ'লো। ভারতীয়রা ট্রান্সভালে প্রবেশ-নিরোধক আইন পুনরায় ভঙ্গ করতে সংকল্প করলেন। শেঠ দাউদ মহম্মদ ও পার্শী রুস্তমজীর মতো ধনী ব্যবসায়ীরা ১৮ই তারিখে ট্রান্সভালে প্রবেশ করলেন। সীমান্তে তাঁদের গ্রেপ্তার ক'রে বিচার না ক'রেই ট্রান্সভাল থেকে বহিষ্কার ক'রে দেওয়া হ'লো। তাঁরা ৩১শে আগস্ট তারিখে আবার ট্রান্সভালে প্রবেশ করলেন। এখন তাঁদের গ্রেপ্তার ক'রে বিচার করা হ'লো। বিচারে তাঁদের ৫০ পাউণ্ড জরিমানা এবং অনাদায়ে তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। তাঁরা জরিমানা না দিয়ে হাসিমুখে জেলেই গেলেন।

তাঁদের এই কার্যে ট্রান্সভালের ভারতীয়রা প্রবল উদ্দীপনা বোধ করলো এবং জোহানেসবার্গের বহু ভারতীয় বিনা লাইসেন্সে ফেরি ক'রে গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করলো। নাটাল থেকে দাউদ মহম্মদ ও রুস্তমজীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বহু ভারতীয় ট্রান্সভালে প্রবেশ ক'রে হাসিমুখে জেলে গেলেন। তাঁদের তিনমাস ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো।

গান্ধীজী নাটালে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পনেরোজন সহকর্মীসহ ট্রান্সভালে প্রবেশ করলে তাঁর কাছে সার্টিফিকেট চাওয়া হ'লো। তিনি তাঁর সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। সার্টিফিকেট দেখাতে না পারায় বা না চাওয়ায় তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'লো। ১৫ই অক্টোবর বিচারে তাঁর ২৫ পাউণ্ড জরিমানা এবং অনাদায়ে দুমাসের সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। গান্ধীজী জরিমানা না দিয়ে জেলে গেলেন। তাঁকে জোহানেসবার্গ থেকে ভোক্‌স্‌রাস্ট্‌ জেলে নিয়ে যাওয়া হ'লো। সেখানে কয়েদীর পোশাক প'রে তাঁকে রোজ মাটি কাটতে হ'তো, তাঁকে মেথরের কাজও দেওয়া হয়েছিল। ভোক্‌স্‌রাস্ট্‌ থেকে তিনি ভারতীয়দের কাছে প্রেরিত তাঁর বাণীতে বললেন: "দুঃখ বরণই আমাদের অস্ত্র, জয় আমাদের সুনিশ্চিত, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দৃঢ় থাকুন।" ১৬ই অক্টোবর গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে লণ্ডনে স্যার মাঞ্চেরজী ভাওনাগরীর সভাপতিত্বে একটি জনসভা হ'লো। এতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত আচরণের নিন্দা ক'রে লালা লজপত রায়, বীর সাভারকর, খাপাড়ে, বিপিনচন্দ্র পাল ও ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিরা বক্তৃতা করলেন। ২৭শে অক্টোবর গান্ধীজীকে ভোক্‌স্‌রাস্ট্‌ থেকে জোহানেসবার্গে নিয়ে যাওয়া হ'লো। কয়েদীর পোশাকে পুলিস পাহারায় তাঁকে রেলস্টেশন থেকে জেল পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো। জেলে তাঁকে দুদিন ভয়ংকর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে রাখা হ'লো।

সারা রাত্রি তিনি বিনিদ্র অবস্থাতেই কাটালেন। দুদিন তাঁকে হাতকড়ি দিয়ে আদালতে আনা হ'লো। এই সময় তিনি জেলে পত্র পেলেন যে, ফিনিক্সে কস্তুরবাঈ গুরুতরভাবে অসুস্থা। তবু তিনি বিচলিত হলেন না। জেল থেকে কস্তুরবাঈকে একটি পত্রে জানালেন, তিনি জরিমানা দিলে মুক্তি পেতে পারেন। কিন্তু সত্যাগ্রহী তিনি, সত্যাগ্রহ সংগ্রামের জন্যে সর্বস্ব পণ করেছেন। আজ যদি তাঁকেও হারাতে হয়, তবু তাও তাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে গান্ধীজী কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। গান্ধীজী জেল থেকে বেরিয়ে তাঁর আইনব্যবসায়ের কাজকর্ম ও রাজনৈতিক বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ১০ই ডিসেম্বর সংবাদ এলো, কস্তুরবাঈয়ের গত তিন মাস যাবৎ ক্রমাগত রক্তস্রাব হচ্ছিল, ডারবানে একটি হাসপাতালে তাঁর অপারেশন হয়েছে। টেলিফোনে ডাক্তার গান্ধীজীকে জানালেন যে, তাঁর স্ত্রীর অবস্থা সংকটজনক। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে ডারবান রওনা হলেন। তিনি হাসপাতালে গিয়ে শুনলেন যে, কস্তুরবাঈকে মাংস খেতে দেওয়া হয়েছে। কস্তুরবাঈ দীর্ঘ রোগভোগের ফলে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিলেন। গান্ধীজী তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতাল থেকে ফিনিক্সে নিয়ে এলেন এবং নিজেই সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করতে লাগলেন। তিনি ঔষধপত্র সব বন্ধ ক'রে দিয়ে জল-চিকিৎসা চালাতে লাগলেন। পুনরায় রক্তস্রাব হ'লো। সকলে ভয় পেলেন। কিন্তু গান্ধীজী ভয় পেলেন না। তিনি কস্তুরবাঈকে নুন ও ডাল খাওয়া বন্ধ করতে বললেন। কস্তুরবাঈ বললেন, "তোমার হ'লে তুমিও নুন ও ডাল খাওয়া ছাড়তে পারতে না।" গান্ধীজী বললেন, "ডাক্তার আমাকে বললে আমি নিশ্চয় ছাড়তাম। বেশ, আমাকে তো ডাক্তার বলেনি, তবু আমি আজ থেকে এক বছর নুন ও ডাল খাব না।" কস্তুরবাঈ স্বামীকে ভালো ক'রেই জানতেন। তিনি ব'লে উঠলেন, "তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নাও। আমি নুন ও

ডাল খাব না।" গান্ধীজী বললেন, "ওতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। বরং তুমি মনে জোর পাবে।" গান্ধীজীর চিকিৎসায় ও পথ্য-ব্যবস্থায় কস্তুরবাঈ সম্পূর্ণ সেরে উঠলেন। তাঁর ভয়াবহ রক্তাল্পতা দেখে ডাক্তাররাও তাঁর আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী যেন মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন করলেন। কস্তুরবাঈ অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি গান্ধীজী ট্রান্সভালে ফিরে এলেন। গান্ধীজীকে আবার সার্টিফিকেট দেখাতে বা টিপসই দিয়ে তাঁর পরিচয় প্রমাণিত করতে বলা হ'লো। গান্ধীজী আবার অসম্মত হ'লে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'লো। বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ট্রান্সভাল থেকে বহিষ্কৃত করবার আদেশ দিলেন। গান্ধীজীকে ট্রান্সভাল থেকে বহিষ্কার করা হ'লো, কিন্তু গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গেই ট্রান্সভালে পুনঃপ্রবেশ করলেন। গান্ধীজীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হ'লো এবং বিচারে তার ৫০ পাউণ্ড জরিমানা বা অনাদায়ে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। দণ্ডভোগ শেষে গান্ধীজী ২৪শে মে প্রিটোরিয়া জেল থেকে মুক্তি পেলেন। গ্রেপ্তার, জেল, বহিষ্কার, পুনঃপ্রবেশ, পুনরায় জেল, সারা ট্রান্সভালে এ-ই চলছিল। কিন্তু ভারতীয়রা তাঁদের সংগ্রামে অটল ছিলেন।

এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ উপনিবেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে একটি রাজ্যে পরিণত করবার কথা চলছিল। এই ব্যাপারে জেনারেল বোথা ও জেনারেল স্মাট্সের লণ্ডন যাওয়ার কথা ছিল। তাই গান্ধীজী এই সময়ে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে লণ্ডনে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবার পরামর্শ দিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়দের একটি প্রতিনিধিদল ২৩শে জুন তারিখে লণ্ডন রওনা হ'লো। প্রতিনিধিদলটি ১০ই জুলাই লণ্ডনে পৌঁছলো। ইতিপূর্বেই জেনারেল বোথা ও জেনারেল স্মাট্স্ লণ্ডনে পৌঁছেছিলেন। গান্ধীজী লণ্ডনে নেমেই বহু বৃটিশ সাংবাদিক

ও পার্লামেণ্ট সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো। তাঁকে স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হ'লো, ট্রান্সভাল সরকার তাঁদের ছোটখাটো দাবী মানতে রাজী, কিন্তু এশিয়াটিক আইন রদ করতে বা বহিরাগমন নিরোধ আইন সংশোধন করতে প্রস্তুত নন। তাঁরা অশ্বেতাঙ্গদের জন্যে যেসব বিধিনিষেধ রচনা করেছেন, তাও অটুট রাখতে বদ্ধপরিকর।

গান্ধীজী এইসব আলাপ-আলোচনা, দেখা-সাক্ষাৎ, আবেদন-নিবেদন সম্পর্কেও তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "বড় বড় লোক ব'লে যাঁদের ভাবা হয়, তাঁদের সঙ্গে আমি যতোই দেখা করছি, ততোই দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছি। এর মতো নিষ্ফল কাজ আর নেই। প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবে তন্ময় হয়ে আছেন। যাঁরা ক্ষমতার আসনে আছেন, নিঃস্বার্থ ন্যায়-অন্যায়বোধ তাঁদের নেই। তাঁরা কেবল নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি রাখতে ও সেটাকে বাড়িয়ে দেখতে ব্যস্ত।... এইভাবে একটি কি দুটি লোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে একটা গোটা মূল্যবান্ দিন নষ্ট করতে বা এতো টাকা ব্যয় করতে সত্যাগ্রহীর বিবেকে বাধে। এর চেয়ে জেলে যাওয়া ও নির্যাতন ভোগ করা অনেক ভালো। আমাদের দাবী যদি এরা মানে, তবে তা এরা মানবে প্রতিনিধিদলের পরিশ্রমের জন্যে নয়, যাঁরা জেলে গেছেন, যাঁরা দুঃসহ নিপীড়ন সহ্য করেছেন, তাঁদের জন্যে। আর আমরা যদি এতে ব্যর্থ হই, তবে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, আমরা যথেষ্ট দুঃখবরণ করিনি।"

গান্ধীজী এইবার ইংলণ্ডে থাকাকালে ইংলণ্ডের ভোটাধিকার আন্দোলনের নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই আন্দোলন দেখে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মিসেস পাঙ্কহার্স্ট ও মিসেস ডেসপোর্ডের মতো ইংরেজ মহিলাদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা

পোষণ করতেন। এঁদের আন্দোলনের ধারা বিশ্লেষণ ক'রেও তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মূল্য ও কৌশল সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখেছিলেন। গান্ধীজী এইবার ইংলণ্ডে চার মাস ছিলেন। তাঁর ইংলণ্ডে আসবার প্রাক্কালে ১লা জুলাই মদনলাল ঢিংরা স্যার কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করেছিলেন। আদালতে ঢিংরা নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর দেশের জন্যে এধরনের কাজ করবার অধিকার তাঁর আছে এবং এর বিচার করবার কোনও অধিকার নেই বিচারপতিদের। তিনি বলেছিলেন, "ভারতের দেশপ্রেমিকদের অমানুষিক প্রাণদণ্ড ও নির্বাসন-দণ্ড দিয়ে ইংরেজরা যা করেছে তারই যৎসামান্য প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই আমি ইংরেজের রক্তপাত করতে সংকল্প করেছিলাম। আমি আমার বিবেক ও কর্তব্য-বোধের সঙ্গে ভিন্ন আর কারও সঙ্গে এবিষয়ে কোনও চক্রান্ত করিনি। আমি বিশ্বাস করি, যে দেশকে বিদেশীরা সঙ্গীনের মুখে পদানত করছে, সে দেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, যদিও নিরস্ত্র জাতির পক্ষে লড়াই সম্ভব হয়নি। আমার কামান বন্দুক ব্যবহারের অধিকার নেই, তাই আমি আততায়ীর মতো পিস্তল দিয়ে হত্যা করেছি। আমি হিন্দু, আমি বিশ্বাস করি, আমার স্বদেশের প্রতি অন্যায় যা, ভগবানের প্রতি অসম্মানও তা। আমার দেশের সেবা শ্রীরামচন্দ্রেরই সেবা। আমার মতো দেশমাতৃকার কোন সন্তানের, যার অর্থ নেই, বিদ্যা নেই, দেশমাতৃকাকে নিজের রক্ত ছাড়া আর দেওয়ার কি আছে? সেই রক্ত আমি দেশমাতৃকার পূজাবেদীমূলে দান করেছি। কিভাবে মরতে হবে, এখন সেই শিক্ষাই ভারতীয়দের চাই। আর আমরা নিজেরা মরেই সে শিক্ষা দিতে পারি। তাই আমি মরছি, শহীদের সকল গৌরব নিয়েই আমি মরছি।" ঢিংরা উচ্চকণ্ঠে তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শের কথা ঘোষণা ক'রে শেষে বললেন, "ভগবানের কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা, আমি যেন এই মায়ের কোলেই বারবার জন্মগ্রহণ করি।

যতোদিন না মা দাসত্বমুক্ত হয়ে আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিতা হন, ততোদিন যেন বারবার আমি তাঁর জন্যেই মরি। বন্দে মাতরম্!" ঢিংরার এই ভাষণ সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। উইনস্টন চার্চিল তখন ছিলেন অবর-উপনিবেশ-সচিব। তিনিও বলেছিলেন, "দেশাত্মবোধের নামে যেসব বক্তৃতা করা হয়েছে, এটি সেগুলির মধ্যে সুন্দরতম।"

গান্ধীজী এই সময়ে ইংলণ্ডবাসী ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁরা গান্ধীজীকে অহিংসার পথ ত্যাগ করতে নানাভাবে প্ররোচিত করেন। গান্ধীজীও তাঁদের সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ ক'রে অহিংসা ও সত্যাগ্রহকেই অস্ত্ররূপে গ্রহণ করতে বলেন। এইসব ভারতীয়ের দেশাত্মবোধ ও দুঃসাহস তাঁকে মুগ্ধ করে; কিন্তু তিনি বোঝেন যে, এঁদের শক্তি ও সাহস ভ্রান্তপথে চালিত হচ্ছে। টলস্টয়ের কাছ থেকেই গান্ধীজী অহিংসার প্রেরণা পেয়েছিলেন। এইবার লণ্ডনে থাকবার সময়েই তিনি সর্বপ্রথম টলস্টয়কে পত্র লেখেন। টলস্টয় তাঁর এই ভারতীয় শিষ্যটি সম্পর্কে খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি গান্ধীজীর উত্তরে লেখেন, "আপনার অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক পত্রটি এইমাত্র পেলাম। পত্রটি আমাকে খুবই আনন্দ দিয়েছে। ভগবান্ আমার ট্রান্সভালের প্রিয় ভাই ও সহকর্মীদের সহায় হ'ন্। কঠোরের বিরুদ্ধে কোমলের, দম্ভ ও হিংসার বিরুদ্ধে নম্রতা ও প্রেমের এই সংগ্রামের একই তীব্রতা আমরা এখানেও, বিশেষতঃ সেনাবাহিনীতে কাজ করতে অসম্মতির দ্বারা ঐহিক বিধিসমূহের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিধির একটি তীব্রতম সংগ্রামের মধ্যে, ক্রমেই অধিকতর অনুভব করছি। এই ধরনের অসম্মতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আমার ভ্রাতৃসুলভ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার সঙ্গে পত্রালাপে আমি আনন্দিত হয়েছি।"

১৩ই নভেম্বর তারিখে গান্ধীজী লণ্ডন থেকে বিদায় নিলেন। ফিরে এলেন চূড়ান্ত সংগ্রামের সংকল্প নিয়ে।

দশ

হিন্দ্ স্বরাজ

গান্ধীজী তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সংগ্রামের একটি সাময়িক কৌশল ব'লে মনে করেন নি। তিনি এ বিষয়ে যতোই চিন্তা করছিলেন, যতোই তিনি টলস্টয়, রাস্কিন, কার্লাইল, এমার্সন, থরো প্রভৃতি মনীষীদের রচনা পড়ছিলেন, ততোই তিনি অহিংসা সম্পর্কে একটি অখণ্ড চিন্তাধারা বা দর্শন গ'ড়ে তুলতে সমর্থ হচ্ছিলেন। ইংলণ্ডে ভারতীয় সন্ত্রাস-বাদীদের এবং ইংলণ্ডের ভোটাধিকার-আন্দোলনকারীদের সংস্পর্শে এসে তিনি আরও গভীরভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করছিলেন এবং একটি সুস্পষ্ট মতাদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই মতাদর্শই পরবর্তীকালে গান্ধীবাদ নামে বিখ্যাত হয়েছে।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তারিখে, গান্ধীজী লণ্ডনে থাকবার সময়েই, লর্ড অ্যাম্প্ট্হিলকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি তাঁর মতাদর্শের কিছুটা আভাস দিয়েছিলেন। তিনি তাতে লিখেছিলেন, ভারতীয়রা বৃটিশ শাসন সম্পর্কে অধৈর্য হয়ে পড়েছে, বৃটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, হিংসার পূজারীরা প্রভাব বিস্তার করছে, এইসব হিংসার বিরুদ্ধে নিপীড়ন-মূলক ব্যবস্থাও ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। ইংরেজরা যে উদারতার সঙ্গে কিছু দেবে বা সময়মতো দেবে, এমন আশাও নেই। বৃটিশ জনসাধারণ বাণিজ্য-স্বার্থ নামক দানবের পূজায় ব্যস্ত। এ দোষও তাদের নয়, দোষ তাদের সমাজব্যবস্থার, তাদের সভ্যতার। ভারত বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে শোষিত হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতা খ্রীষ্টীয় মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সভ্যতাকে ইংলণ্ড যদি ত্যাগ করতে পারে, তবেই সে নিষ্কৃতি পাবে।

গান্ধীজী লিখেছিলেন, "রেলপথগুলি, যন্ত্রপাতিগুলি, এবং তার

সহজাত মানুষের অভ্যাসগুলি কি ভারতবাসীর, কি ইংলণ্ডবাসীর প্রকৃত দাসত্বের তকমা। তাই শাসকদের সঙ্গে আমার কোনও বিবাদ নেই। আমার বিবাদ তাদের পদ্ধতির সঙ্গে। আমার কাছে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের মতো বড় বড় শহরগুলির অভ্যুত্থান আনন্দের নয়, দুঃখের। ভারতের প্রাচীন ব্যবস্থা আংশিকরূপে ভেঙে পড়ায় ভারতেরই ক্ষতি হয়েছে। আমার এই মতামত সত্ত্বেও আমি দেশাত্মবোধের অংশীদার; তবে কি চরমপন্থী কি নরমপন্থী, তাঁদের কারও পদ্ধতির সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মতের মিল নেই। কারণ, শেষ পর্যন্ত তাঁরা সকলেই হিংসায় বিশ্বাসী। হিংসাত্মক পদ্ধতিগুলির অর্থই হ'লো আধুনিক সভ্যতাকে এবং আধুনিক সভ্যতার ফলস্বরূপ নীতির বিনাশকে গ্রহণ করা। কে দেশ শাসন করছে, তা নিয়ে আমি আগ্রহী নই। আমি আশা করি, আমার অভিপ্রায় অনুসারেই শাসকরা আমাকে শাসন করবে। অন্যথায় আমাকে শাসন করবার কাজে আমি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারব না। আমি হয়ে উঠব শাসকদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধী।"

আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতাই যে রয়েছে সমস্ত শোষণ ও সাম্রাজ্য-বাদের মূলে, এই স্থির ধারণা জন্মেছিল গান্ধীজীর মনে। ইংরেজরা যদি এই যন্ত্র-সভ্যতা ত্যাগ করতো, তবে তার সাম্রাজ্যের ও অপরকে শোষণের, হিংসা ও পরপীড়নের প্রয়োজনই ফুরিয়ে যেত। ভারত থেকে যদি ইংরেজরা চলে যায় এবং ভারত নিজে এই যন্ত্র-সভ্যতাকে গ্রহণ করে, তবে তাতেও ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা পাবে না। কারণ, ভারতীয়দের মুষ্টিমেয় একটি অংশই তখন দেশকে শোষণ করবে, চালাবে পীড়ন, হিংসা—দেশের কোটি কোটি মানুষকে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করবে। সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যে চাই শাসক বদল নয়—আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতাকেই পরিপূর্ণরূপে পরিহার।

গান্ধীজী যখন লণ্ডন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রার পথে জাহাজে উঠলেন, এই চিন্তাধারা তাঁর মনে প্রবল বন্যার মতো নেমে এলো। তিনি তাঁর মতাদর্শকে গুজরাটী ভাষায়, 'হিন্দ্-স্বরাজ' নামে একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করলেন। বইখানি প্রায় ত্রিশহাজার শব্দে ২৭১ পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে। ঐ সময়ে এই ধারণাগুলি তাঁর সমগ্র সত্তাকে কিভাবে পেয়ে বসেছিল, তা আমরা বুঝতে পারি এই থেকে যে, এই বইখানি তিনি ১৩ই নভেম্বর থেকে ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত মাত্র দশ দিনে লিখে শেষ করেছিলেন। অনেক সময় লিখতে লিখতে তাঁর ডানহাত অবসন্ন হয়ে পড়তো, তখন তিনি লেখা থামাতেন না, বাঁ হাতেই লিখতেন। এই বইয়ের প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা তিনি বাঁ হাতেই লিখেছিলেন।

"হিন্দ্ স্বরাজে" গান্ধীবাদের মূলতত্ত্ব সর্বপ্রথম সুচিন্তিত আকার লাভ করলো। হিন্দ্ স্বরাজে গান্ধীজী তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যে যে হিংসাত্মক মনোভাবের দ্রুত বিস্তার লক্ষ্য করেছিলেন, তার তীব্র সমালোচনা করলেন। হিংসার মধ্যে ভারতীয়দের বর্তমান দুরবস্থার প্রতিকার নেই। ভারতকে আত্মরক্ষার জন্যে ভিন্নতর ও উচ্চতর উপায় গ্রহণ করতে হবে। ঘৃণার স্থলে প্রেমকে এবং হিংসার স্থলে আত্মত্যাগকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পশুশক্তির বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে হবে আত্মার শক্তিকে। তিনি এই বইয়ের একটি অংশে ইতালির সঙ্গে ভারতের অবস্থার তুলনা ক'রে দেখালেন। তিনি বললেন, "আপনারা যদি মনে করেন যে, ইতালীয়রা ইতালি শাসন করে, তাই ইতালীয় জাতি সুখী, তবে আপনারা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন। ম্যাট্‌সিনি চূড়ান্তভাবে দেখিয়েছেন যে, ইতালি স্বাধীন নয়। স্বাধীন কথাটার অর্থ ভিক্টর এমানুয়েল এক বোঝেন; ম্যাট্‌সিনি বোঝেন আর। এমানুয়েল, কাভুর, এমনকি গ্যারিবল্ডীর কাছে ইতালি মানে ইতালির রাজা ও তাঁর চেলা-চামুণ্ডার দল। ম্যাট্‌সিনির কাছে ইতালি মানে সমগ্র ইতালীয় জনসাধারণ, অর্থাৎ

ইতালীয় কৃষকরা। তাই ম্যাট্‌সিনির ইতালি আজও দাসত্ববন্ধনে আছে। সেখানে শ্রমজীবীরা আজও অসুখী। তাই তারা খুনজখম করে, বিদ্রোহ করে। তাদের পক্ষে বিদ্রোহটাই সর্বদা প্রত্যাশিত। অস্ট্রীয়বাহিনী চলে যাওয়ার পর ইতালি প্রকৃত কতটা লাভবান্‌ হয়েছে? লাভ নামমাত্র। সাধারণ মানুষের অবস্থা আজও মোটামুটি একরকমই আছে। আপনারা নিশ্চয় ভারতে অনুরূপ একটা অবস্থা চান না। আমার বিশ্বাস, দেশের শাসনাধিকার আপনাদের হাতে আসুক, এটাই আপনারা চান না, আপনারা চান ভারতের কোটি কোটি মানুষ সুখী হ'ক। যদি তাই হয়, তবে আমাদের একটিমাত্র বিষয় বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে; কিভাবে কোটি কোটি মানুষ স্ব-শাসনের অধিকার পেতে পারে। আপনারা স্বীকার করবেন যে, অনেক ভারতীয় রাজার হাতে তাঁদের প্রজারা নিষ্পেষিত হচ্ছে। রাজারা তাদের নির্মমভাবে পেষণ করেন। তাঁদের স্বৈরাচার ইংরেজদের স্বৈরাচারের চেয়েও ভীষণ। আপনারা যদি এই ধরনের স্বৈরাচার ভারতে চান, তবে আপনাদের সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না। আমার দেশপ্রেম আমাকে এই শিক্ষা দেয় নি যে বৃটিশ চলে গেলে ভারতীয় রাজাদের পদতলে আমি জনসাধারণকে নিষ্পেষিত হ'তে দেব। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি ইংরেজদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যেমন, দেশীয় রাজাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেও তেমনি সংগ্রাম করবো। আমি দেশপ্রেম বলতে সমগ্র জাতির মঙ্গলই বুঝি। এই মঙ্গল যদি আমি ইংরেজদের কাছে পাই, তবে আমি তাদের কাছেই আমার মাথা নত করব। যদি কোন ইংরেজ ভারতের স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন, তবে সেই ইংরেজকে আমি একজন ভারতীয় ব'লেই সুস্বাগত জানাব। আমরা যখন নিজেদের শাসন করতে শিখব, তখনই আমরা স্বরাজ পাব। এই স্বরাজ আমাদের প্রত্যেককে জীবনে অনুভব করতে হবে। অন্যে যা আমাকে এনে দেবে, তা আমার কাছে স্বরাজ নয়, পরাধীনতা।"

গান্ধীজীর দেশপ্রেম সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ নয়। তাঁর সংগ্রাম শাসকের বিরুদ্ধে নয়, শাসনের নীতি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ইংরেজরা চ'লে গেলেই দেশবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা পাবে না—প্রত্যেকটি মানুষের আত্মচেতনাই প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতাই মানুষের দুঃখের মূলে। তাই যন্ত্রসভ্যতার কবলে পড়ে ইংরেজ জনসাধারণও যেমন সুখী হয় নি, ভারত যদি যন্ত্রসভ্যতাকেই গ্রহণ করে, তবে সেও সুখী হবে না। এইগুলিই হ'লো—হিন্দ্ স্বরাজের মূলকথা, গান্ধীবাদের মূল তত্ত্ব।

গান্ধীজী তাঁর ভারতীয় এক বন্ধুর কাছে 'হিন্দ্ স্বরাজে' তিনি কি বলতে চেয়েছেন, তাঁর একটি সংক্ষিপ্তসার পাঠান। তাতে তিনি বলেন ঃ

১। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে দুস্তর কোনও ব্যবধান নেই। ২। পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় সভ্যতা বলে কিছু নেই, আছে আধুনিক সভ্যতা, সম্পূর্ণরূপে জড়বাদী সভ্যতা। ৩। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসবার আগে ইউরোপের জনসাধারণের সঙ্গে প্রাচ্যের জনসাধারণের বহু সাদৃশ্য ছিল। ৪। বৃটেনের জনসাধারণ ভারত শাসন করে না, ভারত শাসন করে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং সভ্যতার বিজয়গৌরব ব'লে ঘোষিত আধুনিক প্রায় প্রতিটি উদ্ভাবনের মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতা। বোম্বাই, কলকাতা ও ঐ ধরনের অন্যান্য বড় বড় শহরেই প্রকৃতপক্ষে রোগটা প্রবল। ৬। কাল যদি বৃটিশ শাসনের স্থলে আধুনিক পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন ভারতীয় শাসন আসে, তাতে ভারতের অবস্থার কোনও উন্নতি হবে, কেবলমাত্র ভারত থেকে যে টাকা ইংলণ্ডে চ'লে যায় তার একটা অংশ এদেশে থেকে যাবে। ৭। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেদিনই মিলন হ'তে পারে, যেদিন প্রতীচ্য আধুনিক সভ্যতাকে প্রায় পুরোপুরি ছেড়ে ফেলতে পারবে। প্রাচ্য আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করলে তাদের মিলন হবে, এটা আপাতদৃষ্টিতে সত্য

মনে হ'লেও তা প্রকৃতপক্ষে সশস্ত্র সন্ধি—যেমনটি হয়েছে জার্মানি ও ইংলণ্ডের মধ্যে। দুইটি জাতিই মৃত্যুপুরীতে বাস করছে; এ ওকে পাছে খেয়ে ফেলে এই ভয়ে তারা পরস্পরকে এড়িয়ে চলছে। ৮। কোন একজন মানুষ বা একদল মানুষ সারা দুনিয়ার সংস্কার সাধন করবে, এ কথা ভাবাও ঔদ্ধত্য মাত্র। অতিশয় কৃত্রিম ও দ্রুতগামী যন্ত্রযানের সাহায্যে তা করতে চেষ্টা করা অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টার সমতুল। ৯। বলা যেতে পারে, বস্তুগত আরামের বৃদ্ধি নৈতিক বিকাশের পক্ষে আদৌ সহায়ক নয়। ১০। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানটি জাদুবিদ্যার একটি ঘনীভূত রূপ। যাকে আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের কলাকৌশল মনে করি, তার চেয়ে হাতুড়ের চিকিৎসা অনেক ভালো। ১১। হাসপাতালগুলি শয়তানের হাতের যন্ত্রমাত্র; এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে শয়তান তার রাজ্যে নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখে। ...যদি যৌনব্যাধি ও ক্ষয়রোগের হাসপাতালগুলি না থাকতো, তবে ক্ষয়রোগ ও যৌন অপরাধ অনেক কমে যেতো। ১২। গত পঞ্চাশ বছরে ভারত যা শিখেছে তা ভুলে যাওয়ার মধ্যেই তার প্রকৃত মুক্তি। তার রেলপথ, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার বা ঐ ধরনের সব কিছুকে বিদায় দিতে হবে। তথাকথিত ভারতীয় উচ্চতর শ্রেণীকে বিবেক, ধর্ম ও স্বেচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কৃষকের সরল জীবনকে গ্রহণ করতে হবে, জানতে হবে, তার মধ্যেই প্রকৃত সুখ আছে। ১৩। ভারতীয়রা কেউ কলে তৈরী কাপড় ব্যবহার করবে না, হ'ক সে কাপড় ইউরোপীয় কি ভারতীয় কলে তৈরী। ১৪। তা করতে ইংলণ্ড ভারতকে সাহায্য করতে পারে। তাতেই প্রতিদিন তারা যে ভারত শাসন করছে তার উপযুক্ততা প্রমাণিত হবে। ১৫। প্রাচীন ঋষিরা সমাজকে তার বৈষয়িক অবস্থা সীমাবদ্ধ ক'রে দিয়ে সুনিয়মিত ক'রে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। আজ ভারতের চাষীরা যে লাঙল ব্যবহার করে, পাঁচ

হাজার বছর আগেও তাই করত। এতেই তার মুক্তি। এই অবস্থায় মানুষ অধিক দিন অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করতে পারে।

'হিন্দ্ স্বরাজ' ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন কাগজে ধারাবাহিকভাবে বেরুতে থাকে। পরে এটি বই হয়ে বেরোয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার এটি নিষিদ্ধ ক'রে দিলে গান্ধীজী এর একটি ইংরেজী অনুবাদ Indian Home Rule প্রকাশ করেন। গোখেল বইখানি পড়ে এটিকে অত্যন্ত স্থূল এবং অগভীর চিন্তার ফল ব'লেই মনে করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, গান্ধীজী এক বছর ভারতে থাকলে এই বইখানি নিজেই নষ্ট ক'রে ফেলবার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু গান্ধীজী বহু বৎসর ভারতে থাকবার পরও সে রকম কিছু করবার কারণ দেখেন নি। পরে এক সময় তিনি বলেছিলেন, এই বইয়ে তিনি বৃটিশ পার্লামেন্ট প্রসঙ্গে যে বেশ্যা কথাটি ব্যবহার করেছেন, তাতে একজন ইংরেজ মহিলা বিরক্ত হয়েছিলেন। ঐ শব্দটি ছাড়া আর কিছু পরিবর্তন করতে তাঁর ইচ্ছা নেই।

গান্ধীজী টলস্টয়ের কাছে তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজ' এক কপি পাঠিয়েছিলেন। টলস্টয় লিখেছিলেন, "আপনার বইখানি আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। কারণ, আমার মতে, যে প্রশ্নটি এতে আলোচিত হয়েছে—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রশ্ন—তা কেবল ভারতের পক্ষে নয়, তা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

গান্ধীজী যখন এই বইখানি লেখেন, তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। এই বইয়ে গান্ধীজীর মতাদর্শের সার নিহিত আছে। যাঁরা প্রকৃত গান্ধীবাদ কি জানতে চান, হিন্দ্ স্বরাজ তাঁদের পক্ষে অবশ্য-পঠনীয়।

এগার

ঝড়ের আগে

গান্ধীজী শূন্যহাতেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরলেন। কিন্তু তিনি ৩০শে নভেম্বর লণ্ডন থেকে কেপ টাউনে নেমেই যে তারবার্তা পেলেন তাতে তাঁর আনন্দের সীমা রইলো না। পৃথিবীর একপ্রান্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেসব ভারতীয় বাস করেন, তাঁরা যে নিঃসঙ্গ নন, তা গান্ধীজী বুঝলেন। তাঁদের পেছনে আছেন তাঁদের স্বদেশবাসীরা। গান্ধীজীর কাছে প্রেরিত এই তার-বার্তায় ভারতের বিখ্যাত শিল্পপতি রতনজী জামসেদজী টাটা সত্যাগ্রহ-তহবিলে পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা যে কঠোর নিপীড়ন ভোগ করছেন, সে সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছেছিল। তিন হাজারেরও বেশি ভারতীয় কারারুদ্ধ হয়েছেন, ছ শতেরও বেশী সত্যাগ্রহী নির্যাতিত হয়েছেন, শত শত পরিবার অনাহারের সম্মুখীন হয়েছেন। স্বামী-পুত্র কারাগারে রয়েছেন, পত্নী পুত্রবধূ বাজারে ফলমূল শাকসবজি বিক্রি ক'রে সংসার চালাচ্ছেন। ভারতীয় বণিকরা যাঁরা কোনদিন কঠিন কায়িক শ্রম করেন নি, তাঁদেরও কারাগারে পাথর ভাঙতে, মেথরের কাজ করতে হচ্ছে। তাঁরাও কয়েদীর পোশাকে অর্ধাহারে অনাহারে কারাগারে কাটাচ্ছেন। এইসব করুণ সংবাদ যতোই ভারতে পৌঁছতে লাগলো, ততোই ভারতীয়রা বিক্ষুব্ধ হলেন, বেদনায় কাতর হলেন। গোখেল বোম্বাইয়ে একটি জনসভায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের শোচনীয় অবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, "প্রথমেই একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ট্রান্সভালে মিঃ গান্ধী ও আমাদের অন্যান্য স্বদেশবাসীরা নিজেদের জন্যে সংগ্রাম করছেন না। তাঁরা সংগ্রাম করছেন আমাদের

মাতৃভূমির মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্যে। কী অপূর্ব ভঙ্গিতে সমগ্র আন্দোলনটি পরিচালিত হচ্ছে লক্ষ্য করুন। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী সকলেই একটি মানুষের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। যে ব্যক্তি এ কাজ করতে পেরেছেন, তিনি যে বিরাট নৈতিক শক্তির অধিকারী, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁকে হালকাভাবে বিচার করলে চলবে না। যখন অন্যান্য সমস্ত পন্থাই ব্যর্থ হয়েছে, তখনই মিঃ গান্ধী যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পন্থা গ্রহণ করেছেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ যে, যদি আমাদের কেউ এখন ট্রান্সভালে থাকতাম, তবে আমরাও মিঃ গান্ধীর পতাকাতলে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে এই বিরাট আদর্শের জন্যে দুঃখবরণ ক'রে গর্ব বোধ করতাম।"

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এই ধরনের সভাসমিতি হ'লো। সর্বত্রই দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগৃহীত হ'তে লাগলো। এমন কি দেশীয় রাজারাও মুক্তহস্তে সাহায্য দিতে এগিয়ে এলেন। গান্ধীজীর নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস আগামী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করবার জন্যে গান্ধীজীর নামও প্রস্তাব করলো। ভারতে গান্ধীজীর এই প্রভাববৃদ্ধি এবং দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়-দের নিপীড়নের সংবাদে ভারতীয়দের ক্ষোভ বৃটিশ সরকারকেও চিন্তিত করলো। এই সময়ে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে ভারতে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে সাময়িকভাবে বারিসিঞ্চনের জন্যে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় মর্লে-মিন্টো সংস্কারের কথা চলছিল। কংগ্রেস এই পরিস্থিতিতে পাছে এই সংস্কার গ্রহণে সম্মত না হয়, সেইজন্যে বৃটিশ সরকার সম্ভবতঃ ভারতীয়দের সম্পর্কে ট্রান্সভাল সরকারকে একটু নরম নীতি অনুসরণ করতে বলেছিলেন। তাই ২২শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধীজী যখন তাঁর ছ'জন সহকর্মীকে নিয়ে ট্রান্সভালে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'লো না।

ডিসেম্বরের শেষভাগে লাহোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। তাতে গোখেল নিজে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্বন্ধে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। তিনি গান্ধীজী সম্পর্কে বললেন, "তিনি হলেন এমন একজন মানুষ যাঁকে মানুষদের মধ্যে মানুষ, বীরদের মধ্যে বীর, দেশপ্রেমিকদের মধ্যে দেশপ্রেমিক ব'লে বর্ণনা করা চলে। আমরা বলতে পারি, বর্তমান সময়ে তাঁর মধ্যেই ভারতীয় মানবতা সত্যই সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে।" 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ নটেসন দক্ষিণ অফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থার একটি করুণ চিত্র তুলে ধরলেন। সভায় উপস্থিত নরনারীর মধ্যে এক অভাবনীয় উদ্দীপনার সঞ্চার হ'লো। সকলে টাকা, সোনা-দানা, গয়না, যা হাতের কাছে পেলেন, মুক্তহস্তে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের জন্যে দান করলেন। মেয়েরা অনেকেই আংটি ও বালা খুলে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নগদ আঠারো হাজার টাকা সংগৃহীত হ'লো। কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশে অভিনন্দন জানিয়ে তার পাঠালেন। টাকাও পাঠানো হ'লো। কংগ্রেস থেকে ট্রান্সভাল সরকারের কাছে ভারতীয়দের প্রতি সুবিচারের অনুরোধ জানানো হ'লো।

রতন টাটা আরও পঁচিশ হাজার টাকা পাঠালেন। হায়দরাবাদের নিজাম দিলেন আড়াই হাজার টাকা। মিঃ জাহাঙ্গীর পেটিট দিলেন চারশ' পাউণ্ড (প্রায় ছ হাজার টাকা)। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনেও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুঃসাহসিক সংগ্রামে অভিনন্দন জানানো হ'লো এবং আগা খাঁ সম্মেলনেই তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করলেন। রেঙ্গুন, লণ্ডন, মোজাম্বিক, জাঞ্জিবার প্রভৃতি স্থান থেকেও সাহায্য আসতে লাগলো। গান্ধীজী এই অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হচ্ছে, তার বিশদ হিসাব গোখেলকে পাঠালেন।

ভারতবাসীর এই স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও সমর্থন দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহীদের নূতন প্রেরণা যোগালো।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নাটাল থেকে একদল সত্যাগ্রহী ট্রান্সভালে বহিরাগত নিরোধক আইন অমান্য করবার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্যে ডারবান স্টেশনে এসে সমবেত হলেন। প্রায় তিনশত লোকের একটি জনতা প্ল্যাটফর্মে এসে তাঁদের মালা পরিয়ে বিদায় দিলো। এই সত্যাগ্রহীদের জন্যে ট্রেনে একটি বিশেষ কামরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই কামরায় চ'ড়ে সত্যাগ্রহীরা গান্ধীজীর নেতৃত্বে ট্রান্সভাল যাত্রা করলেন। তাঁরা নাটালের সীমা অতিক্রম ক'রে ট্রান্সভালে প্রবেশ করলেন। কেউ তাঁদের বাধা দিলো না বা কোনও প্রশ্ন করলো না। তাঁরা সকলে জোহানেস্‌বার্গে পৌঁছলেন এবং বিনা লাইসেন্সে ফেরি করতে শুরু করলেন। এখন সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করা হ'লো। কিন্তু গান্ধীজীকে কেউ গ্রেপ্তার করলো না। সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার ক'রে আবার নাটালে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার না করবার কারণ গান্ধীজীও নিজে বুঝলেন না।

সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করলে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হয়। এই ব্যয়বহুল ব্যাপারটি এখন ট্রান্সভাল সরকার সন্তর্পণে এড়াতে চাইছিল। তাই সত্যাগ্রহীদের ভরণ-পোষণের সমস্যাটি গান্ধীজীকে ভাবিত ক'রে তুললো। যে অর্থ-সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন বা পাচ্ছিলেন, তা শত শত সত্যাগ্রহীর নিয়মিত ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই গান্ধীজী কিছুটা উদ্বিগ্ন হলেন। এই সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি ফিনিক্স খামারের আদর্শে আর একটি সুবৃহৎ খামার গ'ড়ে তুলবার কথা ভাবলেন। সুযোগও মিলে গেল।

হারম্যান কালেন্‌বাখ নামে এক ধনী জার্মান ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন

গান্ধীজীর বন্ধু। তিনি গান্ধীজীকে এগারোশ' একর জমির একটি বিরাট খামার বিনা খাজনায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহী ও তাঁদের দুঃস্থ পরিবারের ব্যবহারের জন্যে দিলেন। গান্ধীজী ও কালেন্‌বাখ দু'জনেই ছিলেন টলস্টয়ের ভক্ত। তাঁরা তাই এই খামারের নাম দিলেন 'টলস্টয় ফার্ম'।

টলস্টয় খামারটি ছিল প্রায় দু মাইল লম্বা ও পৌনে মাইল চওড়া জমির উপর অবস্থিত। এই খামারে প্রায় একহাজার ফলের গাছ ও একটি ছোট বাড়ি ছিল। জায়গাটা জোহানেস্‌বার্গ থেকে একুশ মাইল দূরে। নিকটতম রেলস্টেশনের দূরত্ব মাইলখানেক। গান্ধীজী ও কালেন্‌বাখ সত্যাগ্রহীদের থাকবার জন্যে এখানে কতকগুলি বাড়ি করবেন স্থির করলেন। জুনমাসের গোড়া থেকেই এখানে কিছু কিছু সত্যাগ্রহী আসতে, থাকতে ও কাজ করতে শুরু করলেন। যাঁরা এখানে বসবাস শুরু করলেন, তাঁদের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু, মুসলিম, পার্শী ও খ্রীষ্টানরা ছিলেন। জনচল্লিশেক ছিলেন যুবক, দু-তিনজন বৃদ্ধ, পাঁচজন স্ত্রীলোক, পঁচিশ জন বালক ও পাঁচজন বালিকা। পৃথক পৃথক খাওয়ার ব্যবস্থা যে এখানে অসুবিধাজনক তা জেনে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা একত্রই করা হ'লো। গান্ধীজী এখানে মাংসাহারের ব্যবস্থা রাখতে চাইলেও মুসলমান ও খ্রীষ্টান সত্যাগ্রহীরা স্বেচ্ছায় নিরামিষ খেতে রাজী হলেন। খ্রীষ্টান মহিলাদের উপর রান্নার ভার রইলো। সকলেই একসঙ্গে ব'সে খেতেন। যে যাঁর এঁটো বাসন ধুয়ে নিতেন আর রান্নাঘরের পাত্রগুলি ধুতেন পালা ক'রে এক-একটি দল। ধূমপান ও সুরাপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল।

কালেন্‌বাখের পরিকল্পনা অনুসারে বাড়িনির্মাণের কাজ শুরু হ'লো। একজন ইউরোপীয় রাজমিস্ত্রী বাড়ি তৈরির কাজ খামারের লোকদের শিখিয়ে দিলেন। একদল গুজরাটী ছুতার বিনা মজুরিতে কাজ ক'রে দিতে রাজী হলেন। তিনি অল্প মজুরিতে আরও

কয়েকজন ছুতারকে এনে দিলেন। ছ' মাসের মধ্যেই বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। মেয়েদের ও পুরুষদের থাকবার জায়গা পৃথক রাখা হ'লো। এমনি কি, এখানে থাকতে হ'লে বিবাহিত ব্যক্তিদেরও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, এই হ'লো নিয়ম।

আবালবৃদ্ধবনিতা খামারবাসী সবাইকে এখানে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'তো। যাঁরা রান্নাঘরে কাজ করতেন না, তাঁদের সকলকে চাষের কাজ ও ফলের গাছগুলি দেখাশোনার কাজ করতে হ'তো। খামারবাসীদের পরিবারগুলি যাতে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে, সেজন্যে ছোটখাটো কারুশিল্পও চালু করা হয়েছিল। কালেন্‌বাখ একটি ক্যাথলিক মিশনারীদের মঠে স্যাণ্ডেল (চটি) তৈরি শিখেছিলেন। ঐ বিদ্যেটা তিনি গান্ধীজীকে শিখিয়ে দিলেন। গান্ধীজী শেখালেন খামারের লোকদের। এইভাবে খামারবাসীরা স্যাণ্ডেল তৈরি ক'রে সেগুলি তাঁদের বন্ধুবান্ধবের কাছে বিক্রি করতে লাগলেন। কালেন্‌বাখ খামারের লোকদের ছুতোরের কাজও শেখালেন। বেঞ্চি থেকে বাক্স পর্যন্ত নানা ধরনের ছোটবড় জিনিস খামারবাসীরা তৈরি করতে লাগলেন। বালকবালিকাদের জন্যে একটি স্কুলও খোলা হ'লো। স্কুলে পড়ানো হ'তো বিকাল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। কারণ, সকালে সবাই কাজে ব্যস্ত থাকতো, তাই পড়বার বা পড়াবার লোক মিলতো না। গান্ধীজী ও কালেন্‌বাখ শিক্ষকের কাজে কয়েকজন যুবককে সাহায্য করতেন। গান্ধীজী ছাত্রছাত্রীদের সকল ধর্মকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে এবং সকল ধর্মাবলম্বীকে ভাইয়ের মতো দেখতে শেখালেন। তিনি এই সকল ছাত্রদের কাছে যা বলতেন, তার ভিত্তিতেই তিনি 'নীতিধর্ম' বা Ethical Religion বইখানি লেখেন। 'নীতিধর্ম' ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গান্ধীজী এখানে বালকবালিকার অবাধ মেলামেশা ও সহশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরে গান্ধীজী অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের ফিনিক্সে রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করেন।

খামারবাসীদের খাদ্য ছিল অত্যন্ত সাধারণ। সকালে ছটায় তাঁরা রুটি ও কফি খেতেন। তারপর বেলা এগারোটায় ডাল-ভাত, শাকসবজি; সন্ধ্যা পাঁচটায় রুটি দুধ বা রুটি কফি। জেলখানার মতো মগে ক'রে খাবার দেওয়া হ'তো। খামারবাসীদের তৈরী কাঠের চামচই ব্যবহৃত হ'তো। পোশাকও ছিল তেমনি সরল ও অনাড়ম্বর। খামারবাসীরা সকলেই ছিলেন শ্রমিক, তাই তাঁরা ইউরোপীয় শ্রমিকদের মতো ট্রাউজার ও শার্ট পরতেন। এগুলির সঙ্গে কয়েদীদের পোশাকের সাদৃশ্য ছিল। পোশাকগুলি মোটা নীল রঙের কাপড় দিয়ে তৈরি হ'তো। খামারবাসী মহিলারাই সেগুলি কেটে সেলাই ক'রে দিতেন। খামারবাসীরা পরস্পরের চুল ছেঁটে দিতেন, দাড়ি কামাতেন। বিছানাও ছিল তদ্রূপ। তক্তাপোষ বা খাটিয়া একটিও ছিল না। সকলে মেঝেতেই শুতেন। প্রত্যেককে দু'খানি কম্বল দেওয়া হ'তো—একখানি পাতবার ও একখানি গায়ে দেওয়ার জন্যে। আর একখানি কাঠের বালিশ।

এখানে সাপ ছিল প্রচুর। গান্ধীজী বিষধর সাপকেও হত্যা করা পাপ ব'লে মনে করতেন। কিভাবে বিষধর ও নির্বিষ সাপ চিনতে হয়, কালেন্‌বাখ তা খামারবাসীদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আল্‌ব্রেখ্‌ট নামে আরও একজন জার্মান ছিলেন খামারে। তিনি সাপ নিয়ে খেলা দেখাতেন। এইভাবে তাঁরা খামারবাসীদের সাপের ভয় ভেঙে দিয়েছিলেন। টলস্টয় খামার থেকে নিকটতম জোহানেস্‌বার্গ শহর প্রায় বিশ মাইল হ'লেও এই খামারে সামান্য একটুকু ঔষধও রাখা হ'তো না। জলচিকিৎসা ও স্বভাব-আরোগ্যের পদ্ধতিতে গান্ধীজীর বিশ্বাস এতোই সুদৃঢ় ছিল যে, তিনি খামার-বাসীদের ঐ পদ্ধতিতে চিকিৎসা ক'রে সারিয়ে তুলতেন। একবার তিনি এক বুড়ো হাঁপানি রোগীকেও ঐ পদ্ধতিতে সারিয়ে তোলেন। তাঁর এই চিকিৎসার সুখ্যাতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। তাই অনেকেই চিকিৎসা করাবার জন্যে তাঁর কাছে আসতো।

খামারবাসীরা নিজেদের কাজে কেউ জোহানেস্‌বার্গে গেলে তাঁকে পায়ে হেঁটেই যেতে হ'তো। তবে খামারের কাজে কেউ গেলে তিনি ট্রেনে থার্ড ক্লাসে যেতে পারতেন। কালেন্‌বাখ নিজেও পায়ে হেঁটে খামার থেকে জোহানেস্‌বার্গ যেতেন। যেতে ছ-সাত ঘণ্টা লাগতো। হাঁটায় খামারবাসীরা সু-অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

সৈনিকদের সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হয়। টলস্টয় খামার ছিল সত্যাগ্রহীদের শিক্ষাশালা। তাঁদের কঠোর জীবনযাত্রার সঙ্গে কারাজীবনের কোনও পার্থক্য ছিল না। ত্যাগ ও দুঃখবরণই যাঁদের অস্ত্র, তাঁদের এর চেয়ে ভালো শিক্ষা-শিবির আর কি হ'তে পারে?

গান্ধীজীও তাঁর আইনব্যবসা ছেড়ে সত্যাগ্রহীদের মনে প্রাণে সত্যাগ্রহের উপযুক্ত সৈনিক ক'রে তুলতে আত্মনিয়োগ করলেন। ঐ সময়ে আইনব্যবসায়ে বছরে তাঁর রোজগার ছিল পাঁচ-ছ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় নব্বুই হাজার টাকা। তাঁর সঞ্চিত যা-কিছু ছিল, তাও তিনি জনহিতকর কাজ ও সত্যাগ্রহীদের জন্যে ব্যয় করেন। এখন নিপীড়িত ভারতীয়দের সঙ্গে দুঃখবরণই তাঁর জীবনের আদর্শ ও ব্রত হয়ে উঠে। টলস্টয় ফার্মে সত্যাগ্রহীদের সংখ্যায় হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। কখনও অনেক সত্যাগ্রহী জেলে চলে যান, আবার কখনও অনেক সত্যাগ্রহী কারামুক্ত হয়ে ফিরে আসেন। সুদীর্ঘ চার বৎসর ধরে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চলছিল। সুতরাং তাতে জোয়ার-ভাঁটা উত্থান-পতন থাকাই ছিল স্বাভাবিক। জেলে যাওয়া-আসা যেন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। ভারতীয়দের পক্ষে যাঁরা ধনী তাঁদের পক্ষে এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের সঙ্গে সমান তালে চলা সব সময় সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহীরা তাঁদের সংগ্রামে অবিচল ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবিদ্বেষী নীতি ভারতে যে

বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল, তা ভারতে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের ফলে নরমপন্থীদের সন্ধি হওয়া সত্ত্বেও প্রশমিত হয় নি। মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের ফলে গোখেল বড়লাটের আইন-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের শোচনীয় অবস্থার কথা পরিষদে তুলে ধরলেন এবং চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক নাটালে পাঠানো বন্ধ করবার জন্যে দাবী তুললেন। বড়লাটের আইন পরিষদে গোখেলের এই দাবী গৃহীত হ'লো এবং ভারত সরকার বৃটিশ সরকারের কাছে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানালেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে বৃটিশ সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে এ বিষয়ে কঠোর বর্ণবিদ্বেষী নীতি ত্যাগ করতে পরামর্শ দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এই পরামর্শ সাময়িকভাবে মেনে নিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২নং আইন বাতিল ক'রে তার পরিবর্তে একটি নূতন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত করলেন। এই নূতন আইন অনুসারে ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ বর্ণবিদ্বেষের ভিত্তিতে নয়, শিক্ষার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করা হবে। গান্ধীজী এই নূতন বিল সম্পর্কে আশান্বিত না হ'লেও তিনি এতে বর্ণবিদ্বেষের নীতি মৌখিকভাবে হ'লেও প্রত্যাহৃত হচ্ছে দেখে কিছুটা সন্তুষ্ট হলেন। জেনারেল স্মাট্‌স্ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের এ বিষয়ে আশ্বস্ত ক'রে জানালেন যে, "এই বিল অনুসারে প্রতি বছর নির্দিষ্টসংখ্যক ভারতীয়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার যে কোনও অঞ্চলে তাদের বসবাস বা যাতায়াত করবার অধিকার সীমাবদ্ধ করবার প্রয়োজন নেই।" উগ্র বর্ণবিদ্বেষীরা কিন্তু জেনারেল স্মাট্‌সের এই ঘোষণায় সন্তুষ্ট হ'লো না। তারা দক্ষিণ আফ্রিকার যে কোন অঞ্চলে যে কোন ভারতীয়ের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করবার দাবী জানালো। কিন্তু বৃটিশ সরকারের

পরামর্শই জেনারেল মেনে চললেন। ইংলণ্ডে এই বছর (১৯১১) জুন মাসে পঞ্চম জর্জের অভিষেক উৎসব হচ্ছিল। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও যাতে এই উৎসব নির্বিঘ্নে হ'তে পারে, সেজন্যে বৃটিশ সরকার উদ্‌গ্রীব ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন বৃটিশ ডোমিনিয়ন, তাই এ বিষয়ে জেনারেল স্মাট্‌সেরও কম উদ্‌বেগ ছিল না। সেজন্যে তিনি ভারতীয়দের সঙ্গে সাময়িকভাবে একটা আপোস-মীমাংসা করলেন। জেনারেল স্মাট্‌স্ রেজিস্ট্রেশন ও বহিরাগত নিরোধক আইন রদ করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১লা জুন তারিখে সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দেওয়া হ'লো। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা তাঁদের তিক্ত সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেছে মনে করলেন। প্রিটোরিয়ার সত্যাগ্রহী একাদশ গোল্ডেন সিটির সত্যাগ্রহী একাদশের বিরুদ্ধে জোহানেস্‌বার্গে ফুটবল ম্যাচ খেললেন। সকলের মনেই খুশির ভাব। ভারতীয়রা পঞ্চম জর্জের অভিষেক-উৎসবেও যোগ দিলেন। তবে তাঁরা সরকারী উৎসবে যোগ দিলেন না, কারণ এই উৎসবে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে তাঁদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয় নি।

যাই হ'ক, অভিষেক-উৎসব শেষ হওয়ার পরে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে একটি নূতন বহিরাগমন নিরোধক বিল আনা হ'লো। এই বিল নানা দিক্ থেকে আগের আইনটির তুলনায় ভালো হ'লেও এতে জেনারেল স্মাট্‌স্ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে পালিত হ'লো না। ভারতীয়রা এতে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। ফলে এই বিলটিকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হ'লো এবং গোখেলের আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকালে একটা সন্তোষজনক মীমাংসাসূত্র পাওয়া যাবে, সকলেই এরকম আশা করলেন। সুতরাং শান্তি অব্যাহত রইলো।

এই সময়ে গান্ধীজী টলস্টয় খামারেই ছিলেন। তিনি ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে ক্রমেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। দক্ষিণ

আফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা সম্মানজনক মীমাংসা হবে এবং তিনি ভারতে ফিরে যাবেন ও ভারতই এখন থেকে তাঁর কর্মস্থল হয়ে উঠবে, এ ধারণা তাঁর ইতিমধ্যেই হয়েছিল। তাই তিনি এই সময়টা গভীরভাবে 'ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বহু বই ও সংবাদপত্র নিয়মিত পড়ছিলেন। একদিন তিনি সংবাদপত্রে কলকাতার গোয়ালাদের ফুকা দিয়ে গোরুর দুধ নিঃশেষে দুয়ে নেওয়ার নিষ্ঠুর পদ্ধতি সম্পর্কে পড়লেন। এই ব্যাপারটি তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করলো। তিনি এ বিষয়ে কালেন্‌বাখের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং এখন থেকে দু'জনেই দুধ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। এই সময়ে তাঁরা কাঁচা চীনাবাদাম, কলা, খেজুর ও পাতিলেবু খেয়ে থাকতেন। এতে তাঁর দৈহিক শক্তি হ্রাস পেয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্যে একদিনে চল্লিশ মাইল হাঁটতেন। একদিন তিনি পঞ্চান্ন মাইলও হেঁটেছিলেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গোখেল দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের এই সংগ্রামে যেসব ভারতীয় নেতা সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন গোখেল। তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা তাঁর স্বচক্ষে দেখবার ইচ্ছা ছিল। এ সম্পর্কে তিনি লণ্ডনে ভারতসচিবকে বললে ভারতসচিব দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে তা জানিয়ে দেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যাতে গোখেলকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দেন সে বিষয়ে নির্দেশ দেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাই গোখেলকে বিপুল সমারোহে সংবর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে এ ঘটনা অভূতপূর্ব। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যে কোনও অশ্বেতাঙ্গ নেতাকে এইভাবে অভ্যর্থনা জানাবে তা কল্পনাতীত। ২২শে অক্টোবর তারিখে গোখেল যখন কেপ টাউনে নামলেন, তখন বিশাল জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই বিপুল অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হ'লো।

শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন কুলী রাজা (the Coolie King)। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সফরকালে গোখেলের ব্যবহারের জন্যে একটি রাষ্ট্রীয় রেল সেলুন ছেড়ে দিলেন। তিনি যেখানেই গেলেন, সর্বত্রই শহরের মেয়ররা তাঁকে জনসভায় অভ্যর্থনা জানালেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সারাক্ষণ তাঁদের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেণ্টের কর্তা মিঃ রান্সিম্যানকে গোখেলের সঙ্গে দিলেন। গান্ধীজী গোখেলের সেক্রেটারি ও সেবকরূপে সর্বদা সঙ্গে রইলেন। গোখেলের প্রতি ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। তিনি যেখানেই গেলেন, শত শত ভারতবাসী অশ্রুসজল চোখে বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। গোখেল দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী প্রিটোরিয়ায় গেলে তিনি সেখানে রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে রইলেন এবং জেনারেল বোথা ও জেনারেল স্মাট্‌স্ সহ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বহু আলাপ-আলোচনা হ'লো। ১৫ই নভেম্বর মন্ত্রীদের সঙ্গে দু'ঘণ্টা আলোচনার পর গোখেল গান্ধীজীকে বললেন, "সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে। ঐ কালা কানুন ওরা রদ করবে। বহিরাগমন নিরোধক আইন থেকে বর্ণবিদ্বেষমূলক অংশ বাদ দেবে। মাথাপিছু তিন পাউণ্ড কর আর দিতে হবে না। তুমি এক বছরের মধ্যেই দেশে ফিরে যেতে পারবে।" কিন্তু গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকগোষ্ঠীকে চিনতেন। তাই তিনি গোখেলকে এতোখানি আশাবাদী হ'তে নিষেধ করলেন। গোখেল নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরলেন।

আরও কয়েক মাস শান্তিতে কাটলো। কিন্তু শীঘ্রই ঝড় উঠলো। এবার ঝড় এলো অন্যদিক থেকে।

বারো

সংগ্রামের শেষ পর্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলি তারা প্রকৃত পালন করবে কিনা এ সংশয় যতোই দিন যাচ্ছিল, ততোই ভারতীয়দের মনে আবার ঘনীভূত হচ্ছিল। এই সময়ে অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা ঘটলো। পোর্ট এলিজাবেথের হাসান ইসপ নামে এক ভারতীয় মুসলমান ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি বাঈ মেরিয়ম নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ভারত থেকে একাই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে এসেছিলেন এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গিয়ে স্ত্রীকে নিজের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় এনেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ইমিগ্রেশন বিভাগের কর্মচারীরা বাঈ মেরিয়মকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নামতে দিতে চাইলো না এবং তাঁকে ভারতে প্রেরণের নির্দেশ দিলো।

এই আদেশের বিরুদ্ধে হাসান ইসপ সুপ্রীম কোর্টে বিচার প্রার্থনা করলে সুপ্রীম কোর্ট সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশই বহাল রাখলো। ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট বা বহিরাগমন নিরোধক আইনে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বিচারপতি বাঈ মেরিয়মকে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা দেন নি। এর তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। যদি ভারতে প্রচলিত বিবাহরীতিকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া না হয়, তবে ভারতীয়দের বিবাহিতা স্ত্রীরা স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার থেকে এবং তাঁদের গর্ভজাত সন্তানরাও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। ফলে সুপ্রীম কোর্টের এই রায় একটি আকস্মিক বিস্ফোরণের মতো ভারতীয়দের চমকে দিলো। গান্ধীজী অবিলম্বে সরকারের কাছে এক পত্র লিখলেন। তাতে তিনি জানতে চাইলেন যে, বিচারপতি সার্লে (Searle) আইনের যে ব্যাখ্যা করেছেন,

তা নির্ভুল কিনা; আর যদি নির্ভুল হয়, তবে সরকার ভারতবর্ষে প্রচলিত বিবাহরীতিগুলি অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহকে স্বীকৃতি দানের জন্যে আইন সংশোধন করবেন কিনা। গান্ধীজীকে সরকার কোনও সদুত্তর দিলো না। গান্ধীজী ২২শে মার্চ তারিখে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকায় এই মামলার বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন। ৩০শে মার্চ তারিখে জোহানেস্‌বার্গে হামিদিয়া ইসলামিক সোসাইটিজ্‌ হলে এক জনসভায় বাঈ মেরিয়মের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়ের তীব্র নিন্দা ক'রে গান্ধীজী বললেন, "এখন তার নারীজাতির সম্মান ও নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ভারতীয় সম্প্রদায়ের কর্তব্য হ'লো সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করা।"

সরকার কিন্তু গান্ধীজীর এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করলো না। পুনরায় সংগ্রামই যে তাদের অভিপ্রেত, এইভাবেই সরকার অতিরিক্ত গেজেটে ১২ এপ্রিল তারিখে একটি নূতন বহিরাগমন নিরোধক বিল (Immigration Bill) প্রকাশ করলো। বিলটি প'ড়ে গান্ধীজী হতাশ হলেন। তিনি বললেন, "এই বিল আগের বিলটির চেয়েও খারাপ; প্রকৃতপক্ষে এতে সাময়িক আপোসের শর্তাবলীর কোনটিকেই কার্যকর করা হয় নি। সরকার যদি এই বিল সংশোধন না করে, তবে পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করতে হবে।" মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ট্রান্সভাল ভারতীয় নারীসংঘ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে লিখিত একটি পত্রে জানালেন, বিচারপতি সার্লের রায় যেভাবে তাঁদের সম্মানহানি করেছে, তা স্বীকার ক'রে নেওয়ার চেয়ে তাঁরা বরং পুরুষদের সঙ্গে সত্যাগ্রহ করবেন এবং কারাগারে দুঃখ সহ্য করবেন। জুন মাসে ইমিগ্র্যাণ্ট্‌স্ রেগুলেশন বিল (বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ বিল) পাস হ'য়ে গেলো। গান্ধীজী তবু হতাশ হলেন না। তিনি এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ চালাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো। তিনি পুনরায় সত্যাগ্রহের পথ নেওয়াই অনিবার্য মনে করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা

সরকারের নির্লজ্জ অঙ্গীকারভঙ্গ এবং তাঁর সত্যাগ্রহ পুনরারম্ভের সংকল্পের কথা তিনি ভারতে গোখেলকে জানালে গোখেল তাঁকে পত্রে জিজ্ঞাসা করলেন, যারা এই অভিযান চালাবে সেই "শান্তি-সৈন্যদের" সংখ্যা কতো। গান্ধীজী জানালেন, খুব কমপক্ষে ষোল, এবং খুব বেশী হ'লে ছেষট্টি। গান্ধীজীর জবাবে গোখেল না হেসে পারলেন না। সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর কাছে কৌতুককর মনে হ'লো। এই মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম কি সম্ভব? কিন্তু গান্ধীজীর রণকৌশল সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। কেই বা জানতো?

গত দু'বারের সংগ্রামে ভারতীয় সম্প্রদায় যে ভয়ংকর দুঃখভোগ করেছিল, তার কথা তারা ভোলেনি। কেবল দুঃখভোগ নয়, ধনী ভারতীয়দের আর্থিক ক্ষতিও হয়েছিল প্রচুর। তাই এবার যে সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে এমন মনে হচ্ছিল না। কিন্তু তা গান্ধীজীকে হতোদ্যম করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তিনি কখনো সংখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহীর সংগ্রামই যে শেষ পর্যন্ত তাদের বিজয়ী করবে, এমন স্থির বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাই অতি অল্পসংখ্যক সত্যাগ্রহী নিয়েই তিনি সংগ্রামের সূচনা করবেন স্থির করলেন।

বিবাহ সম্পর্কে আইনের ব্যাখ্যা শুনে কস্তুরবাঈ খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি বললেন, "তবে এ দেশের আইনে আমি তোমার স্ত্রী নই?" গান্ধীজী বললেন, "ঠিক তাই। কেবল তাই নয়, আমাদের ছেলেমেয়েরাও আমাদের ছেলেমেয়ে নয়।" কস্তুরবাঈ বললেন, "তবে আমরা ভারতে ফিরে যাই চল।" গান্ধীজী বললেন, "সেটা হবে কাপুরুষতা। তাছাড়া তাতে তো সমস্যা মিটবে না।" কস্তুরবাঈ বললেন, "তবে আমিও সত্যাগ্রহ করব, জেলে যাব।" গান্ধীজী বললেন, "যেতে পার। কিন্তু জিনিসটা সহজ নয়। তোমার শরীর খারাপ। তুমি যদি এই দুঃখকষ্ট শেষ

পর্যন্ত সইতে না পার? সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে পালিয়ে আসা লজ্জাজনক হবে।" কস্তুরবাঈ ভয় পেলেন না। ফিনিক্সের অন্যান্য মেয়েরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন।

ফিনিক্স থেকে কস্তুরবাঈসহ ষোলজন সত্যাগ্রহী ১৫ই সেপ্টেম্বর ট্রেনে ক'রে ডারবান থেকে ভোক্স্রাস্ট্ যাত্রা করলেন। তাঁরা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সকলে অত্যাবশ্যক দু-একটি জিনিস ছাড়া কিছুই নিলেন না। সত্যাগ্রহীদের নাম প্রকাশ করা হ'লো না। স্টেশনে সকল শ্রেণীর প্রায় একশ' ভারতীয় এসে সত্যাগ্রহীদের বিদায়-সংবর্ধনা জানালেন। সত্যাগ্রহীরা ভোক্স্রাস্ট্ পৌঁছলে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মচারীরা তাঁদের বাধা দিলো। সত্যাগ্রহীরা কেউ তাঁদের নাম বা পরিচয় প্রকাশ করলেন না। তাঁদের মধ্যে থেকে একজন মুখপাত্র হয়ে কর্মচারীদের সবিনয়ে বললেন যে, কর্মচারীদের কোনরকম অসুবিধায় ফেলতে তাঁদের ইচ্ছা না থাকলেও তাঁরা কেউ এখন তাঁদের পুরো নাম বা পরিচয় প্রকাশ করবেন না। পরদিন তাঁকে অনুরোধ করা হ'লে তিনি কেবল জানালেন যে, তাঁরা বারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা নাটাল থেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করছেন, তাঁরা সত্যাগ্রহী। বর্তমান আইনের বিরুদ্ধেই তাঁদের সত্যাগ্রহ। তাই তাঁদের কাছে আইনসঙ্গত পরিচয়পত্রাদি কিছুই নেই। ভোক্স্রাস্ট্ থানায় এতোগুলি সত্যাগ্রহীকে স্থান দেওয়ার সুযোগ-সুবিধা না থাকায়, কর্মচারীরা সত্যাগ্রহীদের আপাততঃ তাঁদের বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বললেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁদের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশকারী ব'লে অভিযোগ আনা হ'লো। ২২শে সেপ্টেম্বর তাঁদের সকলকে নাটাল সীমান্তে বহিষ্কৃত ক'রে দেওয়া হ'লো। একটি অগভীর নদীর মাঝামাঝি দিয়েই সীমান্তরেখা গিয়েছিল। তাই সত্যাগ্রহীদের নদীর ওপারের দিকে ঠেলে দেওয়া হ'লো। সত্যাগ্রহীরা আবার নদী পার হয়ে ট্রান্সভালে ঢুকলেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে

গ্রেপ্তার করা হ'লো এবং তাঁদের দশজনের তিন মাস ও চারজন স্ত্রীলোকসহ বাকী ছ'জনের এক মাস ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো।

সত্যাগ্রহীদের জেলে পাঠানো হ'লে গান্ধীজী সত্যাগ্রহীদের নাম প্রকাশ করলেন। মহিলারা এই প্রথম সত্যাগ্রহী রূপে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কস্তুরবাঈও ছিলেন। তাঁরা সত্যাগ্রহে কতখানি সাহস ও শক্তির পরিচয় দেবেন, গান্ধীজী সে বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন না। যদি তাঁরা ভয় পেয়ে পেছিয়ে আসেন, তাতে আন্দোলনের ক্ষতি হবে ভেবেই গান্ধাজী তাঁদের নাম গোপন রেখেছিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী ডারবান থেকে ট্রান্সভাল যাত্রা করলেন। তাঁদের চারজন সহযাত্রীকে ভোক্‌স্‌রাস্টে গ্রেপ্তার করা হ'লো কিন্তু তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো না। ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি জোহানেস্‌বার্গে পৌঁছে একটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর বহু সুপরিচিত সত্যাগ্রহী, তাঁদের মধ্যে গান্ধীজীর সেজো ছেলে মণিলালও ছিলেন, মাথায় মোট নিয়ে ভোর থেকে ফেরি করতে বেরুলেন। প্রথম দিন কাউকে গ্রেপ্তার করা হ'লো না। কিন্তু পরদিন তাঁদের গ্রেপ্তার ক'রে সাত দিনের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'লো। কস্তুরবাঈসহ ফিনিক্সের কয়েকজন মহিলা সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ায় অন্যান্য বহু মহিলাও এখন সত্যাগ্রহে যোগ দিতে চাইলেন। ইংলণ্ডে ভোটাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকায় তিনি সত্যাগ্রহী রূপে মহিলাদের উপযুক্ততার কথা চিন্তা করছিলেন। ফিনিক্সের মহিলারা তাঁর ধারণা সুপ্রমাণিত করায় তিনি মেয়েদেরও সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানালেন। টলস্টয় খামার থেকে মহিলারা সত্যাগ্রহে যোগ দিতে এলেন। তাঁদের একজন ছিলেন গর্ভবতী ও ছ'জন ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশুর জননী। একজন ছাড়া তাঁদের সকলেই ছিলেন তামিলভাষী দক্ষিণ ভারতের মেয়ে।

এই সময়ে নাটাল থেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ যেমন ভারতীয়দের

পক্ষে বেআইনী ছিল, তেমনি ট্রান্সভাল থেকে নাটালে প্রবেশও ছিল বেআইনী। ট্রান্সভালে অবস্থিত টলস্টয় খামার থেকে তাই মহিলা সত্যাগ্রহীরা নাটালে প্রবেশ করবেন, স্থির হ'লো। নাটালে প্রবেশ করলে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ভালোই। নইলে তাঁরা নাটালের খনি অঞ্চল নিউ ক্যাসলে চলে যাবেন এবং খনিতে কর্মরত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করতে বলবেন। কয়লা খনির চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল মাদ্রাজের লোক। তাদের মাতৃভাষা ছিল তামিল ও তেলেগু। তাই তাদের সঙ্গে আলাপ করতে মহিলা সত্যাগ্রহীদের কোন অসুবিধা ছিল না। মহিলা সত্যাগ্রহীরা এই কর্মসূচী অনুসারে নাটালে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁদের গ্রেপ্তার করা হ'লো না। তাঁরা নিউ ক্যাসলে গিয়ে পৌঁছলেন। চুক্তিবদ্ধ খনি শ্রমিকদের কাছে তাঁদের আবেদন মন্ত্রের মতো কাজ করলো। কয়লা খনির প্রায় তিন হাজার শ্রমিক ১৭ই অক্টোবর তারিখে ধর্মঘট করলেন। এখন আর সরকার নিষ্ক্রিয় থাকতে পারলো না। তারা অবিলম্বে মহিলা সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করলো। বিচারে তাঁদের তিন মাসের কারাদণ্ড হ'লো। তাঁদের ফিনিক্স থেকে আগত দণ্ডিত সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে মারিৎস্‌বার্গে একই কারাগারে রাখা হ'লো। কারাগারে নিগ্রহ কম হ'লো না। তাঁদের কঠোর পরিশ্রম করানো হ'লো। জেলে ধোপার কাজ তাঁদেরই করতে হ'তো। খাদ্যও দেওয়া হ'তো খাওয়ার অযোগ্য। বাইরে থেকে খাবার পাঠানো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁরা সবই হাসিমুখে প্রকৃত সত্যাগ্রহীর মতো সহ্য করলেন। তাঁদের এই দুঃখবরণের কাহিনী নিউ ক্যাসলে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে দলে দলে শহরে আসতে লাগলো। ফিনিক্সে গান্ধীজী এই সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি নিউ ক্যাসলে গিয়ে পৌঁছলেন। কারণ, কর্মহীন কয়েক হাজার শ্রমিককে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখা সহজ ছিল না। গান্ধীজী এসে

শ্রমিকদের কাছে নানা অভিযোগ শুনলেন। শ্রমিকরা সকলেই যেসব বস্তিতে থাকতেন সেগুলির মালিক ছিল খনির মালিকরা। শ্রমিকরা ধর্মঘট করায় মালিকরা তাদের আলো ও জল বন্ধ ক'রে দিয়েছে এবং তাদের জিনিসপত্র টেনে ঘরের বাইরে ফেলে দিয়েছে। অনেককে তারা বেদম প্রহার করেছে।

এতোগুলি কর্মহীন শ্রমিককে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখাই নয়, তাদের ও তাদের পরিবারের জন্যে যৎসামান্য খাদ্যের ব্যবস্থা করাও একটি ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। এখানকার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে খনির মালিকদের কাজ-কারবার ও লেন-দেন ছিল। তাই তাঁরাও প্রকাশ্যে সত্যাগ্রহীদের সাহায্য করতে সাহস পেলেন না। গান্ধীজী এবার ভারতীয় কোনও ব্যবসায়ীর বাড়িতেও উঠলেন না। তিনি একজন মধ্যবিত্ত মাদ্রাজী খ্রীষ্টান মিঃ ডি. এম. লাজারাসের বাড়িতে উঠলেন। লাজারাসের সামান্য কিছু জমিজমা ও দু-তিন কামরার ছোট একটি বাড়ি ছিল। তিনিও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক পরিবারের লোক। তাই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অসাধারণ। তিনি কেবল গান্ধীজীকে আশ্রয় দিলেন না, কর্মচ্যুত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের জন্য তাঁর বাড়িটি ছেড়ে দিলেন। তাঁর বাড়িটি রাতারাতি হোটেলখানা হয়ে উঠলো। এতগুলি মানুষের মুখে অন্ন যোগাতে উনুনের আগুন দিনরাত আর নিবলো না।

গান্ধীজী শ্রমিকদের বললেন, তাদের এই ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হবে, সুতরাং তারা যেন তাদের সঙ্গে নেওয়ার মতো জিনিসপত্র নিয়ে তাদের বাসা ছেড়ে চলে আসে। বিক্রি করবার মতো কিছু থাকলে খদ্দের জুটলে তাও বিক্রি ক'রে দিতে তিনি পরামর্শ দিলেন। বাকী জিনিস বাসাতেই ফেলে আসতে বললেন। তাদের কেবল কম্বল ও পরবার পোশাক নিয়েই তাঁর সঙ্গে চলে আসতে হবে। কোনরকম হিংসাত্মক কাজ, শাসানি প্রভৃতির

প্রশ্রয় কেউ দিতে পাবে না। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহের নীতি অনুসারে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এতে যদি তারা রাজী থাকে, তবে তিনি তাদের নেতৃত্ব দেবেন। শ্রমিকরা গান্ধীজীর কথায় সম্মত হ'লো এবং গান্ধীভাইয়ের উপর অগাধ বিশ্বাস্ নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো।

নিউ ক্যাসলে ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর কয়েকদিন কেটে গেল, কিন্তু সরকার কোনরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করলো না। সম্ভবত এই কয়েক হাজার নিঃস্ব নিরুপায় মানুষের ক্ষুধার সুযোগ নিতে চাইলো। গান্ধীজী স্থির করলেন, এদের তিনি সত্যাগ্রহীরূপে ট্রান্সভালে নিয়ে যাবেন। সেখানে সরকার তাদের গ্রেপ্তার ক'রে জেলে স্থান দেয় ভালোই। নইলে তিনি তাদের টলস্টয় খামারে থাকবার ব্যবস্থা করবেন। কালেন্‌বাখ এইসব লোকের সাহায্যেই এদের বাসের উপযুক্ত কুঁড়ে কিছু তৈরি ক'রে ফেলতে পারবেন ব'লে ভরসা দিলেন। শ্রমিকরা সংখ্যায় ছিল প্রায় তিন হাজার। রোজই নূতন নূতন শ্রমিকের দল এসে পৌঁছতে লাগলো। এইভাবে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের লোকজনের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ছ হাজার। গান্ধীজী যখন শ্রমিকদের ট্রান্সভালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন, তখন খনির মালিকরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। গান্ধীজী তাই তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ডারবানে গেলেন। গান্ধীজী যাতে শ্রমিকদের খনিতে ফিরে যেতে বলেন, সেজন্যে মালিকরা তাঁকে অনুরোধ করলেন। গান্ধীজী তাতে রাজী হলেন না। তিনি শ্রমিকদের হয়ে মালিকদের সরকারকে মাথাপিছু তিন পাউণ্ড ট্যাক্সের আইন রদ করতে চাপ দিতে বললেন। মালিকরা তাতে রাজী হলেন না। গান্ধীজী আবার নিউ ক্যাসলে ফিরে এলেন। তিনি শ্রমিকদের তাঁর পরিকল্পনার কথা বললেন। শ্রমিকরা ধর্মঘট ক'রে যে বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে, তাও তিনি তাদের বুঝিয়ে বললেন। তারা যদি এইসব বিপদ্ ও দুঃখকষ্ট স্বীকার করতে রাজী হয়, তবেই

তারা তাঁর সঙ্গে আসতে পারে। শ্রমিকরা একবাক্যে জানালো, তারা খনিতে ফিরে যাবে না, গান্ধীভাই তাদের যেখানে নিয়ে যাবেন, তাতে যতো দুঃখকষ্ট হ'ক তারা সেখানেই যাবে। দুঃখকষ্টের ভয় তারা করে না। দুঃখকষ্টে তারা সারা জীবন অভ্যস্তই আছে।

গান্ধীজী জানালেন নিউ ক্যাসেল থেকে ট্রান্সভাল দীর্ঘ পথ। এই সমস্ত পথ তাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে। তারা রোজ মাথা-পিছু দেড় পাউণ্ড রুটি ও এক আউন্স চিনি খাওয়ার জন্যে পাবে। তারা পরনের কাপড় ছাড়া কিছুই সঙ্গে নিতে পাবে না। পথে তারা শান্তিপূর্ণ থাকবে। কারও কোনও জিনিসে হাত দেবে না। সরকার তাদের গ্রেপ্তার করলে হাসিমুখে গ্রেপ্তার বরণ করবে। তাদের প্রহার করলে তা-ও হাসিমুখে সইতে হবে। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলে পর পর কারা শ্রমিকদের নেতৃত্ব করবেন, তা-ও তিনি শ্রমিকদের জানিয়ে দিলেন। শ্রমিকরা পরম উৎসাহে রাজী হয়ে গেল। ২৮শে অক্টোবর (১৯১৩) এই বিশাল জনতা গান্ধীজীর নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলভাবে যাত্রা শুরু করলো এবং নিরাপদে নিউ ক্যাসল থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র শহর চার্লস্‌টাউনে এসে পৌঁছলো। এখানে বিভিন্ন ভারতীয় পরিবারে স্ত্রীলোক ও শিশুদের কোনক্রমে থাকবার ব্যবস্থা হ'লেও পুরুষদের খোলা মাঠে ক্যাম্প ক'রে থাকতে হ'লো। নিউ ক্যাসল থেকে আরও শ্রমিক ও স্ত্রীলোকরা এসে পৌঁছতে লাগলো। দু'টি মেয়ে চার্লসটাউনে এসে পৌঁছলো, তাদের দু'টি শিশু পথে মারা গেছে। একটি শিশু মারা গেছে সর্দিগর্মিতে, আর একটি শিশু মারা গেছে মায়ের কোল থেকে নদীতে পড়ে। তবু মেয়ে দু'টি হতোদ্যম হয় নি; তাদের একজন আর জনকে বলেছে: "যে চলে গেছে, সে তো আর শত কাঁদলেও ফিরে আসবে না। যারা বেঁচে আছে তাদের জন্যেই আমাদের কাজ করতে হবে।" এইসব নরনারীর এমনই ছিল মনের জোর।

চার্লসটাউন থেকে গান্ধীজী সরকারকে তার ক'রে জানালেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে এই অভিযাত্রীদের চার্লসটাউনেই গ্রেপ্তার করতে পারেন। তিনি এ-ও জানালেন যে, সরকার যদি মাথাপিছু তিন পাউণ্ড ট্যাক্স দেওয়ার আইন রদ করেন, তবে শ্রমিকরা কাজে ফিরে যাবে, তিনি অন্যান্য দাবীর সঙ্গে শ্রমিকদের জড়াতে চান না। কিন্তু সরকার নীরব রইলো। এক সপ্তাহ কেটে গেল। গান্ধীজী এবার তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে মনঃস্থ করলেন। এই বিশাল বাহিনীকে সরকার গ্রেপ্তার করবে না, এ ধারণা তাঁর ছিল। তাই এদের তিনি টলস্টয় খামারে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই প্রস্তুত হলেন। এখান থেকে টলস্টয় খামার প্রায় ছু শ' মাইল পথ। রোজ বিশ-পঁচিশ মাইল হাঁটলেও আট দিন লাগবে। এই দীর্ঘ পথ অভিযানের জন্যে তিনি সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ করলেন। গোখেল তাঁকে ভারত থেকে মাসে ছু'হাজার পাউণ্ড (প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা) ক'রে ছ'মাস টাকা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গান্ধীজী তাই তাঁর এই বিশাল বাহিনীর জন্যে রোজ ২৫০ পাউণ্ড (সাড়ে তিন হাজার টাকার চেয়েও বেশী) খরচ করবেন স্থির করলেন। একজন ইউরোপীয় রুটিওয়ালা তাঁকে রুটি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলো। রেল কর্মচারীরা সহযোগিতা করায় সরবরাহের অসুবিধা হ'লো না।

অভিযান শুরু করবার প্রাক্কালে গান্ধীজী আবার একবার জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে চার্লস্‌টাউন থেকে প্রিটোরিয়ায় টেলিফোন করলেন। তার জবাবে জেনারেল স্মাট্‌সের সেক্রেটারি গান্ধীজীকে জানালেন যে, জেনারেল স্মাট্‌স্‌ এ বিষয়ে গান্ধীর সঙ্গে কোনও আলাপ করতে চান না। গান্ধী যা ইচ্ছা করতে পারেন।

৬ই নভেম্বর ভোর সাড়ে ছটায় সত্যাগ্রহী বাহিনী রওনার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। এই বাহিনীতে ২০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন স্ত্রীলোক ও ৫৭ জন শিশু ছিল। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে খনি ও আখের

বাগিচার শ্রমিকরা ছিল। সত্যাগ্রহীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে যাত্রা শুরু করলো।

চার্লসটাউন থেকে এক মাইল দূরে নাটাল থেকে ট্রান্সভালকে বিচ্ছিন্ন ক'রে একটি ক্ষুদ্র জলধারা ছিল। এখানে অশ্বারোহী পুলিস পাহারায় নিযুক্ত ছিল। গান্ধীজী পুলিশের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। গান্ধীজী সত্যাগ্রহীদের তাঁর নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা অত্যুৎসাহে জয়ধ্বনি দিতে দিতে স্রোতোধারা পার হয়ে ট্রান্সভালে প্রবেশ করলে পুলিস তাদের ঘিরে ধরলো। কিন্তু এই বিশাল জনতাকে ঠেকানো সহজ ছিল না। তাদের গ্রেপ্তার করবারও ইচ্ছা ছিল না পুলিসের। গান্ধীজী এসে জনতাকে শান্ত করলেন এবং তাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার সত্যাগ্রহী বাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে ট্রান্সভালের মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করলো। তিন মাইল দীর্ঘ শীর্ণদেহ অবসন্নপদ ক্ষুধিত ও উলঙ্গপ্রায় শত শত মানুষের এই নিস্তব্ধ মিছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করলো। ভোক্‌স্‌রাস্ট্‌ শহরের পথগুলি অতিক্রম ক'রে মিছিল এগিয়ে চললো। যেসব ইউরোপীয় দু'দিন আগেও মারপিটের ভয় দেখাচ্ছিল, তারাও এই শান্তিপূর্ণ মিছিল দেখে স্তব্ধ হয়ে রইলো। ভোক্‌স্‌রাস্ট্‌ থেকে প্রায় আট মাইল দূরে পামফোর্ডে মিছিল রাত্রিযাপনের জন্যে থামলো। মিছিল এখানে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছেছিল। সত্যাগ্রহীরা নিজেদের বরাদ্দ যৎসামান্য খাদ্য নিয়ে বিশ্রাম করতে গেল। কেউ ভজন গাইতে লাগলো, কেউ গল্প-গুজব করতে লাগলো, কেউ বা অবসন্ন দেহ মাটিতে এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। রাত্রি ক্রমেই বাড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে চারিদিক নীরব হয়ে এলো। গান্ধীজীও বিশ্রামের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

এই সময় একজন ইউরোপীয়ান একটি লণ্ঠন হাতে এসে

পৌঁছলো। গান্ধীজীকে লোকটি তাঁর গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট দেখালে গান্ধীজী গ্রেপ্তার বরণ করলেন এবং তাঁর সহকর্মী নাইডুকে সমস্ত বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, পরদিন ভোরেই আবার যাত্রা শুরু হবে; সত্যাগ্রহীরা যখন পথে তাদের বরাদ্দ খাবার নেওয়ার ও বিশ্রাম করবার জন্যে থামবে, তখনই তাদের তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ জানান হবে। সত্যাগ্রহীদের যদি গ্রেপ্তার করা হয়, তবে তারা গ্রেপ্তার বরণ করবে। যদি গ্রেপ্তার করা না হয়, তবে তারা এগিয়ে চলবে।

গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার ক'রে ভোক্‌স্‌রাস্টে নিয়ে গিয়ে পরদিন সকালে আদালতে হাজির করা হ'লো। আদালত তাঁকে ব্যক্তিগত জামিনে ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত খালাস দিলে তিনি মোটরে ক'রে ফিরে এসে পুনরায় সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সত্যাগ্রহীরা স্ট্যাণ্ডারটনে পৌঁছলে ভারতীয় দোকানদাররা তাদের কিছু খাবার উপহার দিলো। ঐ খাবার যখন বিতরণ করা হচ্ছিল, তখন ম্যাজিস্ট্রেট এসে গান্ধীজীকে আবার গ্রেপ্তার করলেন। গান্ধীজী সত্যাগ্রহীদের অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে চলে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীজীকে আদালতে হাজির করলে তিনি সেখানে দেখলেন যে, নাইডু প্রভৃতি তাঁর পাঁচজন সহকর্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গান্ধীজীকে এই আদালত ব্যক্তিগত জামিনে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত খালাস দিলো। গান্ধীজী একটি গাড়িতে ক'রে দ্রুত গিয়ে আবার সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সত্যাগ্রহীরা জোহানেস্‌বার্গের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন। পরদিন গান্ধীজী ও মিঃ পোলক শোভাযাত্রীদের পুরোভাগে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ট্রান্সভালের বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কর্মচারী মিঃ চ্যাম্‌নি এসে পৌঁছলেন এবং গান্ধীজীকে নিভৃতে ডেকে বললেন, তিনি গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। গান্ধীজী মিঃ পোলকের ওপর সত্যাগ্রহীদের পরিচালনার ভার দিয়ে গ্রেপ্তার

বরণ করলেন। এইভাবে তিনি চারদিনে তিনবার গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে হাইডেলবার্গে নিয়ে যাওয়া হ'লো। সত্যাগ্রহীরা রাত্রিযাপনের জন্যে গ্রেলিংস্‌স্টাডে থামলেন। এখানে সংবাদ এলো যে, সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেছে। পরদিন, ১০ই নভেম্বর, সকাল ন'টায় সত্যাগ্রহীরা ব্যালফোরে গিয়ে পৌঁছলেন। এখানে এসে তাঁরা দেখলেন, তাঁদের নাটালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনটি বিশেষ ট্রেন অপেক্ষা করছে। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা ট্রেনে উঠতে চাইলেন না। তাঁরা গান্ধীভাই না বললে নাটালে ফিরবেন না। শেষ পর্যন্ত পোলক ও অন্যান্য কয়েকজন নেতা তাঁদের বুঝিয়ে ট্রেনে চড়তে রাজী করালেন। সত্যাগ্রহীরা নাটালে পৌঁছলে আদালতে তাঁদের অভিযুক্ত করা হ'লো এবং তাঁদের সকলেই সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পোলক ও কালেন্‌বাখকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁরা ভোক্‌স্‌রাস্ট্‌ জেলে আটক রইলেন।

এসব ঘটনা সম্পর্কে গান্ধীজী কিছুই জানতেন না। তিনি আবার জামিন চাইলেন, কিন্তু এবার তাঁকে জামিন দেওয়া হ'লো না। ১১ই নভেম্বর ডাণ্ডির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তাঁর বিচার হ'লো। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শকদের ভীড়ে আদালত ভরে গিয়েছিল। একজন ইউরোপীয় অ্যাডভোকেট গড্‌ফ্রে গান্ধীজীর পক্ষ সমর্থন করলেও গান্ধীজী সমস্ত অভিযোগ স্বীকার ক'রে নেওয়ায় তাঁর বলবার আর কিছুই রইলো না। বিচারে গান্ধীজীর ৬০ পাউণ্ড জরিমানা ও অনাদায়ে ন'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। গান্ধীজী কারাদণ্ডই গ্রহণ করলেন।

গান্ধীজীর কারাদণ্ডের সংবাদ বিদ্যুদ্‌গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নাটালে দু'হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করলো। গান্ধীজীর কারাদণ্ড ও শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংবাদ যতোই ছড়িয়ে পড়লো, ধর্মঘটও ততোই বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করলো। সরকারও

এখন কঠোর দমননীতির আশ্রয় নিলো। অশ্বারোহী পুলিসরা শ্রমিকদের প্রহার করতে লাগলো, নানাভাবে নির্যাতন চালালো। তবু শ্রমিকদের মনোবল ভাঙা সম্ভব হ'লো না। সরকার গুলী চালালো। গুলীতে কয়েকজন নিহত হ'লেও শ্রমিকরা নির্ভীকভাবে বুলেটের সামনে বুক পেতে দাঁড়ালো। শ্রমিকদের এই বীরত্ব বহু ইউরোপীয়েরও প্রশংসা ও সহানুভূতি পেলো। দক্ষিণ আফ্রিকার সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি শ্রমিকদের উপর এই বর্বর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করলো এবং মাথা পিছু তিন পাউণ্ড কর বিলোপের দাবীতে শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ও আন্দোলনকে সমর্থন জানালো।

গান্ধীজীকে ভোক্‌স্‌রাস্ট্‌ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। স্মরণ থাকতে পারে, গান্ধীজী চারদিনে পর পর তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি মামলা হয়েছিল। একটির মাত্র বিচার হয়েছিল, এবং সেজন্য তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এখন ১৪ই নভেম্বর তাঁর দ্বিতীয় মামলার বিচার হ'লো। সাক্ষীর অভাবে বিচারে বিলম্ব হয় দেখে গান্ধীজী নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন। জেলে কালেন্‌বাখ ও পোলক আটক ছিলেন। তাঁদেরও বিচার হ'লো। তাঁদের ক্ষেত্রেও সাক্ষীর অভাব ঘটলো। তাড়াতাড়ি যাতে বিচার হয়ে যায়, সেজন্যে গান্ধীজীই কালেন্‌বাখ ও পোলকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন। বিচারে গান্ধী, কালেন্‌বাখ ও পোলকের প্রত্যেকের তিন মাস ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। তাঁরা কয়েকদিন একত্রই ছিলেন, কিন্তু সরকার তাঁদের পৃথকভাবে রাখাই সমীচীন মনে করলো এবং গান্ধীজীকে ব্লোমফোণ্টেনে স্থানান্তরিত করলো। ব্লোম-ফোণ্টেনে তাঁকে ইউরোপীয় ও নিগ্রো অপরাধীদের সঙ্গে রাখা হ'লো।

গান্ধীজী, তাঁর সহকর্মীরা ও শত শত শ্রমিক ও সত্যাগ্রহী জেলে

পচতে লাগলেন। সরকার কঠোর দমননীতি চালাতে লাগলো। বন্দী শ্রমিকদের জোর ক'রে খনিতে নিয়ে কাজ করাতে চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হ'লো। ভারতীয়দের উপর এই অত্যাচার ও অবিচারের কাহিনী ভারতে যতোই পৌঁছতে লাগলো, ততোই সেখানে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণার সঞ্চার হ'লো। গোখেল এ নিয়ে বড়লাটের আইন পরিষদে ও পরিষদের বাইরে তুমুল আন্দোলন শুরু করলেন। ঐ সময়ে ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড হার্ডিং। তিনি ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন ক'রে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নিন্দা ক'রে তাঁর মতামত প্রকাশ করলেন। ইংলণ্ডেও ভারতীয়দের সমর্থনে জনমত গঠিত হ'তে লাগলো। 'দি টাইমস্' পত্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতায়দের এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা ব'লে বর্ণনা করলো। ভারতসচিবও আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারলেন না। এই অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার নিজেদের মুখরক্ষার জন্যে শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণ সম্পর্কে তদন্তের উদ্দেশ্যে বিচারপতি স্যার ডাব্লিউ. সলোমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করলো। তারা ভারত সরকারকেও ভারতের পক্ষে কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো এবং গান্ধীজীকে কারামুক্ত ক'রে দিলো।

১৮ই ডিসেম্বর গান্ধীজী মুক্তি পেলেন। এই কমিশনে কোনও ভারতীয়কে না নেওয়ায় তিনি ভারতীয়দের এই কমিশন বর্জন করতে বললেন। শ্রমিকদের উপর গুলীচালনায় গান্ধীজী অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি এজন্যে মাথাপিছু তিন পাউণ্ড কর রহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনটি কঠোর ব্রতপালনের শপথ নিলেন— তিনি শ্রমিকদের মতো পোশাক—একটি খাটো কাপড় ও কোর্তা পরবেন, খালি পায়ে থাকবেন এবং একবেলা মাত্র আহার করবেন। আত্মীয়ের মৃত্যুতে হিন্দুরা যে শোক ও অশৌচ পালন করেন, এ ছিল প্রকৃতপক্ষে তাই। ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

করাচী অধিবেশনে গান্ধীজী ও সত্যাগ্রহীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রশংসা করলো এবং জাতিধর্মশ্রেণী-নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহীদের জন্যে মুক্তহস্তে দান করতে আহ্বান জানালো। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে একটি পত্রে অভিনন্দন জানালেন। গোখেলের চেষ্টায় সত্যাগ্রহীদের জন্যে ভারত থেকে অর্থসাহায্য আসতে লাগলো। গোণ্ডলের ঠাকুরসাহেব ও রানীসাহেবা, নিজাম, গায়কোয়াড় প্রভৃতি দেশীয় রাজারা মুক্তহস্তে দান করলেন। ইংলণ্ডের লেবার পার্টির নেতা ও পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এবং ভ্যালেন্টিন চিরলের মতো বিখ্যাত ইংরেজরাও সত্যাগ্রহীদের সহানুভূতি জানিয়ে অর্থসাহায্য পাঠালেন।

এই সময়ে হঠাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয় রেলকর্মচারীরা ধর্মঘট করলো। ফলে সরকার অত্যন্ত অসুবিধায় পড়লো। গান্ধীজী জানুয়ারির গোড়াতে আবার নূতন ক'রে যে সত্যাগ্রহ আরম্ভের পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তিনি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখলেন এবং ইউরোপীয় রেলকর্মচারীদের ধর্মঘটের সঙ্গে নিজেদের সংগ্রামকে জড়িত করতে চাইলেন না। গান্ধীজী এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে জেনারেল স্মাট্স্ স্বীকার করলেন যে, তিনি গান্ধীজীর এই "স্বনিয়োজিত সৌজন্যে ও বীরপণায়" মুগ্ধ হয়েছেন। জেনারেল স্মাট্স্ গান্ধীজীর সঙ্গে ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ করেছিলেন। জেনারেল স্মাট্সের সেক্রেটারী গান্ধীজীকে পরিহাসচ্ছলে বললেন, "ভারতীয়দের আমি পছন্দ করি না, তাদের সাহায্য করতেও আমার আদৌ ইচ্ছা নেই। কিন্তু কি করি বলুন? আপনি আমাদের দুর্দিনে সাহায্য করেন। আপনাদের গায়ে কিভাবে আমরা হাত তুলি? আমার অনেক সময় মনে হয়, আপনি যদি ইউরোপীয় ধর্মঘটীদের মতো হিংসার আশ্রয় নিতেন, তবে আপনাদের কিভাবে শায়েস্তা করা যায়, তা দেখতাম।"

রেলকর্মচারীদের ধর্মঘট কঠিন আকার ধারণ করেছিল। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় সামরিক আইন জারী করতে হয়েছিল। জেনারেল

স্মাট্‌স্‌ এই ধর্মঘট নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে তাঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর পূর্বের সেই দম্ভ ও অহমিকা আর ছিল না। তিনি বলেছিলেন, "আপনাদের দাবী মঞ্জুর করবার সিদ্ধান্ত আমরা করেছি। তবে এজন্যে আমরা কমিশনের একটা সুপারিশ চাই। এর পর গান্ধীজী ও জেনারেল স্মাট্‌সের মধ্যে কতকগুলি পত্রালাপ হয় এবং গান্ধীজী সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করেন। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ পূর্বের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় ভারতীয়রা সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখার ব্যাপারে প্রথমে রাজী না হ'লেও গান্ধীজী তাঁদের স্বমতে আনতে সহজেই সমর্থ হলেন। আবার একটি সাময়িক আপোস হ'লো। এই আপোস ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের গান্ধী-স্মাট্‌স্‌ চুক্তি নামে পরিচিত হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত কমিশনের রায় প্রকাশিত হ'লো। ভারত সরকারের পক্ষে যে ইউরোপীয় ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি ভারতে ইংরেজ আমলার মনোভাবই দেখালেন এবং তাঁর মতামত ভারতীয়দের বিপক্ষেই গেল। কমিশন ইউরোপীয় সৈনিকদের গুলীচালনা ও অত্যাচারের সম্পর্কে নীরব থাকলেও ভারতীয়দের মাথাপিছু তিন পাউণ্ড কর রহিত করবার দাবী, ভারতীয় বিবাহ-স্বীকৃতির দাবী এবং আরও কয়েকটি ছোটখাটো দাবী মঞ্জুরির সুপারিশ করলো। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সলোমন কমিশনের সুপারিশগুলিকে কার্যে পরিণত করবার জন্যে 'ইণ্ডিয়ানস্‌ রিলিফ বিল' নামে একটি বিল আনলো। ঐ বিলে তিন পাউণ্ড কর বাতিল করা হ'লো, ভারতীয় বিবাহরীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহকে বৈধ ব'লে স্বীকার করা হ'লো এবং কেবল টিপসইযুক্ত সার্টিফিকেট থাকলেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার মেনে নেওয়া হ'লো। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন এই বিলটি আইনে পরিণত হ'লো।

এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

তেরো

ভারতে প্রত্যাবর্তন

গান্ধীজী এবার ভারতে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাঁর দাদা লক্ষ্মীদাস কিছুদিন যাবৎ রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। দেশে ফিরে দাদার সেবাযত্ন করবার একান্ত আগ্রহ ছিল গান্ধীজীর। কিন্তু দেশে তাঁর ফিরবার আগেই লক্ষ্মীদাসের মৃত্যু ঘটলো। এই সময়ে ফিনিক্সে একটি ঘটনা গান্ধীজীকে অত্যন্ত মর্মাহত করে। ফিনিক্সে দু'টি ছাত্র একটি বিশ বৎসর বয়স্কা বালিকার শ্লীলতাহানি করে। গান্ধীজী এই ঘটনার সংবাদ পেয়েই দ্রুত জোহানেস্‌বার্গ থেকে ফিনিক্সে ফিরে যান এবং ছাত্র দু'টি যে তাঁকে কতোখানি মর্মবেদনা দিয়েছে এবং তারা কতোখানি নিচে নেমেছে, তা তাদের উপলব্ধি করাবার জন্যে তিনি এক সপ্তাহ অনশন করলেন এবং সাড়ে চার মাস দিনে একবার মাত্র আহারের শপথ নিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে মেয়েটিও অনশন করলো, সমস্ত অলংকার ত্যাগ ক'রে মাথার চুলগুলি খাটো ক'রে ছেঁটে বেদনা ও অনুতাপ প্রকাশ করলো। কিন্তু কিছুদিন বাদে অনুরূপ একটি ঘটনা আবার ঘটলো এবং এতে নিজের ছেলে মণিলাল জড়িত থাকায় তিনি আরও পক্ষকাল অনশন করলেন। এই দীর্ঘ অনশন এবং দিনে একবার মাত্র আহারের ফলে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কর্মতৎপরতা এতোটুকুও তিনি হ্রাস করলেন না। এই সময়ে গোখেল পীড়িত অবস্থায় লণ্ডনে ছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে লণ্ডনে ডেকে পাঠালে গান্ধীজী লণ্ডনের পথেই দেশে ফিরবেন স্থির করলেন। রওনা হওয়ার দিন স্থির হয়ে গেল ১৮ই জুলাই (১৯১৪)।

গান্ধীজীর রওনা হওয়ার পূর্বে পক্ষকাল তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানাবার জন্যে বহু সভাসমিতি ও ভোজের আয়োজন হ'লো।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাগজগুলিও গান্ধীজীকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানালো। দক্ষিণ আফ্রিকার বহু বিশিষ্ট ইউরোপীয় বাসিন্দাও ঐসব বিদায়-সংবর্ধনায় ও ভোজসভায় অংশ নিলেন। ১৮ই জুলাই তারিখে ডারবানের টাউনহলে গান্ধীজী ও কস্তুরবাঈকে আপ্যায়িত করা হ'লো। ঐ সভায় ডারবানের মেয়র নিজে সভাপতিত্ব করলেন। নাটালের বিশপ, জেনারেল বোথা ও জেনারেল স্মাট্‌স্ গান্ধীজীকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র দিলেন। ইউরোপীয়দের এই সহৃদয় ব্যবহারে গান্ধীজী মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

১৮ই জুলাই গান্ধীজী কস্তুরবাঈ ও কালেন্‌বাখকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরূপে জাহাজে ইংলণ্ড রওনা হলেন। জাহাজে তাঁরা শুনলেন যে, ইউরোপে একটি ভয়ংকর যুদ্ধ বাধতে চলেছে। গান্ধীজী লণ্ডনে পৌঁছবার দু'দিন আগেই, ৪ঠা আগস্ট, সত্যই যুদ্ধ বেধে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

গান্ধীজী লণ্ডনে নেমে শুনলেন, গোখেল চিকিৎসার জন্যে প্যারিসে গিয়েছিলেন, হঠাৎ যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তিনি সেখানে আটক পড়েছেন। প্যারিসের সঙ্গে লণ্ডনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় গোখেল কবে নাগাদ ফিরবেন বা ফিরতে পারবেন কিনা, তা ঠিক জানা গেল না। গোখেল না ফেরা পর্যন্ত গান্ধীজী ইংলণ্ডে থাকবেন স্থির করলেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের একজন নাগরিক রূপে এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডবাসী ভারতীয়রা ইংলণ্ডকে কিভাবে সাহায্য করতে পারবে, সে বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এই সময়ে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, জিন্না ও লাজপত রায় প্রভৃতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও ভারত সচিবের কাছে লিখিত পত্রে সাম্রাজ্যের এই বিপদে সাম্রাজ্যের নাগরিক রূপে ভারতীয়গণ যে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না, তা জানালেন। ৮ই আগস্ট তারিখে গান্ধীজীকে তাঁর ভারতীয় ও ইউরোপীয় অনুরাগীরা হোটেলে সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন

করলেন। এই সংবর্ধনাসভায় ডাঃ আনন্দ কে. কুমারস্বামী, এম. এ. জিন্না, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয়রা গান্ধীজীর ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে বক্তৃতা দিলেন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী, ভারত সচিব, গ্ল্যাডস্টোন, কার্জন, অ্যাপ্‌টুহিল, কে. হার্ডি, র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রভৃতি ইংলণ্ডের জননেতারা ও গোখেল এই সভায় অনিবার্য কারণে উপস্থিত হ'তে না পারায় দুঃখপ্রকাশ ক'রে ও গান্ধীজীকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র দিলেন। গান্ধীজী এই সভায় ভারতীয়দের বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিক রূপে তাঁদের কর্তব্যপালনের আহ্বান জানালেন। শীঘ্রই গান্ধীজী ইংলণ্ডে ও আয়ারল্যাণ্ডে প্রবাসী ভারতীয়দের একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে অনেকেই তাঁর প্রতিবাদ ক'রে ইংলণ্ডের এই সংকটকালে ভারতীয়দের দাবীকে জোরদার করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁদের বোঝালেন, ইংলণ্ডের সংকটকে ভারতীয়দের সুযোগ রূপে গ্রহণ করা উচিত হবে না। ১৮ই আগস্ট গান্ধীজী ও কস্তুরবাঈসহ প্রায় পঞ্চাশজন ভারতীয়ের স্বাক্ষরিত একটি পত্র ভারত সচিবের কাছে পাঠানো হ'লো। তাতে বলা হ'লো যে, যুক্তরাজ্যে প্রবাসী ভারতীয়রা ইংলণ্ডের এই সংকটে ইংরেজদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে চান। গান্ধীজী যুদ্ধে সাহায্যের জন্যে একটি ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করলেন। প্রথমে ইতস্ততঃ করলেও বৃটিশ সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলো। ফলে গান্ধীজীসহ প্রায় আশিজন স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা প্রাথমিক চিকিৎসাদির বিষয়ে দেড় মাস শিক্ষাগ্রহণ করলেন। কস্তুরবাঈ, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবিকারা সৈনিকদের পোশাক সেলাইয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

গান্ধীজীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন। এজন্যে প্রায়ই তাঁকে তাঁর বাসা

থেকে দু'মাইল পথ হেঁটে যাতায়াত করতে হ'তো। সুস্থ শরীরে এই সামান্য পথ হাঁটা তাঁর পক্ষে কিছুই ছিল না। কিন্তু অসুস্থ শরীরে তাঁর পক্ষে এটা খুবই ক্ষতিকর হয়ে উঠলো। তিনি প্লুরিসিতে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত কাজে বেরুতে লাগলেন।

গোখেল অক্টোবর মাসে লণ্ডনে ফিরে এলেন। তিনি গান্ধীজীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। প্লুরিসি সত্ত্বেও গান্ধীজী কেবল নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবকের কাজই করছিলেন না, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর খাদ্য সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছিলেন। এই সময়ে তাঁর খাদ্য ছিল চিনেবাদাম, কাঁচা-পাকা কলা, পাতিলেবু, জলপাইয়ের তেল, টমাটো ও আঙুর। দুধ, চাল, গম, ডাল প্রভৃতি কিছুই তিনি খাচ্ছিলেন না। ডাঃ জীবরাজ মেহ্‌টা তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে দুধ ও দানাশস্য কিছু পরিমাণে খাওয়ার জন্যে বারবার অনুরোধ ক'রে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। এই খবর গোখেলের কানে গেলে তিনি গান্ধীজীকে ডাক্তারের পরামর্শমতো চলতে অনুরোধ করলেন। গান্ধীজী তাঁর প্রিয় বন্ধু কালেন্‌বাখের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরে শেষ পর্যন্ত দুধ ও মাংস ছাড়া অন্য সবকিছু ডাক্তারের পরামর্শমতো খেতে রাজী হলেন। কিন্তু গোখেল লণ্ডন ত্যাগ করবার পরই আবার গান্ধীজী কেবল ফল খেয়ে থাকতে শুরু করলেন। গান্ধীজীর প্লুরিসি কোনমতেই সারলো না। তখন তিনি ডাঃ এলিসন নামে এক ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন রইলেন। ডাঃ এলিসন তাঁর জন্যে বীট, মুলো, পেঁয়াজ, সবুজ শাক-সবজি ও কমলালেবুর মতো কিছু কিছু ফল খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নিজের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছে দেখে গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত রাঁধা শাকসবজি ও ভাত খেতে রাজী হলেন। এই সময়ে তাঁকে অনেকদিন শয্যাশায়ীই থাকতে হ'লো। ভারত সচিব মিঃ রবার্ট্‌স্ তাঁকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে পরামর্শ দিলেন। মিঃ রবার্ট্‌স্ তাঁকে বোঝালেন যে,

ভারতের আবহাওয়ায় তিনি সহজেই সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং এখানে থেকে তিনি এই যুদ্ধে যতোখানি সাহায্য করতে পারবেন, তার চেয়ে ঢের বেশি পারবেন ভারতে থেকে।

এই সময়ে কস্তুরবাঈয়ের স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে পড়লো। তাই গান্ধীজী ভারতে যাওয়াই স্থির করলেন। কালেন্‌বাখ ভারতে যাওয়ার জন্যেই গান্ধীজীর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন। কিন্তু জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধায় বৃটিশ সরকার কালেন্‌বাখকে ভারতে যাওয়ার পাসপোর্ট দিলো না। তাই গান্ধীজী তাঁর প্রিয়বন্ধু কালেন্‌বাখকে ইংলণ্ডে রেখে ভারতে রওনা হ'তে বাধ্য হলেন। এর প্রায় বিশ বছর পরে স্বল্পকালের জন্যে ভারতে গান্ধীজীর সঙ্গে কালেনবাখের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই আদর্শবাদী জার্মান পরলোক গমন করেন।

৯ই ডিসেম্বর গান্ধীজী ও কস্তুরবাঈ জাহাজে ভারতে রওনা হন। তখনও গান্ধীজীর বুক প্লাস্টারের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বাঁধা ছিল।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি গান্ধীজী বোম্বাইয়ে জাহাজ থেকে নামলেন। তাঁকে নামাবার জন্যে জাহাজ অ্যাপলো বন্দরে ধরেছিল। এই বন্দরটি ইংলণ্ডের রাজারানী, যুবরাজ, বড়লাটরা ও ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অবতরণের জন্যে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হ'তো। তাই এই ঘাটে তাঁর অবতরণ ছিল বিশেষ মর্যাদারই পরিচায়ক। জাহাজঘাটে শত শত ভারতীয় গিয়ে গান্ধীজী ও কস্তুরবাঈকে অভ্যর্থনা করলেন। গান্ধীজীকে একটি বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু সরকারের আপত্তির ফলে তা কিছুটা পরিবর্তিত করতে হ'লো। গান্ধীজী ভারতে আসবার কথা সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও ক'রে ছাপা হ'লো। গান্ধীজী সান্টা ক্রুজে রেবাশঙ্কর ঝাবেরির বাড়িতে উঠেছিলেন। জায়গাটা শহরের উপকণ্ঠে হ'লেও সাংবাদিকরা তাঁকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললেন। তিনি তাঁদের জানালেন,

তিনি ভারতে স্থায়িভাবে থাকবার জন্মেই এসেছেন। তাঁকে বহু সভাসমিতিতে অভ্যর্থনা জানানো হ'লো। বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড উইলিংডন গোখেলের কাছে গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। গান্ধীজীকে বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট নাগরিকরা জাহাঙ্গীর পেটিটের বাড়িতে যে সম্মান জানান, তাতে স্যার ফিরোজশাহ মেটা গান্ধীজীর ও কস্তুরবাঈয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। গান্ধীজীকে বোম্বাইয়ের গুজরাটী অধিবাসীরাও বিশেষ সংবর্ধনা জানান। এই সংবর্ধনাসভায় মিঃ জিন্নাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। অন্যান্য বক্তাদের বেশির ভাগই ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। কিন্তু গান্ধীজী গুজরাটী ভাষাতেই তার উত্তর দেন। তিনি গুজরাটীদের সমাবেশে ইংরেজীতে ভাষণদানের প্রতিবাদ করেন এবং নিজের গুজরাটী ও হিন্দুস্থানীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতের কথা ঘোষণা করেন। তিনি অধিকাংশ সংবর্ধনাসভায় বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় সাফল্যের সংবাদগুলোই এদেশে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু তার ব্যর্থতা ও অসাফল্যের সংবাদ আসেনি। এখন তিনি এদেশে থেকেই কাজ করতে চান। তাই তাঁর দোষত্রুটি, ব্যর্থতা, অক্ষমতা সকলের চোখেই ধরা পড়বে। তাঁরা যেন সেগুলি ক্ষমা করেন। গান্ধীজী বোম্বাই থেকে পুণায় গিয়ে গোখেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গোখেলের ইচ্ছা ছিল গান্ধীজী গোখেলের সার্ভেণ্ট্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্য হন। গান্ধীজীরও অনুরূপ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গান্ধীজীকে শেষ পর্যন্ত তাতে বিরত হ'তে হয়। গোখেল তাঁকে কার্যতঃ সার্ভেণ্ট্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়ার সদস্য ব'লেই মনে করতেন। গান্ধীজী ফিনিক্স বা টলস্টয় খামারের মতো একটি আশ্রম এদেশে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে গোখেল সার্ভেণ্ট্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়ার তহবিল থেকে তাঁকে অর্থ দিতে বলেন।

জানুয়ারি মাসের শেষাশেষি গান্ধীজী তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রাজকোট ও পোরবন্দরে গেলেন। তিনি

বাধোয়ানে পৌঁছলে একজন স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী তাঁকে বিরামগামের শুল্ক ব্যবস্থায় যাত্রীদের যে দুর্ভোগ হয়, সে সম্পর্কে জানালেন। গান্ধীজী তাঁকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "জেলে যেতে পারবেন?" রাজনৈতিক কর্মীটি বললেন, "আপনি যদি আমাদের নেতৃত্ব দেন, তবে আমরা জেলে যেতেও প্রস্তুত। আমরা কাথিয়াবাড়ী; তাই আপনার উপর আমাদের অধিকার সকলের আগে। আপনি ডাক দিলেই আমরা আসব, এ বিশ্বাস আপনি রাখতে পারেন।" গান্ধীজী কাথিয়াবাড়ের যেখানেই গেলেন, সেখানেই তিনি বিরামগাম শুল্ক-অবরোধের কথা শুনলেন। তিনি এ বিষয়ে খুঁটিনাটি খোঁজখবর নিলেন এবং বই ও কাগজপত্র যা পেলেন পড়লেন। এইসব অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর স্থির প্রত্যয় হ'লে তিনি বোম্বাই সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করলেন। বোম্বাইয়ের গভর্নর গান্ধীজীকে লিখলেন, "এ ব্যাপারটা আমাদের হাতে থাকলে, অনেকদিন আগেই এর একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতো।" তিনি গান্ধীজীকে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। গান্ধীজী বক্তৃতায় সত্যাগ্রহের উল্লেখ করেছিলেন, সেজন্যে গভর্নরের সেক্রেটারী ক্ষোভ প্রকাশ করলে গান্ধীজী বললেন, "এটা কোনপ্রকার ধমক নয়। এটা জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া যে, এর প্রতিকারের জন্য আমাদের কি কি ন্যায়সঙ্গত পন্থা আছে।" গান্ধীজী ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, কিন্তু ভারত সরকার তাঁর পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া আর কিছুই করলো না। পরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সঙ্গে গান্ধীজী একটি সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে আলাপ করেন এবং ভারত সরকার এই শুল্ক-ব্যবস্থা তুলে নেয়।

গান্ধীজী ভারতে পৌঁছে তাঁর সঙ্গে আগত ফিনিক্সের ছাত্রদের রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে খুবই খুশী হয়েছিলেন এবং ফিনিক্সের ছাত্রদের সাদরে গ্রহণ

করেছিলেন। গান্ধীজী তাই সস্ত্রীক রাজকোট থেকে বোলপুর গেলেন। কিন্তু ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে না থাকায় গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলেন না। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরবর্তীকালের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহকর্মী ও অনুরাগীর সাক্ষাৎ হ'লো এখানে। কাকা কালেলকর ও চিন্তামন শাস্ত্রী এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এন্‌ড্রুজ ও পিয়ারসনের সঙ্গে গান্ধীজী পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। গান্ধীজী এখানে ছাত্রদের স্বাবলম্বী হ'তে এবং নিজেদের খাদ্য নিজেদের প্রস্তুত ক'রে নিতে বললেন। তিনি দুদিন মাত্র শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই সময় তিনি তারযোগে সংবাদ পেলেন যে, পুণায় গোখেলের মৃত্যু হয়েছে। গান্ধীজী শোকপ্রকাশের জন্যে একবৎসর কাল নগ্নপদে থাকবার ব্রত নিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁরা একটি শোকসভা করলেন। তারপর গান্ধীজী, কস্তুরবাঈ ও মগনলাল পুণা রওনা হলেন।

পুণা পৌঁছেই গান্ধীজী সোজা সার্ভেণ্ট্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদর কার্যালয়ে চ'লে গেলেন এবং গোখেলের পরলোকগত আত্মা খুশী হবেন মনে ক'রে সোসাইটির সদস্য হওয়ার জন্যে আবেদনপত্র পেশ করলেন। কিন্তু তাঁকে সোসাইটির সদস্যরূপে গ্রহণ করা নিয়ে সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত স্থির হ'লো যে, গোখেলের ইচ্ছা ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গান্ধীজী এক বৎসর ভারতবর্ষ সফর করবেন, তারপর তাঁর আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে। গোখেলও তাঁর জীবদ্দশায় গান্ধীজীকে অন্ততঃ এক বছর ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না ক'রে সে সম্পর্কে কিছু মতামত প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। গান্ধীজী তাই সোসাইটির সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন এবং ভারতসফর করতে মনঃস্থ করলেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি সোসাইটির সদস্যপদ প্রার্থনা ক'রে যে আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন, তাও প্রত্যাহার ক'রে নিলেন।

গান্ধীজীর ভারত-পরিক্রমা শুরু হ'লো। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করলেন এবং যাতাযাতের সুবিধার জন্যে লম্বা কোট পাগড়ি ইত্যাদি ছেড়ে শুধু ধুতি শার্ট ও কাশ্মীরী টুপি পরলেন। তখন ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তিনি রেঙ্গুন যাত্রা করলেন। রেঙ্গুন যাওয়ার পথে গান্ধীজী কলকাতায় নামলেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তিনি কলকাতায় ছাত্রদের একটি সভায় বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন যে, যদিও গোখেল তাঁকে এক বৎসর দু কান খুলে রাখতে ও মুখ বুজে থাকতে বলেছিলেন, তবু তিনি ছাত্রদের কিছু বলবার লোভ সামলাতে পারছেন না। তিনি ছাত্রদের বললেন, রাজনীতি ছাত্রদের কাছে নিষিদ্ধ বস্তু হয়ে থাকতে পারে না; তবে রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখাও উচিত নয়। তিনি জানেন, অনেক ছাত্রই মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চায়, কিন্তু তারা জানে না কিভাবে মাতৃভূমির প্রকৃত সেবা করা সম্ভব। তাই তারা প্রায়ই অন্যায় পন্থা নেয়। তারা ভগবান্‌কে ভয় না ক'রে মানুষকে ভয় ক'রেই কাজ করে। যদি তারা রাজদ্রোহ করতে চায়, তবে তা তাদের মুক্তকণ্ঠে বলতে হবে এবং সাহসের সঙ্গে তার ফলাফল গ্রহণ করতে হবে। কারও যদি দেশসেবা সম্পর্কে কোনও কার্যসূচী থাকে, তবে তাকে তা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ্যে রাখতে হবে। গান্ধীজী ছাত্রদের ধর্মপ্রাণ হ'তে এবং ধর্ম ও সুনীতির দ্বারা পরিচালিত হ'তে বললেন। বললেন, তাতে তিনি তাদের প্রদর্শিত পথে চলবেন এবং তাদের সঙ্গে মৃত্যুকেও বরণ করবেন। কিন্তু তারা যদি দেশে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে চায়, তবে তিনি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন।

গান্ধীজী রেঙ্গুন থেকে ফিরবার পর আবার শান্তিনিকেতনে গেলেন (৬ই মার্চ)। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজেই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ঐ বৎসর কুম্ভমেলা হচ্ছিল হরিদ্বারে।

কুম্ভমেলায় যাত্রীদের সাহায্যের জন্যে সার্ভেন্ট্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকরা গিয়েছিল। তাদের সাহায্য করবার জন্যে শান্তিনিকেতন থেকে মগনলাল গান্ধীর নেতৃত্বে ফিনিক্সের ছাত্ররাও গেল। গান্ধীজীর কুম্ভমেলায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মহাত্মা মুন্সিরামের (পরবর্তী কালের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল। তাই তিনিও হরিদ্বারে গেলেন। কুম্ভমেলায় তীর্থযাত্রীদের, এমন কি সাধুদেরও, ভণ্ডামি ও অশালীনতা তাঁকে পীড়া দিলো। গান্ধীজী গুরুকুলে গিয়ে মহাত্মা মুন্সিরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অচিরেই দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠলো। গান্ধীজী গুরুকুল থেকে গেলেন লছমনঝোলা। এখানে বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। একজন সন্ন্যাসী গান্ধীজীর চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন; তবে তিনি গান্ধীজীর শিখা ও উপবীত না দেখে দুঃখ প্রকাশ করেন। গান্ধীজী বৈষ্ণব পরিবারে জন্মেছিলেন, তাই বিলাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর শিখা ছিল। কিন্তু বিলাতের লোকেরা পাছে তাঁকে বর্বর মনে করে, এই ভেবে তিনি শিখা মুণ্ডন ক'রে ফেলেছিলেন। নিজের ধর্মীয় চিহ্ন সম্পর্কে তাঁর এই লজ্জা তাঁকে এখন সত্যই পীড়া দিলো। তিনি এখন থেকে আবার শিখা রাখবেন স্থির করলেন।

এপ্রিল মাসে গান্ধীজী কস্তুরবাঈ সহ মাদ্রাজে এলেন। তাঁরা দুজনে দুটি বোঁচকা সঙ্গে নিয়ে নিতান্ত চাষাভুষোর মতোই তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করছিলেন। তাঁরা স্টেশনে পৌছলে শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা তাঁদের মাল্যভূষিত করলেন এবং তাদের বিপুল সংবর্ধনা জানানো হ'লো। গান্ধীজীর অনুরাগী বন্ধু ও ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক নটেশনের বাড়িতে তাঁদের দুজনের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। নটেশন তাঁর অতিথিদের জন্যে নির্ধারিত কক্ষটিতে দুটি খাটিয়া, একটি চেয়ার, একটি টেবিল ও একটি

ডেস্ক রেখেছিলেন। গান্ধীজী ঐ জিনিসগুলিকে বিলাসিতার চিহ্ন ব'লে সরিয়ে নিতে বললেন। মাদ্রাজের নাগরিকরা ২১শে এপ্রিল ভিক্টোরিয়া হলে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। এখানে গান্ধীজী কয়েকটি বড় বড় সভায় বক্তৃতা করলেন।

তিনি দক্ষিণ ভারতে মাসাধিক কাল ভ্রমণ করেন। সর্বত্রই তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি এখানে অস্পৃশ্য পঞ্চমাদের সামাজিক অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনকালে সরকারের গুলীতে নিহত দু'জন ভারতীয় শ্রমিকের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গেও তিনি দেখা করেন।

ভারত-সফরশেষে গান্ধীজী কোথা স্থায়িভাবে কাজ শুরু করবেন, তা একটা সমস্যা হয়ে উঠেছিল। দেশীয় রাজ্যে থেকে সারা বৃটিশ ভারতের সেবার অন্তরায় অনেক, তাই তিনি বৃটিশ ভারতের কোথাও বাস করতে মনঃস্থ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমেদাবাদে থাকাই স্থির হ'লো। কারণ, তিনি আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে আদর্শ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, সেজন্যে প্রাচীন কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন স্থির করেছিলেন। আমেদাবাদ ছিল প্রাচীন তাঁতশিল্পের কেন্দ্র। তাই এখানে হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোলার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তিনি এখানে মাতৃভাষা গুজরাটীর সাহায্যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারবেন। তাছাড়া, আমেদাবাদে ধনীদের বাস হওয়ায় তাঁদের কাছ থেকে তিনি সহজেই আর্থিক সাহায্য পেতে পারবেন, এমন আশাও করেছিলেন। গান্ধীজী তাই আমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুকরণে একটি ছোট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। এটি হবে তাঁর কর্মীদের শিক্ষণকেন্দ্র। তিনি গোড়া থেকেই স্থির করলেন, এই আশ্রমে তিনি অস্পৃশ্যদের স্থান দেবেন। তিনি অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে তাঁর এই মনোভাব ও আদর্শের কথা আদৌ গোপন করলেন না।

আমেদাবাদের কাছে কোচরাব গ্রামে আশ্রমটি স্থাপিত হ'লো। গান্ধীজীর এক ব্যারিস্টার বন্ধু জীবনলাল দেশাইয়ের একটি ছোট বাংলো ছিল এই গ্রামে। গান্ধীজী সেটি ভাড়া নিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে কোচরাবের ছোট্ট আশ্রমটি স্থাপিত হ'লো। গান্ধীজী এই আশ্রমের নাম দিলেন 'সত্যাগ্রহ আশ্রম'। পরে এই আশ্রম সবরমতীতে স্থানান্তরিত হয়। গোড়ার দিকে আশ্রমবাসী পুরুষ ও নারীর সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ। তাঁদের মধ্যে অর্ধেক ছিলেন তামিলভাষী এবং অবশিষ্টরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোক। তাঁরা সকলেই একান্নবর্তী পরিবারের লোকের মতোই থাকতেন। দেশের সেবাই ছিল আশ্রমবাসীদের ব্রত। তাঁরা সকলেই সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, অচৌর্য, অপরিগ্রহ প্রভৃতির শপথ নিয়েছিলেন। সাহস ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ছিল আশ্রম-বাসীদের পক্ষে অপরিহার্য। গান্ধীজী বলেছিলেন, "আশ্রমিকদের রাজা, প্রজা, জাতি, পরিবার, দস্যু, তস্কর, হিংস্র প্রাণী, এমন কি মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত থাকতে হবে। প্রকৃত সাহসী লোকই সত্যের ও আত্মার শক্তি দিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারে।" যেসব জিনিসের উৎপাদন বা উৎপাদক সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, সেগুলি সত্যাগ্রহীর ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এই উৎপাদনের সঙ্গে বহু বঞ্চনা ও প্রতারণা জড়িত থাকতে পারে। কলকারখানায় শ্রমিকদের উপর নানাভাবে অবিচার করা হয়। কলকারখানা চলবার সময়ে যে চুল্লি জ্বলে, তাতে বহু কীটপতঙ্গ, এমন কি অনেক সময় শ্রমিকও মারা যায়; যন্ত্র চলবার সময়েও শ্রমিকরা অনেক সময় আহত ও নিহত হয়। তাই কি স্বদেশের, কি বিদেশের কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য আমাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। শৌখিন জিনিসের ব্যবহার ব্রহ্মচর্যের অন্তরায়। কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের মতো শৌখিন নয়। এসব নানা দিক থেকেই কুটিরশিল্পজাত স্বদেশী জিনিসের ব্যবহারই

আদর্শ। ভারতীয় ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার ব্যবহার বর্জনীয়। কারণ, নিজের ভাষার মাধ্যমে ছাড়া কোনও জাতির মানসিক উন্নতি সম্ভব নয়। সকলকেই নিজ নিজ মাতৃভাষা ছাড়া ভারতের অন্য একটি প্রধান ভাষা শিখতে হবে। সংস্কৃত ভারতীয় ভাষাসমূহের জননী হওয়ায় সংস্কৃত শেখাও দরকার। ভারতে শিক্ষিত সম্প্রদায় কায়িক শ্রমকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। কিন্তু প্রকৃতিই মানুষকে কায়িক শ্রমের উপযুক্ত ক'রে গড়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের জীবিকার জন্যে কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করা উচিত। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তাই আশ্রমবাসীদের প্রত্যেককেই কিছু সময় কৃষিকার্যে অতিবাহিত করতে হবে। কায়িক-শ্রমের দ্বারা কেবল জীবিকাই উপার্জিত হয় না, কায়িক শ্রমের দ্বারা মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিরও বিকাশ ঘটে। কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ সম্ভব না হ'লে অন্য কোনপ্রকার কায়িক শ্রম করতে হবে। আমাদের দেশের দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে চরখা ও হস্তচালিত তাঁতের অবলুপ্তি। তাই আশ্রমিকদের চরখায় সুতো কাটতে ও তাঁতে কাপড় বুনতে হবে।

আশ্রমে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। চার বছরের বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের ছাত্রছাত্রীরূপে গ্রহণ করা হবে। তবে ছাত্রছাত্রীদের উপর তাদের অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্রমের নিয়ম ও ব্রতগুলিকে গ্রহণ করতে হবে। কৃষি, বয়ন, সাহিত্য, গণিত, ধর্মীয় বিষয়, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি শেখানো হবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সংস্কৃত ও হিন্দী এবং একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা শিখতে হবে। উর্দু, বাংলা, তামিল ও তেলেগু লিপিগুলি শেখা চাই। ইংরেজী হবে গৌণ ভাষা। দশ বছরে শিক্ষা সমাপ্ত হবে। ছাত্রছাত্রীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে আশ্রমের ব্রতগুলি গ্রহণ ক'রে আশ্রমে থাকতে বা আশ্রম ত্যাগ করতে পারবে। আশ্রমিক ছাত্রদের সকলের পোশাক হবে একরকম। দিনে তিনবার খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। তবে খাবার

অত্যন্ত অনাড়ম্বর। মুখরোচক খাদ্য আশ্রমে নিষিদ্ধ ছিল—কারণ রসনা-সংযমও ছিল আশ্রমিকদের অন্যতম ব্রত। লবণ, মরিচ ও হলুদ ছাড়া অন্য কোন মসলাও ব্যবহৃত হ'তো না। দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য মাংসের মতোই উত্তেজক ও প্রায়ই ক্ষয়রোগের কারণ হয় ব'লে দুধের ব্যবহার কম করা হয়েছিল।

ছুটি ব'লে কিছুই ছিল না। সপ্তাহে দু'দিন রুটিনের কিছুটা রদবদল করা হ'তো এবং ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের অভিরুচিমতো কাজকর্ম করতে পারতো। বছরে তিন মাস বলিষ্ঠ ছাত্রদের দেশভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হ'তো—তবে সেই ভ্রমণটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করতে হ'তো পদব্রজে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে বেতন নেওয়া হ'তো না। তবে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা আশ্রমের জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করবেন, এমন আশা করা হ'তো।

আশ্রমটি কয়েক মাস স্থাপিত হওয়ার পরেই গান্ধীজী তাঁর জনৈক অনুরাগীর কাছ থেকে একটি অস্পৃশ্য পরিবারকে আশ্রমে স্থান দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র পেলেন। গান্ধীজী তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জানিয়ে দিলেন যে, অস্পৃশ্য পরিবারটি যদি আশ্রমের নিয়মকানুন মেনে চলতে রাজী থাকে, তবে তাদের আশ্রমে নিতে কোনও বাধা নাই। অস্পৃশ্য পরিবারটি সানন্দে রাজী হলেন। পরিবারে ছিলেন তাঁরা তিনজন—বাবা দুদাভাই, মা দানিবেন ও মেয়ে লক্ষ্মী। দুদাভাই বোম্বাইয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁরা আশ্রমে আসার ফলে কিন্তু আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকদের অনেকের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিলো। প্রথম সমস্যা দেখা দিলো কুয়োর ব্যবহার নিয়ে। জল তোলার জন্যে যে লোকটি নিযুক্ত ছিল, সে আপত্তি করতে লাগলো। তার ধারণা, আশ্রমে অস্পৃশ্যরা থাকায় আশ্রমের সকলেই প্রায় অস্পৃশ্য, সুতরাং তাদের বালতির এককণা জল গায়ে পড়লেও সে অশুচি হবে। লোকটি দুদাভাই সহ অন্যান্য আশ্রমবাসীদের সঙ্গে নানাভাবে দুর্ব্যবহার

করতে লাগলো। গান্ধীজী আশ্রমিকদের সত্যাগ্রহীর মতোই এসব দুর্ব্যবহার হাসিমুখে সহ্য করতে বললেন। সত্যাগ্রহেরই জয় হ'লো। লোকটি তাঁদের বিরক্ত করা বন্ধ করলো এবং নিজের কাজের জন্যে লজ্জিত হ'লো। কিন্তু যাঁরা অর্থ সাহায্য দিতেন, তাঁরা অর্থ সাহায্য বন্ধ করলেন। গান্ধীজীকে ও আশ্রমবাসীদের একঘরে করার কথাও জনশ্রুতিতে শোনা যেতে লাগলো। গান্ধীজীকে তাঁরা চিনতেন না। এই হৃদয়হীন কুসংস্কারকে সমাজের বুক থেকে চিরতরে উৎপাটিত করতে তিনি আরও দৃঢ়সংকল্প হলেন। তিনি স্থির করলেন, প্রয়োজন হ'লে তিনি তাঁর আশ্রমকে অস্পৃশ্য পল্লীতে তুলে নিয়ে যাবেন এবং কায়িক শ্রমের দ্বারাই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করবেন। এদিকে আশ্রমের তহবিল শূন্য হয়ে এলো। এই সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। একদিন এক ধনী ব্যক্তি হঠাৎ মোটরে চ'ড়ে আশ্রমে এলেন এবং গান্ধীজীকে তাঁর আশ্রমের জন্যে অর্থ সাহায্য দিতে চাইলেন। গান্ধীজী অর্থ সাহায্য নিতে রাজী হ'লে ধনী ভদ্রলোক পরদিন তাঁকে তের হাজার টাকা এনে দিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর নাম জানালেন না। পরে অবশ্য নাম অজ্ঞাত রইলো না। এই দাতাটি ছিলেন একজন মিল-মালিক অম্বালাল সারাভাই। অর্থের সমস্যাটা বছর খানেকের জন্যে আপাততঃ রইলো না। কিন্তু এখানেই সমস্যার শেষ হ'লো না। গান্ধীজীর নিকটতম জন—কস্তুরবাঈ ও মগনলাল গান্ধী—অস্পৃশ্যদের সঙ্গে একত্র থাকার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। গান্ধীজী তাঁদের হয় আশ্রমের নিয়ম পালন করতে, নয় আশ্রম ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। অনেকে কস্তুরবাঈকে বোঝালেন যে, স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণে সাধ্বী পত্নীর কোনও পাপ হয় না,—এ-ই হিন্দুশাস্ত্রের বিধান। কস্তুরবাঈ এখন নিশ্চিন্তমনে আশ্রমজীবন গ্রহণ করলেন। মগনলাল এ বিষয়ে আরও ভেবে দেখবার জন্যে ছ'মাসের জন্যে মাদ্রাজ গেলেন। সেখানে তিনি তাঁতের কাজ খুব

ভালোভাবে শিখে এলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দেই আশ্রমে তাঁতের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ঐ কাজ খুব উন্নত ধরনের ছিল না। কিন্তু পরে তাঁতের কাজে আশ্রমবাসীরা খুবই দক্ষতা অর্জন করেন। গান্ধীজী নিজেও রোজ চার ঘণ্টারও বেশী তাঁত চালাতেন। আশ্রমে প্রায় দশটি তাঁত নিয়মিত চলতো। তাঁতে যে কাপড় তৈরি হ'তো তাতে আশ্রমবাসীরা রোজ বাজারে কাপড় বিক্রি ক'রে আট আনা থেকে বারো আনা পেতেন। এতে আশ্রমের আর্থিক সমস্যা অনেকটা মিটেছিল। তাঁতের কাজই যথেষ্ট ছিল না। প্রয়োজন ছিল তাঁতের উপযুক্ত হাতে-কাটা সুতোর। কিন্তু কলে তৈরী সুতো বাজারে চালু হওয়ার পর হাতে-কাটা সুতোর চল একেবারেই ছিল না। কিভাবে হাতে সুতো কাটা হ'তো তাও লোকে ভুলে গিয়েছিল। গান্ধীজী নিজে বলেছেন, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত তিনি চরখা দেখেন নি। তাই আশ্রমিকরা অন্যান্য তাঁতীদের মতোই ভারতীয় কলে তৈরী সুতোই ব্যবহার করতেন। কিন্তু গান্ধীজী সেই প্রাচীন সুতো কাটার শিল্পটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। তাই তিনি প্রাচীন চরখা ও চরখায় কিভাবে সুতো কাটা হ'তো তা আবিষ্কারের জন্যে সর্বদা সচেষ্ট রইলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরোচ শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে যান। সেখানে সৌভাগ্যক্রমে গঙ্গাবেন মজমুদার নামে এক বিধবা মহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। গঙ্গাবেন গান্ধীজীকে চরখার সন্ধান দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দেন এবং সারা গুজরাট ঘুরে শেষে বরোদা রাজ্যের বিজাপুরে চরখার সন্ধান পান। এখানে অনেকের বাড়িতে চরখা ছিল। কিন্তু এখন কেউ চরখায় সুতো কাটতো না, চরখাগুলি বাড়ির পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে অব্যবহৃত অবস্থায় প'ড়ে ছিল। ওরা সুতো কাটা ছেড়ে দিলেও গঙ্গাবেনের উৎসাহে তুলো ও সুতোর খদ্দের পেলে সুতো কাটতে রাজী হ'লো। গান্ধীজী তুলো ও খদ্দেরের ব্যবস্থা করলেন।

গান্ধীজী কল থেকেই তুলোর পাঁজ সংগ্রহ করেছিলেন। এটা গর্হিত মনে ক'রে তিনি কাপাসের বিচি ছাড়িয়ে তুলোর পাঁজ তৈরি করবার জন্যে লোক খুঁজতে লাগলেন। সে ব্যবস্থাও গঙ্গাবেন করলেন। এইভাবে হাতে তৈরী পাঁজ থেকে হাতে স্থতো কেটে হাত-তাঁতে কাপড় তৈরী হ'লো—এবং গঙ্গাবেনের উৎসাহে ও চেষ্টায় প্রকৃত খাদিশিল্পটি গ'ড়ে উঠলো। বিজাপুরে যখন স্থতো কাটার কাজ পুরো কদমে চলছিল, তখন আশ্রমেও স্থতোকাটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মগনলাল চরখার অনেক উন্নতি সাধন করলেন। চরখাও তৈরি হ'তে লাগলো আশ্রমে। তূলো পরিষ্কার ক'রে পাঁজ তৈরি করা, স্থতো কাটা ও হাত-তাঁতে কাপড় বুনে যে ভারতের কোটি কোটি উপবাসী মানুষ তাদের জীবিকার সংস্থান করতে পারে, এ বিষয়ে গান্ধীজীর দৃঢ় প্রত্যয় ঘটলো। সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রকৃতপক্ষে ছিল ফিনিক্স ও টলস্টয় খামারের মতো অহিংস যুদ্ধের সৈনিকদের শিক্ষা-শিবির। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী সি. এফ. এণ্ড্রুজকে বলেছিলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতে হয়তো সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যখন হবে, তখন এই আশ্রমটি যে বহু শক্তিশালী যোদ্ধা সরবরাহ করবে, তিনি সে বিষয়ে নিঃসংশয়। সত্যই, পাঁচ বছর পরে যখন অহিংস সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তখন সবরমতী আশ্রম তার প্রমাণও দিয়েছিল।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রাজা পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে গান্ধীজীকে কাইজার-ই-হিন্দ্ পদক দিয়ে বৃটিশ সরকার সম্মানিত করলেন। ঐ বৎসর রবীন্দ্রনাথও স্যার উপাধিতে ভূষিত হলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে চলছিল, তাতে মিত্রপক্ষ—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া—বিশেষ স্থবিধা করতে পারছিল না। ভারতে বৃটিশ-বিরোধী সকল প্রকার কার্যকলাপকে কঠোর হস্তে দমনের জন্যে

ভারত সরকার চেষ্টা করছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতরক্ষা আইন পাস হয়েছিল। এই আইনের ফলে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যে বহু লোক দণ্ডিত হয়েছিলেন। মহম্মদ আলি, সওকত আলি, আবুল কালাম আজাদ, হজরত মোহানি প্রভৃতি বহু মুসলমান নেতা গৃহে অন্তরীণ হয়েছিলেন। তুরস্ক এই যুদ্ধে জার্মানির পক্ষে থাকায় ভারতীয় মুসলমানদের তুরস্কের (তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানদের ধর্মনেতা বা খলিফা) প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল। তাই ভারত সরকার ভারতীয় মুসলমানদের এখন সন্দেহের চক্ষে দেখছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের উপরও ভারত সরকারের শ্যেনদৃষ্টি ছিল। তাই রাজনৈতিক বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ব্যাহত হয়েছিল এবং তা প্রচ্ছন্নভাবে সর্বস্তরে ধূমায়িত হচ্ছিল। গান্ধীজী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেননি, এমন কি রাজনৈতিক বক্তৃতাও দেন নি। এর প্রধান কারণ, তিনি গোখেলের নির্দেশ—এক বৎসর ভালোভাবে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ না ক'রে তিনি যেন সে সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ না করেন—মেনে চলছিলেন। এই সময়ে গান্ধীজী তাই সমাজ-সংস্কার ও জনহিতকর কার্যেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লোকমান্য তিলক দীর্ঘকাল মান্দালয়ে নির্বাসিত ও কারারুদ্ধ থাকবার পর মুক্তি পেয়ে ভারতে এলেও তিনিও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত ছিলেন। এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত গীতার টীকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই বইয়ের পাঁচ হাজার কপি মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছিল।

ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। কংগ্রেস এই বছরে গোখেল, স্যার ফিরোজশাহ্ মেহ্তা ও হেনরি কটনের মতো বিচক্ষণ ও সর্বজনমান্য নেতাদের হারিয়েছিল।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত শ্রমিক নেতা কের হার্ডি, যিনি পার্লামেণ্টের ভেতরে ও বাইরে ভারতীয়দের অক্লান্ত সাহায্য করতেন, তাঁরও মৃত্যু ঘটেছিল। তাই একটি শোকাচ্ছন্ন পরিবেশে অধিবেশন শুরু হয়েছিল এবং এই কংগ্রেসে তিলক বা গান্ধীজী, কেউই পুরোভাগে ছিলেন না। এই কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ভারত যাতে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করতে পারে, সেজন্যে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন, প্রাদেশিক স্বশাসন, আইন-সভাসমূহের সম্প্রসারণ ও সেগুলিতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি, শাসন পরিষদ্গুলির পুনর্গঠন, যেসব প্রদেশে শাসন পরিষদ্ নেই সে সব প্রদেশে শাসন পরিষদ্ প্রবর্তন, ভারতসচিব পদের পরিবর্তন বা বিলোপ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উদার ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবী করা হয়েছিল। বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেসের সংবিধানেরও কিছু রদবদল করা হয়েছিল, এই রদবদলের ফলে চরমপন্থীদেরও কংগ্রেসে প্রবেশের পথ অবারিত হয়েছিল। তিলক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুগামী চরমপন্থীদের নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আপোস ও তাঁদের ঐক্যবদ্ধভাবে কংগ্রেসে কাজ করবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতীয় চেতনা দেখা দিয়েছিল। এনভার পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে যে জাতীয়তাবাদী 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার প্রভাব এসে পড়েছিল ভারতীয় মুসলমানদের ওপর। তরুণ আবুল কালাম আজাদের আল্ হিলাল পত্রিকা উর্দুভাষী মুসলমানদের মধ্যে এক অভিনব উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। মওলানা মহম্মদ আলি, সওকত আলি, খান আবদুল গফর খান প্রভৃতি মুসলিম নেতারা বৃটিশ-বিরোধী তরুণ মুসলিমদের নানাভাবে উদ্দীপিত ক'রে তুলেছিলেন। এই সময়ে আলিগড় থেকে মুসলিম লীগের কার্যালয় লখ্নৌয়ে

স্থানান্তরিত হওয়ায় মুসলিম লীগ ইংরেজ প্রভাব থেকে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত হয়েছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ক্রমেই আবার দানা বেঁধে উঠছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ডাঃ আনসারি, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই অধিবেশনে হিন্দু-মুসলিম একতার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন একই সময়ে হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডি. ই. ওয়াচা, মিসেস অ্যানী বেসান্ট, বি. জি. হর্নিম্যান, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি বহু কংগ্রেস নেতা মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের উপস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা মুসলিম লীগকে বৃটিশ তোষণের পথ থেকে জাতীয় আন্দোলনের পথে নিয়ে এলেন।

এইভাবে যখন কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মিলন, কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের সহযোগিতা এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ভারতীয় রাজনীতিতে একটি অভাবনীয় ঐক্যের সূচনা করলো, তখনই গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে পদার্পণ করলেন।

চৌদ্দ

চম্পারণ

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজীর ভারত পর্যবেক্ষণের এক বৎসর পূর্ণ হ'লো। তাই গোখেলের নির্দেশমতো এখন আর ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর কিছু বলবার বাধা রইল না। এই সময়ে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন হচ্ছিল। এই উদ্বোধনে বক্তৃতাদানের জন্মে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন। ভারতের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিই এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং ভাষণ দিয়েছিলেন। গান্ধীজী ভাষণ দিলেন ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। সভায় ছাত্র ও তরুণ শিক্ষিতের সংখ্যা সর্বাধিক হ'লেও বহু রাজরাজড়াও উপস্থিত ছিলেন। দ্বারভাঙার মহারাজা সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন। মিসেস অ্যানী বেসাণ্ট বক্তৃতা শেষ করবার পরই গান্ধীজী বলতে উঠলেন। মহার্ঘ পরিচ্ছদ ও মণি-মাণিক্য-ভূষিত রাজারাজড়াদের পাশে খাটো খদ্দরের ধুতি ও কাঠিয়াবাড়ী আচকান ও টুপীতে গান্ধীজীকে বেমানান লাগলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় আলোড়নসৃষ্টিকারী এই ক্ষুদ্র শীর্ণকায় মানুষটির দিকে সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। গান্ধীজী তাঁর ভাষণে বললেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ভাষণ দিচ্ছেন না, তিনি শোনা যায় এমন ভাবে চিন্তা করছেন মাত্র—অর্থাৎ যার যেমন লাগে লাগুক, তিনি তাঁর একান্ত মনের কথাগুলোই বলছেন।

গান্ধীজী প্রথমেই মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, পুণায় একজন অধ্যাপক তাঁকে বলেছিলেন যে, ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করায় অন্ততঃ তাঁর জীবনের ছ'টা বছর অকারণে নষ্ট হয়েছে। তাই যদি সত্য হয়, তবে ভারতে যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করছে, তাদের সংখ্যাকে ছয় দিয়ে গুণ করলেই আমরা বুঝবো যে

আমাদের দেশ তার অগ্রগতির পথে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর অপচয় করছে। তাছাড়া, দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, চিন্তাশীল মনীষীরা তাঁদের মূল্যবান্ চিন্তাগুলি ইংরেজীতে প্রকাশ করায় তা সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য হয় না। অন্য দূরের কথা, শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিন্তার ভাগ তাঁদের স্ত্রীরাও পান না। অধ্যাপক রায় (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র) ও অধ্যাপক বসুর (আচার্য জগদীশচন্দ্র) মতো ব্যক্তিদের চিন্তাও আজ সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে উঠছে না।

তারপর গান্ধীজী বললেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতবাসীর জন্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবী করেছেন। কিন্তু যতোই বক্তৃতা দেওয়া হ'ক, তা আমাদের স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত ক'রে তুলবে না। আমাদের চরিত্রই আমাদের স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত ক'রে তুলবে। কিন্তু আমরা নিজেদের শাসন করতে কতোখানি সচেষ্ট হচ্ছি? তারপর তিনি বিশ্বনাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী পরিবেশ সম্পর্কে উল্লেখ ক'রে বললেন, "এই বিরাট মন্দিরটিই কি আমাদের নিজেদের চরিত্রের প্রতিফলন নয়?...এই পবিত্র মন্দিরের গলিপথগুলি যে রকম নোংরা, সে রকম থাকা কি উচিত? বাড়িগুলো কোনরকমে এলোপাথাড়ি গড়ে তোলা হয়েছে। গলিগুলো আঁকাবাঁকা, সরু। আমাদের মন্দিরগুলিই যদি উন্মুক্ততা ও পরিচ্ছন্নতার আদর্শ না হয়, তবে আমাদের স্বায়ত্তশাসনটা কেমন হবে? ইংরেজরা ইচ্ছায় হোক কি বাধ্য হ'য়েই হোক তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভারত ছেড়ে চ'লে গেলেই কি আমাদের মন্দিরগুলি শুচিতা, পরিচ্ছন্নতা ও শান্তির আবাস হয়ে উঠবে? কংগ্রেসের সভাপতি (স্যার এস. পি. সিংহ) যে বলেছেন, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের কথা চিন্তা করার আগে দীর্ঘ পথ এগুতে হবে, তাঁর সঙ্গে আমি একমত।"

গান্ধীজী বললেন, বড় বড় শহরগুলোতে দুটো অংশ থাকে—একটা সৈন্যাবাস, অপরটা আসল শহর। শহরগুলির অধিকাংশই দুর্গন্ধ বিবরবিশেষ। আমরা শহুরে জীবনে অনভ্যস্ত। কিন্তু আমরা

যদি নাগরিক জীবন চাই, তবে আমাদের ঢিলেঢালা গ্রাম্য জীবনের অভ্যাসগুলি ছাড়তে হবে। কোনও বড় শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময়ে সর্বদা পথিকরা রাস্তার পাশের কোন বাড়ির ওপর থেকে গায়ে পানের পিক এসে পড়বার ভয়ে সন্ত্রস্ত আছেন, তা ভাবতেও খারাপ লাগে। ট্রেনেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুরবস্থা দেখেছি। কিন্তু তাদের এই অসুবিধার জন্যে রেল কোম্পানিই সম্পূর্ণ দায়ী নয়। পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক নিয়মগুলোও আমরা জানি না। আমরা প্রায়ই গাড়ির মেঝেতে থুতু ফেলি। ভেবেও দেখি না যে, ওখানে অনেক যাত্রীকে শুতে হয়। আমরা নিজেরা রেলের কামরাগুলিকে ঠিকমতো ব্যবহার করি না। ফলটা হয়ে ওঠে অবর্ণনীয়। তথাকথিত উপরের শ্রেণীর যাত্রীরাও তাঁদের অপেক্ষাকৃত ভাগ্যহীন ভাইদের ভয়ে এতোটুকু ক'রে রাখেন। ছাত্ররাও এ ব্যাপারে কম যায় না। তারা ইংরেজী বলে, বিদেশী কায়দায় পোশাক পরে, সুতরাং গরীব যাত্রীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজেদের জায়গা ক'রে নেওয়ার অধিকার তাদের আছে।

গান্ধীজী বললেন, আমাদের সভার সভাপতি মহামান্য রাজা বাহাদুর কাল সভায় আলোচনাপ্রসঙ্গে ভারতের দারিদ্র্য সম্পর্কে বলেছিলেন। অন্যান্য বক্তারা এ বিষয়ে খুবই জোর দিলেন। কিন্তু যে সভামঞ্চে বড়লাট সেদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেখানে আমরা কি দেখেছিলাম? একটি আশ্চর্যরকম জমকালো দৃশ্য—মূল্যবান মণিমাণিক্যের ঘটা যা প্যারিস থেকে আগত সবচেয়ে বড় মণিকারেরও চোখ ধাঁধিয়ে দিতে যথেষ্ট ছিল। আমি এইসব মণি-মাণিক্যে ভূষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাদের দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের তুলনা ক'রে দেখলাম। ঐসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আমার বলতে ইচ্ছা হ'লো—যদি তাঁরা তাঁদের এইসব মণিমাণিক্য খুলে স্বদেশবাসীদের জন্যে ন্যাসরক্ষকরূপে এগুলি না রাখেন, তবে কি ভারতের মুক্তি আছে? আমার বিশ্বাস সম্রাট

বা লর্ড হার্ডিং, কেউ চান নি যে, এইভাবে বাক্সপেঁটরা ঝেড়ে অলংকারগুলি আপাদমস্তক ধারণ ক'রে তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হোক্।

গান্ধীজী বললেন, বৃটিশ ভারতে বা কোনও দেশীয় রাজ্যে যখনই শুনি যে বিরাট একটি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে, তখনই আমি ব'লে উঠি, "ওরে, এ টাকা যে আমাদের চাষীদের কাছ থেকেই এসেছে!" এই চাষীরাই আমাদের দেশের মানুষের শতকরা ৭৫ ভাগ। অথচ তারা পরিশ্রম ক'রে যা উৎপাদন করে, তা আমরা তাদের কাছ থেকে সবটুকুই কেড়ে নিই বা অপরকে কেড়ে নিতে দিই। এটা কি স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত মনোভাব? আমাদের মুক্তি উকিল, ডাক্তার, জমিদার, কেউ আনতে পারবে না, আনতে পারে ঐ কৃষকরাই।

তারপর গান্ধীজী দেশের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী মনোভাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে তার নিন্দা করলেন। গান্ধীজীর ভাষণ স্বাভাবিক কারণেই উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিরক্ত ক'রে তুলেছিল। যাঁরা স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন, তাঁরাও গান্ধীজীর এইসব উক্তিতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। চরমপন্থী তরুণরাও গান্ধীজীর বক্তৃতায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তাই গান্ধীজীর বক্তৃতার শেষের দিকে তিনি শ্রোতাদের দিক থেকে মাঝে মাঝে বাধা পেতে লাগলেন। এমন কি মিসেস বেসাণ্টও বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন—Please stop it. কিন্তু গান্ধীজী তবু থামলেন না। শ্রোতাদের অনেকেই আসন ছেড়ে উঠে যেতে লাগলেন। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জন্যে নির্দিষ্ট আসনগুলি শূন্য হয়ে গেল। গান্ধীজী তবু তাঁর বক্তব্য ব'লে চললেন। শেষে সভাপতিও সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। সুতরাং গান্ধীজীকে বক্তৃতা বন্ধ করতে হ'লো। এ তাঁর এক অভিনব অভিজ্ঞতা। তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন, "শ্রোতাদের নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে দেখেছি; বক্তাকে বসিয়ে দিতেও দেখেছি;

কিন্তু সভাপতিকে এভাবে সভা ত্যাগ ক'রে চলে যেতে কখনো দেখিনি।" গান্ধীজীর এই ভাষণ সরকারী মহলেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তাই গভীর রাত্রিতে পুলিশ কমিশনার গান্ধীজীকে অবিলম্বে বেনারস ত্যাগ করবার জন্যে নির্দেশ দিলেন। মালব্যজী বুঝিয়ে সুঝিয়ে পুলিশ কমিশনারের এই আদেশ প্রত্যাহার করালেও গান্ধীজী পরদিন সকালেই বেনারস ত্যাগ করলেন।

শুধু সরকার ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীই সেদিন গান্ধীজীর ওপর বিরক্ত হননি, মিসেস বেসাণ্টের মতো ব্যক্তিরাও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীদের তো কথাই নেই। গান্ধীজী গোখেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে পুণা গেলেন এবং সেখানে ভাষণ দিলেন। তিনি হরিদ্বার, মাদ্রাজ ও করাচীতে বহু জনসভায় বক্তৃতা করলেন। যেখানে সম্ভব হ'লো, সেখানেই তিনি হিন্দীতে বক্তৃতা করলেন। তিনি সর্বত্রই স্বদেশী, কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন, অনাড়ম্বর জীবনের আদর্শ, অহিংসা প্রভৃতির কথা বললেন।

এদিকে ভারতীয় রাজনীতিতে দ্রুত পট পরিবর্তন হ'তে লাগলো। তিলক ও মিসেস অ্যানী বেসাণ্ট তাঁদের দুটি পৃথক হোম রুল লীগ প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতের স্বায়ত্তশাসনাধিকার এঁদের উভয়ের দাবী হ'লেও এবং এই দুই সংস্থার দাবী প্রায় এক হ'লেও তাঁরা পৃথক দুটি সংস্থা কেন প্রতিষ্ঠা করলেন, সে সম্পর্কে মিসেস অ্যানী বেসাণ্ট বলেছিলেন, "তিলক একটি হোম রুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমি অন্যটি করেছি। কারণ, অনেক লোক আছেন, যাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন, অথচ আমাকে ঘৃণা করেন; আবার অনেক লোক আছেন, যাঁরা আমাকে ভালোবাসেন, অথচ তাঁকে ঘৃণা করেন। তাই 'একসঙ্গে-পৃথকভাবে' (together-separately) কাজ করাই সর্বোত্তম পন্থা।" সরকার কিন্তু তিলককে নীরব করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো। বেলগাম ও আমেদাবাদে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলির

মধ্য থেকে তিনটিকে বেছে নিয়ে তাঁরা তাঁকে অভিযুক্ত করলো। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে তিনি এই ধরনের কাজে একবছর বিরত থাকবেন এই মর্মে বিশ হাজার টাকার মুচলেকা দিতে আদেশ করলেন। পরে হাইকোর্ট এই আদেশ বাতিল করলেও সরকারের এই নিপীড়নমূলক ব্যবহার তিলকের জনপ্রিয়তা আরও বাড়ালো। ২৯শে জুলাই তাঁর ৬১-তম জন্মদিনে সমগ্র জাতি তাঁকে সম্মান জানালো। জনসাধারণ তাঁকে এক লাখ টাকার একটি তোড়া দিলো। ঐ টাকা তিনি সংবিধানসম্মত পন্থায় জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে ব্যয় করবেন ব'লে স্থির করলেন। ঐ বছরের মাঝামাঝি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শাসনতন্ত্র সংস্কারের দাবীতে একটি মিলিত পরিকল্পনা রচনায় সচেষ্ট হ'লো। শাসন পরিষদগুলিতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বাড়িয়ে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রভাব বৃদ্ধিই ছিল তাঁদের প্রধান দাবী। এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রুর বাড়িতে কংগ্রেস ও লীগ নেতারা মিলিত হয়ে এই পরিকল্পনা রচনা করলেন এবং কলকাতায় কংগ্রেস কমিটি ও লীগ কাউন্সিলের মিলিত অধিবেশনে সেটি গৃহীত হ'লো। অক্টোবর মাসে আমেদাবাদে জিন্নার সভাপতিত্বে যে প্রাদেশিক সম্মেলন হ'লো, তাতে কংগ্রেস ও লীগের এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানানো হ'লো। তিলক প্রধান প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানালেন। গান্ধীজী ভারতরক্ষা আইনের কবল থেকে জনসাধারণের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দাবী ক'রে প্রস্তাব আনলেন।

ডিসেম্বর মাসে (১৯১৬) লখ্‌নৌয়ে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হ'লো তা নানাদিক্ থেকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা হয়ে উঠলো। দীর্ঘ ন'বছর পরে কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা আবার ঐক্যবদ্ধ হলেন। কংগ্রেসের সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার দশ বছর আগে দাদাভাই নওরোজী যে স্বরাজের ধ্বনি তুলেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস মিলিতভাবে সংগ্রামের জন্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হ'লো।

এই চুক্তি লখ্‌নৌ চুক্তি নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়েছে। কংগ্রেস চুক্তি অনুসারে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা (separate electorate) মেনে নিলো। মুসলমানরা যাতে অধিকতর সংখ্যায় নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাতে পারে, তার ব্যবস্থাও করা হ'লো। মুসলমানরা একই সঙ্গে পৃথক নির্বাচন-মণ্ডলী থেকে ও সাধারণ নির্বাচনমণ্ডলী থেকে ভোটদানের অধিকার ত্যাগ করলো। কংগ্রেস-লীগ চুক্তি অনুসারে যেসব দাবী তোলা হ'লো, সেগুলি মোটামুটি এই : (১) প্রশাসন ও অর্থের ব্যাপারে প্রদেশগুলিকে যথাসম্ভব কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে; (২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যদের পাঁচভাগের চার ভাগ নির্বাচনের মাধ্যমে গৃহীত হবেন; (৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কমপক্ষে অর্ধেক সদস্যকে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হ'তে হবে; (৪) গভর্নর জেনারেল বা গভর্নররা তাঁদের বিশেষ ক্ষমতাবলে বাতিল না করলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে তাদের নিজ নিজ আইনসভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করতে হবে; (৫) বৈদেশিক সম্পর্ক ও দেশরক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরঙ্কুশ অধিকার থাকবে; (৬) ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ডোমিনিয়নের মর্যাদা পাবে এবং ভারতসচিবের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্ক উপনিবেশ সচিবের সঙ্গে ডোমিনিয়নগুলির সম্পর্কের অনুরূপ হবে।

যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও লীগের এই ঐক্যবদ্ধ দাবী উপেক্ষিত হবে না ব'লেই সকলে বিশ্বাস করছিলেন। তাই লখ্‌নৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা গেল। ২৩০১ জন প্রতিনিধি ভারতের সকল অঞ্চল থেকে এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। বহু সংখ্যক অতিথি ও দর্শকেরও সমাবেশ হয়েছিল। সভামণ্ডপে তিলধারণের স্থান ছিল না। দীর্ঘ ন'বছর

পরে তিলক লখ্‌নৌ কংগ্রেসের এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালে সমগ্র সভামণ্ডপ ফেটে পড়েছিল। তিলকের জনপ্রিয়তা বিদেশীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এডুইন মণ্টেগু তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "এখন সম্ভবতঃ ভারতে সর্বাধিক শক্তিমান্ পুরুষ হলেন তিলক।" সরকারও তিলক ও মিসেস বেসাণ্টের হোম রুল আন্দোলনের গতিই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। গান্ধীজী হোম রুল আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। এমন কি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সাধনের ক্ষেত্রেও তিনি কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন নি। গান্ধীজী চলেছিলেন তাঁর নিজের পথে, ভারতীয় রাজনীতির প্রধান প্রবাহ থেকে দূরে। তিনি তখনও ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত প্রজা; বৃটিশ শাসকদের সম্পর্কে আশাবাদী। তাই তিনি মিসেস বেসাণ্টকে সুস্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন, "মিসেস বেসাণ্ট, আপনি বৃটিশদের বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমি করি। তাই এই যুদ্ধের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে আমি সাহায্য করতে পারব না।" শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনে—বিদেশী শাসকদের স্থলে স্বদেশী শাসকদের আগমনেই যে দেশের প্রকৃত উপকার হবে, এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। সুতরাং দেশকে স্বরাজের উপযুক্ত ক'রে তোলাই ছিল তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্বে তিনি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গভীরভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন। সামাজিক ক্ষেত্রে জাতি ও ধর্মের গোঁড়ামি, অস্পৃশ্যতা, অন্ধ কুসংস্কার ও হৃদয়হীন সংকীর্ণতা তাঁকে যেমন ব্যাকুল করেছিল, তেমনি তাঁকে ব্যাকুল করেছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য—জনসাধারণের দারিদ্র্য, কৃষক ও শ্রমিকের দুঃসহ জীবন, সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক অবিচার। কংগ্রেস তখনও ছিল সীমিত মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান। মুসলিম লীগও তাই। গান্ধীজীই কংগ্রেসকে প্রকৃত জনসাধারণের সংস্থায় পরিণত

করেন। যে দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষক, সে দেশের প্রকৃত স্বরাজের জন্যে কৃষকদের সমর্থন ও সহযোগিতা যে চাই, তা তিনি ভালো ক'রেই জানতেন। তাছাড়া, সত্যাগ্রহের সৈনিকরূপে দরিদ্র মানুষ যে ত্যাগ ও দুঃখবরণের দুঃসাহস দেখতে পারে, ধনীরা যে তা পারে না, দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধীজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতের দরিদ্র মানুষদের হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই তিনি হোম রুলের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন।

তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন। তাই ভারত সফরকালে এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের প্রশ্নটি সর্বদাই তাঁর মনে জাগরূক ছিল। বছরের পর বছর ধ'রে ভারতীয় নেতারা ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে, কংগ্রেসের অধিবেশনে ও অসংখ্য জনসভায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণের প্রথা রহিত করবার জন্যে দাবী জানাচ্ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাতে কর্ণপাত করেন নি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস প্রথা রহিত হওয়ার পর এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণের প্রথাই তার স্থান অধিকার করেছিল। তাই ইংরেজ সরকার এই প্রথা রোধ ক'রে তার উপনিবেশগুলির বাগিচা ও খনির মালিকদের ক্ষতি করতে অনিচ্ছুক ছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মালব্যজী কেন্দ্রীয় আইন সভায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণের প্রথা রোধ করবার প্রস্তাব তুললে তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিং জানান যে, বৃটিশ সরকার এই প্রথা তুলে দেবেন। কিন্তু কবে তোলা হবে, সে সম্পর্কে তিনি নির্দিষ্ট কিছু না বলায় গান্ধীজী এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সংশয় পোষণ করতে থাকেন। পর বৎসর (১৯১৭) ফেব্রুয়ারি মাসে মালব্যজী পুনরায় ঐ প্রস্তাব একটি বিলের আকারে আইন সভায় তুলতে চাইলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড

তাতে অনুমতি দিলেন না। তাই গান্ধীজী এ বিষয়ে দেশব্যাপী একটি অন্দোলন গ'ড়ে তোলার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু এই ধরনের কোন আন্দোলন শুরু করবার আগে তিনি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। চেম্‌স্‌ফোর্ড তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেন না।

তাই গান্ধীজী বোম্বাই থেকে এ বিষয়ে প্রচার-ভ্রমণ শুরু করলেন। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইম্পিরিয়াল সিটিজেন্‌স্‌ অ্যাসো-সিয়েনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি এই অমানুষিক প্রথার নিন্দা ক'রে বক্তৃতা দিলেন। এই সভায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখের মধ্যে এই ঘৃণিত প্রথা রহিত করবার দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। গান্ধীজী করাচী, কলকাতা ও অন্যান্য বহু জায়গায় জনসভা ক'রে এই প্রথা রহিত করবার দাবী জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর ভ্রমণকালে সর্বত্রই গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে অনুসরণ করলো এবং ট্রেনে নানাভাবে উত্ত্যক্তও করলো। গান্ধীজী যখন এইভাবে একটি আন্দোলন গ'ড়ে তুলছিলেন, তখন ভারতীয় নারীদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। জনমত এবং গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ করবার জন্যে প্রস্তুতি দেখে বড়লাট ১২ই এপ্রিল থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বিদেশে প্রেরণ নিষিদ্ধ ক'রে আদেশ জারী করলেন। অবশ্য ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকেই এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয়।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণের প্রথার মতোই আর একটি শোচনীয় ব্যবস্থা ছিল এ দেশে—নীলকরদের হাতে নীলচাষীদের অবাধ শোষণের ব্যবস্থা। নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুদীর্ঘকাল ধরেই চলছিল। সম্প্রতি বিহারেও এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের করুণ কাহিনী গান্ধীজী

প্রথম শুনেছিলেন। রাজকুমার শুক্ল নামে একজন কৃষক কর্মী 'নীলের এই দাগ ধুয়ে ফেলবার' কঠোর সংকল্প নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে নীলচাষীদের হয়ে আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন এবং কলকাতা কংগ্রেসে নীলচাষীদের প্রসঙ্গ উঠলে গান্ধীজীকে আলোচনায় অংশ নিতে বললেন। কিন্তু নীলচাষীদের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় গান্ধীজী আলোচনায় অংশ নিতে চাইলেন না এবং রাজকুমার শুক্লকে কথা দিলেন যে, তিনি বিহারের চম্পারণে যাবেন এবং সেখানে দু-একদিন থেকে নীলচাষীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসবেন। এই প্রতিশ্রুতিতেই কিন্তু রাজকুমার শুক্ল ক্ষান্ত হলেন না, তিনি ছায়ার মতো গান্ধীজীর পিছু পিছু ঘুরতে লাগলেন এবং গান্ধীজীকে শেষ পর্যন্ত চম্পারণ জেলায় নিয়ে গেলেন।

চম্পারণ জেলাটি বিহারের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। গণ্ডক নদী এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। চম্পারণ জেলায় দুটি শহর আছে—মতিহারি ও বেতিয়া। মতিহারি সদর শহর। প্রায় তিন শ গ্রাম আছে এই জেলায়। শতকরা নব্বই ভাগ লোক গ্রামে থাকে। নীলের চাষ গ্রামবাসীদের অন্যতম প্রধান জীবিকা। বিগত দু শতাব্দী ধরেই এখানে নীলের চাষ চ'লে আসছে। আগে নীলকররা ছিল স্থানীয় লোক। পরে নীল ও আখের ব্যবসা ইংরেজদের হাতে চ'লে যায় এবং ইংরেজ নীলকররা এক ভয়াবহ জাল বিস্তার ক'রে নীলচাষীদের জীবন দুঃসহ ক'রে তোলে।

গান্ধীজী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্যে কলকাতা এসেছিলেন। তিনি রাজকুমার শুক্লের সঙ্গে কলকাতা থেকে ৯ই এপ্রিল (১৯১৭) রওনা হয়ে পাটনা পৌঁছলেন। শুক্ল গান্ধীজীকে রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ঐ সময় রাজেন্দ্রপ্রসাদ পুরী চলে যাওয়ায় গান্ধীজী তাঁর বিলাতে অবস্থানকালের এক প্রাক্তন বন্ধু ও মুসলিম লীগের

ভূতপূর্ব সভাপতি মঝরল হকের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ঐদিন সন্ধ্যায় গান্ধীজী মজফ্‌ফরপুর রওনা হলেন। ঐ সময় জে. বি. কৃপালনী মজফ্‌ফরপুর গভর্নমেণ্ট কলেজে অধ্যাপনা করতেন। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ আলাপ না থাকলেও পত্রালাপ ছিল। তিনি ছাত্রদের নিয়ে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনার জন্যে স্টেশনে হাজির ছিলেন। তা ছাড়াও বহু লোক গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করবার জন্মে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্টেশনে গান্ধীজীকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হ'লো। অনেকে তাঁর আরতি করলেন এবং তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে তাঁর গাড়ি নিজেরা টেনে নিয়ে গেলেন। সেদিন রাত্রে গান্ধীজী কৃপালনীর সঙ্গে তাঁর হোটেলে রইলেন। পরদিন শহরের অনেক উকিল এসে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদও এসে পৌঁছলেন। উকিলরা সকলেই নীলচাষীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। তাঁরা নীলকরদের বিরুদ্ধে নীলচাষীদের মামলা চালিয়ে তাদের সাহায্য করেন, তাও জানালেন—অবশ্য, ফী নিয়েই। কিন্তু গান্ধীজী বললেন, আদালতে মামলা ক'রে এই ধরনের অন্যায়ের প্রতিকার সম্ভব নয়। যে 'তিনকাঠিয়া' প্রথার ফলে নীলচাষীদের এই দুর্গতি, তা রহিত করতে না পারলে নীলচাষীদের প্রকৃত কোনও উপকার হবে না। এর প্রতিকারের জন্মে কারাবরণ করতেও তিনি প্রস্তুত।

১১ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজী প্ল্যাণ্টার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মিঃ উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর আসবার উদ্দেশ্য কি জানালেন। মিঃ উইলসন তাঁকে বললেন যে, অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারিরূপে নয়, ব্যক্তিগতভাবে তিনি গান্ধীজীকে সম্ভব হ'লে সাহায্য করবেন। তবে গান্ধীজী বাইরের লোক, নীলকর ও নীলচাষীদের বিবাদের মধ্যে তাঁর আসা উচিত নয়। গান্ধীজী অতঃপর চম্পারণ রওনা হলেন এবং ত্রিহুত বিভাগের কমিশনার মিঃ মর্স্‌হেডকে তাঁর উপস্থিতির কথা জানিয়ে

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। মিঃ মর্স্‌হেড ১৬ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি গান্ধীজীর বিহারে আসার জন্যে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বললেন, সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করছেন, সুতরাং অবিলম্বে গান্ধীজীর চম্পারণ ত্যাগ করা উচিত। গান্ধীজী বললেন, তিনি দীর্ঘদিন ধ'রে এখানকার লোকদের কাছ থেকে বহু চিঠিপত্র পেয়েছেন, তাই নীলচাষীদের প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে এসেছেন। সুতরাং চম্পারণ ত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীর চিঠিসহ নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে পরে কমিশনারকে একটি পত্রও দিলেন। এরপর গান্ধীজী গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নীল-চাষীদের সঙ্গে দোভাষীর সাহায্যে আলাপ করতে লাগলেন। তাঁর আগমন সংবাদে দলে দলে নীলচাষীরা এসে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে লাগলো। তিনি যতোই শুনতে লাগলেন, যতোই দেখতে লাগলেন, ততোই চম্পারণ ত্যাগ না করবার সংকল্প দৃঢ়তর হ'তে লাগলো। ১৫ই এপ্রিল তারিখে তিনি চম্পারণের সদর শহর মতিহারির উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁর কার্যকলাপ যে সরকার ও নীলকররা ভালো চক্ষে দেখছে না, এবং তাঁকে যে কোনও মুহূর্তে যে গ্রেপ্তার করা হ'তে পারে, তা গান্ধীজী জানতেন। তাই তিনি গ্রেপ্তারের জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

পরদিন দুপুরে তিনি যখন একটি গ্রামে একজন লোকের কাছে গ্রামবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন, তখন একজন দারোগা সাইকেলে ক'রে সেখানে এসে উপস্থিত হ'লো এবং গান্ধীজীকে জানালো যে, কালেক্টর সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। দারোগা গান্ধীজীর জন্যে গোরুর গাড়ী ও পরে একা যোগাড় ক'রে দিলো। পথে ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং একা থেকে নিজের গাড়িতে তুলে নিলেন। গাড়ি কিছুদূর অগ্রসর হ'লে ডেপুটি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

গান্ধীজীকে একটি নোটিশ পড়তে দিলেন। এই নোটিশে তাঁকে পরের ট্রেনেই চম্পারণ ছেড়ে চ'লে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজী জানালেন, চম্পারণ ত্যাগ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; এজন্যে তাঁর যে শাস্তি হবে, তা তিনি মাথা পেতে নেবেন।

আদেশ-অমান্যের ফলে তাঁর গ্রেপ্তার যে অবধারিত, গান্ধীজী তা জানতেন। তাই তিনি সারারাত জেগে পত্র লিখলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে কিভাবে কাজ ক'রে যেতে হবে, সে সম্পর্কে বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদকে সব বুঝিয়ে দিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে তার ও চিঠিপত্র এসে পৌঁছতে লাগলো। মঝরুল হক ও মালব্যজী চম্পারণ আসবার ইচ্ছা জানালেন। রাজেন্দ্র প্রসাদকে স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে এসে পড়তে বলা হ'লো। সি. এফ. এণ্ড্রুজ এসে পৌঁছলেন। ১৭ই এপ্রিল মতিহারিতে বহু প্রজার কাছ থেকে গান্ধীজী তাদের বিবৃতি নিলেন। তিনি বিবৃতিগুলি নেওয়ার সময়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে জেরা করতেন, তাদের বাড়িয়ে বা বানিয়ে কিছু বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। এইভাবে বিবৃতি নেওয়া যখন চলছিল, তখন একজন দারোগা এসে উপস্থিত ব্যক্তিদের সকলের নাম লিখে নিলো। গান্ধীজী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এইভাবে সারাদিন বিবৃতি নেওয়া হ'লো। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও সমন এলো না দেখে গান্ধীজী মতিহারি থেকে ষোল মাইল দূরে একটি গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি পত্র দিলেন। তিনি একথাও জানালেন যে, তিনি গোপনে কিছুই করতে চান না, তাই একজন পুলিস অফিসার তাঁর সঙ্গে দিলে ভালো হয়। ম্যাজিস্ট্রেট উত্তরে জানালেন, গান্ধীজী যেন মতিহারি ত্যাগ না করেন, তাঁকে ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত ক'রে শীঘ্রই সমন পাঠানো হবে।

সমন এসে পৌঁছলো। তাতে তাঁকে ১৮ই এপ্রিল তারিখে

মহকুমা শাসকের কাছে হাজির হ'তে বলা হয়েছে। গান্ধীজী কারাবরণের জন্যে প্রস্তুত হলেন। ১৮ই এপ্রিল দুপুরে তিনি তাঁর দুজন দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে একটি গাড়িতে ক'রে আদালতে রওনা হলেন। তাঁর সহকর্মীরাও সকলে তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন। তাঁরা জানালেন, তাঁরাও জেলে যেতে প্রস্তুত। গান্ধীজী হাসিমুখে বললেন, এবার তাঁদের সাফল্য অনিবার্য।

গান্ধীজী আদালতে গিয়ে দেখলেন, এই নূতন পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন সংবাদ না দেওয়া সত্বেও আদালত জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। তিনি যখন আদালতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর পিছুপিছু দু হাজারেরও বেশি লোক আদালতে ঢুকলো। আদালতে ঢুকবার চেষ্টায় বেশ ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতিও হ'লো। আদালতের জানালার কয়েকটি কাচও ভেঙে গেল। অবস্থা দেখে হাকিম গান্ধীজীকে মোক্তারদের লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিলেন এবং লোকে যাতে আদালতে ঢুকতে না পারে সেজন্যে সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করলেন। পরে গান্ধীজীকে আদালতে আনা হ'লো। সরকার পক্ষের উকিল মামলার জন্যে দিন চাইলে, গান্ধীজী প্রতিবাদ ক'রে বললেন, তার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি যে চম্পারণ ত্যাগের আদেশ অমান্য করেছেন, তা তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করছেন। তার পর আদালতে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাঠ করলেন। তাতে তিনি বললেন :

"আমি মানুষ ও জাতির সেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি। কৃষকরা নীলকরদের কাছে ন্যায়সংগত ব্যবহার পাচ্ছে না ব'লে জানিয়েছে এবং এসে তাদের সাহায্য করবার জন্যে আমাকে সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু সমস্যাটি ঠিক কি তা ভালোভাবে না জেনে আমার পক্ষে সাহায্য করা তো সম্ভব নয়। তাই আমি সম্ভব হ'লে প্রশাসন বিভাগ ও নীলকরদের সহযোগিতা নিয়েই অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছি। এছাড়া আমার আর অন্য কোনও

উদ্দেশ্য নেই এবং আমি বিশ্বাস করি না যে, আমার আসার ফলে কোনরকম গোলযোগ ও জীবনহানি ঘটতে পারে। এসব বিষয়ে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে ব'লেই আমি দাবী করি। প্রশাসন বিভাগ, অবশ্য, অন্যরকম মনে করেন। আমি তাঁদের অসুবিধার কথা বুঝি এবং স্বীকার করি, তাঁরা যেমন সংবাদ পান, তার ওপর ভিত্তি ক'রেই তাঁদের কাজ করতে হয়। আইনানুগ নাগরিকরূপে আমার ওপর যে আদেশ জারি করা হয়েছে, তা মেনে নেওয়াই আমার প্রথম কাজ। কিন্তু আমি যাদের জন্যে এখানে এসেছি, তাদের প্রতি আমার যে কর্তব্য আছে, তা লঙ্ঘন না ক'রে তা আমি করতে পারি না। আমি মনে করি, এখন তাদের মধ্যে থেকেই আমি তাদের সেবা করতে পারি। সুতরাং স্বেচ্ছায় আমি চ'লে যেতে পারি না। কর্তব্যের এই সংঘাতের মধ্যে আমি কেবল আমাকে বহিষ্কৃত করবার দায় আমি প্রশাসনের ওপর ছেড়ে দিতে পারি। আমি ভারতের জনজীবনে যে স্থান অধিকার করি, সেরকম কোনও ব্যক্তির পক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার বিষয়ে যে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমি পূর্ণ সচেতন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যে ধরনের জটিল শাসনতন্ত্রের মধ্যে বাস করি, তাতে আমি যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, সেরকম কোন অবস্থায় কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র নিরাপদ ও সম্মানজনক পথ হ'লো, আমি যে পথ নিতে সংকল্প করেছি তা—অর্থাৎ বিনা প্রতিবাদে আদেশ অমান্যের শাস্তি গ্রহণ করা।"

১৪৪ ধারার এই আদেশ জারী যে সম্পূর্ণ বে-আইনী হয়েছিল, ম্যাজিস্ট্রেট তা জানতেন। তাই তিনি এই অবস্থায় কি করবেন, স্থির করতে পারছিলেন না। গান্ধীজীকে এই অভিযোগের ভিত্তিতে দণ্ড দিতে তিনি ইতস্ততঃ করছিলেন। তাই তিনি গান্ধীজীকে বললেন, "আপনি যদি এখন এই জেলা ত্যাগ ক'রে চলে যাওয়ার

প্রতিশ্রুতি দেন, তবে মামলা প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হবে।” গান্ধীজী বললেন, “তা অসম্ভব। শুধু এখন নয়, আমি জেল থেকে বেরিয়ে আবার চম্পারণে ফিরে আসব এবং চম্পারণই আমার বাসস্থান হয়ে উঠবে।” ম্যাজিস্ট্রেট কি করবেন, স্থির করতে না পেরে জানালেন যে, তিনি বেলা তিনটেয় রায় দেবেন। তিনটার সময় গান্ধীজী উপস্থিত হ'লে ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন, ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত তিনি রায় দেওয়া স্থগিত রাখছেন, গান্ধীজী এক শ' টাকার জামিনে মুক্তি পাবেন। গান্ধীজী বললেন, এখানে তাঁর জামিনদার কেউ নেই। তখন ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীজীকে ব্যক্তিগত জামিনেই মুক্তি দিলেন। গান্ধীজী বাসায় ফিরে এসে এ সম্পর্কে তাঁর বন্ধুদের কাছে ও সংবাদপত্রগুলিতে পত্র দিলেন। কিন্তু রায় প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এ নিয়ে আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে বললেন। ইতিমধ্যে মঝরুল হক, বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, অনুগ্রহনারায়ণ, শম্ভুশরণ, মিঃ পোলক প্রভৃতি ব্যক্তিরা মতিহারিতে এসে পৌঁছলেন। স্থির হ'লো গান্ধীজীর জেল হ'লে মঝরুল হক ও ব্রজকিশোরবাবু নেতৃত্ব করবেন। ১৯শে এপ্রিল থেকে আবার দলে দলে কৃষকরা এসে জবানবন্দী দিতে লাগলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম জবানবন্দী নেওয়া চললো। জবানবন্দীগুলির সভ্যতা কঠোরভাবে জেরা ক'রে বিচার ক'রে তবে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হ'লো। ওদিকে রায়দানের নির্ধারিত তারিখের আগে ২০শে এপ্রিল ম্যাজিস্ট্রেট একটি লিখিত বার্তা পাঠিয়ে জানালেন যে, লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নর গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ক'রে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন গান্ধীজী ইচ্ছামতো তদন্ত চালাতে পারেন, প্রয়োজন হ'লে সরকারী কর্মচারীরাও তাঁকে সাহায্য করবেন।

২২শে তারিখে গান্ধীজী বেতিয়া গেলেন। বেতিয়ার অগণিত মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। স্টেশনে এতো লোকের ভীড়

হয়েছিল যে, ট্রেনটি স্টেশনের বাইরেই থামাতে হ'লো। পরদিন গান্ধীজী বেতিয়ার মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করলেন। পরদিন গান্ধীজী ও ব্রজকিশোরবাবু লৌকড়িয়া গেলেন। সেখানে গান্ধীজী যখন গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন বেতিয়ার মহকুমা শাসক মিঃ লিউইসও উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী এখানে দুদিন থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে বেতিয়ায় ফিরলেন। ২৭শে এপ্রিল তিনি পদব্রজে হেঁটে রাজকুমার শুক্লের গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন। গান্ধীজী দেখলেন, শুক্লের গৃহটি ভগ্নাবস্থায় রয়েছে, নীলকুঠির এজেন্টরা এটি লুঠ করেছে ও ভেঙেচুরে দিয়েছে। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে তদন্ত ক'রে তিনি পরদিন সদলবলে বেতিয়ায় ফিরলেন। তিনি হাজার হাজার গ্রামবাসীর জবানবন্দী নিলেন। স্থানীয় প্রশাসনবিভাগ এইসব অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে নিজেদের নিতান্ত অসহায় বোধ করলো। এমন কানাঘুষা শোনা গেল যে, সরকার গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীদের ভারতরক্ষা আইনে বিহার থেকে বহিষ্কৃত করবে এবং তাঁদের কাগজপত্র নষ্ট ক'রে দেবে। ২৮শে মে তারিখে সন্ধ্যায় বেতিয়ার মহকুমা শাসক মিঃ লিউইস সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন, তার একটি কপি গান্ধীজীর কাছে পাঠালেন। গান্ধীজী সেটি পড়ে তাতে তাঁর মন্তব্যগুলি লিখে দিলেন।

ইউরোপীয় সম্প্রদায়, স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা এবং নীলকররা সকলেই সরকারের কাছে গান্ধীজীর কার্যকলাপের অতিরঞ্জিত ও ভীতিপ্রদ বিবরণ পাঠাতে লাগলো। ফলে সরকার গান্ধীজীকে চম্পারণে থাকার অনুমতি দিলেও তাঁর দলবল যাতে চম্পারণ ত্যাগ করে, সে ব্যবস্থা করতে বললেন। গান্ধীজী তাতে রাজী হলেন না। তবে তিনি শীঘ্রই তাঁর তদন্তের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি প্রায় আড়াই হাজার শব্দের একটি রিপোর্ট পাঠালেন। এতে তিনি কৃত্রিম

নীল আমদানির ফলে নীলের দাম পড়ে যাওয়ায় নীলকরদের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা কিভাবে নীলকররা কৃষকদের নানাভাবে শোষণ ক'রে উম্মূল করছে, সুস্পষ্টভাবে দেখালেন। তিনি দেখালেন, তিনকাঠিয়া প্রথায় কৃষককে তার সেরা জমি নীলচাষের জন্যে দিতে হচ্ছে, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার অন্য ফসল ফলাবার কোনও সুযোগ নেই। কুঠিতে নীল নিয়ে যাওয়ার জন্যে খরচাও নামমাত্র দেওয়া হয়। কুঠির শ্রমিকদের কাজের জন্যে অত্যল্প পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তাদের নির্দয়ভাবে খাটানো হয়। বালকরাও রেহাই পায় না। কুঠির নিজস্ব জমিতে লাঙল করবার জন্যে চাষীদের লাঙল জোর ক'রে নিয়ে আটক রাখা হয়, এতে চাষীরা সময়মতো নিজেদের জমিতে লাঙল দিতে পারে না। কুঠির কর্মচারীরা কুঠির শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের সামান্য বেতনের ও গাড়িভাড়ার এক-পঞ্চমাংশ দস্তুরি হিসাবে আদায় করে। প্রায়ই বেআইনীভাবে কুঠির শ্রমিকদের জরিমানা করা হয়। কুঠিতে কেউ কাজ করতে রাজী না হ'লে তাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার ও জুলুম করা হয়, তাদের গোরু-বাছুর খোঁয়াড়ে আটক রাখা হয়, তাদের বাড়িতে পাইক বসে, তাদের ধোপা, নাপিত, ছুতার, কামার বন্ধ করা হয়। কূয়া থেকে তাদের জল নিতে দেওয়া হয় না, তাদের বাড়ির সামনের বা পেছনের রাস্তা লাঙল চালিয়ে তাদের বেরুবার পথটুকু পর্যন্ত বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, অনেক সময় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা আনা হয়। তাদের মারপিট করা হয়, ঘরে আটক রাখা হয়। স্থানীয় জমিদাররাও অনেকে এইসব পথ নেয়। কিন্তু গরীব প্রজারা সরকারের কাছে এর কোন প্রতিকার পায় না।

গান্ধীজীর রিপোর্ট পেয়ে সরকার জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, সেটেলমেণ্ট অফিসার ও নীলকরদের কাছ থেকে ৩০শে জুনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়ে পাঠালো। লেপ্টন্যাণ্ট-গভর্নর স্যার এডোয়ার্ড গেট গান্ধীজীকে দেখা করবার জন্যে রাঁচী ডেকে পাঠালেন।

এতে গান্ধীজীর সহকর্মীরা ভয় পেলেন এবং সেখানে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার কথা ভেবে সকলেই উদ্‌বিগ্ন হলেন। গান্ধীজী ৪ঠা জুন রাঁচীতে স্যার এডোয়ার্ড গেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পর পর তিন দিন ধ'রে লেঃ গভর্নরের সঙ্গে ও তাঁর শাসন পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা চললো। ফলে স্থির হ'লো, নীলকর ও রায়তদের সম্পর্কের বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন বসানো হবে এবং গান্ধীজীও ঐ কমিশনের সদস্য হবেন। ৮ই জুন গান্ধীজী পাটনা হয়ে বেতিয়ায় ফিরে এলেন। ১৩ই জুন সরকার মধ্য প্রদেশের কমিশনার মিঃ এফ. জি. ফ্রাইয়ের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করলো। স্থির হ'লো, কমিটি জুলাই মাসে কাজ আরম্ভ করবে এবং তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করবে।

১২ই জুলাই থেকে কৃষকদের জবানবন্দী নেওয়া বন্ধ করা হ'লো। এপর্যন্ত গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা আট হাজারের বেশি লোকের জবানবন্দী নিয়েছিলেন। তবু ডাকে অসংখ্য জবানবন্দী আসতে লাগলো। গান্ধীজী ইতিমধ্যে একবার বোম্বাই থেকে ঘুরে এলেন।

১১ই জুলাই থেকে কাজ শুরু হ'লো। স্থির হ'লো কমিটির পরবর্তী অধিবেশনগুলি বেতিয়া, মতিহারি প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় বসবে। কমিটির অধিবেশন যেখানে হ'তো সেখানেই হাজার হাজার কৃষক এসে ভীড় করতো। গান্ধীজী তাদের এইভাবে ভীড় না ক'রে তাদের বক্তব্যগুলি তাঁর সহকর্মীদের জানাতে বললেন। ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত কমিটির কতকগুলি অধিবেশন হওয়ার পর সাময়িক ভাবে অধিবেশন বন্ধ রইলো। গান্ধীজী ১৬ই আগস্ট আমেদাবাদ যান এবং চম্পারণে কাজের ভার রাজেন্দ্র প্রসাদের উপর দিয়ে যান। ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি ফিরে আসেন এবং ৩রা অক্টোবর দীর্ঘ আলোচনার পর কমিটির সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন। সরকার রিপোর্টের সুপারিশ-

গুলি গ্রহণ ক'রে আইন সভায় চম্পারণ ভূমি সংস্কার বিলটি আনেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি আইনে পরিণত হয়।

কিন্তু গান্ধীজী জানতেন, এই আইনই কৃষকদের রক্ষা করতে পারবে না। কারণ কৃষকদের দুর্ভোগের মূলে আছে তাদের অজ্ঞতা। তাই তিনি অবিলম্বে এই অঞ্চলে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করলেন। তিনি শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে স্বেচ্ছাসেবক-শিক্ষকরূপে কাজ করবার জন্যে আবেদন জানালেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষকরা এসে পৌঁছলেন। এঁদের মধ্যে কর্নাটক থেকে আগত বাবাসাহেব সোমন ও পুণ্ডলিক, বোম্বাই থেকে আগত অবন্তিকাবাঈ গোখেল, পুণা থেকে আগত আনন্দিবাঈ বৈশম্পায়ন ও শঙ্কররাও দেও প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম থেকেও ছোটেলাল, সুরেন্দ্রনাথ ও দেবদাসকে আনলেন। মহাদেব দেশাই ও নরহরি পারিখও সস্ত্রীক এসে পৌঁছলেন। এঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন কস্তুরবাঈ। ১৪ই নভেম্বর প্রথম বিদ্যালয়টি মতিহারি থেকে মাইল চোদ্দ দূরে একটি গ্রামে স্থাপিত হ'লো। দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি স্থাপিত হ'লো সপ্তাহ খানেক পরে বেতিয়া থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে একটি গ্রামে। এখানে একজন সাধু তাঁর মন্দিরটিকে বিদ্যালয়ের জন্যে বিনা ভাড়ায় দিয়েছিলেন। পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে মধুবনীতে তৃতীয় বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় পরিচালনা করেন মহাদেব দেশাই, নরহরি পারিখ ও কৃপালনী। গান্ধীজী এইসব বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুসরণ করলেন না। বিদ্যালয়গুলিতে বারো বছরের কম বয়স্ক ছাত্রদের নেওয়া হ'লো। তাদের হিন্দী, উর্দু, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, কৃষি ও বিভিন্ন কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'লো। শিক্ষার্থীদের চরিত্রের ও শক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশই ছিল লক্ষ্য। গ্রামবাসীরা তাঁদের বাড়িতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের

থাকতে দিতেন। গান্ধীজী এবিষয়ে নীলকর ও জমিদারদের সহযোগিতাও চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা সহযোগিতার পরিবর্তে নানাভাবে বিরোধিতাই করছিল। একবার একটি বিদ্যালয় তারা পুড়িয়েও দিয়েছিল। কিন্তু কর্মীরা নিজের মাথায় ইট বয়ে এনে শীঘ্রই একটি নূতন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। ছ মাস বাদে গান্ধীজী নূতন শিক্ষক-শিক্ষিকার উপর বিদ্যালয়গুলির ভার দিলেন।

চম্পারণে গান্ধীজী দরিদ্র জনসাধারণের সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলেন এক সুমহান্ কর্তব্য তাঁর সম্মুখে রয়েছে এবং সে কর্তব্য সম্পাদনের অফুরন্ত শক্তি রয়েছে এই দীন হীন দরিদ্র কৃষকদের মধ্যেই। দরিদ্র মানুষের এই শক্তির পরিচয় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতেও পেয়েছিলেন।

পনেরো

আমেদাবাদ ও খেদা

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বেশির ভাগ সময় গান্ধীজী চম্পারণে কাটালেও ঐ সময় তাঁকে অন্যান্য বিভিন্ন কাজেও ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ে কোচরাবে প্লেগ দেখা দিলে তিনি সত্যাগ্রহ আশ্রমটিকে স্থানান্তরিত করবার প্রয়োজন বোধ করেন। এখানে আশ্রমের পরিবেশটিও তাঁর মনোমত ছিল না। তিনি জুন মাসে তাঁর এক ব্যবসায়ী বন্ধুর সাহায্যে সবরমতী নদীর তীরে আশ্রমের জন্যে একটি স্থান সংগ্রহ করেন। এই স্থানটি ছিল সবরমতী জেলের কাছেই। এখানে কোন বাড়ি না থাকায় আশ্রমবাসীরা কিছুদিন ক্যাম্প ক'রে রইলেন। আশ্রমটির পরিচালনা করতে লাগলেন মগনলাল গান্ধী।

এই সময়ে ভারতবর্ষে তিলক, মিসেস বেসাণ্ট ও গান্ধী সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তিলক ও মিসেস বেসাণ্ট সারা দেশে ঘুরে ভারতবাসীকে হোম রুলের দাবীতে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। তিলকের প্রধান কর্মস্থল ছিল মহারাষ্ট্র ও মিসেস বেসাণ্টের প্রধান কর্মস্থল ছিল মাদ্রাজ। তাই ঐ দুটি প্রদেশে হোম রুল আন্দোলন খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এবং সর্বস্তরের মানুষের মনে তা সাড়া জাগিয়েছিল। গান্ধীজী হোম রুল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়লেও এই আন্দোলনকে সমর্থন করছিলেন। হোম রুল আন্দোলন ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকেই ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবী। কিন্তু এই সামান্য দাবীকেও বৃটিশ সরকার প্রশ্রয় দিচ্ছিল না। মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড পেটল্যাণ্ড মিসেস বেসাণ্টকে ও তাঁর সহকর্মীদের অন্তরীণ ক'রে মাদ্রাজে হোম রুল আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে চাইলেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে সারা দেশে তুমুল

বিক্ষোভ দেখা দিল। হোম রুল আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করলো। কংগ্রেসের চরমপন্থী, নরমপন্থী, মুসলিম লীগ, সকল রাজনৈতিক দলের মুখে এক কথা—হোম রুল। হোম রুল আন্দোলনের ফলে ভারতে যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে, এই ব'লে বৃটিশ আমলাতন্ত্র যে অতিরঞ্জিত চিত্র প্রচার করতে চেয়েছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, তিলকের মতো বৃটিশবিরোধীও ভারতীয়দের বৃটিশ বাহিনীতে যোগ দিতে বলছিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একটি মিলিত সভায় জিন্না, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজবাহাদুর সপ্রু ও ওয়াজির হাসানকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে পাঠাবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তাঁরা ইংলণ্ডে ভারতের হোম রুলের ন্যায়সংগত দাবীকে তুলে ধরবেন এবং বৃটিশ সরকার যাতে লখ্‌নৌয়ে গৃহীত শাসন-সংস্কার প্রস্তাব অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থার রদবদল করে, সে জন্যে সচেষ্ট হবেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিসেস বেসান্ট, আবুল কালাম আজাদ, সওকত আলি প্রভৃতি বরেণ্য নেতাদের মুক্তির দাবীতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তাবও করেছিলেন।

ভারতের এই ন্যায়সংগত দাবীর প্রতি কিন্তু বৃটিশ সরকার এতোদিন কর্ণপাত করে নি। মেসোপটেমিয়ায় মিত্র শক্তির বিপর্যয় বৃটিশ সরকারকে সচেতন ও সন্ত্রস্ত ক'রে তুললো। ভারত থেকে উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ না হওয়ার জন্যে মিঃ মণ্টেগু তৎকালীন ভারত সচিব মিঃ অস্টেন চেম্বারলেনের তীব্র সমালোচনা করলেন। এই সমালোচনার ফলে মিঃ চেম্বারলেন পদত্যাগ করলেন এবং মিঃ মণ্টেগু হলেন ভারত সচিব (২০শে আগস্ট, ১৯১৭)। মিঃ মণ্টেগু ভারতীয়দের সম্পর্কে নরম নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যুদ্ধে ভারতীয়দের পূর্ণ সহযোগিতা লাভের ইচ্ছায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে ভারতে ক্রমে স্বায়ত্ত-শাসনশীল সরকারের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসনশীল সংস্থাসমূহের

গঠন ও প্রশাসনের সকল শাখায় ভারতীয়দের সহযোগিতার সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের অভিপ্রায়ের কথা ঘোষণা করলেন। মিসেস বেসাণ্ট ও তাঁর সহকর্মীদের মুক্তি দেওয়া হ'লো। মিঃ মণ্টেগু নিজে ভারত পরিদর্শনে এলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি-দল বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ও মিঃ মণ্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁদের শাসন-সংস্কার বিষয়ক পরিকল্পনার কথা জানালেন। এই প্রতিনিধিদলে তিলক, জিন্না, সপ্রু, মতিলাল নেহ্‌রুর সঙ্গে গান্ধীজীও ছিলেন। কংগ্রেস-লীগের শাসন-সংস্কার বিষয়ক পরিকল্পনাটি রচনায় গান্ধীজী অংশ না নিলেও তিনি এই পরিকল্পনাকে গুজরাটে জনপ্রিয় ক'রে তুললেন এবং মিঃ মণ্টেগুর কাছে একটি আবেদন পত্রে কয়েক হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন। আবেদন পত্রে বলা হ'লো যে, এই পরিকল্পনার ফলাফল ব্যাখ্যা ক'রে জানাবার পর স্বাক্ষরগুলি সংগৃহীত হয়েছে। নভেম্বর মাসে গোধরায় যে গুজরাট রাজনৈতিক সম্মেলন হ'লো, তাতে গান্ধীজী সভাপতিত্ব করলেন। ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনেও গান্ধীজী অংশ গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষে গান্ধীজী কলকাতা থেকে চম্পারণ গেলেন এবং সেখানে শিক্ষা ও সমাজউন্নয়নমূলক কাজে কিছুদিন আত্মনিয়োগ করলেন।

কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯১৮) আমেদাবাদ থেকে তাঁর ডাক এলো সেখানে মিল-মালিকদের ও শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তাতে শ্রমিকদের সাহায্য করতে। আবেদনটি পাঠিয়েছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট মিল-মালিক অম্বালাল সারাভাইয়ের ভগিনী অনসূয়াবেন সারাভাই। মিল-মালিকদের অনেকেই ছিলেন গান্ধীজীর বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। অম্বালাল সারাভাই এই মালিক-শ্রমিক বিরোধে মালিকদের নেতৃত্ব করেছিলেন। অথচ ইনিই গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আশ্রমের জন্য অকৃপণহস্তে দান করেছিলেন।

কিন্তু এসব হিসাব গান্ধীজীকে তাঁর কর্তব্য থেকে বিরত করলো না। তিনি চম্পারণ থেকে অবিলম্বে আমেদাবাদে ছুটলেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে আমেদাবাদে ভয়ংকর প্লেগ দেখা দিয়েছিল। ফলে লোকে দলে দলে আমেদাবাদ ত্যাগ করছিল। মিলের শ্রমিকরা যাতে আমেদাবাদ ত্যাগ না করে, সেজন্যে মিলের মালিকরা তাদের টাকা পিছু বারো আনা বোনাস দিচ্ছিল। কিন্তু প্লেগের প্রাদুর্ভাব দূর হ'লে মিল-মালিকরা ঐ বোনাস দিতে অসম্মত হ'লো। এদিকে যুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বেড়েছিল। তাই শ্রমিকরা ঐ বোনাস বন্ধ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো। এইভাবে মালিক-শ্রমিক বিরোধের সূত্রপাত হ'লো। গান্ধীজী আমেদাবাদে পৌঁছে মিলের মালিকদের সঙ্গে ও শ্রমিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। এই আলোচনার ফলে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়েই এ বিষয়ে মীমাংসার ভার একটি ট্রাইবুন্যালে দিতে সম্মত হলেন। গান্ধীজী, শংকরলাল ব্যাঙ্কার ও বল্লভভাই প্যাটেল শ্রমিকদের এবং অম্বালাল সারাভাই, জগভাই, ও চণ্ডুলাল চিমনলাল মালিকদের প্রতিনিধিত্ব করলেন। ট্র্যাবুন্যালের সভাপতি হ'লেন আমেদাবাদের কালেক্টর মিঃ চ্যাটফীল্ড। কিন্তু ট্রাইবুন্যালের কাজ শুরু হওয়ার আগেই মিল-মালিকরা ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে হঠাৎ লক-আউট ঘোষণা করলেন এবং ট্রাইবুন্যালে গেলেন না। ষোল দিন বাদে মিল-মালিকরা তাদের মিলগুলি খুললো। কিন্তু এখন শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে রাজী হ'লো না, তারা ধর্মঘট করলো। তারা দাবী জানালো, অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ-ভাগ মাইনে তাদের বাড়াতে হবে। মিল-মালিকরা শেষ পর্যন্ত শতকরা বিশ ভাগ মাইনে বাড়াতে রাজী হ'লেন। গান্ধীজী মীমাংসার জন্যে শ্রমিকদের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ মাইনে বৃদ্ধিতে রাজী করালেন। কিন্তু মিল-মালিকরা তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। ফলে গান্ধীজী শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবীর সমর্থনে শ্রমিকদের নেতৃত্ব

গ্রহণ করলেন। তবে তিনি এই সংগ্রাম পরিচালনার পূর্বে শ্রমিকদের কাছে কয়েকটি প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিলেন : তারা হিংসার আশ্রয় নেবে না ; তারা দলত্যাগী শ্রমিকদের লাঞ্ছনা করবে না ; তারা ভিক্ষা বা অপরের দানের উপর নির্ভর করবে না ; তারা ধর্মঘট চলার সময়ে নিজ নিজ জীবিকা সাধু উপায়ে অর্জন করবে ; এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের সংকল্পে অটল থাকবে। একটি জনসভায় শ্রমিকরা এই শপথ গ্রহণ করলো। গান্ধীজী সবরমতী নদীতীরে বৃক্ষচ্ছায়ায় নিয়মিত সভা ক'রে শ্রমিকদের অহিংস সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত ক'রে তুললেন। প্রতিদিন হাজার হাজার শ্রমিক সভাগুলিতে যোগ দিলো এবং তারা রোজ আমেদাবাদ শহরের পথে পথে মিছিল ক'রে তাদের দাবী জানালো।

প্রথম দু সপ্তাহ শ্রমিকরা অসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখালো। কিন্তু এই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ক্রমেই ভাটা পড়তে লাগলো। সভায় শ্রমিকের সংখ্যা কমতে লাগলো। ক্ষুধার জ্বালা ও হতাশা তাদের মুখে চোখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। অনেকে এমন কথাও বলতে লাগলো, "গান্ধী সাহেব আমরণ লড়াইয়ের কথা বলতে পারেন ; তাঁকে তো অনাহারে থাকতে হয় না !" গান্ধীজী শ্রমিকদের মনোবল অটুট রাখবার জন্যে জনসভায় ধর্মঘটের সম্মানজনক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর অনশনের সংকল্প ঘোষণা করলেন। এইরকম ঘোষণার জন্যে শ্রমিকরা প্রস্তুত ছিল না। তারা একবাক্যে ব'লে উঠলো : "আপনি নয়, আমরাই অনশন করব। আমাদের দুর্বলতা মাফ করুন। আমরা শেষ পর্যন্ত সংকল্পে অটল থাকবো।" গান্ধীজী বললেন, "তোমাদের অনাহারে থাকবার প্রয়োজন নেই। তোমরা সংকল্পে অটল থাকলেই হবে।" তিনি শ্রমিকদের কিছু কিছু কাজ ক'রে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করতে বললেন এবং মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত নিজের অনশনের সংকল্পের কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন। বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদ পৌরসভায়

শ্রমিকদের কিছু কাজ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। মগনলাল বললেন, সবরমতী আশ্রমে যে তাঁতশিল্পের বাড়িটি তৈরি হবে, তার ভিত করবার কাজেও কিছুসংখ্যক শ্রমিককে লাগানো যেতে পারে। অনসূয়াবেন নিজে মাথায় মাটির ঝুড়ি নিয়ে শ্রমিকদের এই কাজে লাগালেন। অনসূয়াবেন ও কয়েকজন সহকর্মী গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথমদিন অনশন করলেন।

গান্ধীজীর অনশনের সংবাদে দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো। মিল-মালিকরা কেবল দেশব্যাপী সমালোচনার সম্মুখীন হলেন না; গান্ধীজীকে তাঁদের অনেকেই গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। গান্ধীজীর অনশনে তাঁরা উদ্বেগ বোধ করলেন। শ্রমিকরাও নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেলো। গান্ধীজী তিনদিন অনশন করবার পর মিল-মালিকরা শতকরা ৩৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবী মেনে নিয়ে মীমাংসা করলেন। গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন। এই উপলক্ষে মিল-মালিকরা শ্রমিকদের মধ্যেও মিষ্টান্ন বিতরণ করলেন। ১৯শে মার্চ তারিখে মিল-মালিক ও কমিশনারের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক-ভাবে মীমাংসা ও ধর্মঘটের অবসান ঘটলো।

আমেদাবাদে শ্রমিক ধর্মঘটের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজীর ডাক এলো খেদা জেলা থেকে। খেদা জেলায় এ বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে অজন্মা হয়েছিল। সরকারী আইন অনুসারে শতকরা ২৫ ভাগ বা তার কম ফসল হ'লে সে বৎসর চাষীরা খাজনা ছাড় পায়। এ বৎসর অজন্মার ফলে ফসল শতকরা ২৫ ভাগের কম হয়েছে দাবী ক'রে চাষীরা খাজনা আদায় বন্ধ রাখার দাবী করলো। কিন্তু সরকার পক্ষ ফসল শতকরা ২৫ ভাগের বেশি হয়েছে দাবী ক'রে খাজনা আদায় শুরু করলো। ফলে চাষীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিলো। সার্ভেন্ট্স্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ব্যাপক তদন্ত করা হ'লো এবং তাঁরা ফসলের পরিমাণ শতকরা পঁচিশ ভাগের কম হয়েছে ব'লে

কমিশনারের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠালেন। কৃষকদের পক্ষ থেকে মোহনলাল পাণ্ড্য ও শংকরলাল পারিখ প্রভৃতি ব্যক্তিরা আন্দোলন শুরু করলেন। বোম্বাই প্রদেশের আইন সভায় বিঠলভাই প্যাটেল এ বিষয়ে প্রস্তাব আনলেন এবং একাধিক প্রতিনিধিদল গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কিন্তু ফল কিছুই হ'লো না। গান্ধীজী খেদায় পৌঁছে প্রথমেই পঞ্চাশটিরও বেশী গ্রামে নিজে গিয়ে ক্ষেতগুলি স্বচক্ষে দেখলেন এবং গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, এ বৎসর শস্য শতকরা পঁচিশ ভাগের কম হয়েছে। তিনি প্রথমে এ বিষয়ে তদন্তের জন্যে একটি নিরপেক্ষ কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করলেন। সরকার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত না ক'রে জোর ক'রে খাজনা আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। তখন গান্ধীজী বললেন, যে সব ক্ষেতে সাধারণত ছ আনার বেশি ফসল হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে ভিন্ন অন্যত্র খাজনা আদায় পুরোপুরি বা ক্ষেত্রবিশেষে আধা-আধি বন্ধ রাখা হ'ক। কিন্তু সরকার তাতেও কর্ণপাত না করলে গান্ধীজী কৃষকদের ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ থেকে সত্যাগ্রহ করতে আহ্বান জানালেন। গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা দ্রুত সত্যাগ্রহ গ'ড়ে তোলেন। এ বিষয়ে বল্লভভাই প্যাটেল, শংকরলাল ব্যাংকার, অনসূয়াবেন, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ও মহাদেব দেশাই ছিলেন গান্ধীজীর প্রধান সহকর্মী। এই সত্যাগ্রহে খাজনা বন্ধই ছিল প্রধান হাতিয়ার। যাদের খাজনা দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাদেরও খাজনা বন্ধ রাখতে আহ্বান জানানো হ'লো। কারণ, তাঁরা খাজনা দিলে গরীব চাষীরা ভয় পেয়ে জমি, থালা-বাসন, আসবাবপত্র প্রভৃতি বিক্রি ক'রে বা ঋণ ক'রে খাজনা দেবে। যাঁদের খাজনা দেওয়ার সামর্থ্য আছে, তাঁরাও গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সত্যাগ্রহীর সংখ্যা দু হাজারেরও বেশি হ'লো। খাজনা বন্ধ আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করলো।

যুদ্ধের এই সংকটজনক মুহূর্তে গান্ধীজী এই ধরনের একটি

আন্দোলনের সূত্রপাত করায় কমিশনার তাঁর নিন্দা করলে গান্ধীজী তার উত্তরে বললেন :

"কমিশনারই এই সংকট ডেকে এনেছেন।...তিনি আত্মসমর্থনের জন্যে যুদ্ধকে টেনে আনছেন এবং সাম্রাজ্যের এই বিপদের দিনে আমাদের দাবী থেকে রায়তদের ও আমাকে বিরত থাকবার জন্যে বলেছেন। কিন্তু আমি নির্ভয়ে বলতে চাই, কমিশনারের এই মনোভাব জার্মানির চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক। যে বিপদ্ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে আসছে, তার হাত থেকেই আমি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে চাই। দীর্ঘ সুষুপ্তি থেকে ভারত যে জেগে উঠছে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। রায়তদের নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য কি তা বুঝবার জন্যে তাদের লেখাপড়া জানার প্রয়োজন হয় না। শুধু জানার প্রয়োজন তাদের অপরাজেয় শক্তির কথা। কোনও সরকার, তা যতোই শক্তিশালী হ'ক না কেন, তাদের ইচ্ছা ও সংকল্পের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। সাম্রাজ্যের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করছে ভারতে খেদা জেলার রায়তরা।"

কমিশনার রায়তদের জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে নেওয়ার ভয় দেখালেন এবং সরকারী কর্মচারীদের গোরু বাছুর সহ যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি ক'রে খাজনা আদায় করতে বললেন। কৃষকদের জরিমানা প্রভৃতি দণ্ডেরও ব্যবস্থা করা হ'লো। মাঠের ফসল বাজেয়াপ্ত করা চললো। সরকারের এই দমন নীতির সম্মুখে কৃষকরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। গান্ধীজী কৃষকদের মনোবল বৃদ্ধির জন্যে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত জমির ফসল তুলে নেওয়ার জন্যে সত্যাগ্রহীদের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, এ ফসল কৃষকদের প্রাপ্য, এতে সরকারের কোনও অধিকার নেই। মোহনলাল পাণ্ড্য কয়েকজন সত্যাগ্রহী সহ এই রকম একটি ক্ষেতের ফসল তুলে নিলেন। সরকার তাঁদের গ্রেপ্তার করলো এবং বিচারে তাঁদের জেল হ'লো। সত্যাগ্রহীদের

জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেলো। কৃষকদের সাহস ও মনোবল ফিরে এলো। আন্দোলন ও প্রতিরোধ ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করলো। কিন্তু চার মাস সংগ্রাম চলবার পর হঠাৎ তার অবসান ঘটলো। সরকার থেকে জানানো হ'লো যে, যাদের খাজনা দেওয়ার সামর্থ্য আছে, তারা যদি খাজনা দেয়, তবে গরীব প্রজাদের খাজনা রেহাই দেওয়া হবে। সরকারের এই শর্ত মেনে নিতে কোনও অসুবিধা ছিল না। খেদার কৃষকদের সংগ্রাম জয়ী হ'লো। সত্যাগ্রহীরা জেল থেকে মুক্তি পেলেন এবং জনসাধারণ তাঁদের বিপুল অভ্যর্থনা জানালো। গান্ধীজীকে সংবর্ধনা জানানো হ'লে তিনি তার উত্তরে বললেন: "যে জনসাধারণের সেবক, তার কোনও সম্মান গ্রহণ করতে নেই। সেবাকেই যে তার ধর্ম করেছে, সে সম্মান কামনা করতে পারে না। যখনই সে তা করবে, তখনই সে শেষ হবে।...আমাকে সম্মান জানাবার শ্রেষ্ঠ পথ হ'লো আমার কথামতো চলা এবং আমার নীতিকে কার্যে পরিণত করা।"

গান্ধীজীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও তাঁর সংগ্রামের রীতিনীতি সরকারকে চিন্তিত ক'রে তুলেছিল। ১৭ই এপ্রিল তারিখে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্র সচিবকে একটি পত্রে লেখেন যে, "গান্ধীজীকে তাঁর সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করবার জন্যে বলা উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে আপনার অভিমত জানবার জন্যে মহামান্য ভাইসরয় আমাকে বলেছেন। গান্ধীর অশান্ত কার্যকলাপকে অন্য কোনও উপযোগী-খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব মনে হয়; তাঁকে যদি তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া হয়, তবে তাঁর কার্যকলাপ ও কর্মশক্তি সর্বদাই নানা ঝামেলার সৃষ্টি করবে।" উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব লিখলেন যে, "আমি লক্ষ্য করেছি, গান্ধী মেসোপটেমিয়ায় বা ফ্রান্সে যুদ্ধের সহায়ক কোনও কাজে আত্মনিয়োগ করতে আগ্রহী। তাঁকে যদি কোনও কাজে মেসোপটেমিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তবে অনেক ঝামেলা বাঁচে।"

এপ্রিল মাসের শেষে দিল্লীতে যে যুদ্ধ সম্মেলন বসলো, বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড তাতে যোগদানের জন্যে গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করলেন। গান্ধীজী আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও এই সম্মেলনে তিলক, মিসেস বেসাণ্ট ও আলী ভাইদের মতো সর্ববরেণ্য নেতাদের আমন্ত্রণ না করায় প্রতিবাদ জানালেন। তিনি দিল্লী পৌঁছে বড়লাটকে তাঁর এই আপত্তির কথা জানালেন। বড়লাট তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, যদি গান্ধীজী সত্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যকে মোটামুটি হিতকর শক্তি ব'লে মনে করেন, তবে তিনি নিশ্চয় এই সংকটময় মুহূর্তে বৃটেনকে সাহায্য করবেন। তিনি আরও বললেন যে, যুদ্ধের পরে গান্ধীজী যতো ইচ্ছা নৈতিক বাদ-প্রতিবাদ তুলতে বা বিবাদ করতে পারবেন, কিন্তু এখন নয়। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী যুদ্ধ সম্মেলনে যোগ দিতে রাজী হলেন। বড়লাট তাঁকে সৈন্য-সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি সমর্থন করতে অনুরোধ করলে তিনি হিন্দীতে একটিমাত্র বাক্য ব'লে সমর্থন জানালেন।

১০ই জুন বোম্বাইয়ে বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড লিনলিথগোর সভাপতিত্বে একটি যুদ্ধ সম্মেলন হ'লো। গান্ধীজী ছাড়াও দেশের বহু নেতা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। লর্ড লিন্‌লিথগো এই সম্মেলনে হোম রুল আন্দোলনকারীদের সমালোচনা করলেন এবং তিলককে তাঁর বক্তৃতাকালে হোম রুল সম্পর্কে কিছু না বলতে নির্দেশ দিলেন। এতে তিলক ক্ষুব্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করলেন। তাঁর সঙ্গে জিন্না, হর্নিম্যান, কেলকার, করণ্ডিকার প্রভৃতি নেতারাও বেরিয়ে এলেন। গভর্নরের এই ব্যবহারের প্রতিবাদে ১৬ই নভেম্বর বোম্বাইয়ে যে সভা হ'লো, গান্ধীজী তাতে গভর্নরের কার্যের তীব্র সমালোচনা করলেন এবং তিলক প্রভৃতিকে অপমান করায় গভর্নর যে যুদ্ধ প্রচেষ্টার ক্ষতিসাধন করেছেন, তাও বললেন। তবে তিনি সভায় উপস্থিত জনতার কাছে এই সংকটকালে বৃটেনকে সাহায্যের

জন্যে আবেদন জানালেন। তিনি খেদা জেলার অধিবাসীদের উদ্দেশেও দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষায় সাহায্য করবার জন্যে আবেদন প্রচার করলেন। কয়েকদিন পূর্বে যে খেদাবাসী তাঁকে দেবতুল্য শ্রদ্ধার আসন দিয়েছিল, তারা তাঁর এই আবেদনে কর্ণপাত করলো না। গান্ধীজী ও বল্লভভাই প্যাটেল যখন সৈন্য সংগ্রহের জন্যে খেদায় গেলেন, তখন তাঁরা গোযান পর্যন্ত সহজে পেলেন না, অধিকাংশ পথ তাঁদের পায়ে হেঁটেই ঘুরতে হ'লো। অনেক সময় তাঁদের গ্রামের বাইরে রেঁধে খেতে হ'লো। যারা গান্ধীজীকে দূর-দূরান্তর থেকে দেখতে এসেছিল, তারা গ্রাম থেকে বাইরে এসে তাঁর খবরও নিলো না। বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ক্ষোভ যে কতো গভীর গান্ধীজী তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। অনেক সভায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'লো, "আপনি তো অহিংসার পূজারী, তবে আপনি আমাদের অস্ত্র ধরতে বলছেন কেমন ক'রে?" অনেকে বললো, "বৃটিশ রাজ আমাদের জন্যে কি করেছে যে, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব?"

গান্ধীজী এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নি। সত্যই, গান্ধীজীকে এই সৈন্য-সংগ্রহকারীর ভূমিকায় অত্যন্ত বেমানান লেগেছিল। কিন্তু তিনি সৈন্য সংগ্রহের বিষয়ে কেন উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর নিজের অহিংস নীতি ও তাঁর গুরু টলস্টয়ের শিক্ষাকে সাময়িকভাবে কেন লঙ্ঘন করেছিলেন, তা মিসেস বেসাণ্টকে লেখা তাঁর ৪ঠা জুলাইয়ের পত্র থেকে বোঝা যায়ঃ আমরা যদি সৈন্য সরবরাহ করি, তবে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো শর্ত আরোপ করতে পারব। কিন্তু আমরা যদি শর্তের জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকি, তবে যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতে পারে; তখন ভারত সামরিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে এবং আমরা একটি সামরিক একনায়কত্বের মুখোমুখি দাঁড়াবো। বর্তমান অবস্থায়

এটাই হ'লো সর্বাপেক্ষা স্বার্থপর দিক্ এবং আমাদের স্বার্থই বলবে যে, আমি দেশের সামনে যে পথের নির্দেশ রেখেছি, তাই এক মাত্র নির্ভুল পথ।" গান্ধীজী হোম রুল লীগের অন্যান্য নেতাদের কাছেও ঐ ধরনের পত্র লিখে হোম রুল লীগের কার্যালয়গুলিকে সৈন্য-সংগ্রাহক "সংস্থায় পরিণত করতে বললেন। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন, আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই আমরা বৃটিশ সরকারের কাছে কিছু পেতে পারি। তিনি তাঁর পত্রে ও প্রচারপত্রে এ কথাও বললেন যে "ভারতে বৃটিশের বহু কুকীর্তির মধ্যে ইতিহাস বলবে সর্বাধিক কলঙ্কজনক কীর্তি হ'লো একটি সমগ্র জাতিকে অস্ত্রব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা। আমরা যদি অস্ত্র আইন রদ করাতে চাই, আমরা যদি অস্ত্রের ব্যবহার শিখতে চাই, তবে এই হ'লো সুবর্ণ সুযোগ।"

গান্ধীজী সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। এই সময় চিনে বাদাম, কলা ও পাতিলেবুই ছিল তাঁর খাদ্য। রাঁধা খাবার তিনি কিছুই খেতেন না। পরিশ্রম ও এই ধরনের আহারের ফলে তাঁর শরীর দ্রুত ভেঙে পড়লো এবং তিনি কঠিন আমাশা রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁকে সবরমতী আশ্রমে এনে রাখা হ'লো। তিনি এখানে নিজেই জলচিকিৎসা করতে লাগলেন। তাতে যন্ত্রণার ও রোগের কিছুটা উপশম হ'লেও শরীরের কোনও উন্নতি হ'লো না। ডাক্তাররা তাঁকে মাংসের যুস ও ডিম খেতে বললেন। কিন্তু তিনি সেগুলি স্পর্শও করলেন না। তিনি ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর পদধ্বনিও যেন শুনতে পেলেন। এই সময়ে তিনি গীতা পাঠ করতেন এবং তাঁর সব কাজই অসমাপ্ত রয়ে গেল ব'লে দুঃখ প্রকাশ করতেন।

এমন সময়ে সংবাদ এলো, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, জার্মানির পরাজয় হয়েছে এবং সৈন্য সংগ্রহের আর প্রয়োজন নেই। নভেম্বর মাসের

শেষার্ধে তিনি একটি পার্বত্য নিবাসে কাটালেন এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বোম্বাই এলেন। ডাক্তাররা সকলেই বললেন, দুধ ছাড়া স্বাস্থ্যোদ্ধার কোনক্রমে সম্ভব নয়। কিন্তু দুধ তিনি পান করবেন না ব'লে যে শপথ করেছিলেন, তা ভাঙতে কোনমতে রাজী হলেন না। শেষে কস্তুরবাঈ তাঁকে বোঝালেন যে, তিনি গোরুর দুধ সম্পর্কে শপথ করেছিলেন, কিন্তু অন্য দুধ সম্পর্কে তো করেননি। গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত ছাগ দুগ্ধ খেতে রাজী হলেন। গান্ধীজী এ সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছিলেন, এতে "বাঁচবার ইচ্ছা সত্যের প্রতি আগ্রহের চেয়েও শক্তিশালী প্রমাণিত হ'লো।"

ধীরে ধীরে গান্ধীজী আরোগ্যের পথে অগ্রসর হলেন। তাঁর মৃত্যুর নয়, এক মহান্ জীবনের আহ্বান তিনি শীঘ্রই শুনতে পেলেন। রোগশয্যায় তিনি উঠে বসলেন, নিজের মধ্যে অনুভব করলেন এক অপরিসীম শক্তি। যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্যে তিনি প্রাণপাত করতে চলেছিলেন, সেই বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে তাঁর মোহের কুজ্‌ঝটিকা সম্পূর্ণরূপে স'রে গেল—তার বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি শিউরে উঠলেন।

ষোল

সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ

গান্ধীজী যখন সৈন্যসংগ্রহে ব্যস্ত ও রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস থেকে মহাযুদ্ধের মোড় ফিরেছিল এবং জার্মানি ও তার সহযোগীরা বিভিন্ন রণক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হচ্ছিল। নভেম্বর মাসে জার্মানির পরাজয়ে মহাযুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। যুদ্ধের পরে ভারতবাসী বৃটেনের কাছে উপযুক্ত প্রতিদান পাবে, এমন আশা ভারতের জনসাধারণ পোষণ করছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মণ্টেগু-চেম্স্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। রিপোর্টটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে রিপোর্ট নিয়ে মতদ্বৈধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। এ রিপোর্টে যেসব শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেগুলিকে নরমপন্থীরা মেনে নিলেন। কিন্তু চরমপন্থী ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতারা একে যথেষ্ট মনে করলেন না। তিলক বললেন, রিপোর্টটি ভালো, কিন্তু পরিকল্পনাটি কোনও কাজের নয়—"a good report with a useless scheme." মিসেস বেসাণ্ট বললেন, "এই রিপোর্টে যে রাজনৈতিক সংস্কারের ইঙ্গিত রয়েছে, তা ইংলণ্ডের পক্ষে দেওয়ার ও ভারতের পক্ষে নেওয়ার অযোগ্য।" গান্ধীজী অবশ্য বললেন, "পরিকল্পনাটিকে পত্রপাঠ অগ্রাহ্য না ক'রে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার ক'রে দেখা উচিত।" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নরমপন্থীরা এই পরিকল্পনাটি কংগ্রেসে গৃহীত হবে ব'লে মণ্টেগুকে ভরসা দিলেন। কিন্তু কার্যতঃ যখন তাঁরা দেখলেন যে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই এই পরিকল্পনার বিরোধী, তখন তাঁরা আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত বোম্বাই কংগ্রেসে অনুপস্থিত থাকলেন। সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে

বোম্বাইয়ে চারদিন ধরে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। দীর্ঘ আলোচনার পর এই কংগ্রেস কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মিলিতভাবে গৃহীত স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবগুলিকেই কার্যকর করবার দাবী তুললো এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের কম কিছু ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করবে না ব'লে ঘোষণা করলো। নরমপন্থীরা যাঁরা কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশন বয়কট করেছিলেন, তাঁরা বোম্বাইয়ে পৃথকভাবে একটি অধিবেশন করলেন, তাঁরা মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড-পরিকল্পিত শাসন সংস্কারকে গ্রহণের জন্যে সুপারিশ করলেন। তাঁরা দু-একটি সামান্য সংশোধনের প্রস্তাব করলেন এবং মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড পরিকল্পনাকে বৃটিশ রাষ্ট্রনায়কগণ যাতে দ্রুত কার্যকরী করেন, সেজন্য একটি প্রতিনিধিদল ইংলণ্ডে পাঠাবারও প্রস্তাব নিলেন।

ইতিপূর্বেই তিলক ও মিসেস বেসাণ্ট ইংলণ্ডে ভারতবিরোধী বা ভারতের স্বার্থহানিকর প্রচারের বিরোধিতা করবার জন্যে ইংলণ্ডে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে সংকল্প করেছিলেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে তিলক ভারতের প্রায় ত্রিশটি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ইংলণ্ডে প্রতিনিধিদল প্রেরণের জন্যে প্রায় দুলক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে তিলক একজনের কাছে এক টাকা না নিয়ে চৌষট্টি জনের কাছে চৌষট্টি পয়সা নেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই প্রচার অভিযানে মোটরে ও রেলে প্রায় দু হাজার মাইল ঘুরেছিলেন। তখন তাঁর বয়স একষট্টি বছর এবং সুদীর্ঘ নির্জন কারাবাসের ফলে শরীর ভগ্ন হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রযাত্রা করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। এপ্রিল মাসেই এই প্রতিনিধি দলের ইংলণ্ড যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পাসপোর্ট না দেওয়ায় ঐ সময় তাঁরা ইংলণ্ড যেতে পারেন নি। ইতিমধ্যে স্যার ভ্যালেন্টিন চিরলের বিরুদ্ধে তিলকের মানহানির মামলা দেশে বিদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ঐ

মামলা আর স্থগিত রাখা সম্ভব নয় জেনে সরকার তিলককে পাসপোর্ট দিতে বাধ্য হ'লো। তবে ইংলণ্ডে তিনি কোনও সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতে পারবেন না, এই শর্ত আদায় ক'রে নেওয়া হ'লো। তিলক সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। তিনি ইংলণ্ডে পৌছেই সর্বপ্রথমে সভাসমিতিতে তাঁর বক্তৃতাদানের যে বাধা ছিল তা অপসারিত করলেন। অবশ্য, যাতে তাঁর মামলার কোনও ক্ষতি না হয়, সেজন্যে তিনি প্রথম কয়েক মাস সভাসমিতিতে যোগ দিলেন না। তবে তিনি ইংলণ্ডে পৌছে বৃটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি পুনরুজ্জীবিত করলেন। তিনি ইংলণ্ডের শ্রমিক দল ও শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য স্থাপন করলেন। শ্রমিক দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'হেরাল্ড' কাগজটি যাতে দৈনিক হেরাল্ডে পরিণত হ'তে পারে সেজন্যে শ্রমিক দলকে দু হাজার পাউণ্ডের (প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার) একটি চেক দিলেন। জর্জ বার্নার্ড শ, সিডনি ওয়েব প্রভৃতি তৎকালীন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। তিনি অসংখ্য রচনায় ও ভাষণে ভারতের সমস্যা ও দাবীগুলিকে বৃটিশ জনসাধারণের সমক্ষে তুলে ধরলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হ'লো, তাতেও তিনি ভারতের সমস্যাগুলি সম্পর্কে পার্লামেন্টের সদস্যপদ-প্রার্থীদের সচেতন ক'রে তুললেন। ঐ সময়ে প্যারিসে শান্তি সম্মেলন চলছিল। তাই তিনি শান্তি সম্মেলনে ভারতের বক্তব্য রাখবার জন্যে প্যারিসে যেতে চাইলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাঁকে পাসপোর্ট না দেওয়ায় শান্তি সম্মেলনের প্রেসিডেণ্টের কাছে তিনি একটি স্মারকলিপি পাঠালেন। শান্তি সম্মেলনে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন যে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি ঘোষণা করেছিলেন, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড পরিকল্পনায় যে তা কার্যকর হবে না, তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখালেন। বৃটিশ সরকার ও ভারত সরকার তিলক সম্পর্কে

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশের সপ্তাহ কাল পরেই সিডিসন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। এই রিপোর্টেও তিলকের কার্যকলাপ ও বক্তৃতা একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। তিলক ও তাঁর অনুগামীদের মসিলিপ্ত করা এবং তাঁদের সম্পর্কে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করবার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু তাতে তিলকের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি যে ভারতের অবিসংবাদী ও সর্বাধিক শক্তিশালী জননায়ক দেশে বিদেশে সে সম্পর্কে কোনও সংশয় ছিল না। তিলক ইংলণ্ডে থাকা কালেই তাঁকে কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনের সভাপতি ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল। অবশ্য, ডিসেম্বরে দিল্লীতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো, তখন তিনি দেশে ফিরতে না পারায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। কিন্তু কংগ্রেসে তিলকেরই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'লো।

কংগ্রেসের ইতিহাসে এই অধিবেশন এক নূতন অধ্যায় সূচিত করলো। আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হ'লো: প্রেসিডেণ্ট উইলসন, মিঃ লয়েড জর্জ ও অন্যান্য রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা ভবিষ্যৎ বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে সকল প্রগতিশীল জাতির ক্ষেত্রে যে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস দাবী করে যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও শান্তি সম্মেলন ভারতকে প্রগতিশীল জাতিরূপে স্বীকৃতি দিক্ এবং তার ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রযোজ্য হ'ক। ভারতে এই নীতির কার্যকর প্রয়োগের প্রথম পদক্ষেপ রূপে আলাপ-আলোচনার পথ থেকে সকল অন্তরায় অপসারিত করা উচিত, এবং সেজন্যে অবাধ রাজনৈতিক সমালোচনার ক্ষেত্রে বাধা আরোপ করে যে সকল আইন-কানুন, বিধিনিষেধ, অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি রয়েছে সেগুলি অবিলম্বে রদ করা হ'ক; তাছাড়া, সাধারণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন অনুসারে বিচারের বাইরে বৃটিশ ভারতীয় প্রজাদের গ্রেপ্তার

আটক, বহিষ্কৃত ও কারারুদ্ধ করবার অধিকার যেসব আইন-কানুন, বিধিনিষেধ ও অর্ডিন্যান্স বলে শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছে সেগুলি রদ করা হ'ক ; ভারতে রাজদ্রোহের আইনকে ইংলণ্ডে প্রচলিত রাজদ্রোহ আইনের অনুরূপ করা হ'ক, এবং, সর্বোপরি, বৃটিশ পার্লামেণ্টে আইন ক'রে ভারতে একটি পূর্ণ দায়িত্বশীল সংস্কার প্রতিষ্ঠা করা হ'ক ; এবং যখন এই পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সকল আভ্যন্তরীণ বিষয়ের কর্তৃত্বভার ভারতীয় জাতির ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যমরূপে একটি সর্বোচ্চ আইন সভার উপর ন্যস্ত থাকবে।"

বিচারপতি রাওলাটের সভাপতিত্বে রাজদ্রোহের প্রশ্ন সম্পর্কে তদন্তের জন্যে সরকার যে কমিটি নিয়োগ করেছিল, তাতে বিনা বিচারে বিপ্লবী কার্যে লিপ্ত সন্দেহে যে কোনও ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ ও অন্তরীণ করবার সুপারিশ করা হয়েছিল। কংগ্রেসে এই রাওলাট কমিটির সুপারিশগুলির তীব্র নিন্দা করে বলা হ'লো : "যদি রাওলাট কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর করা হয়, তবে তা ভারতবাসীর মৌলিক অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ হবে।" কংগ্রেস প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে লোকমান্য তিলক, গান্ধীজী ও সৈয়দ হাসান ইমামকে পাঠানোর জন্যেও দাবী জানালো। গান্ধীজী অসুস্থ থাকায় দিল্লীর অধিবেশনে যোগ দেন নি। এইভাবে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের অবসান হ'লো।

এলো ১৯১৯। ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল, কিন্তু তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। শান্তি সম্মেলনে যে আত্মনিয়ন্ত্রণের বাণী ও আদর্শ ঘোষিত হয়েছিল তা বাগাড়ম্বর মাত্র ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে জাতীয়তাবাদীরা যেমন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তেমনি বৃটেন তার সাম্রাজ্যবাদী দমননীতিকে কঠোর থেকে কঠোরতর করেছিল। আয়ারল্যাণ্ডে সিন ফিন দলের নেতৃত্বে আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা

কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। মিশরে জাতীয়বাদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদীরা এক নব উদ্দীপনা ও প্রেরণা লাভ করেছিল। যুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল। ফলে ভারতের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। কলকারখানায় ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। পরাজিত তুরস্কের সুলতানের প্রতি বৃটেনের ব্যবহারে ভারতীয় মুসলমানগণ রুষ্ট হয়েছিল। এই বিক্ষোভের উত্তাপ ইংরেজ শাসকরা অনুভব করেছিল এবং কঠোর দমননীতির দ্বারাই এই বিক্ষোভের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দুটি বিল আনা হ'লো—বিলগুলি রাওলাট বিল্‌স্ নামে পরিচিত। ভারত রক্ষা আইনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় দমনমূলক কার্যের জন্যে প্রথম বিলটি রচিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিলটি রচিত হয়েছিল দেশের ফৌজদারী আইনে একটি স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে। বিল দুটি কেন্দ্রীয় আইনসভায় ৬ই ফেব্রুয়ারি আনা হ'লো।

রাওলাট কমিটির রিপোর্টের সুপারিশগুলি যখন প্রকাশিত হয়, তখন গান্ধীজী আরোগ্যের পথে আমেদাবাদে ছিলেন। তিনি সুপারিশগুলি পড়ে তাঁর আশঙ্কার কথা বল্লভভাইকে জানালেন, বললেন, "এইসব ব্যবস্থা আইনে পরিণত হ'লে এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে আমাদের সত্যাগ্রহ করা উচিত। আমি এভাবে শয্যাশায়ী না থাকলে একাই লড়তাম এবং অন্যান্য সকলে আমার অনুসরণ করতো।" এর কিছুদিন বাদে সবরমতী আশ্রমে বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, হর্নিম্যান, উমর খোবানি, শংকরলাল ব্যাংকার ও ইন্দুলাল যাজ্ঞিককে নিয়ে একটি ছোট সভা হ'লো এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই তারিখে এঁরা সকলে ও আরও অনেকে গান্ধীরচিত একটি সত্যাগ্রহের শপথপত্রে স্বাক্ষর করলেন। গান্ধীজী সত্যাগ্রহের জন্যে বোম্বাইয়ে সত্যাগ্রহ সভা নামে একটি সংস্থা

গঠন করলেন এবং সত্যাগ্রহীদের শপথপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হ'লো। পক্ষকালের মধ্যেই প্রায় ১২০০ লোক এই শপথ-পত্রে স্বাক্ষর দিলেন। এখন চারিদিকে সভাসমিতি শুরু হ'লো। শপথ-পত্রে সত্যাগ্রহীদের স্বাক্ষর সংগৃহীত হ'তে লাগলো এবং নিয়মিত প্রচারপত্র প্রকাশিত হ'তে লাগলো। মার্চ মাসে সত্যাগ্রহ সভা ঘোষণা করলো যে, এখন সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ সাহিত্য পাঠ ও সংবাদপত্রের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি অমান্য করা যেতে পারে। সত্যাগ্রহ সভা কতিপয় নিষিদ্ধ পুস্তক নির্বাচিত ক'রে দিলো। সেগুলির মধ্যে গান্ধীজীর 'হিন্দ্ স্বরাজ' এবং কামাল-পাশার জীবনী ও ভাষণাবলীও ছিল।

কয়েক মাস পূর্ব পর্যন্ত মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট এবং শাসন-সংস্কার-সংক্রান্ত সুপারিশগুলিই ভারতীয় রাজনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু এখন রাওলাট বিলগুলিই তার স্থান অধিকার করলো। রাওলাট বিলগুলি আইনে পরিণত হ'লে প্রস্তাবিত শাসনসংস্কারগুলি যে প্রহসনমাত্র হবে, তাতে কোনও সংশয় ছিল না। তাছাড়া, বৃটিশ সরকার যে স্বৈরনীতি ও দমন-নীতির আশ্রয় নিতে চলেছে, তা যে ভারতের সকল রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ করবার জন্যেই করা হচ্ছে, সে বিষয়ে কারো সংশয় ছিল না। তাই সারা দেশে রাওলাট বিলগুলির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দিলো। এই বিলগুলির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ জানালেন গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা। ফলে গান্ধীজীই এই দুর্দম ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু জনসাধারণের এই বিক্ষোভ ও অসন্তোষকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে এবং আইনসভায় ভারতীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা ক'রে সরকার অশোভন দ্রুততার সঙ্গে এই বিলগুলিকে আইনে পরিণত করতে অগ্রসর হ'লো। গান্ধীজী নিজে কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশনে

দর্শকরূপে উপস্থিত থেকে সকল কিছু প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি ভাইসরয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে এই বিলগুলিকে আইনে পরিণত করা থেকে বিরত থাকবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলেন। অন্যান্য বহু নেতাও সরকারকে প্রভাবিত করবার জন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো।

কিভাবে এই ভয়ংকর আইনগুলির প্রতিরোধ করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্যে গান্ধীজীকে মাদ্রাজের নেতারা—কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার ও চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী—মাদ্রাজে আমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। গান্ধীজী দুর্বল দেহ নিয়ে মাদ্রাজে পৌঁছলেন। তাঁদের মধ্যে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হ'লো। কিন্তু কিভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করা হবে, তাঁরা স্থির করতে পারলেন না। আগেই প্রথম বিলটি আইনে পরিণত হয়েছিল। ১৮ই মার্চ তারিখে দ্বিতীয় বিলটিও আইনরূপে গেজেটে প্রকাশিত হ'লো। ঐ দিন রাত্রিতে গান্ধীজী ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষ রাত্রিতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তখনও আধো ঘুম আধো জাগরণ অবস্থায় ছিলেন, হঠাৎ একটি পরিকল্পনা তাঁর চেতনায় জেগে উঠলো। পরদিন তিনি রাজাগোপালাচারীকে বললেন, "কাল রাত্রিতে স্বপ্নে একটা চিন্তা আমার মাথায় এসেছে। আমাদের দেশব্যাপী একটি হরতাল ডাকা উচিত। সত্যাগ্রহ একটি আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি। সুতরাং আত্মশুদ্ধির একটি অনুষ্ঠান দিয়েই এর সূচনা হওয়া আমি উচিত বলে মনে করি। তাই ভারতবাসীরা একদিন তাদের কাজকর্ম বন্ধ করুক, উপবাস করুক, উপাসনা করুক।... আমাদের এই ডাকে সমস্ত প্রদেশগুলি সাড়া দেবে কিনা জানি না। তবে আমার মনে হয়, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার ও সিন্ধুপ্রদেশ সাড়া দেবে। এইসব জায়গাতেও যদি উপযুক্তরূপে হরতাল পালিত হয়, তা হ'লেও আমরা সন্তুষ্ট হ'তে পারব।" ২৩শে মার্চ তারিখে গান্ধীজী এই দেশব্যাপী হরতালের প্রস্তাব দিলেন। ৩০শে মার্চ

প্রথমে হরতালের দিন নির্দিষ্ট হয়। পরে তা পরিবর্তন ক'রে ৬ই এপ্রিল করা হয়; হরতালের প্রস্তুতির জন্যে গান্ধীজী তাঁর রুগ্‌ণ শরীর নিয়েও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, তুতিকোরিন ও নেগাপত্তমে বক্তৃতা দিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় দক্ষিণ আফ্রিকায় বীর সত্যাগ্রহীদের উল্লেখ করেন এবং ভারতে ভারতবাসীদেরও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এই ঘৃণ্য আইনগুলিকে রহিত করবার জন্যে সরকারকে বাধ্য করতে বললেন।

হরতালের তারিখ যে ৩০শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিলে পরিবর্তিত করা হয়েছে, এই সংবাদ ঠিকমতো না পৌঁছায় ৩০শে মার্চ তারিখেই দিল্লীতে জনসাধারণ হরতাল পালন করলো। আর্য সমাজের বিখ্যাত প্রচারক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীর জুম্মা মসজিদে সমবেত এক বিশাল জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে কয়েক স্থানে গুলী চালালো। তাতে বহু লোক হতাহত হ'লো। চাঁদনিচকে গৈরিক-বাসপরিহিত দীর্ঘদেহ সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গুর্খা সৈন্যের সঙ্গীনের সম্মুখে বুক পেতে দিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে সে বার্তা বিদ্যুদ্‌-গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। স্থানীয় নেতারা গান্ধীজীকে দিল্লীতে আসবার জন্যে আহ্বান জানালেন। গান্ধীজী ৩রা এপ্রিল সেখানে সত্যাগ্রহের উদ্বোধনে অংশগ্রহণের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে বোম্বাই গিয়েছিলেন। তিনি তাই ৬ই এপ্রিল হরতালের পর দিল্লী যেতে মনঃস্থ করলেন। ৬ই এপ্রিল বোম্বাইয়ে হাজার হাজার নরনারী সমুদ্র স্নান ক'রে গান্ধীজীর নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল ক'রে বার হলেন। ঐদিন কতিপয় জনসভায় গান্ধীজী বক্তৃতা করলেন এবং দিল্লীতে ইংরেজ সরকারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিলেন। তিনি বললেন, "আত্মত্যাগ ছাড়া কোন জাতি গড়ে ওঠে নি, কোনও জাতির অভ্যুত্থান হয়নি।" বোম্বাইয়ে হরতাল পরিপূর্ণরূপে

সাফল্যমণ্ডিত হ'লো এবং 'হিন্দ্ স্বরাজ' ও 'সর্বোদয়' প্রভৃতি নিষিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করবার প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। গান্ধীজী ও সরোজিনী নাইডু নিষিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়ের জন্যে গাড়িতে ক'রে বেরুলেন। সব কপিই অল্পসময়ের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেলো। বইয়ের দাম ছিল চার আনা মাত্র। কিন্তু অনেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দিয়ে এক-এক কপি বই কিনলেন। যাঁরা বই কিনতে এলেন, তাঁদের বলা হ'লো, এই বই রাখবার জন্যে তাঁদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড হ'তে পারে। তা সত্ত্বেও তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে বই কিনলেন। সংবাদপত্রের রেজিস্ট্রেশন আইন অমান্যের জন্যে গান্ধীজী নিজের সম্পাদনায় বিনা রেজিস্ট্রেশনে 'সত্যাগ্রহ' নামে একটি 'সাপ্তাহিক' প্রকাশ করলেন। ৭ই এপ্রিল সোমবার এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বেরুলো।

কেবল দিল্লীতে নয়, পাঞ্জাবেও সরকারী দমননীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। তাই গান্ধীজী ৮ই এপ্রিল মহাদেব দেশাইকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী ও অমৃতসরের উদ্দেশে রওনা হলেন। মথুরা পৌঁছে গান্ধীজী তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে ব'লে কানাঘুষা শুনলেন। ট্রেন পালাওলে পৌঁছবার আগে ট্রেনটিকে একটি ছোট স্টেশনে থামিয়ে গান্ধীজীর ওপর একটি নোটিশ জারী করা হ'লো। এই নোটিশে বলা হ'লো যে, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ ঐসব স্থানে তাঁর উপস্থিতিতে শান্তিভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পুলিস তাঁকে ট্রেন থেকে নামতে বললো। তিনি ট্রেন থেকে নামতে অনিচ্ছাপ্রকাশ ক'রে বললেন, "পাঞ্জাব থেকে সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ পেয়েছি, তাই পাঞ্জাব যাচ্ছি। সেখানে অশান্তি সৃষ্টির জন্যে নয়, অশান্তি প্রশমিত করতেই যাচ্ছি।"

৯ই এপ্রিল পালোয়াল স্টেশনে জোর ক'রে তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে পুলিসের হেফাজতে রাখা হ'লো। শীঘ্রই দিল্লী থেকে একদল পুলিসসহ একটি ট্রেন এসে পৌঁছলো এবং তাঁকে ঐ

ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীতে উঠতে বাধ্য করা হ'লো। ট্রেনটি মথুরা পৌঁছলে তাঁকে পুলিস ব্যারাকে নিয়ে রাখা হ'লো। তারপর ভোর চারটায় তাঁকে ঘুম থেকে তুলে একটি বোম্বাইগামী মাল-গাড়িতে তুলে দেওয়া হ'লো। দুপুরে তাঁকে আবার সোয়াই মাধোপুরে নামানো হ'লো। ইতিমধ্যে লাহোর থেকে একটি মেল ট্রেনে ক'রে পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর মিঃ বাউরিং এসে পৌঁছলেন। এখন গান্ধীজীকে মিঃ বাউরিংয়ের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হ'লো। মিঃ বাউরিং তাঁকে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়ে তাঁকে বোম্বাইয়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। গান্ধীজী বললেন, তিনি স্বেচ্ছায় বোম্বাইয়ে ফিরে যাবেন না। সুরাটে আর একজন পুলিস অফিসারের ওপর গান্ধীজীর ভার দেওয়া হ'লো। ১১ই এপ্রিল গাড়ি বোম্বাই পৌঁছলে পুলিস অফিসারটি তাঁকে বললো, "আপনি এখন মুক্ত।" কেবল তাঁর পাঞ্জাব ও দিল্লী প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় নি। ভারত সরকার তাঁর বোম্বাই ত্যাগের বিরুদ্ধেও একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। পালোয়াল থেকে মহাদেব দেশাই পাঞ্জাববাসীদের প্রতি গান্ধীজীর বাণী বহন ক'রে নিয়ে গেলেন। তাতে তিনি পাঞ্জাববাসীকে তাঁদের সত্যাগ্রহ-শপথে অবিচল থাকতে এবং তাঁর গ্রেপ্তারে ক্রুদ্ধ না হ'তে বললেন। "আমি যা চেয়েছিলাম, তা পেয়েছি—হয় রাওলাট আইন প্রত্যাহার, নয় করাবাস। সত্য থেকে একচুলও বিচ্যুতি কিংবা ইংরেজ হোক বা ভারতীয় হোক্ কারও প্রতি হিংসা সত্যাগ্রহীরা যে মহান্ আদর্শ নিয়ে লড়ছেন তাকে নিশ্চয় বিনষ্ট করবে। যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এখন সমগ্র জাতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে ব'লে মনে হয়, তা বাস্তব হয়ে উঠবে ব'লে আমি আশা করি।... এ বিষয়ে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের দায়িত্ব অনেক বেশি, কারণ মুসলমানরা সংখ্যালঘু। এ বিষয়ে হিন্দুরা দেশের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করবেন ব'লেই আমি আশা করি।......দুঃখ বরণের

মধ্য দিয়েই আমাদের মুক্তি আসবে। ইংলণ্ড থেকে সংস্কারের আকারে তা এসে পড়বে না, সে সংস্কারগুলি ইংলণ্ড যতোই অকৃপণ হস্তে আমাদের দিক্ না কেন।”

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ সর্বত্র বিদ্যুদ্‌গতিতে ছড়িয়ে পড়লো এবং সর্বত্রই বিক্ষোভ তীব্রতর হ'লো। গান্ধীজী বোম্বাইয়ে নামামাত্র উমর সোবানি ও অনসূয়াবেন তাঁকে এসে জানালেন যে, তাঁকে অবিলম্বে মোটর ক'রে পাইধুনি অঞ্চলে যেতে হবে, সেখানে যে কোনও মুহূর্তে গোলযোগ ও হাঙ্গামা দেখা দিতে পারে। জনসাধারণ গান্ধীজীকে দেখে আনন্দে জয়ধ্বনি করতে লাগলো এবং দলে দলে ক্রমে ভীড় করলো। দেখতে দেখতে একটি বিরাট মিছিল গ'ড়ে উঠলো এবং তাঁকে পুরোভাগে নিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ ক'রে তা এগিয়ে চললো। কিন্তু মিছিল কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ অশ্বারোহী বল্লমধারী পুলিস জনতার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে তার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। জনতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, ঘোড়ার পায়ের তলায় বহু লোক পিষ্ট ও জখম হ'লো। শান্তিপূর্ণ জনতার ওপর পুলিসের এই বর্বর আক্রমণ জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। গান্ধীজী জনসাধারণকে শান্তিপূর্ণ থাকতে ব'লে পুলিস কমিশনার মিঃ গ্রিফিথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং পুলিসের এই কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। মিঃ গ্রিফিথ পুলিসের কাজের সমর্থন ক'রে বললেন, “আপনার উদ্দেশ্য মহৎ বুঝলাম। কিন্তু যদি আপনার বাণী ও শিক্ষা জনসাধারণ না মেনে চলে, তখন আপনি কি করবেন?” গান্ধীজী বললেন, “সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হ'লে নিশ্চয় আইন অমান্য প্রত্যাহার ক'রে নেবো।” তখন অন্য একজন পুলিস কর্মচারী বললেন, “আপনি কি জানেন, আমেদাবাদ ও অমৃতসরে কি ঘটছে? সেখানে লোকে ক্ষিপ্ত

হয়ে গেছে, তারা টেলিগ্রাফের তার পর্যন্ত কেটে দিচ্ছে। এইসব গোলযোগের জন্যে আপনিই দায়ী।” জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে উঠছে শুনে গান্ধীজী চিন্তিত হলেন। তিনি চৌপট্টিতে গিয়ে এক জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। তিনি জনসাধারণকে শান্ত ও অহিংস থাকতে অনুরোধ জানালেন। “আমাকে আটক করায় এতো উত্তেজনা ও গোলযোগের কারণ কি আমি বুঝতে পারছি না। এ তো সত্যাগ্রহ নয়। এ যে ‘দুরাগ্রহের’ চেয়েও খারাপ। যাঁরা সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে সকল প্রকার হিংসা থেকে বিরত থাকতে হবে। ঢিল ছুঁড়ে বা অন্য উপায়ে কাউকে আঘাত করা তাঁদের কাজ নয়। কিন্তু বোম্বাইয়ে আমরা ঢিল ছুঁড়ছি, রাস্তায় বাধার সৃষ্টি ক’রে ট্রাম আটক করছি। এ সত্যাগ্রহ নয়। হিংসাত্মক কাজের জন্যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মুক্তির দাবী করছি। কিন্তু আমাদের কর্তব্য হ’লো গ্রেপ্তার বরণ করা।······এমন সময় আসতে পারে যখন আমাকেই সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে হ’তে পারে। মৃত্যুকে আমি অগৌরবের মনে করি না। কোন সত্যাগ্রহীর মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি ব্যথা পাই, কিন্তু সংগ্রামের জন্যে এই তো উপযুক্ত আত্মদান। কিন্তু যারা সত্যাগ্রহী নয়, যারা আন্দোলনে যোগ দেবে না, যারা আন্দোলনের বিরোধিতা করছে, তাদের কেউ যদি আহত হয়, তবে সেই পাপ আঘাতের জন্যে সত্যাগ্রহীই দায়ী। আমার দায়িত্ব লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি।”

কিন্তু ঘটনা স্রোত আপন বেগে এগিয়ে চললো। অনসূয়াবেনের গ্রেপ্তারের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় আমেদাবাদে গোলযোগ ও সংঘর্ষ দেখা দিল। কাপড়ের কলের শ্রমিকদের উপর কয়েকবার গুলী চালানো হ’লো এবং ১২ই এপ্রিল থেকে সামরিক আইন জারী হ’লো। ১৩ই এপ্রিল গান্ধীজী আমেদাবাদে পৌঁছলেন। তিনি আমেদাবাদে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৪ই

তারিখে তিনি সবরমতী আশ্রমের কাছে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি জনসাধারণের হিংসাত্মক পথ নেওয়ার নিন্দা করলেন। এজন্যে প্রায়শ্চিত্তরূপে তিনি তিন দিনের জন্য অনশন করলেন এবং জনসাধারণকেও একদিন অনশন করতে আহ্বান জানালেন। গান্ধীজীর আবেদন আমেদাবাদে অবিলম্বে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করলো। সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হ'লো।

আমেদাবাদে যেদিন (১২ই এপ্রিল) সামরিক আইন জারী হয়েছিল, সেদিন ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে এর চেয়ে সহস্রগুণে ভয়ংকর একটি ঘটনা ঘটেছিল—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। ৬ই এপ্রিল দেশব্যাপী হরতালের পর সমগ্র দেশে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। কোন কোন স্থানে দু-একটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেও আন্দোলন অহিংস ও শান্তিপূর্ণ ছিল। পাঞ্জাবেও দিল্লীর মতোই ৩০শে এপ্রিল অমৃতসরে হরতাল পালিত হয়েছিল। ৬ই এপ্রিল সারা প্রদেশে হরতাল হয়েছিল। ৯ই এপ্রিল তারিখে ছিল রামনবমীর উৎসব। ঐদিন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য পাঞ্জাব দেখেছিল। পাঞ্জাবের এই নবজাগরণ ইংরেজ শাসকদের শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল। কারণ, ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীতে পাঞ্জাবীরাই একটি প্রধান অংশ দখল ক'রে ছিল। পাঞ্জাবের বিপ্লবী চেতনা সৈন্যবাহিনীতে অনুপ্রবেশ করবার আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল। তাই পাঞ্জাবের লেঃ-গভর্নর স্যার মাইকেল ও'-ডোয়ার পাঞ্জাবকে বিপ্লবী চেতনামুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর হলেন। ১০ই এপ্রিল ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ কিচলু প্রভৃতি স্থানীয় নেতাদের আটক করা হ'লো। বহিষ্কার, আটক, গ্রেপ্তার চললো। ঐদিন দুপুরে নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ অমৃতসরে পৌঁছলে সেখানে হরতাল ঘোষিত হ'লো এবং জনসাধারণ একটি বিশাল মিছিল ক'রে ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলুর মুক্তির দাবীতে ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের বাসভবনের উদ্দেশে রওনা হ'লো। রেলওয়ে

লেভেল ক্রসিংএর কাছে মিছিলকে আটক ক'রে তাদের শহরে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হ'লো। নিরস্ত্র জনতার উপর তুবার গুলী চালানো হ'লো এবং অনেকেই গুলীতে আহত হ'লো। ফলে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, পাঁচজন-ছজন ইংরেজকে হত্যা ক'রে প্রতিশোধ নিলো, ব্যাঙ্কের বাড়ি ও সরকারী বাড়ি পুড়িয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনী তলব করা হ'লো। সৈন্যবাহিনী কঠোর দমননীতির সাহায্যে শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলো। পরদিন ১১ই এপ্রিল একটি শোক মিছিল বার হ'লো। এই মিছিলটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলো। ঐদিন সন্ধ্যায় জেনারেল ডায়ার এসে পৌঁছে সৈন্যবাহিনীর ভার নিলো।

ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার শুরু হ'লো। জনসমাবেশ ও সভাসমিতি নিষিদ্ধ ক'রে আদেশ জারী হ'লো। কিন্তু এই ঘোষণা ইংরেজীতে প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের অনেকেই তা জানলো না। পরদিন, ১২ এপ্রিল, ছিল বৈশাখী মেলার দিন। সে উপলক্ষ্যেও জালিয়ানাওয়ালাবাগে প্রায় দশ হাজার নর-নারী ও শিশু উপস্থিত হয়েছিল। জেনারেল ডায়ার এই সমাবেশ বন্ধের জন্যে কোনও ব্যবস্থা করলো না। জালিয়ানওয়ালাবাগে অগণিত মানুষ জমায়েত হ'তেই সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'লো এবং গোলাগুলী শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমবেত জনতার উপর নির্বিচারে গুলী চালিয়ে যেতে আদেশ দিলো। দশ মিনিট অবিশ্রান্ত গুলী চললো। এই দশ মিনিটে ১৬৫০ রাউণ্ড গুলী চালানো হয়েছিল। মানুষ প্রাণভয়ে চারিদিকে পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পলায়নের পথগুলি রুদ্ধ ছিল। তাই দলে দলে মানুষ বন্দুকের গুলীতে লুটিয়ে পড়লো, বৃদ্ধ, নারী, শিশু, কেউ রেহাই পেল না। সরকারী হিসাবেই ৩৭৯ জন লোক নিহত ও ২০০ জন আহত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা ছিল

এর চেয়ে অনেক বেশি। পাঞ্জাবের অন্যান্য বহু স্থানেও এই ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন ঘটলো। লেঃ-গভর্নর মাইকেল ও'ডোয়ার ভারত সরকারের কাছে প্রদেশের নিয়মিত আদালত-সমূহ বন্ধ ক'রে সারা প্রদেশে সামরিক আদালত স্থাপনের অনুমতি চাইলো। ভারত সরকার ১৫ই এপ্রিল সে অনুমতি দিলে সারা পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসকদের নৃশংস তাণ্ডব শুরু হ'লো। কঠোর সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তন ক'রে পাঞ্জাবের সকল সংবাদ ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে ও বিদেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হ'লো। পাঞ্জাব থেকে কাউকে বাইরে আসতে বা পাঞ্জাবে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হ'লো না। পাঞ্জাবকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা হ'লো। একমাস পাঞ্জাবে এইভাবে অত্যাচার, নির্যাতন, গ্রেপ্তার হত্যা চললো। ১১ই জুন রেলপথের সংলগ্ন অংশগুলি ছাড়া অন্যান্য স্থান থেকে সামরিক আইন তুলে নেওয়া হ'লো। ২৫শে আগস্ট সামরিক আইন সম্পূর্ণরূপে তুলে নেওয়া হ'লো।

পাঞ্জাবের এই নৃশংস ঘটনাবলীর সংবাদ ধীরে ধীরে বাইরে আসছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ঘৃণায় ও রোষে ফেটে পড়েছিল। নরমপন্থীরা পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবের বর্বর তাণ্ডবলীলার তীব্র নিন্দা না ক'রে পারলো না। গান্ধীজী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই উন্মত্ত পৈশাচিক রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ২০শে এপ্রিল তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের তদন্ত দাবী করলো। গান্ধীজীকে পাঞ্জাবে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করা হ'লো। গান্ধীজী বড়লাটকে অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলেন ও তার করলেন। কিন্তু অনুমতি মিললো না। পাঞ্জাবে তাঁর ঈপ্সিত আবহাওয়া না থাকায় কিছুদিন তিনিও সেখানে যাওয়ার চেষ্টা ত্যাগ করলেন। ১১ই মে তারিখে গান্ধীজী বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে একটি পত্রে জানালেন যে, তিনি শান্তি রক্ষার জন্যে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতেও প্রস্তুত

আছেন। তবে সেজন্যে সরকারকে রাওলাট আইনের প্রত্যাহার ও খিলাফত প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। কিন্তু ভারত সরকার তাতে বিন্দুমাত্র সাড়া দিলো না। বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, সরকার জাতীয় আন্দোলনকে বলপ্রয়োগে দমন করতে বদ্ধপরিকর। পাঞ্জাবে যে নৃশংস অত্যাচার ও বর্বরোচিত আচরণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সমগ্র ভারত তাতে রুষ্ট হয়েছিল। এই নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে ৩০শে মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঘৃণাভরে বৃটিশ-প্রদত্ত স্যার উপাধি ত্যাগ করলেন। তিনি পাঞ্জাবের ঘটনাবলীতে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে লর্ড চেম্‌স্‌-ফোর্ডকে একটি পত্র লিখলেন। এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পাঞ্জাবে সামরিক আইনের আওতায় সংঘটিত নৃশংস ঘটনাবলীর তদন্ত দাবী করা হ'লো। পাঞ্জাবে সংঘটিত ঘটনাবলীর তদন্তের জন্যে একটি কমিটিও গঠিত হ'লো। এ ব্যাপারে ইংলণ্ডে ও ভারতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং তহবিল সংগ্রহের প্রস্তাবও গৃহীত হ'লো। তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইনে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ড কার্যকর না করার জন্যে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ভারত সচিব ও লর্ড সিংহকে তার পাঠানো হ'লো। গান্ধীজী সাময়িকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করলেন, কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী মতিলাল নেহ্‌রু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও মালব্যজী তদন্তের জন্যে পাঞ্জাবে গেলেন। ভারত সরকারও তদন্তের জন্যে জাস্টিস হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করলেন। এই তদন্ত কমিশনের আটজন সদস্যের মধ্যে তিনজন ছিলেন ভারতীয়— স্যার সুলতান আমেদ, স্যার চিমনলাল শীতলবাদ ও পণ্ডিত জগৎ-নারায়ণ। সেই সঙ্গে ভারত সরকার সরকারী কর্মচারীদের 'শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যে' সকল কিছু করবার অধিকার দিয়ে একটি আইন পাশ করলো। তদন্ত কমিশনের গঠন সম্পর্কে

কংগ্রেস নেতারা তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। মালব্যজী বড়লাটের আইনসভায় বললেন যে, এই তদন্ত কমিশন নিয়োগের অধিকার ভারত সরকারের নেই, কারণ ভারত সরকার অভিযুক্ত পক্ষ।

পাঞ্জাবের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী প্রতিদিন এসে পৌঁছতে লাগলো এবং সেগুলি 'বোম্বে ক্রনিকল' কাগজে প্রকাশিত হ'তে লাগলো। বোম্বে ক্রনিকলের সম্পাদক বি. জি. হর্নিম্যান এ সম্পর্কে কতকগুলি জ্বালাময় নিবন্ধ লিখলেন। ফলে হঠাৎ হর্নিম্যানকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হ'লো এবং 'বোম্বে ক্রনিকল' কাগজ ও বোম্বে ক্রনিকলের ছাপাখানার ওপর কড়া সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লো। এই অবস্থায় বোম্বে ক্রনিকলের পরিচালকবর্গ গান্ধীজীকে বোম্বে ক্রনিকলের দায়িত্ব নিতে বললেন। গান্ধীজী এই দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বেই সরকার বোম্বে ক্রনিকলের প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিলো। যমুনাদাস, দ্বারকাদাস, উমর সোবানি, শংকরলাল ব্যাংকার প্রভৃতি ব্যক্তিরা যাঁরা বোম্বে ক্রনিকলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাটিরও পরিচালক ছিলেন। বোম্বে ক্রনিকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা গান্ধীজীকে ইয়াং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিতে অনুরোধ করলেন। গান্ধীজী সম্মত হলেন এবং ইয়াং ইণ্ডিয়া এখন দ্বি-সাপ্তাহিক কাগজরূপে প্রকাশিত হ'তে লাগলো। গান্ধীজী এই সঙ্গে একটি গুজরাটী ভাষায় কাগজ প্রকাশের কথাও চিন্তা করছিলেন। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, উমর সোবানি ও শংকরলাল ব্যাংকার গুজরাটী মাসিক পত্রিকা 'নবজীবন' পরিচালনা করছিলেন। তাঁরা ঐ কাগজটি গান্ধীজীর হাতে তুলে দিলেন। গান্ধীজী 'নবজীবন' পত্রিকাকে একটি সাপ্তাহিক কাগজে রূপান্তরিত করলেন। ইতিমধ্যে বোম্বে ক্রনিকল পুনঃপ্রকাশিত হওয়ায় গান্ধীজী 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' কাগজটিকেও সাপ্তাহিক করলেন। বোম্বাই থেকে 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' এবং আমেদাবাদ থেকে

'নবজীবন' প্রকাশিত হচ্ছিল। তাতে গান্ধীজীর অসুবিধা হওয়ায় তুটি কাগজই আমেদাবাদ থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা হ'লো। গান্ধীজী আমেদাবাদে এই তুটি কাগজের জন্য নিজস্ব একটি ছাপাখানা স্থাপন করলেন। গান্ধীজীর পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ৭ই অক্টোবর থেকে 'নবজীবন' ও ৮ই অক্টোবর থেকে 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হ'লো। এই তুটি পত্রিকার মাধ্যমে গান্ধীজী জনসাধারণকে সত্যাগ্রহের আদর্শ ও রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষিত ক'রতে লাগলেন। পত্রিকাগুলির দাম ছিল এক কপি এক আনা। পত্রিকাগুলির গ্রাহকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলো। একসময় এই তুটি কাগজের প্রত্যেকটির গ্রাহকসংখ্যা চল্লিশ হাজারকেও অতিক্রম করেছিল। পত্রিকাগুলি ভারতের সর্বত্র পঠিত হ'তো। ইয়াং ইণ্ডিয়া ও নবজীবনে প্রকাশিত গান্ধীজীর রচনাগুলি ভারতের অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রায়ই পুনর্মুদ্রিত হ'তো। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই তুটি পত্রিকার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গান্ধীজী পাঞ্জাব পরিদর্শনের জন্যে যে অনুমতি চেয়েছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর হ'লো। ১৭ই অক্টোবর তারিখে পাঞ্জাবে গিয়ে তিনি অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। পাঞ্জাবে গান্ধীজীর উপস্থিতি জনসাধারণের মনে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ও সাহস এনে দিলো। গান্ধীজী ও কংগ্রেসেব অন্যান্য নেতারা হাণ্টার কমিটির কাছে এই মর্মে আবেদন করলেন যে, তদন্তকালে কারারুদ্ধ নেতাদের মুক্তি দেওয়া হ'ক; কমিটিতে যে তুজন রিভিজন জজ আছেন, তাঁদের একজনকে পাঞ্জাবের বাইরে থেকে নেওয়া হ'ক এবং রিভিজন জজদের, তাঁরা প্রয়োজন মনে করলে, আরও সাক্ষ্য নেওয়ার অধিকার দেওয়া হ'ক।" সরকার এই আবেদন অগ্রাহ্য করলে কংগ্রেস তদন্ত কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করলো এবং তদন্তের জন্যে পৃথক একটি কমিটি নিয়োগ করলো। এই কমিটি গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, ফজলুল হক

ও আব্বাস তায়েবজীকে নিয়ে গঠিত হ'লো। মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় জয়াকর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তদন্ত কমিটির প্রধান কার্য পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হ'লো গান্ধীজীর ওপর। তদন্তের কাজে তিনি পাঞ্জাবের বহু গ্রামে গেলেন এবং পাঞ্জাবী জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। তদন্তের সময় কোনও বিবৃতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় দেখা দিলে সে বিবৃতিকে তিনি রিপোর্টে স্থান দিতে দিলেন না। কংগ্রেস তদন্ত কমিটির কাজ শুরু হওয়ার সময়েই গান্ধীজীকে দিল্লীতে খিলাফত প্রশ্ন নিয়ে আহূত হিন্দু-মুসলিম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্যে আহ্বান জানানো হ'লো। ২৪শে নভেম্বর তারিখে তিনি এই সম্মেলনে উর্দু ভাষায় ভাষণ দিলেন। সম্মেলনে তিনি বললেন, বৃটেন মুসলমানদের খলিফা তুরস্কের সুলতানের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে। তার প্রতিবাদে ভারতীয় মুসলমানগণ শান্তি উৎসব যে বর্জন করতে চেয়েছেন, তা খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তবে খিলাফতের দাবীতে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের নীতিকে তিনি সমর্থন করলেন না। তিনি তার পরিবর্তে সরকারের সঙ্গে অসহযোগের নীতি গ্রহণের প্রস্তাব করলেন। এইভাবে সর্বপ্রথম non-co-operation বা অসহযোগের ধারণাটি গান্ধীজীর মাথায় এলো। অবশ্য, গান্ধীজী তখনও অসহযোগের প্রকৃত তাৎপর্য ও রূপ কি হবে, তা চিন্তা ক'রে দেখেন নি। এই সম্মেলনে অসহযোগের কথা গান্ধীজী প্রথম উচ্চারণ করলেও পরবর্তী কয়েক মাস তা সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সেদিন সহসা তিনি 'অসহযোগ' শব্দটি উচ্চারণ করলেও তিনি নিজেও জানতেন না, এই অসহযোগই আসন্ন দেশব্যাপী আন্দোলনে প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

১০ই ডিসেম্বর তারিখে গান্ধীজী তাঁর 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখেন, "অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বহুজল্পিত শাসন-

সংস্কার বিলটি এদেশের আইনে পরিণত হবে এবং যথাসময়ে নূতন আইনসভাগুলি পুরাতন আইনসভাগুলির স্থান নেবে। জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আমি আমার মতামত প্রকাশ করিনি; কারণ, এতে আমি আদৌ আগ্রহ বোধ করিনি। যে জিনিস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাতে দেশবাসীর কিছু উপকার হবে না, তা নিয়ে উৎসাহ বোধ করা যায় না।······ভারতের যে প্রকৃত সংস্কারের প্রয়োজন আছে, তা হ'লো স্বদেশী। আমাদের সামনে যে আশু সমস্যা রয়েছে, সেটি কিভাবে দেশের শাসন চলবে, তা নয়, কিভাবে আমাদের খাওয়া-পরা হবে সেটাই। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত থেকে কাপড় কিনবার জন্যে ষাট কোটি টাকা বিদেশে গিয়েছে। আমরা যদি ঐ হারে বিদেশী কাপড় কিনতে থাকি, তবে আমরা আমাদের দেশের তাঁতীদের ও কাটুনিদের পরিবর্ত কোনও কাজ না দিয়েই প্রতি বছর ঐ পরিমাণ টাকা থেকে বঞ্চিত করি। আমাদের দেশের অধিবাসীদের অন্ততঃ এক-দশমাংশ লোক যে নিষ্ঠুরভাবে অর্ধাহারে রয়েছে এবং অধিকাংশ লোকই যে ঠিকমতো খেতে পায় না, তা আশ্চর্যের কিছু নয়। শাসন-সংস্কার পরিকল্পনাটি যতোই উদার হ'ক না কেন, অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যার কোন সমাধান করতে পারবে না।······ কুটির-শিল্প ছাড়া ভারতীয় কৃষক মরবে। সে কেবল তার জমিতে উৎপন্ন ফসল দিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে না। তার পরিপূরক একটি শিল্প চাই। সুতো কাটা সব শিল্পের মধ্যে সোজা, সস্তা ও সবচেয়ে ভালো। আমি জানি এর অর্থ হ'লো আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপ্লব ঘটানো। আর এটা বিপ্লব ব'লেই আমি দাবী করি যে স্বরাজের পথ হ'লো স্বদেশী। যে জাতি প্রতি বছর ষাট কোটি টাকা বাঁচিয়ে সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ নিজেদের ঘরে ঘরে দেশের কাটুনি ও তাঁতীদের মধ্যে বিতরণ ক'রে দিতে পারে, সে জাতি যে সংগঠন-শক্তি ও শিল্পশক্তি আয়ত্ত করবে, তাতে

সে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কিছুই ক'রে নিতে পারবে।"

এই সময়ে অসহযোগ ও স্বদেশী—এই ছুটি চিন্তা গান্ধীজীর মনের পূরোভাগে স্থান পেয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম সম্মেলনে তিনি বিদেশী বর্জনের প্রতিবাদ করেছিলেন এই কারণে যে, দেশে কুটির-শিল্প গ'ড়ে তুলতে না পারলে কেবল দেশীয় কলকারখানার উপর নির্ভর ক'রে ঐ কর্মসূচী কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। এই কারণেই তিনি বিদেশী বর্জনের পরিবর্তে অসহযোগের প্রস্তাব করেছিলেন। তাই অসহযোগ ও স্বদেশীর মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল।

ডিসেম্বরের (১৯১৯) শেষ সপ্তাহে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। ভারতের সকল প্রান্ত থেকে এই কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য লোকে তীর্থযাত্রীর মতো ভীড় ক'রে এলো। কংগ্রেসের কয়েক হাজার প্রতিনিধি ও দর্শক সকলেই জালিয়ানওয়ালাবাগ দর্শন করলেন। ভারতবাসীর রক্তে রঞ্জিত এই ভূমিতে তাঁরা লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন, অনেকে এর পবিত্র মৃত্তিকা সঙ্গে নিয়ে গেলেন, অনেকে এর মাটি দিয়ে কপালে তিলক পরলেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট তখনও প্রকাশিত না হওয়ায় এই কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো না। তবে কংগ্রেস এখনআর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান ছিল না—যে মধ্যবিত্ত আইনসভায় কিছুসংখ্যক আসন ও সরকারী চাকরিতে কিছুসংখ্যক নিয়োগ নিয়েই সন্তুষ্ট হ'তে পারতো। এখন কংগ্রেস হয়ে উঠেছিল সত্যিকার জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে নরমপন্থীরা যোগ দেন নি সত্য, কিন্তু তাঁদের অনুপস্থিতি আর শূন্যতা সৃষ্টি করে নি। তাঁদের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছিল সংগ্রামী মানুষ। তিলক নভেম্বর মাসে দেশে ফিরে এসেছিলেন। তিনিও এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর জীবনে কংগ্রেস অধিবেশনে এই শেষ যোগদান। তিলক দেশে ফিরে বলেছিলেন, "গান্ধী যখন সত্যাগ্রহ

শুরু করেছিলেন, তখন আমি যদি বোম্বাইয়ে থাকতাম, আমিও তাঁর সঙ্গে দুঃখকষ্ট ভোগ করতাম।" বহু নেতা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সোজা কংগ্রেসে চ'লে এসেছিলেন। সওকত আলি ও মহম্মদ আলি দীর্ঘ কারাভোগের পর জেল থেকেই কংগ্রেসে এসে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেসে প্রায় আটহাজার প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে দেড় হাজার প্রতিনিধি ছিলেন কৃষক। ত্রিশ হাজারের বেশি এসেছিলেন দর্শক।

এ দেশের আবহাওয়াকে শান্ত করবার জন্যে বৃটিশ পার্লামেণ্ট দ্রুত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে শাসনসংস্কার বিলটিকে আইনে পরিণত করলো। যুবরাজের ভারত আগমনের কথাও ঘোষণা করা হ'লো। তাই অমৃতসর কংগ্রেসের সুর স্বভাবতই নরম ছিল। শাসন-সংস্কারের জন্য ধন্যবাদ জানানো হ'লো; যুবরাজ স্বাগত হলেন; স্যার মাইকেল ও'ডোয়ারের ও লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের পদচ্যুতি দাবী করা হ'লো; শাসনসংস্কারকে 'যথেষ্ট নয়, সন্তোষজনক নয় ও নৈরাশ্যজনক' বলা হ'লো; পুনরায় পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের দাবীও জানানো হ'লো। গান্ধীজী জনসাধারণের হিংসাত্মক কার্যের নিন্দা ক'রে একটি প্রস্তাব আনলেন, সেটিও বিনা বাধায় গৃহীত হ'লো। গান্ধীজীর উপর কংগ্রেসের সংবিধান রচনার ভার ন্যস্ত হ'লো।

প্রকৃতপক্ষে তখনও গান্ধীজীর কর্মব্যস্ততা কংগ্রেসকে নিয়ে ছিল না। এই সময়ে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে খিলাফত প্রশ্নটি গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। ভারতের আট কোটি মুসলমান তুরস্কের সুলতানকে তাদের ধর্মনেতা বা খলিফা ব'লে মান্য করতো। তুরস্কের সঙ্গে মিত্র শক্তি যে অপমানজনক আচরণ করেছিল, তা মুসলমানদের কাছে তাদের ধর্মের প্রতি অসম্মানের সমতুল্য ছিল। তাই মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। গান্ধীজী এই প্রশ্নটিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের নয়, সারা ভারতের জাতীয়

প্রশ্নরূপেই দেখলেন। তিনি এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্যে আমেদাবাদ থেকে দিল্লী গেলেন। দিল্লীতে হিন্দু ও মুসলিম নেতারা বড়লাটের কাছে এ বিষয়ে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের জন্যে সমবেত হয়েছিলেন। বড়লাটের কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হ'লো, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হ'লো না। যদি লণ্ডনে কোনও প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে তিনি সুযোগ সুবিধা ক'রে দিতে পারেন। ফলে লণ্ডনে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের প্রস্তাব হ'লো এবং স্থির হ'লো মওলানা মহম্মদ আলি এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন। প্রতিনিধিদল যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠলো যে, প্রতিনিধিদল পাঠিয়েই মুসলমানেরা চুপচাপ ব'সে থাকবে, না সেই সঙ্গে আন্দোলনেরও পথ নেবে। মুসলিম লীগের তৎকালীন সভাপতি হাকিম আজমল খাঁ এবং তরুণ মুসলিম নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতারা প্রতিনিধিদল প্রেরণ, অনুনয়-বিনয় ও আবেদন-নিবেদনের কার্যকারিতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির কথা ভাবছিলেন। কিন্তু কিভাবে চাপ সৃষ্টি করা যাবে, সে বিষয়ে তাঁরা কেউ কিছু স্থির করতে পারেননি। চাপ সৃষ্টি করা হবে কিনা, সে বিষয়েও সকলে একমত ছিলেন না। আজমল খাঁর বাড়িতে দীর্ঘ দু ঘণ্টা ধ'রে আলোচনা হ'লো, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল না। তখন গান্ধীজী দু-তিনজন লোক নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন ক'রে তার ওপরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিতে বললেন। সাব-কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেবে, পরে বৃহত্তর একটি কমিটির কাছে তা পেশ করা হবে। সকলেই তাতে রাজী হলেন এবং গান্ধীজী, হাকিম আজমল খাঁ ও আবুল কালাম আজাদকে নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠিত হ'লো। তাঁরা অধ্যক্ষ রুদ্রের বাড়িতে তিনঘণ্টা ধরে আলোচনা করলেন। হিন্দু-মুসলিম সম্মেলনে গান্ধীজী

অসহযোগের কথা প্রথম তুললেও এখানেই তিনি তাকে একটি সুস্পষ্ট রূপ দিলেন। আজাদ ও আজমল খাঁ দুজনেই গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হ'লেন। পরদিন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা আবার মিলিত হ'লে গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবটি তাঁদের সম্মুখে রাখলেন। কিন্তু অনেকেই তখনও এ বিষয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

এই সময়ে মীরাটে খিলাফত সম্মেলন চলছিল। গান্ধীজী ও আজাদ দিল্লী থেকে সেখানে রওনা হলেন এবং গান্ধীজী এই সম্মেলনে তাঁর অসহযোগের কর্মসূচী প্রকাশ্যে প্রথম রাখলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে মওলানা আজাদের সভাপতিত্বে কলকাতায় যে দ্বিতীয় খিলাফত সম্মেলন হ'লো, তাতে মওলানা আজাদ মুসলমান সম্প্রদায়কে এই অসহযোগের কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানালেন। ইতিমধ্যে খিলাফত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্যে প্রতিনিধিদল লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। ১৭ই মার্চ লয়েড জর্জ তাঁদের যে উত্তর দিলেন, তাতে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় রুষ্ট হ'লো। ১৯শে মার্চ তারিখে এর প্রতিবাদে দেশব্যাপী শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো—ঐদিনের কর্মসূচীরূপে গৃহীত হ'লো উপবাস, উপাসনা ও হরতাল। ১৯শে মার্চ প্রতিবাদ দিবসরূপে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করলো এবং পরিপূর্ণ শান্তিতে অতিবাহিত হ'লো। এরপর ঘটনা দ্রুতগতিতে এগুতে লাগলো। বিখ্যাত চিকিৎসক ও জনপ্রিয় জননেতা আজমল খাঁ সরকার-প্রদত্ত সকল সম্মান ত্যাগ করলেন। সরকার তাঁকে যে দুটি স্বর্ণপদক, কাইজার-ই-হিন্দ্ ও হাজিক্-উল-মুল্ক্ উপাধি দিয়েছিল, তা তিনি পরিত্যাগ করলেন। এইভাবে অসহযোগের সূচনা হ'লো।

২৫শে মার্চ তারিখে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত নৃশংস ঘটনাবলী সম্পর্কে কংগ্রেসের রিপোর্ট বেরুলো। গান্ধীজীই এই রিপোর্টটি রচনা করেন। অমৃতসরের ঘটনাবলীর স্মরণে ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ পালন করা হ'লো। ৬ই এপ্রিল

সভাসমিতি ক'রে ভারত সরকারকে রাওলাট আইন প্রত্যাহারের জন্যে অনুরোধ জানানো হ'লো। গান্ধীজী বোম্বাইয়ের একটি জনসভায় ঘোষণা করলেন যে, নূতন শাসনসংস্কারব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে রাওলাট আইন যদি রদ করা না হয়, তবে ভারতবাসীর সহযোগিতা আশা করা ভুল হবে এবং তিনি সাম্রাজ্যের পক্ষে আর থাকতে পারবেন না। এদিকে তুরস্কেরও প্রশ্নের চূড়ান্ত মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। ১৪ই মে তারিখে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের শান্তিচুক্তির শর্তাবলী প্রকাশিত হ'লো। ঠিক এই সময়ে হাণ্টার কমিটির রিপোর্টও প্রকাশিত হ'লো। ফলে উভয়দিক্ থেকে ভারতবাসীর মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার হ'লো। ৩০শে মে তারিখে বেনারসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো। পাঞ্জাবের নৃশংস ঘটনাবলী, শাসনসংস্কারের সীমাবদ্ধতা ও খিলাফত প্রশ্ন একত্র মিলিত হ'লো। গান্ধীজী কংগ্রেসে প্রস্তাব করলেন যে, তুরস্কের সঙ্গে শান্তি চুক্তির শর্তাবলী এবং হাণ্টার কমিটিতে যেভাবে পাঞ্জাবের নৃশংস ঘটনাবলীকে লঘুভাবে দেখানো হয়েছে, তার প্রতিবাদে অবিলম্বে অসহযোগ আন্দোলন করা উচিত। কিন্তু বেনারস কংগ্রেস এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না এবং গান্ধীজীর প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে কলকাতায় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকলো। ১লা জুন তারিখে এলাহাবাদে যে হিন্দু-মুসলিম সম্মেলন হ'লো, তাতে মিসেস বেসাণ্ট, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, পণ্ডিত মতিলাল নেহ্রু প্রভৃতি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মিসেস বেসাণ্ট মুসলিম সম্প্রদায়কে অসহযোগের কর্মসূচী গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানালেন। অন্য নেতারা অসহযোগের সমর্থন ও বা বিরোধিতা কিছুই করলেন না। কিন্তু ৯ই জুন তারিখে এলাহাবাদে খিলাফত কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে অসহযোগের নীতিকে সমর্থন জানালেন এবং অসহযোগের কর্মসূচী প্রণয়নের জন্যে একটি

কার্যকরী কমিটি নিয়োগ করলেন। স্বদেশীকেও অসহযোগের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করবার কথা গান্ধীজী ভাবছিলেন। তাই তিনি স্বদেশী দ্রব্য ও খদ্দরের উৎপাদন ও ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন ক'রে তুললেন। ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষার ব্যবহারেও সকলকে উৎসাহী ক'রে তুললেন। সর্বোপরি, তিনি দেশবাসীকে সরকারের নির্দয়তম প্ররোচনাতেও শান্ত ও অহিংস থাকবার জন্যে শিক্ষিত ক'রে তুলতে লাগলেন।

অসহযোগের কর্মসূচী রচিত হ'লেও গান্ধীজী মুসলিমদের ন্যায়সংগত দাবী মেনে নেওয়ার জন্যে ২২শে জুন বড়লাটকে আবার একটি পত্র লিখলেন। তাতে তিনি জানালেন, "ভারতীয় মুসলমানদের দাবী স্বীকৃতি না হ'লে তাদের সম্মুখে তিনটি মাত্র পথ খোলা থাকবে—হিংসার আশ্রয় গ্রহণ, ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ ও এই অন্যায়ের অংশীদার না হওয়ার চেষ্টায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ত্যাগ করা। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বিপজ্জনক ঝুঁকির কথাও জানালেন।

মুসলমানদের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মুসলমানরা দলে দলে বাস্তু ত্যাগ ক'রে 'হিজরত' (পলায়ন) শুরু করেছিল এবং পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্থানে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল। আবদুল গফর খাঁ ও তাঁর অনুগামীরাও এই 'হিজরতে' যোগ দিয়েছিলেন। আবদুল গফর খাঁ আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লা খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে আমানুল্লা খাঁ তাঁকে দেশত্যাগ করার অকার্যকারিতার কথা বুঝিয়ে বললেন। আবদুল গফর খাঁ দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রায় আঠারো হাজার মুসলমান দেশত্যাগ ক'রে আফগানিস্থানে প্রবেশ করেছিল। এখন আবদুল গফর খাঁর চেষ্টায় তাদের পলায়ন বন্ধ হ'লো এবং তারা ভারতীয় মুসলিমদের সঙ্গে একযোগে খিলাফত সংগ্রামে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলো।

বড়লাট গান্ধীজীর উত্তরে নীরব রইলেন। গান্ধীজী তাই ২৮শে জুলাই তারিখে ১লা আগস্ট থেকেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবার কথা পুনরায় ঘোষণা করলেন। তিনি আন্দোলন আরম্ভের পূর্বদিন চিত্তশুদ্ধির জন্যে দেশবাসীকে উপবাস ও উপাসনা করবার কথা বললেন। খিলাফত কমিটি ১লা আগস্টকে পরিপূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে ডাক দিলেন।

গান্ধীজী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অবিসংবাদী নির্মাতারূপে ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে এলেও তখনও তিলক ছিলেন ভারতের সর্ববরেণ্য অবিসংবাদী নেতা। খিলাফত সম্পর্কে তিলক গান্ধীজীর মতো অত্যুৎসাহী না হ'লেও তিনিও খিলাফতকে সমর্থন করছিলেন। তাঁর মত ছিল, এ বিষয়ে মুসলমানদেরই অগ্রণী হয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নেবেন হিন্দুরা তাকে অকুণ্ঠিত সমর্থন জানাবে এবং মুসলমানদের দাবী নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করবে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পঁচিশ বৎসর তিলকই বৃটিশের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিলেন। তাই এই আসন্ন দেশব্যাপী আন্দোলনেও দেশবাসী তাঁকেই প্রধান সেনাপতিরূপে দেখতে চাইলো।

২৩শে জুলাই (১৯২০) ছিল তিলকের চৌবট্টিতম জন্মদিন। কিছুদিন আগে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর শরীর দুর্বল ছিল। এই সময়ে বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে একটু বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর ঠাণ্ডা লাগলো এবং তিনি আবার জ্বরাক্রান্ত হ'লেন। ২৬শে জুলাই সোমবার তাঁর অসুস্থতা গুরুতর আকার ধারণ করলো এবং তাঁর নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিলো। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। হাজার হাজার মানুষ ভীড় ক'রে তাঁদের প্রিয় নেতার স্বাস্থ্যের সংবাদ নেওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুলেটিন প্রকাশিত

হ'লো। বুধবার তাঁর হার্টের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লো এবং তিনি অচৈতন্য হয়ে গেলেন। পরের তিনদিন প্রায় ঐ একই অবস্থায় কাটলো। শনিবার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে গেলো। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট রাত্রি ১২টা ৪০ মিনিটে তিলক পরলোকগমন করলেন।

ঐ দিন ছিল রাওলাট আইন ও পাঞ্জাবে নৃশংস ঘটনাবলীর প্রতিবাদে এবং খিলাফতের দাবীতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হওয়ার দিন। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে লোকমান্যকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে এলো। ভারত কোন নেতার মৃত্যুতে এ ধরনের জাতীয় শোকোচ্ছ্বাস এর আগে প্রত্যক্ষ করেনি। ঐদিন গান্ধীজী জওহরলাল নেহ্‌রুর সঙ্গে সিন্ধু সফর শেষে বোম্বাইয়ে ফিরে এলেন। তিনিও শোক মিছিলে যোগ দিলেন। বোম্বাই শহরের ধনী নির্ধন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেন গৃহত্যাগ ক'রে এসে এই মিছিলে যোগ দিল। তিলক ছিলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ। গান্ধীজী তাঁর শবাধার তুলতে গেলে কেউ বাধা দিলে তিনি বললেন, "জননায়কের জাত নেই।" তিনি শবাধারে কাঁধ লাগালে তাঁর পরে ডাঃ কিচলু ও মওলানা সওকত আলি শবাধারে কাঁধ দিলেন। শব-শোভাযাত্রা চৌপট্টির দিকে অগ্রসর হ'লো। সূর্যাস্তের সময়ে চিতায় আগুন দেওয়া হ'লো। গান্ধীজী বললেন, "তাঁর সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয় তিনি হারালেন।" জাতির সম্মুখে দেখা দিল একটি প্রশ্ন— তিলকের পর কে? তিলকের শূন্যস্থান কে পূরণ করবে? হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, পার্শি, জৈন, ধনী, নির্ধন, কৃষক, শ্রমিক সকলে একবাক্যে সে প্রশ্নের উত্তর দিলো: মহাত্মা গান্ধী।

গান্ধীজী ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

সতেরো

অসহযোগ সংগ্রাম

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখে মহাত্মা গান্ধী বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে একটি পত্রে তাঁর বৃটিশ-প্রদত্ত খেতাব ও পদক ফিরিয়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করলেন। গান্ধীজী সংগ্রামকে ক্রমবর্ধমান তীব্রতা অনুসারে খেতাব পদক প্রভৃতি বর্জন থেকে কর বন্ধ পর্যন্ত কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীতে একদিকে ছিল ইংরেজের স্কুল-কলেজ, আদালত, সরকারী চাকরি, আইনসভা ও বিদেশী পণ্য বর্জন এবং অন্যদিকে ছিল জাতীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, সালিশের মাধ্যমে বিচার ও বিবাদ মীমাংসার ব্যবস্থা, হাতে কাটা সুতো দিয়ে হাত-তাঁতে কাপড় (খদ্দর) উৎপাদন ও ব্যবহার, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন প্রভৃতি জাতীয় উন্নতি ও ঐক্যসাধনের ব্যবস্থা।

তাঁর এই সংগ্রামসূচী সম্পর্কে অনেক জাতীয় নেতার মনে সংশয় ছিল। দেশে প্রচলিত শিক্ষালয়সমূহ বর্জন ক'রে সেগুলির স্থলে জাতীয় শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠার কার্যকরতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, মদনমোহন মালব্য, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির সন্দেহ ছিল। গান্ধীজী কেবল সরকারী ও সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষালয়গুলি ত্যাগ করতেই বলেননি, তিনি ইংরেজি ভাষার স্থলে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করতে বলেছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষালয়সমূহে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার ক'রে ইংরেজরা ভারতীয় বালক-বালিকাদের স্বদেশে বিদেশী ক'রে তুলেছিল।

ইংরেজের আদালত সম্পর্কে তিনি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর 'হিন্দ্‌ স্বরাজে' বলেছিলেন, "আইনজীবীরা ভারতবর্ষকে দাসত্ববন্ধনে

বেঁধেছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি করেছে এবং ইংরেজের কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতের আদালতসমূহে বিচার-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তাতে ভারতবাসী সুবিচারের পরিবর্তে যা পেতো, তা তাকে ধ্বংসের পথেই টেনে নিয়ে যেতো। তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু ইংরেজের আদালতসমূহের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন, "আদালতমে জো জিতা সো হারা, জো হারা সো মরা।" তাছাড়া বৃটিশের আইন-আদালত ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকে ন্যায় ও পবিত্রতার একটি ছদ্মবেশ দিয়েছিল।

বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী ব্যবহারের নীতি গান্ধীজী ভারতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের কাল থেকেই প্রচার করেছিলেন। তিনি তাঁর আশ্রমে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার, সুতো কাটা ও কাপড় বোনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গান্ধীজী সংগ্রামসূচীতে বিলাতী বস্ত্র বর্জন ও খাদি ব্যবহারকে প্রাধান্য দিলে সরকার ও জাতীয় নেতাদের অনেকেই তাকে বৃটিশের দুর্বলতম স্থানে—বৃটিশের ব্যবসা-বাণিজ্যে—আঘাত দেওয়ার হাতিয়াররূপে দেখলেন। এর দ্বারা বৃটিশের উপর প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি হ'লেও গান্ধীজী বিলাতী বস্ত্র বর্জন এবং খাদি উৎপাদন ও ব্যবহারকে সমরকৌশলরূপে নয়, জাতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের হাতিয়াররূপেই, লক্ষ্য করেছিলেন। ভারত যদি বিলাতী বস্ত্র বর্জন ক'রে নিজ হাতে কাটা সুতো দিয়ে কাপড় বুনে তা ব্যবহার করে, তবে প্রতি বৎসর কমপক্ষে ষাট কোটি টাকা ভারতে থেকে যাবে, জমির উপর কৃষকদের চাপ কমবে, কৃষকদের কৃষি ছাড়াও জীবিকা উপার্জনের একটি পথ আবিষ্কৃত হবে, অনাহারে অর্ধাহারে যে কোটি কোটি ভারতবাসী দিন কাটাচ্ছে, তাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

আইনসভা বর্জনের সূচীটি কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে তীব্রতম মতদ্বৈধের সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যতোদিন গান্ধীজী

বৃটিশের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন, ততোদিন তিনি আইনসভাসমূহে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের সমর্থন করতেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের ফলে ভারতীয়গণ আইন-সভাসমূহে যে সীমাবদ্ধ অধিকার পেয়েছিল, গান্ধীজী তাকে গ্রহণ ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখতে বলেছিলেন। কিন্তু বৃটিশের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতায় বিশ্বাস হারাবার পর তিনি ইংরেজের আইনসভায় প্রবেশের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। যাঁরা আইনসভায় প্রবেশ ক'রে ভেতর থেকে তাকে 'ধ্বংস' করতে চাইলেন, গান্ধীজী তাদের বিরোধিতা করলেন। কারণ, আইনসভায় প্রবেশ ক'রে তাকে বানচাল করার মধ্যে কপটতা ও কূটনীতি অর্থাৎ অসত্যের প্রশ্রয় ছিল। তাঁর কাছে আইনসভায় প্রবেশ মানেই ছিল সহযোগ; অসহযোগ ও আইনসভায় প্রবেশ একসঙ্গে করা প্রকৃত সত্যাগ্রহীর তাই পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সরকার এবং নরমপন্থী জাতীয় নেতারা অসহযোগ আন্দোলন ও তার কর্মসূচীর মধ্যে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির সম্ভাবনা লক্ষ্য করলেন। সরকার অবশ্য গোড়ার দিকে অসহযোগ আন্দোলনকে আমল দিতে চাইলো না। ছাত্ররা শিক্ষকরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে আসবে, উকিল-মোক্তাররা আদালত বর্জন করবে, সরকারী কর্মচারীরা ইস্তফা দেবে, এসব পরিকল্পনাকে তারা নির্বোধের স্বর্গে বাস করার তুল্য মনে করলো। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড গান্ধীজীর এই অসহযোগের পরিকল্পনাকে—the most foolish of all foolish schemes ব'লে বর্ণনা করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মতো নেতারাও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবার বিরোধিতা করলেন। স্যার নারায়ণ চন্দ্রবরকরের মতো ব্যক্তিরা দেশবাসীকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ না দিতে আহ্বান জানালেন। কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক ও কর্মসূচী দেশবাসীর কল্পনাকে জাদুকরের মতো স্পর্শ করলো।

গান্ধীজী, মওলানা সওকত আলি, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়ালেন এবং খিলাফত প্রশ্নে বহু বক্তৃতা দিলেন। সর্বত্রই হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে 'গান্ধীজীকি জয়', 'মহম্মদ আলি সওকত আলি কি জয়','বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করলো। গান্ধীজী 'গান্ধীজীকি জয়' ও 'মহম্মদ আলি সওকত আলিকি জয়' ধ্বনির পরিবর্তে 'হিন্দু-মুসলমান কি জয়' ধ্বনি দিতে বললেন। তিনি ধ্বনির পারম্পর্য সম্পর্কেও দেশবাসীকে সতর্ক হ'তে বললেন। তিনি বললেন। "প্রধান ধ্বনি হবে তিনটি : প্রথম ধ্বনি 'আল্লাহো আকবর'—ভগবানই সর্বশক্তিমান্; তাঁর চেয়ে আর কেউ সর্বশক্তিমান নয়। দ্বিতীয় ধ্বনি 'বন্দে মাতরম্' বা 'ভারত মাতা কি জয়!' আর তৃতীয় ধ্বনি হবে 'হিন্দু-মুসলমান কি জয়!' তিনি 'ভারত মাতা কি জয়ের' চেয়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিটি বেশি পছন্দ করতেন। তিনি বললেন, "ওতে বাংলার মানসিক ও আনুভূতিক শ্রেষ্ঠতাকে সুন্দরভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।" গান্ধীজী সর্বত্রই অহিংসার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জনতার হিংসাত্মক আচরণের তীব্র নিন্দা করেন এবং কঠিনতম প্ররোচনাতেও সকলকে শান্ত ও অহিংস থাকতে বলেন। তিনি বলেন, "ভারত যদি হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করতে চায়, তবে তা তারা যুদ্ধ নামে পরিচিত সুশৃঙ্খল হিংসার দ্বারা লাভ করুক।" জনতার অসংযত ও বিশৃঙ্খল হিংসার দ্বারা নয়। তিনি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার উপর খুবই জোর দেন। তিনি মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভাসমিতি পরিচালনার জন্যে সুদক্ষ সেনাপতির মতো শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার বিশদ নিয়মাবলী প্রবর্তন করেন। তিনি আন্দোলন পরিচালনার জন্য সুনিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গ'ড়ে তোলার ওপর জোর দেন। ফলে দেশের সর্বত্র সুসংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গ'ড়ে ওঠে। মিছিল,

সভাসমিতি, সমাবেশ প্রভৃতি পরিচালনার জন্যে কেবল অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ করতেই তিনি পরামর্শ দেন। মিছিল, সভাসমিতি, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সমাবেশে শিশুদের আনতে তিনি নিষেধ করেন।

ধীরে ধীরে লোকে খেতাব ও সম্মান ত্যাগ করতে এবং ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু এই সাধারণ সূচনা দেখে কেউ কল্পনা করতে পারে নি যে, এই আন্দোলন জাতীয় চেতনায় কি প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তারিখে তুরস্কের সঙ্গে মিত্র পক্ষের সেভার্স চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'লো। এই চুক্তির শর্তাবলী ভারতীয় মুসলমানদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করলো। আগস্ট মাসের শেষভাগে গুজরাট রাজনৈতিক সম্মেলনে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশনে এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হওয়ায় প্রাদেশিক সম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত হ'তে পারে কিনা তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক দেখা দিলো। ফলে ৪ঠা থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসলো। এই অধিবেশনে বিশ হাজারেরও বেশি লোক যোগ দিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৫০০০-এর বেশি প্রতিনিধি এলেন। লালা লাজপত রায় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। গান্ধীজী অসহযোগের প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাব কারা সমর্থন করবে এবং কারা এর বিরোধিতা করবে, তা গান্ধীজী না জানলেও মিসেস বেসান্ট, মদনমোহন মালব্য, বিজয়রাঘবাচারী, মতিলাল নেহ্‌রু, চিত্তরঞ্জন দাশ ও মহম্মদ আলি জিন্নার মতো ব্যক্তিদের সংঘবদ্ধ বিরোধের সম্মুখীন হলেন। গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবে পাঞ্জাবে ও খিলাফত প্রশ্নে ইংরেজরা যে অন্যায় করেছে, তারই প্রতিকার দাবী করেছিলেন। বিজয়রাঘবাচারী ও মতিলাল নেহ্‌রু ঐ প্রস্তাবে স্বরাজের দাবীকেও অন্তর্ভুক্ত করতে বললেন। গান্ধীজী

সানন্দে ঐ দাবী অন্তর্ভুক্ত করলেন। গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবে অসহযোগের কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে স্থান দিলেন: (১) খেতাব, অবৈতনিক পদ ও স্থানীয় সংস্থাসমূহে সরকার মনোনীত পদ ত্যাগ করতে হবে; (২) সরকারী সমাবেশে এবং সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা তাদের সম্মানে আয়োজিত সরকারী বা আধা-সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন করতে হবে; (৩) স্কুলকলেজ থেকে ছেলেমেয়েদের ধীরে ধীরে সরিয়ে আনতে হবে; (৪) ধীরে ধীরে আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের ইংরেজের আদালত ত্যাগ করতে হবে, বিবাদীয় বিষয় সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে; (৫) মেসোপটেমিয়ায় কাজ করবার জন্যে সৈনিক, কেরানী ও শ্রমিকরূপে নাম লেখাতে অস্বীকার করতে হবে; (৬) নূতন কাউন্সিলগুলিতে নির্বাচনের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে হবে; যারা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করবে না তাদের ভোট দিতে ভোটাদের অস্বীকার করতে হবে; এবং (৭) বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে হবে।

অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাশ সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন। তাঁদের সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হ'লো, কংগ্রেসের দাবীসমূহ ইংলণ্ডের কাছে উত্থাপিত করবার জন্যে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হ'ক, ইতিমধ্যে দেশে জাতীয় শিক্ষালয়সমূহ ও সালীশী বোর্ডসমূহ গ'ড়ে তোলা হ'ক এবং আইনসভাগুলিতে প্রবেশ করা হ'ক। এই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হ'লে তা যে সংগ্রামকে বিলম্বিত ক'রে দেবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় ছিল না। অধিবেশনে তীব্র বাক্‌বিতণ্ডার পরে গান্ধীজীর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হ'লো। নেতারা বিরোধী মনোভাব পোষণ করলেও সাধারণ প্রতিনিধিরা কিন্তু গান্ধীজীর প্রস্তাবকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন এবং গান্ধীজীর প্রস্তাব ১৯৫৫-৮৭৩ ভোটে গৃহীত হ'লো। জিন্না ছাড়া অন্যান্য মুসলিম নেতারা সকলেই গান্ধীজীকে সমর্থন করলেন। কিন্তু অমুসলমান নেতাদের অধিকাংশই সমর্থন জানালেন চিত্তরঞ্জন দাশকে। কয়েক

বৎসর যাবৎ মুসলিম লীগও কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে একই স্থানে তাদের অধিবেশন করছিল। কলকাতায় ৭ই সেপ্টেম্বর মুসলিম লীগের অধিবেশন হ'লো। মুসলিম লীগও অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করলো।

গান্ধীজী সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ালেন এবং সর্বত্রই তিনি অসহযোগের কর্মসূচী জনসাধারণকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন। তিনি স্কুল-কলেজ আদালত ও বিদেশী বর্জনের জন্ম আহ্বান জানালেন এবং সর্ব অবস্থাতেই অহিংস থাকতে পরামর্শ দিলেন।

এখন ভারত সরকার আন্দোলনের তীব্রতা অনুমান ক'রে শঙ্কিত হ'লো। সরকারী ঘোষণায় বলা হ'লো এই আন্দোলনের নেতাদের এ পর্যন্ত কোনপ্রকার বাধা দেওয়া না হ'লেও তাঁরা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাঁদের গ্রেপ্তারের জন্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজী সরকারের এই ঘোষণাকে অসহযোগের প্রথম জয়লাভ ব'লে অভিনন্দন জানালেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'লে জনসাধারণের কর্তব্য কি হবে, সে সম্পর্কে তিনি জনসাধারণকে সতর্ক ক'রে দিলেন। তিনি ইয়াং ইণ্ডিয়াতে লিখলেন, "সরকার যদি রক্তের নদী বইয়ে দেয়, তাতে আমি ভয় পাবো না। কিন্তু জনসাধারণ যদি আমার জন্মে বা আমার নামে সরকারের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন, তবে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হব। আমাকে গ্রেপ্তার করা হ'লে জনসাধারণ যদি তাঁদের সংযম হারান, তবে তাতে আমাকেই অপমান করা হবে। কেবল আমার উপর নির্ভর ক'রেই জাতির অগ্রগতি হবে না। আমি যে পথ দেখিয়েছি, তা বুঝলে ও অনুসরণ করলেই অগ্রগতি হ'তে পারবে। এই কারণেই আমি চাই যে, জনসাধারণ পরিপূর্ণ আত্মসংযম রক্ষা করবেন এবং আমার গ্রেপ্তারের দিনকে উৎসবের দিন ব'লে গণ্য করবেন।" গান্ধীজী জনসাধারণকে শান্ত ও সংযত থেকে অসহযোগের কর্মসূচী পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করতে এবং স্বদেশী সহ অন্যান্ম গঠনমূলক

কর্মসূচীকে দ্রুত রূপায়িত করতে আহ্বান জানিয়ে বললেন, "যদি জনসাধারণ এই বর্জন ও স্বদেশীর কর্মসূচীকে কার্যকর করতে দৃঢ়-সংকল্প হন, তবে তাঁদের স্বরাজের জন্যে এক বৎসরও অপেক্ষা করতে হবে না।"

ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসলো। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন বিজয়রাঘবাচারী। তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে মতানৈক্য প্রকাশ করলেন এবং কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত অসহযোগ প্রস্তাবের কয়েকটি বিষয়ের সমালোচনা করলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধীজীর বিরোধিতা করবার জন্যে বাংলাদেশ থেকে আগত বহু প্রতিনিধি সহ উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজীর বিরোধিতা করবার জন্যে মহারাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন খাপাড়ে ও কেলকার। জিন্না ও তাঁর অনুবর্তীরাও গান্ধীজীর কর্মসূচী সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু এঁদের সকলের বিরোধিতা নাগপুর কংগ্রেসে হাওয়ায় উড়ে গেল। উপস্থিত চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি বিপুল সংখ্যাধিক্যে কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবকে সমর্থন জানালো। নাগপুর কংগ্রেসে আদালত বর্জনকে কর্মসূচী থেকে বাদ দেওয়ার জন্যে চাপ এলো। কিন্তু গান্ধীজী দৃঢ়তার সঙ্গে সে চাপ রোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত নাগপুর কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্পর্কেও গান্ধীজী একটি প্রস্তাব আনলেন। এই প্রস্তাবে "সম্ভব হ'লে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে এবং প্রয়োজন হ'লে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতের স্বরাজ লাভ" কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হ'লো। মালব্য ও জিন্না কেবল "বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে" এই সংশোধন আনলেন, কিন্তু বিপুল ভোটাধিক্যে তাঁদের এই সংশোধন অগ্রাহ্য হ'লো। কংগ্রেস এতোদিন রাজনৈতিক সম্মেলন মাত্র ছিল। গান্ধীজী-রচিত নূতন সংবিধান অনুসারে কংগ্রেসের শাখা-প্রশাখা গ্রামে গ্রামে বিস্তৃত হ'লো এবং পনেরোজন ব্যক্তি

নিয়ে গঠিত কংগ্রেসের একটি কার্যনির্বাহক কমিটি রইলো। নূতন সংবিধান অনুসারে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সংগঠনগুলিকে ভাষাভিত্তিক করা হ'লো এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিসংখ্যা, প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি এবং কংগ্রেসের নিম্নতম কমিটিগুলির সংগঠন প্রভৃতি সুনিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট করা হ'লো। এক কথায় গান্ধীজী তাঁর রচিত এই সংবিধানের দ্বারা কংগ্রেসকে একটি আধুনিক পার্টিতে পরিণত করলেন। কংগ্রেস এখন প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের পার্টি হয়ে উঠলো। গান্ধীজী কংগ্রেসের এই নূতন সংবিধানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি বললেন, "আমি এই নূতন সংবিধানকে কতকটা গর্বের সঙ্গেই দেখি। আমি মনে করি, আমরা যদি এই সংবিধানকে পুরোপুরি কার্যকর করতে পারি, তবে কেবল এইটুকু কাজই আমাদের স্বরাজ এনে দেবে। আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করায় বলতে পারি যে, আমি কংগ্রেসের রাজনীতিতে সত্যই প্রবেশ করলাম।"

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে শুরু হ'লো। বাংলাদেশ সাড়া দিলো সর্বাগ্রে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে জানুয়ারি মাসে কলকাতার তিন হাজার কলেজ ছাত্র কলেজ বর্জন করলো। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করলো। গান্ধীজী বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানালেন এবং প্রথম সুযোগেই কলকাতা এলেন। গান্ধীজী কলকাতা আসায় বাংলাদেশে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রবলতর হ'লো। ইতিপূর্বে গান্ধীজী আমেদাবাদে গুজরাট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এখানে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি জাতীয় কলেজের উদ্বোধন করলেন। কলকাতা থেকে তিনি গেলেন পাটনা এবং পাটনায় বিহার বিদ্যাপীঠ স্থাপন করলেন। চার মাসের মধ্যেই পাটনা, আলিগড়, আমেদাবাদ, বোম্বাই, বেনারস ও দিল্লীতে জাতীয় কলেজগুলি স্থাপিত হ'লো। গান্ধীজী ও মওলানা মহম্মদ আলির মিলিত

চেষ্টায় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বা জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লো। ছাত্ররাই কেবল স্কুল-কলেজ ত্যাগ করলো না। বহু আইনজীবী আইনব্যবসায় ত্যাগ করলেন। এঁদের অনেকেই বছরে লক্ষাধিক টাকাও রোজগার করতেন। এঁদের মধ্যে মতিলাল নেহ্রু, চিত্তরঞ্জন দাশ, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি প্রধান। যাঁরা সরকারী উচ্চপদ ছেড়ে এলেন, তাঁদের মধ্যে তরুণ সুভাষচন্দ্র বসুর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. থেকে পদত্যাগ ক'রে কলকাতা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ নিলেন। প্রচারের ঝড় বইলো সারা দেশে। খিলাফতের দাবিকে আন্দোলনে প্রাধান্য দেওয়ায় অসংখ্য মওলানা ও মৌলবী আন্দোলনে যোগ দিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সম্প্রীতি ও ঐক্যবোধ দেখা দিলো। গোঁড়া হিন্দু নেতারা মুসলমান নেতাদের সঙ্গে একত্র ব'সে আহার করতে দ্বিধা বোধ করলেন না। মুসলমানরা গোমাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন, এমন কি ইদের দিনেও গো-কোরবানি বন্ধ করলেন। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যবোধ একটি উচ্চতম সীমারেখায় গিয়ে পৌঁছলো। সারা দেশে অসংখ্য সভা-সমিতি হ'তে লাগলো। সভাগুলিতে হাজার হাজার নরনারী সমবেত হলেন। গান্ধীজী, মওলানা মহম্মদ আলি, মওলানা সওকত আলি, আবুল কালাম আজাদ, মতিলাল নেহ্রু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহ্রু প্রভৃতি নেতারা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়ালেন। দলে দলে নূতন কর্মী, নূতন বক্তা এসে যোগ দিতে লাগলেন। দেশের সর্বত্র দেখা দিল এক অভাবনীয় উন্মাদনা—শঙ্কাবোধ, নৈরাশ্য, অনুৎসাহ কোথায় আত্মগোপন করলো। গ্রামের চাষাভুষোরাও স্বরাজ ও কংগ্রেসের কথা বলতে লাগলো। তারা পাঞ্জাব ও খিলাফত নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। যারা খিলাফতের ইতিহাস জানতো

না, তারা এর মধ্যে নূতন অর্থ আবিষ্কার করলো। উর্দুতে খিলাফ শব্দের অর্থ 'বিরুদ্ধে'। তাই তারা 'খিলাফতের' অর্থ করলো সরকারের প্রতি বিরুদ্ধতা।

জনমানসের এই জাগরণ, এই উন্মাদনা দেখে সরকার হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তারা যেন সম্বিত ফিরে পেলো এবং দমননীতি শুরু করলো। অনেক নেতার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী হ'লো। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফর খান শিক্ষাদান ও সমাজহিতকর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হঠাৎ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে তিনবছরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলো। সরকার এখন সকল কাজেই রাজনীতির গন্ধ পেলো, সরকারের প্রতি বিরোধিতা লক্ষ্য করলো। সরকারী দমননীতির মুখে গান্ধীজী সকলকে শান্ত, সংযত ও অহিংস থাকতে বার বার পরামর্শ দিলেন।

গান্ধীজী গঠনমূলক কার্যের ওপরও সমান গুরুত্ব আরোপ করলেন। যা কিছু ভারতীয় সমাজকে অধঃপতিত ও দুর্বল করছে, সেগুলি দূর করবার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। অস্পৃশ্যতা বর্জন ও মাদক বর্জনকেও তিনি আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মদের দোকানগুলিতে পিকেটিং শুরু হ'লো। ভারতবাসীকে মদ্যপান ত্যাগ করবার জন্যে ভারতীয় নেতারা গান্ধীজীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আহ্বান জানালেন। অনেকে মাদক বর্জনের মধ্যে আফগারী শুল্কের দিক থেকে সরকারের ক্ষতির দিক্‌টা লক্ষ্য করলেও গান্ধীজীর কাছে তা ছিল মূল্যহীন। জাতিকে সবল ও সমর্থ ক'রে তোলাই ছিল গান্ধীজীর মূল লক্ষ্য। তিনি ভারতীয় নারী সমাজকে আহ্বান ক'রে জানালেন, তাঁরা যেন নিজেদের পুরুষের কামনার দ্রব্য ব'লে মনে না করেন। পুরুষদের খুশী করবার জন্যে তাঁদের নিজেদের সাজিয়ে রাখবার অভ্যাস ত্যাগ ক'রে তাঁদের পুরুষের সঙ্গে সমান অংশীদার হয়ে উঠতে হবে। যেসব হতভাগ্য

নারী জীবিকার জন্যে নিজেদের সম্মান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে, তাদেরও তিনি আত্মসচেতন ক'রে তুললেন। তিনি অন্ধ্রের কোকনাডে এবং বাংলার বরিশালে বারবনিতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বরিশালে প্রায় একশত বারবনিতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। গান্ধীজী বারবনিতাদের কংগ্রেসের কর্মীরূপে গ্রহণ নিষিদ্ধ করায় তারা গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। তারা জানালো যে, তারা কংগ্রেসের সদস্য হয়েছে, চাঁদা দিয়েছে, স্বরাজ তহবিলে অর্থ দিয়েছে, তবু তাদের কংগ্রেসের জন্যে কর্মীরূপে কাজ করতে দেওয়া হবে না কেন। গান্ধীজী এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন না। তিনি দু ঘণ্টা এঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি বলেন, "এই একশত বোনের কাছে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। এদের মধ্যে কয়েকজন ছিল বয়স্কা, বেশির ভাগের বয়স ছিল বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে, দু-তিনজনের বয়স ছিল বারোর কম। নিজেদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এদের গভীর নৈরাশ্যবোধ আমাকে শাণিত তীরের মতো বিদ্ধ করেছিল। অথচ এরা বেশ বুদ্ধিমান, খুব সরল ও সাদাসিদে। এদের কথাবার্তার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ছিল, এদের উত্তরগুলি ছিল অপকট ও সুস্পষ্ট। এদের সঙ্কল্প ছিল সত্যাগ্রহীর সংকল্পের মতোই দৃঢ়। এদের মধ্যে এগারোজন সাহায্য করবার মতো একজন কাউকে পেলে তাদের বর্তমান জীবন ত্যাগ ক'রে সূতো কেটে ও কাপড় বুনে জীবিকার্জন করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অবশিষ্টরা এ বিষয়ে ভেবে দেখবার জন্যে সময় চেয়েছিল, কারণ তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে চায় নি।" গান্ধীজী নারীজাতির একাংশের এই অধঃপতনের জন্যে পুরুষদেরই দায়ী করেছিলেন এবং নারীকে যথোচিত মর্যাদাদানের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। গান্ধীজী ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ক'রে তোলার জন্যে প্রচণ্ডভাবে অভিযান চালালেন। সকল সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ ও পুরুষ-নারীকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে

তুলে আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলাই হ'লো তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

অসহযোগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ হ'লো। রবীন্দ্রনাথ মডার্ন রিভিউ কাগজে একটি প্রবন্ধে অসহযোগের প্রতিবাদে লিখলেন, "আমি প্রার্থনা করি, ভারত পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে সহযোগিতার প্রতীক হয়ে উঠুক। ভারতের পক্ষে ঐক্যই সত্য, অনৈক্যই অমঙ্গল।...আমাদের চিত্তকে প্রতীচ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করবার বর্তমান প্রয়াস মানসিক আত্মহত্যার প্রচেষ্টা মাত্র।...বর্তমান যুগে প্রতীচ্য প্রাধান্য বিস্তার করেছে, কারণ প্রতীচ্যের উপর একটি দায়িত্ব পূরণের ভার ন্যস্ত হয়েছে। আমাদের প্রাচ্যবাসীদের উচিত হবে প্রতীচ্যের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। সমস্যাটি একটি বিশ্বসমস্যা। অন্যান্য জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন জাতি মুক্তিলাভ করতে পারে না। হয় আমরা সকলে রক্ষা পাবো, নয় আমরা সকলে ধ্বংস হবো।" গান্ধীজী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে প্রতিবাদ জানালেন। "ভারত ও পশ্চিমের মধ্যে একটি চীনা প্রাচীর খাড়া করা অসহযোগের উদ্দেশ্য নয়। অন্যপক্ষে, অসহযোগের উদ্দেশ্য হ'লো পারস্পরিক সম্মান ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রকৃত, সম্মানজনক ও স্বেচ্ছাবৃত্ত সহযোগের পথ প্রস্তুত করা। বর্তমান সংগ্রাম চলছে বাধ্যতামূলক সহযোগের বিরুদ্ধে, একপাক্ষিক সংঘবদ্ধতার বিরুদ্ধে, সভ্যতা নামের ছদ্মবেশের আড়ালে শোষণের আধুনিক পদ্ধতিসমূহকে অস্ত্রের সাহায্যে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে।"

গান্ধীজী কংগ্রেসকে আধুনিক পার্টির উপযোগী একটি সংবিধান দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি একটি জাতীয় পতাকাও দিলেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকাটি রচিত হ'লো। হিন্দুদের প্রিয় বর্ণ গৈরিক, মুসলমানদের প্রিয় বর্ণ সবুজ হ'লো এই পতাকায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মিলনের প্রতীক।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতীক রূপে গৃহীত হ'লো শ্বেতবর্ণ। গান্ধীজী বললেন, শ্বেতবর্ণ শান্তি ও শুদ্ধিরও প্রতীক। ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানসিক পুনরুজ্জীবনের প্রতীকরূপে পতাকার মধ্যস্থলে গৃহীত হ'লো চরকার পূর্ণায়তন চিত্র। তিনি বললেন, "প্রত্যেক জাতিরই একটি পতাকার প্রয়োজন আছে। কোটি কোটি মানুষ এই পতাকার জন্যে মৃত্যু বরণ করেছে। এ এক প্রকার পৌত্তলিকতা সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পৌত্তলিকতাকে ধ্বংস করা হবে মহাপাপ। কারণ, পতাকা একটি আদর্শের প্রতীক।" তিনি বললেন, "আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী, পার্শী, যারাই ভারতে বাস করি, তাদের সকলের জন্যে একটি পতাকার প্রয়োজন আছে—যে পতাকার জন্যে আমরা সকলে বাঁচব, সকলে মরব।"

অসহযোগ আন্দোলন জনচেতনায় এমন এক অভূতপূর্ব আলোড়ন আনলো যে, তাতে সকলপ্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগলো। পাঞ্জাবের আকালী কৃষকরা সরকার-রক্ষিত ধনী মহান্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গুরুদ্বারে শিখ তীর্থযাত্রীদের একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশের উপর হঠাৎ পুলিস হানা দিলো এবং পুলিসের গুলীতে অনেকে হতাহত হ'লো। মহারাষ্ট্রে মুসলির কৃষকরা জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো এবং সত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলো। শ্রমিকদের মধ্যেও অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ব্যাপক হয়ে উঠলো। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিকরা ধর্মঘট ক'রে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করলো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সারা দেশে চার শর-ও বেশি ধর্মঘট হ'লো এবং তাতে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক অংশ গ্রহণ করলো। কোথাও কোথাও হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটলো। গান্ধীজী কঠোরভাবে তার নিন্দা করলেন এবং এর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বার বার সতর্ক ক'রে দিলেন। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই সংকটজনক হয়ে উঠলো। ১৯২১

খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের স্থলে লর্ড রেডিং ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। তিনি মে মাসে গান্ধীজীকে সাক্ষাৎকারের জন্যে সিমলায় ডেকে পাঠালেন। লর্ড রেডিং ছ দফায় গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং প্রতিবারেই কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা হ'লো। এই আলোচনা সম্পর্কে লর্ড রেডিং তাঁর পুত্রকে যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব, সুন্দর ইংরেজী, স্পষ্টবাদিতা, আন্তরিকতা, অমায়িকতা, ধর্মীয় ও নৈতিক দৃঢ়তা সম্পর্কে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। প্রধান চারটি বিষয়ে আলোচনা হয়—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিত পাঞ্জাবের ঘটনাবলী, খিলাফত প্রশ্ন, স্বরাজ এবং আফগানিস্থান কর্তৃক ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে গান্ধীজীর মনোভাব। লর্ড রেডিং কথা প্রসঙ্গে বললেন, মওলানা মহম্মদ আলি ও মওলানা সওকত আলি গান্ধীজীর নীতি মেনে চলছেন না; তাঁরা তাঁদের বক্তৃতায় হিংসাত্মক কাজের উঁশকানি দিচ্ছেন। লর্ড রেডিংয়ের উদ্দেশ্য ছিল মহম্মদ আলি ও সওকত আলির সঙ্গে গান্ধীজীর মতানৈক্য ও বিরোধ সৃষ্টি করা। তা সম্ভব হ'লে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিবাদ ও অনৈক্য দেখা দেবে, সে বিষয়ে লর্ড রেডিং নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী লর্ড রেডিংয়ের উক্তির প্রতিবাদ করলেন এবং মহম্মদ আলি ও সওকত আলি অহিংস নীতিতে তাঁদের অবিচল আস্থার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন। আফগানিস্থান ভারত আক্রমণ করলে ভারতীয় মুসলমানরা আফগানিস্থানকে সাহায্য করবে ব'লে মহম্মদ আলি ও সওকত আলি তাঁদের বক্তৃতায় বলেছেন, এই মিথ্যা জনরব প্রচার করা হ'লো। গান্ধীজী এরও প্রতিবাদ জানালেন। তিনি আরও বললেন, "আমি বিশ্বাস করি না যে আফগানিস্থান ভারত আক্রমণ করবে। আমি বিশ্বাস করি, সরকার আফগান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন। তাছাড়া, অসহযোগ-আন্দোলনকারীরা যে-সরকারকে সংশোধন বা শেষ

করতে চায়, সে সরকারকে তারা শর্তহীনভাবেই সাহায্য দেবে। আফগানদের হাতে ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে, তাও আমি দেখবো; তবু ভারত তার আত্মসম্মানের মূল্যে আফগানদের কাছে কখনও স্বাধীনতা ক্রয় করবে না। প্রত্যেকটি অসহযোগীর কর্তব্য হ'লো আফগানিস্থানকে জানিয়ে দেওয়া যে, ভারতবাসী তাদের হস্তক্ষেপ চায় না।" তবে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই যে আফগান আক্রমণ বা বলশেভিক বিপদের কথা প্রচার করছে এবং এ ধরনের কোনও জুজুর ভয়ে ভারতবাসীরা যাতে বিশ্বাস না করে, সে বিষয়েও তিনি ভারতবাসীকে সতর্ক ক'রে দিলেন। ভারতবাসীদের জানা দরকার, ইংরেজদের সামরিক প্রস্তুতি ও সামরিক ব্যয়-বৃদ্ধি ভারতীয়দের পদানত রাখবার জন্যেই।

গান্ধীজী দেশের নরমপন্থী নেতাদেরও অসহযোগের কোনও কোনও কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, তাঁরা অনেকেই নূতন সংস্কার আইনে সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হ'লেও এবং সরকারের সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে সহযোগিতা করলেও, মাদক বর্জনের মতো একটি কর্মসূচীকে কার্যকর করতে সাহায্য করায় তাঁদের আপত্তি থাকতে পারে না। তিনি ইংরেজদেরও ভারতীয়দের দাবী ও আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে আহ্বান জানালেন। কারণ, অসহযোগীরা ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। অসহযোগীরা বিদ্বেষ পোষণ করে ইংরেজ-প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

৩১শে জুলাই তারিখে বোম্বাইয়ের পারেলে উমর সোবানীর অঙ্গনে গান্ধীজী আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশী বস্ত্রের একটি বহ্ন্যুৎসব করলেন। হাজার হাজার মানুষ সেই অপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো। পর্বতপ্রমাণ বিদেশী বস্ত্রের স্তূপকে যখন আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে লাগলো, তখন হাজার হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হ'লো। ঐদিন প্রায় দেড় লক্ষ টাকার বিলাতী

কাপড় পুড়ে ছাই হ'লো। পরদিন ছিল তিলকের মৃত্যুদিবস। চৌপাটি বালুসৈকতে গান্ধীজী এক বিশাল জনতার উদ্দেশে বললেন, "সুন্দরী বোম্বাই কাল যে আগুন জ্বালিয়েছে তা পার্শীদের মন্দিরের আগুনের মতোই চিরদিন অনির্বাণ থাকবে। তা কাল আমাদের বাইরের অশুদ্ধিকে—বিদেশী পরিচ্ছদকে—যেভাবে পুড়িয়েছে, তেমনি তা আমাদের সকল অশুদ্ধিকেই দগ্ধ করবে।"

বোম্বাইয়ে গান্ধীজী যে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করলেন, তার স্ফুলিঙ্গ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। সর্বত্রই শুরু হ'লো বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। অনেকে এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতায় ক্ষুব্ধ হলেন। অনেকে বলতে লাগলেন, যে দেশের মানুষ অর্ধোলঙ্গ রয়েছে, সেখানে পরবার বস্ত্র না দিয়ে পরবার বস্ত্রকে আগুনে পুড়িয়ে গান্ধীজী দেশকে উলঙ্গ করতে চলেছেন। গান্ধীজীর সুদীর্ঘকালের অনুরাগী বন্ধু সি. এফ. এন্‌ড্রুজও তীব্র সমালোচনা ক'রে গান্ধীজীকে লিখলেন: "বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করা এবং বিদেশী বস্ত্র পরা মহাপাপ ব'লে জনসাধারণকে বলা, বিদেশের ভাইবোনদের শিল্পকীর্তিকে আগুনে বিনষ্ট করা, এ সবই আমার কাছে স্বতন্ত্র বোধ হচ্ছে। আপনি কি জানেন, আপনি আমাকে যে খদ্দর উপহার দিয়েছিলে তা পরতে আমার ভয় করছে।" গান্ধীজী তার উত্তরে বললেন, "যদি সমস্ত বিদেশী দ্রব্যের উপর জোর দেওয়া হ'তো, তবে তা জাতীয়-সংকীর্ণতাপ্রসূত, আঞ্চলিক ও দুরভিসন্ধিমূলক হ'তো। বিদেশী বস্ত্রের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি ইংলণ্ডে প্রস্তুত ঘড়ি বা জাপানে প্রস্তুত ল্যাকারের জিনিসকে তো দূরে সরিয়ে দিই নি। আমার বিদেশের ভাইবোনরা যতোই শ্রম ও যত্ন নিয়ে মদ তৈরি করুন না কেন, আমি ইউরোপের সেরা মদকেও বিনষ্ট করবো। ভারত আজ জাতিবিদ্বেষে পূর্ণ। আমি ইউরোপের প্রতি ভারতবাসীর এই অশুভ প্রবণতাকে সংযত ক'রে রাখতে প্রাণপণে চেষ্টা করছি। আমি তাদের বিরূপ মনোভাবকে মানুষের দিক

থেকে বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। বিদেশীবস্ত্রপ্রীতি এনেছে বিদেশী শাসন, এনেছে দারিদ্র্য, এবং সবচেয়ে ভয়ংকর হ'লো, এনেছে লজ্জা। পাঠক হয়তো জানেন না, খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, কাঠিয়াবাড়ের শত শত 'অস্পৃশ্য' তাঁতী, কর্মাভাবে বোম্বাই পৌরসভায় মেথরের কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। এদের দুরবস্থা এমন হয়ে ওঠে যে, এদের অনেককেই ছেলেমেয়ে হারাতে হয়, অনেকেরই শোচনীয় শারীরিক ও মানসিক অধঃপতন ঘটে। পাঠক হয়তো জানেন না, গুজরাটের এই শ্রেণীর বহু নারীকে কুটিরশিল্পের অভাবে রাস্তানির্মাণের কাজে নামতে হয়ে এবং নানা চাপে পড়ে তারা নিজেদের ইজ্জতও বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। পাঠক হয়তো জানেন না, পাঞ্জাবের তাঁতীরা কর্মাভাবে সৈনিকের পেশা গ্রহণ করতে এবং নিজের দেশের জন্যে নয়, নিজেদের জীবিকার জন্যে, তাদের অফিসারদের আদেশে উচ্চশির ও নিরপরাধ আরবদের হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।...বিদেশী বস্ত্র স্পর্শ করাকে আমি যদি পাপ মনে করি, তাতে কি আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে? কারও পরিপাকযন্ত্র দুর্বল হ'লে তাকে গুরুপাক খাদ্য খেতে না দেওয়া কি পাপ?..."

গান্ধীজী সারাদেশে ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি শহরে গ্রামে যেখানেই গেলেন, সেখানেই হাজার হাজার মানুষ তাঁকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে, ভীড় ক'রে এলো। মুহূর্তের জন্য দর্শনলাভও পুণ্যকর্ম হয়ে উঠলো। জনমানসে তিনি কি ধরনের শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিলেন, একটি ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যাবে। তিনি বিহারের একটি গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে অবিরাম বৃষ্টিতে একশ-চার বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা তাঁর ক্ষণিক দর্শনের আশায় প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন, তিনি চোখে ঝাপসা দেখেন। তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থান দেখেছেন। তিনি রাম ও কৃষ্ণের উদ্দেশে দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাম ও কৃষ্ণ দুজনেই অবতার। এখন তিনি আর

একজন অবতারকে দেখতে এসেছেন—এই অবতার মহাত্মা গান্ধী। তাঁকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না! কৃষক, শ্রমিক মধ্যবিত্ত, ধনী, কুলনারী, গণিকা—সকলেরই চিত্তে মহাত্মা শ্রদ্ধার একটি অখণ্ড আসন লাভ করেছিলেন। গান্ধীজী যেখানেই যেতেন, সেখানেই 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়!' ধ্বনিতে হাজার হাজার কণ্ঠ মুখরিত হ'তো। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতি এই দেবদুর্লভ শ্রদ্ধা ও গান্ধীজীর জয়ধ্বনি গান্ধীজীকে পীড়িত করতো। তিনি অনেক সময় অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। তিনি বরিশালে পঁচিশ হাজার মানুষের এক সমাবেশে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমি যেখানেই যাই সেখানেই প্রত্যেককে 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়!' ধ্বনি দিতে কিংবা আবার পদতলে লুণ্ঠিত হ'তে সচেষ্ট দেখি। কিন্তু আমার কথা শুনতে কারো ইচ্ছা দেখি না। আমার নিজের সম্পর্কে এবং আমার পরিপার্শ্ব সম্পর্কে আমার ঘৃণা জন্মে গেছে। আমি যখন 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়!' চীৎকার শুনি, তখন যেন একটা তীক্ষ্ণ তীর আমার মর্মস্থল ভেদ ক'রে যায়। যদি মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারতাম যে এই চীৎকারে তোমাদের স্বরাজ আসবে, তবে এই কষ্ট আমি কোন মতে সহ্য করতাম। কিন্তু আমি যখন দেখি যে, লোকে এই অর্থহীন চীৎকারে তাদের সময় ও শক্তি ব্যয় করছে এবং প্রকৃত কাজ পড়ে থাকছে, তখন আমার মনে হয়, তারা এর চেয়ে আমার জন্যে যদি একটি চিতা জ্বালাতো তবে আমি তাতে লাফিয়ে উঠতাম এবং আমার মর্মদাহ চিরতরে নির্বাপিত হ'তো।"

আগস্টমাসে (১৯২১) মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ দেখা দিল। মোপলারা ছিল মুসলমান কৃষক ও জেলে। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে মালাবারে একটি খিলাফত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো। তারা কয়েকজন ইউরোপীয়ান এবং বহু হিন্দু জমিদার ও মহাজনকে হত্যা করলো, বহু হিন্দুকে জোর ক'রে মুসলমান করলো। গান্ধীজী সেপ্টেম্বর মাসে মহম্মদ আলিকে সঙ্গে

নিয়ে মোপলাদের শান্ত করবার জন্যে মালাবার রওনা হলেন। পথে সরকার মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করলো। বোম্বাইয়ের গভর্নর একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন যে, করাচী সম্মেলনে সিপাইদের আনুগত্য নষ্ট করবার চেষ্টায় একটি প্রস্তাব গ্রহণের অভিযোগে মহম্মদ আলির বিচার হবে। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের গভর্নরের এই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে বলেন, "সম্ভবত বোম্বাইয়ের গভর্নর জানেন না যে, সিপাইদের আনুগত্য নষ্ট করবার কাজ গত বৎসর থেকে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস শুরু করেছে। আরও অনেক আগে সিপাই বা অন্য কেউ যে কোনভাবেই এই সরকারের সেবা করছে, তারাই যে সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সকল অন্যায়ে অংশগ্রহণ করছে, তাদের প্রকাশ্যে সে কথা বলবার অধিকার ভারতের আছে, এ কথা আমিই প্রথম বলেছিলাম এবং সেজন্য সকল নিন্দা বা প্রশংসা আমারই প্রাপ্য। কংগ্রেসের ঘোষণাকেই করাচী সম্মেলন ঐসলামিক পরিভাষায় পুনরাবৃত্তি করেছে মাত্র... মহামান্য গভর্নর যে রাজদ্রোহিতার কথা বলেছেন, তা আনুগত্য নষ্ট করবার চেষ্টার চেয়ে কম ক্ষমার্হ। কিন্তু তাঁর জানা উচিত এই রাজদ্রোহিতাই কংগ্রেসের আদর্শ হয়ে উঠেছে।"

গান্ধীজী এই সময়েই কটিবাস মাত্র পরিধানের সংকল্প করেন। তিনি বলেন, "আমি জানি, অনেকের পক্ষেই বিদেশী কাপড়ের বদলে অন্য কাপড় সংগ্রহ করা কঠিন হবে। কোটি কোটি মানুষ এতোই দরিদ্র যে তারা বিদেশী কাপড়ের বদলে খদ্দর কিনতে পারবে না। তারা কেবল কটিবাস প'রেই সন্তুষ্ট থাকুক। আমাদের জলবায়ুতে বছরের গরম কয়েক মাস আমাদের শরীররক্ষার জন্যে প্রায় কিছুই লাগে না। ভারত কখনও শিক্ষা-দীক্ষার মাপকাঠি রূপে পুরুষের সর্বাঙ্গ আবৃত করার উপর নজর দেয় নি। সুতরাং পোশাক সম্পর্কে উন্নাসিকতা রাখবার প্রয়োজন নেই।" গান্ধীজী এবিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে তাঁর টুপি জামা ও কোট ছাড়লেন

এবং কটিবাস ও প্রয়োজন হ'লে একখানি চাদর গায়ে দেওয়ার সংকল্প করলেন। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি নাপিত ডাকিয়ে মাথা নেড়া করলেন এবং পরদিন তিনি কটিবাস মাত্র পরিধান ক'রে মাত্রা থেকে ষাট মাইল দূরে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিতে গেলেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজীকে উইনস্টন চার্চিল "অর্ধোলঙ্গ ফকির" বলে বর্ণনা করেছিলেন। ঐ দিন থেকেই গান্ধীজী প্রকৃত অর্ধোলঙ্গ ফকিরের বেশ গ্রহণ করলেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি মুসলমানদের কাছে একটি আবেদন প্রচার ক'রে বললেন, "সৈনিকদের কর্তব্য সম্পর্কে আলি-ভাইরা যে ডাক দিয়েছেন, তা অনুসরণ ক'রে প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কারাবরণ করা।" ৪ঠা অক্টোবর তিনি বোম্বাইয়ে ভারতীয় নেতাদের একটি সম্মেলনও আহ্বান করলেন। এই সম্মেলন থেকে প্রচারের জন্য তিনি একটি ইস্তাহার রচনা করলেন। বেসামরিক কর্মচারী বা সৈনিক রূপে ভারতীয়দের সরকারের অধীনে চাকরি করা উচিত নয়, সে কথা ইস্তাহারে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হ'লো। এই ইস্তাহারে গান্ধীজী, আবুল কালাম আজাদ, আজমল খাঁ, মতিলাল নেহ্রু, সরোজিনী নাইডু, আব্বাস তায়েবজী, এন. সি. কেলকার, বিঠলভাই প্যাটেল, বল্লভভাই প্যাটেল, এম. আর. জয়াকর, জওহরলাল নেহ্রু, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, হজরত মোহানি প্রভৃতি পঞ্চাশজন সর্বভারতীয় নেতা স্বাক্ষর দিলেন। ৫ই অক্টোবর বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে এই ইস্তাহারকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। এই ইস্তাহারে ঘোষিত কথাগুলি দেশের শত শত সভামঞ্চ থেকে উচ্চারিত হ'লো। কিন্তু সরকার এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করলো না। বেসামরিক কর্মচারী ও সৈনিকদের আনুগত্যের বিরুদ্ধে এইভাবে দেশব্যাপী প্রচারের জন্য সরকার প্রস্তুত ছিল না।

করাচীতে মহম্মদ আলি, সওকত আলি ও তাঁদের সহ-

অভিযুক্তদের বিচার হ'লো। বিচারে ১লা নভেম্বর তারিখে তাঁদের প্রত্যেকের দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। এই কঠোর দণ্ডাদেশ সারা দেশে আন্দোলনকে তীব্রতর ক'রে তুললো। ৪ঠা নভেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বোম্বাই ইস্তাহারকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হ'লো এবং প্রদেশ-গুলিকে নিজ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ট্যাক্স বন্ধ অভিযান সহ আইন অমান্যের কর্মসূচী গ্রহণের অধিকার দেওয়া হ'লো।

গান্ধীজী অবশ্য দেশের জনসাধারণকে তিনি নিজে বারদৌলতে কিভাবে এই অভিযান শুরু করেন, তা লক্ষ্য করবার জন্যে অপেক্ষা করতে বললেন। হজরত মোহানি বললেন, আইন অমান্য আন্দোলন দেশের সর্বত্র একই সঙ্গে আরম্ভ হওয়া উচিত, নইলে সরকারের পক্ষে তা দমন করা সহজ হবে। গান্ধীজী কিন্তু তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। তিনি অন্যান্য সমস্ত প্রদেশকে শান্ত ও সংযত থাকতে উপদেশ দিলেন। গান্ধীজী বোঝালেন, "ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন ভূমিকম্পের মতোই, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সর্বব্যাপী অভ্যুত্থান। যেখানে আইন অমান্যের রাজত্ব শুরু হবে, সেখানে সরকার ব'লে কিছু থাকবে না। সেখানে প্রত্যেকটি পুলিসকে, প্রত্যেকটি সৈনিককে, প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারীকে হয় স্থানত্যাগ করতে হবে, নয় তাকে স্বরাজের সেবায় নিযুক্ত হ'তে হবে। থানা, আদালত, অফিস প্রভৃতি সব কিছুই আর সরকারী সম্পত্তি থাকবে না, জনসাধারণ সেগুলির দায়িত্ব নেবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণ কর্তৃক কণামাত্র বলপ্রয়োগ চলবে না। অনানুগত্য এমন পরিপূর্ণ হবে যে, সরকার যদি 'ডাইনে চলো' ব'লে আদেশ জারী করে, তবে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না ক'রে বাঁ দিকে চলতে হবে। সরকারের প্রতি বিরুদ্ধতা এইরকম সুদৃঢ় হ'লেও আইন অমান্যের মূলকথা হবে এই যে, সবকিছুই পরিপূর্ণ শান্ত সংযমের মনোভাব নিয়ে করতে হবে। কিন্তু এই 'অমান্যের'

মধ্যে যদি শান্তিপূর্ণ মনোভাবের অভাব থাকে, যদি তা আস্ফালন বা ঔদ্ধত্যের মনোভাব নিয়ে করা হয়, যদি তাতে ক্রুদ্ধ উত্তেজনার ও প্রতিহিংসার মনোভাব থাকে, তবে সেই civil disobedience আর civil থাকবে না, criminal হয়ে উঠবে। সুতরাং আইন অমান্য আন্দোলনের সংগ্রামে সকলের অংশগ্রহণের অধিকার নেই।" গান্ধীজী বললেন, "বারদৌলিতে স্বরাজের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হ'লে বারদৌলির পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বারদৌলির পার্শ্ববর্তী তালুকের লোকে স্বরাজের পতাকা উড্ডীন করবে। এইভাবে জেলার পর জেলায় আইন অমান্য সম্প্রসারিত হবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে স্বরাজের পতাকা উড্ডীন হবে। তবে এই আন্দোলন চলাকালে দেশের কোথাও যদি হিংসা সামান্যতম পরিমাণেও আত্মপ্রকাশ করে, তবে এই আইন অমান্য আন্দোলন চালানো যুক্তিযুক্ত হবে না।"

১৭ই নভেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব্‌ ওএল্‌স্‌ ভারতসফর উপলক্ষে বোম্বাইয়ে এসে নামলেন। সমগ্র দেশ হরতাল ক'রে যুবরাজকে স্বাগত জানালো। বোম্বাইয়ে উৎসব-অনুষ্ঠান বর্জন সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হ'লো। ইউরোপীয়রা, কিছুসংখ্যক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও পার্শী, শহরের সামান্য কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ী হিন্দু ও মুসলমান ছাড়া এইসব অনুষ্ঠানে কেউ যোগ দিল না। বোম্বাইয়ের নাগরিকরা বিপুল সংখ্যায় পারেলে এসে সমবেত হ'লো এবং বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করলো। গান্ধীজী এই জনসমাবেশে জানালেন যে, তিনি কয়েকদিন বাদেই বারদৌলিতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। সরকার সেখানে গুলী চালাতে পারে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, জনসাধারণ যেন শান্ত, সংযত ও সম্পূর্ণ অহিংস থাকেন।

গান্ধীজী যখন পারেলে জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন শহরের অন্যত্র কিছুসংখ্যক লোক শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের লাঞ্ছিত করছিল এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। বেলা বাড়বার

সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়তে লাগলো এবং শহরে হাঙ্গামা দেখা দিলো। গান্ধীজী এই সংবাদ শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন। পার্শীরা যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগ দেওয়ায় পার্শী সম্প্রদায়ই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। তারা উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে বিদেশী পোশাকে যখন ফিরছিল, তখন জনতা তাদের পথে লাঞ্ছিত করে এবং তাদের পোশাক কেড়ে নিয়ে পোড়ায়। জনতা বহু মদের দোকান তছনছ করে এবং অনেকগুলি ট্রামগাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। একটি থানায় আগুন দেওয়া হয়। চারজন পুলিসকে প্রহার করতে করতে মেরে ফেলা হয় এবং অনেকে আহত হয়।

গান্ধীজী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জনতা তাঁকে ঘিরে ধরলো এবং "মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!" ধ্বনি দিতে লাগলো। গান্ধীজী তাদের তিরস্কার ক'রে স্থানত্যাগ করতে বললেন। তিনি আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন এবং তাদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এলেন। রাত্রি দশটা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ও খুন-জখমের খবর আসতে লাগলো। গান্ধীজী স্বচক্ষে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে এসেছিলেন। সারারাত্রি তাঁর চোখে ঘুম এলো না। তিনি হতাশায় ভেঙে পড়লেন। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যে আশার আলো তিনি দেখেছিলেন, তা মুহূর্তে নিভে গেল। তিনি নিজে যথাসময়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন নি, একথাই তাঁর বারবার মনে হ'লো। এই ঘটনার পশ্চাতে কিছু বুদ্ধিমান লোকের নিপুণ হাত আছে, তা তিনি স্পষ্টই বুঝলেন। তাই যদি হয়, তবে বারদৌলিতে আইন অমান্য আন্দোলন তো মরীচিকা মাত্র। তিনি সেই রাত্রিতেই সুরাট ও বারদৌলিতে যাওয়ার কর্মসূচী বাতিল ক'রে দিলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাসকে সুরাটে পাঠিয়ে বারদৌলির আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি স্থগিত রাখবার ব্যবস্থা করলেন।

পরদিন বোম্বাইয়ের পার্শী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। কংগ্রেসের নেতারা শহর সফর ক'রে শান্তি-স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু প্রতিহিংসা-স্পৃহাই সকল সম্প্রদায়ের লোককে যেন পেয়ে বসলো। গান্ধীজী ১৯শে নভেম্বর অনশন শুরু করলেন। ঐদিন দেবদাসকে সুরাট থেকে বোম্বাইয়ে ডেকে আনলেন এবং জানালেন যে, যদি শহরের কোন অংশে দাঙ্গা বাধে, তবে তিনি সেই দাঙ্গার বলি হওয়ার জন্যে তাঁর পুত্র দেবদাসকে সেখানে পাঠাবেন। ধীরে ধীরে জনতার উত্তেজনা কমে এলো এবং ২২শে নভেম্বর শহরে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'লে গান্ধীজী তাঁর অনশন ভঙ্গ করলেন। তবে এই সময় তিনি সংকল্প করলেন যে, স্বরাজ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সোমবার তিনি অনশন করবেন।

২৩শে নভেম্বর তারিখে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বারদৌলি অভিযান স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হ'লো এবং কংগ্রেস কমিটিগুলিকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গ'ড়ে তুলতে নির্দেশ দেওয়া হ'লো। স্বেচ্ছাসেবকদের কথায় ও কার্যে কঠোর-ভাবে অহিংস হ'তে হবে এবং তারা অন্যের মধ্যে অহিংস নীতির প্রচার করবে।

ইউরোপীয় অধিবাসীরা বড়লাটকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে চাপ দেওয়ায় সরকার সমগ্র ভারতে দমননীতি তীব্রতর ক'রে তুললো। বাংলা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসাম সরকার কংগ্রেস ও খিলাফতের সকল স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করলো। কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি এই আদেশকে অমান্য ক'রেই স্বাগত জানালো। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হ'লো, কিন্তু হাজার হাজার নূতন স্বেচ্ছাসেবক ক্রমে তাদের স্থান পূরণ করলো। যুক্তপ্রদেশ সরকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির

৫৫ জন সদস্যকেই একটি আলোচনাসভায় গ্রেপ্তার করলো। লালা লজপত রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহ্রু, আবুল কালাম আজাদ ও জওহরলাল নেহ্রুর মতো দেশবরেণ্য নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু আন্দোলন ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠলো। প্রিন্স অব্ ওএল্স্ যেখানেই গেলেন, সেখানেই হরতাল দিয়ে দেশের মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। সরকার দমননীতি তীব্র থেকে তীব্রতর ক'রে তুললো। গান্ধীটুপি ও খদ্দর সরকারী কর্মচারীদের চক্ষুশূল হয়ে উঠলো। স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের লাঞ্ছনা ও গ্রেপ্তার সর্বব্যাপী হয়ে উঠলো। কংগ্রেস ও খিলাফতের কার্যালয়গুলি ভেঙে দেওয়া হ'লো, জাতীয় শিক্ষালয়গুলির আসবাব ও কাগজপত্র নষ্ট ক'রে ফেলা হ'লো, বহু স্থানে গৃহ ও শস্যক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগ করা হ'লো, পুলিস ও সরকারী কর্মচারীরা বহু স্থানে লুটপাট করলো, মেয়েদের গা থেকে অলংকার ছিনিয়ে নিলো, তাদের সম্ভ্রম ও সতীত্ব নষ্ট করলো।

সরকারের হৃদয়হীন দমননীতি মদনমোহন মালব্যকে বিচলিত করলো এবং তিনি বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। বড়লাট লর্ড রেডিং প্রিন্স অব্ ওএল্সের আসন্ন কলকাতা-সফরকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলবার অভিপ্রায়ে মালব্যজীকে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করতে উৎসাহ দিলেন। কিন্তু গান্ধীজী মালব্যকে তারযোগে জানালেন, "দমননীতির জন্য চিন্তা করবেন না। সরকার পাঞ্জাব, খিলাফত ও স্বরাজ এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে প্রস্তুত না থাকলে আলোচনায় কোনও ফল হবে না।"

মালব্যজী কলকাতার জেলে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করলেন। আজাদ ও চিত্তরঞ্জন কতিপয় শর্তে হরতাল বন্ধ রাখতে সম্মত হলেন। গান্ধীজী জানালেন, "সম্মেলনের তারিখ, সম্মেলনের সদস্যদের নাম ঘোষণা, করাচী ফতোয়া সংক্রান্ত বন্দীরা সহ সকল বন্দীর মুক্তি এবং চিত্তরঞ্জন ও আজাদ প্রদত্ত শর্তাবলীর স্বীকৃতি

পেলে হরতাল প্রত্যাহার করা যেতে পারে।" গান্ধীজীর এই তারবার্তাসহ মালব্যজী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে বড়লাট বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং আলাপ-আলোচনার চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। নির্বাচিত সভাপতি চিত্তরঞ্জন জেলে থাকায় আজমল খাঁ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। প্রায় অর্ধমাইল দীর্ঘ কংগ্রেস শিবির খাদি দিয়ে রচিত হ'লো এবং শিবিরের নাম দেওয়া হ'লো খাদিনগর। সম্মেলনে চেয়ার-বেঞ্চি বাদ দিয়ে মেঝেতে একলাখ লোকের আসন করা হয়েছিল; কিন্তু সম্মেলনে প্রায় দু লক্ষ লোক যোগ দিলেন। খদ্দর-পরিহিত প্রায় দু-হাজার সুশিক্ষিত স্বেচ্ছা-সেবক সম্মেলনের ব্যবস্থায় নিযুক্ত রইলেন। খাদিনগরের পাশেই স্থাপিত হ'লো মুসলিমনগর। তার পাশেই খিলাফত সম্মেলনের সভামণ্ডপ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সাক্ষী হয়ে রইলো।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে দুটি চিন্তাধারা দেখা দিলো। মালব্যজী একটি গোল টেবিল বৈঠকের সমর্থনে কংগ্রেসকে দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করাতে চাইলেন। গান্ধীজী বললেন, "আমি শান্তি চাই; কিন্তু সে শান্তি কবরের শান্তি নয়।" মালব্যজীর প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হ'লো। গান্ধীজী সরকারের সমস্ত আইন ও গঠনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন চালাতে, সম্পূর্ণরূপে অহিংস থাকতে, সরকারের নিষেধাজ্ঞা ও প্রবল বাধা উপেক্ষা ক'রে দেশের সর্বত্র সভাসমিতি করতে, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে দলে দলে যোগ দিয়ে শান্তভাবে কারাবরণ করতে ভারতবাসীদের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব আনলেন। সম্মেলনে ছ হাজার প্রতিনিধির সমর্থনে এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। নেতাদের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা বিবেচনা ক'রে গান্ধীজীর উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বভার দেওয়া হ'লো। তবে এই শর্ত দেওয়া হ'লো যে, কংগ্রেসের সম্মতি ছাড়া তিনি জাতীয়

কংগ্রেসের আদর্শের পরিবর্তনসাধন ক'রে সরকারের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবেন না।

এইভাবে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ অতিক্রান্ত হ'লো। একবছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে ব'লে গান্ধীজী যে ঘোষণা করেছিলেন, তা নিয়ে অনেকে পরিহাস করতে লাগলেন। অ্যানী বেসান্ট বললেন, "স্বরাজ আসবার কথা ৩০শে সেপ্টেম্বর কি ১লা অক্টোবর তারিখে।...৩১শে ডিসেম্বর তারিখেও স্বরাজ যেমন দূরে ছিল তেমনিই আছে।" স্বরাজ না এলেও ভারতবাসীর পা থেকে শৃঙ্খল যে খসে পড়ছিল, তা নিঃসন্দেহ ছিল।

এখন গান্ধীজীই ছিলেন কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক। অন্যান্য নেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন কারান্তরালে। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের নির্যাতন ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। বিনা প্ররোচনায় তাঁদের বেত্রাঘাত পর্যন্ত করা হ'তো। তাঁদের কঠোরতম শ্রম করতে বাধ্য করা হ'তো। খাদ্য দেওয়া হ'তো আহারের অযোগ্য। সমগ্র দেশে বিক্ষোভের সীমা ছিল না। সমগ্র দেশ বিপ্লবের প্রান্ত-সীমায় এসে পড়েছিল এবং যে কোনও মুহূর্তে তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়তো। কংগ্রেসের নেতারা ও দায়িত্বশীল কর্মীরা প্রায় সকলেই জেলে থাকায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ রোধ করা কঠিন হয়ে উঠতো এবং সরকারও এই আন্দোলনকে নির্মমহস্তে দমন করবার সহজ অজুহাত পেতো।

কিছুসংখ্যক উদারপন্থী নেতা কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে একটা আপোস-মীমাংসা ঘটাবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৪ই জানুয়ারি মালব্যজী ও মিঃ জিন্না বোম্বাইয়ে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করলেন। স্যার শঙ্কর নায়ার এই সম্মেলনের সভাপতি হলেন। অসহযোগ-আন্দোলনকারীরা সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেও তাঁদের সদস্যরূপে গ্রহণ করা হ'লো না। কেবল কংগ্রেসের মুখপাত্ররূপে গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করা হ'লো। মালব্যজী ও জিন্না যে প্রস্তাবের

খসড়া রচনা করেছিলেন, তাতে মহম্মদ আলি, সওকত আলি ও করাচী ফতোয়ার অন্যান্য সমর্থকদের কারামুক্তির দাবী ছিল না। গান্ধীজী বললেন, সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্যে এঁদের কারামুক্তির শর্ত অপরিহার্য। গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে স্যার শঙ্করণ নায়ার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং উত্তেজনাবশে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। তাঁর স্থলে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সরকারের সঙ্গে বৈঠকের পূর্বশর্ত রূপে আলি ভাইদের ও অন্যান্য খিলাফত বন্দীদের মুক্তিদানের দাবীসহ সম্মেলন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলো। এই প্রস্তাবে সরকারের দমননীতির নিন্দা করা হ'লো। যথাসম্ভব সত্বর বৈঠক আহ্বানের জন্যে বলা হ'লো এবং আলোচনাকালে কংগ্রেস আইন অমান্য অভিযান বন্ধ রাখবার প্রতিশ্রুতি দিলো। কিন্তু পক্ষকালের মধ্যে সরকারপক্ষ থেকে কোন সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় ২৯শে জানুয়ারি (১৯২২) তারিখে বারদৌলি তালুকের অধিবাসীরা ব্যাপক আইন অমান্যের সংকল্প গ্রহণ করলো। আপোস-মীমাংসার চেষ্টায় মধ্যস্থরা ব্যর্থ হ'লেন। তাই ৩১শে জানুয়ারি সুরাটে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি একটি অধিবেশনে বারদৌলির জনগণকে ব্যাপক আইন অমান্য শুরু করতে নির্দেশ দিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের শান্ত ও সংযত থাকতে অনুরোধ জানালেন।

আপোস-আলোচনার জন্য ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত আইন অমান্য অভিযান বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গান্ধীজী। সেই সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ১লা ফেব্রুয়ারি বড়লাটকে একটি পত্রে তিনি বারদৌলিতে সমাসন্ন আইন অমান্য অভিযানের কথা জানালেন এবং পুনরায় তিনি সরকারকে পাঞ্জাব, খিলাফত ও স্বরাজ সংক্রান্ত দাবীগুলির সন্তোষজনক মীমাংসার জন্যে অনুরোধ করলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সরকার গান্ধীজীর সমস্ত দাবী অগ্রাহ্য ক'রে

একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলো। এই বিজ্ঞপ্তিতে সরকার দমননীতির সমর্থন করলো। গান্ধীজী ৭ই ফেব্রুয়ারি বড়লাটকে এর প্রত্যুত্তরে আর একটি পত্র দিলেন। তাতে তিনি সরকারের দমননীতির বীভৎস চিত্র ঘটনাবলীর তালিকাসহ তুলে ধরলেন। কিন্তু এই পত্র পাঠাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ৮ই ফেব্রুয়ারি সকালে সংবাদপত্রে একটি ভয়ংকর সংবাদ পড়ে তিনি প্রস্তরবৎ হয়ে গেলেন।

৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে যুক্তপ্রদেশের গোরখপুরের কাছে চৌরিচৌরায় এই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছে। ঐদিন একটি মিছিল চৌরিচৌরার থানার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল। মিছিলটির পেছনে-পড়া কিছুসংখ্যক লোককে থানার কনেস্টবলরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ফলে গোলযোগ বাধে এবং পুলিস গুলী চালায়। গুলী ফুরিয়ে গেলে পুলিস থানার ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন উত্তেজিত জনতা থানায় অগ্নিসংযোগ করে এবং ঐ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২২ জন পুলিস থানার মধ্যে পুড়ে মারা যায়।

দেশে হিংসাত্মক কার্যের প্রবণতা যে কতো ব্যাপক, তা দেখে গান্ধীজী অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সামনে আইন অমান্য অভিযান বন্ধ রাখার প্রস্তাব করলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা তাঁর সঙ্গে একমত না হ'লেও তাঁর অনুরোধে তাঁরা আইন অমান্য অভিযানের সূচী বাতিল ক'রে দিয়ে সুতোকাটা, মাদকবর্জন, সমাজসংস্কার ও শিক্ষামূলক কার্যাদির সূচী গ্রহণ করলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে গান্ধীজী পাঁচদিনের জন্য অনশন করেন।

কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয়রা সকলেই জেলে ছিলেন। বারদৌলির এই সিদ্ধান্ত তাঁদের নির্বাক ক'রে দিলো। সকলেই গান্ধীজীর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। মতিলাল নেহ্‌রু, লালা লজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি প্রত্যেকেই গান্ধীজীর এই কাজের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা ক'রে পত্র লিখলেন এবং এই ধরনের বিক্ষিপ্ত

ঘটনার জন্যে তাঁরা গান্ধীজীকে আন্দোলন বন্ধ রাখতে নিষেধ করলেন। তরুণ নেতা জওহরলাল নেহ্‌রুও বিভ্রান্ত হয়ে একটি পত্র লিখলেন। গান্ধীজী তাঁর পত্রের উত্তরে লিখলেন :

"আমি দেখেছি, তোমরা সকলে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে মর্মাহত হয়েছ।...তোমরা কি মর্মবেদনার মধ্য দিয়ে কাটাচ্ছ, তাও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বোধ করছি যে, এই পত্রের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ জানি, প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলেই অবস্থাটা ঠিকমত বুঝতে পারবে।...তোমাকে না ব'লে পারছি না, এটা আমি শেষ অবলম্বন রূপেই করেছি। আমি বড়লাটকে যখন পত্র দিয়েছিলাম, তখন যে আমার দ্বিধা ছিল, তা পত্রের ভাষা দেখলে যে কেউই বুঝতে পারবে। বোম্বাইয়ের ঘটনাবলীতে আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করেছিলাম, যদিও আমি বিবেকের সতর্কবাণীতে তখন কর্ণপাত করিনি। গোরখপুরের ঘটনাবলীর পূর্বে আমি কলকাতা, এলাহাবাদ ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলমানদের কাছ থেকে বহু পত্র পেয়েছিলাম। তাতে তাঁরা বলেছিলেন, সব দোষ সরকারের নয়, আমাদের জনসাধারণও মারমুখী ও উদ্ধত হয়ে উঠছে, ভীতিপ্রদর্শন করছে, তারা অনেক ক্ষেত্রে আয়ত্তের বাইরে চ'লে গেছে এবং তাদের আচারব্যবহার অহিংস নয়। ফিরোজ জির্কার ঘটনার জন্যে সরকারের দোষ থাকলেও, আমরা একেবারে দোষমুক্ত ছিলাম না। বেরিলির ব্যাপারে হাকিমজী অভিযোগ করেছেন। জজুরের ব্যাপারে আমি তিক্ত অভিযোগসমূহ পেয়েছি। সাহ্‌জানপুরেও জোর ক'রে টাউনহল দখলের চেষ্টা করা হয়েছে। কনৌজ থেকেও কংগ্রেসের সেক্রেটারি নিজে তার পাঠিয়েছেন যে, সেখানে স্বেচ্ছাসেবক ছেলেরা আয়ত্তের বাইরে যাচ্ছে, তারা একটি হাই স্কুলে পিকেটিং করছে এবং ছেলেমেয়েদের তাদের স্কুলে যেতে দিচ্ছে না। গোরখপুরে ছত্রিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভুক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে একশও কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাস করে না।

যমুনাজী আমাকে লিখেছেন যে, কলকাতায় সংগঠনে চূড়ান্ত অব্যবস্থা দেখা দিয়েছে, স্বেচ্ছাসেবকরা বিলাতী কাপড় পরছে এবং অহিংসার শপথ নিচ্ছে না। এইসব খবর আমি পেয়েছি। দক্ষিণ ভারত থেকেও অনেক খবর পেয়েছি, চৌরিচৌরার সংবাদ তাতে বারুদের স্তূপে দেশলাইয়ের কাঠির স্ফুলিঙ্গের মতো এসেছে এবং অগ্নিকাণ্ড বাধিয়েছে। একথা নিঃসন্দেহ যে, অহিংসার সুগন্ধ গোলাপের আতরের গন্ধের মতো ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তার তলায় হিংসার পচা দুর্গন্ধ এখনও শক্তিশালী রয়েছে। তাকে অস্বীকার করা বা খাটো ক'রে দেখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

যাই হ'ক, বারদৌলি সিদ্ধান্ত সরকারকে দুঃসাহসী ক'রে তুললো। মিঃ মন্টেগু সুস্পষ্ট ভাষায় ভারতবাসীর এই আন্দোলন দমনের দৃঢ়সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসলো। গান্ধীজী সেখানে মতিলাল নেহ্‌রু ও লালা লজপত রায়ের পত্র পড়ে শোনালেন এবং বললেন, যাঁরা জেলে গেছেন, তাঁরা আইনত মৃত। যারা বাইরে আছে, তাদের পরামর্শ দেওয়ার অধিকার তাঁরা দাবী করতে পারেন না। প্রতিনিধিদের সমস্ত বিষয়টি নিজেদের চিন্তা ক'রে দেখতে হবে। তিনি বললেন, আইন অমান্য অভিযান করবার আগে জনসাধারণকে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে হবে এবং সেজন্যে গঠনমূলক প্রস্তাব নিতে হবে। গান্ধীজীকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হ'লো। ডাঃ মুঞ্জে ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বারদৌলি প্রস্তাব বাতিল করবার দাবী তুললেন। মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা আইন অমান্য বন্ধ রাখার, খদ্দর পরিধানের, অস্পৃশ্যতা বর্জনের ও স্বদেশীর বাধ্যবাধকতার বিরোধিতা করলেন। ডাঃ মুঞ্জে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাবও আনলেন। গান্ধীজী নিজের সমর্থনে একটি কথাও বললেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়লাভ

করলেন। তবে তিনি বুঝলেন যে, যাঁরা তাঁকে সমর্থন করছেন, তাঁরাও আন্তরিকভাবে তাঁকে সমর্থন করছেন না। অনেকে তাঁর পেছনে তাঁকে 'ডিক্টেটর' বলেন। তিনি এ-ও বুঝলেন, দেশের বর্তমান মানসিকতার তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন না।

বারদৌলি প্রস্তাবেই যে আইন অমান্য অভিযানের শেষ, তা সরকার বুঝেছিল। তবে এই অভিযান বন্ধ করায় সরকার এখন কি করবে, তা আবার ভেবে দেখবার প্রয়োজন বোধ করলো। যেদিন বারদৌলি প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেদিনই, ১২ই ফেব্রুয়ারি, গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বড়লাট বোম্বাই সরকারকে গান্ধীজীর গ্রেপ্তার আপতত: স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিলেন এবং উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। গান্ধীজীর মতোই সরকারও মনে করছিল গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশে হিংসাত্মক কার্যের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। গান্ধীজী তাঁর গ্রেপ্তারে দেশবাসীকে শান্ত ও সংযত থাকতে, এবং তাঁর গ্রেপ্তারের দিনকে আনন্দের দিনরূপে গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন। তিনি তাদের সম্পূর্ণ অহিংস থেকে গঠনমূলক কর্মসূচীতে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানালেন।

মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই গান্ধীজীর আসন্ন গ্রেপ্তার সম্পর্কে জনরব ছড়িয়ে পড়লো। ১০ই মার্চ গান্ধীজী সান্ধ্য উপাসনার পর সকলকে তাঁর গ্রেপ্তার সম্পর্কে জনরবের কথা বললেন এবং ঐদিন রাত্রিতে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার কথা জানালেন। তিনি ঐদিন রাত্রিতে তাঁর গ্রেপ্তারের পর ইয়াং ইণ্ডিয়া কাগজের পরিচালনার বন্দোবস্ত করলেন। রাত্রি দশটার পরে শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার আশ্রম ত্যাগ ক'রে গেলেন। পথে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। তারপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিস সহ আশ্রমে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলেন। গান্ধীজী আশ্রমের সকলের সঙ্গে দু-একটি কথা ব'লে সকলকে তাঁর প্রিয় বৈষ্ণব কবি নরসিং মেটার একটি

ভক্তিমূলক গান গাইতে বললেন। গান শেষ হ'লে তিনি পুলিসের গাড়িতে উঠে বসলেন। পুলিস তাঁকে নিকটবর্তী জেলে নিয়ে গেল। গান্ধীজী তাঁর কারাবাসের জন্যে স্বতন্ত্র একটি খাটো কাপড়, দুটি কম্বল এবং গীতা, রামায়ণ, কোরানের ইংরেজী অনুবাদ, আশ্রমের উপাসনা গ্রন্থ এবং বাইবেলের সারমন অন দি মাউণ্ট এক কপি সঙ্গে নিলেন।

পরদিন ১২ই মার্চ গান্ধীজীকে ও শংকরলাল ব্যাঙ্কারকে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্রাউনের কাছে হাজির করা হ'লো। গান্ধীজীর ও শংকরলালের বিরুদ্ধে ইয়াং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় তিনটি প্রবন্ধ লেখার ও প্রকাশের অভিযোগ ছিল। প্রবন্ধগুলির লেখক ছিলেন গান্ধীজী ও প্রকাশক ছিলেন শংকরলাল। আদালতে গান্ধীজী নিজের পরিচয়ে বললেন, তাঁর বয়স ৫২ বৎসর, পেশায় তিনি কৃষক ও তন্তুবায়, তাঁর বাসস্থান সবরমতী আশ্রম। গান্ধীজীকে দায়রায় সোপর্দ করা হ'লো। দায়রার বিচারের দিন ১৮ই মার্চ নির্দিষ্ট হওয়ায় গান্ধীজী সবরমতী জেলেই রইলেন।

১৮ই মার্চ তারিখে আমেদাবাদের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ ব্রুমফীল্ডের আদালতে গান্ধীজীর ও শংকরলালের বিচার হ'লো। গান্ধীজী আদালতে একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করলেন। তাতে তিনি সাম্রাজ্যের একনিষ্ঠ অনুগত সহযোগী থেকে কি কারণে সাম্রাজ্যের আপোসহীন অসহযোগীতে পরিণত হলেন, তা অনবদ্য ভঙ্গিতে বর্ণনা করলেন। তিনি অহিংসা ও অসহযোগের মহান্ আদর্শও ব্যাখ্যা করলেন।

বিচারপতি ব্রুমফীল্ড তাঁর রায় দিয়ে বললেন, "মিঃ গান্ধী, আপনি অপরাধ স্বীকার ক'রে আমার কাজ সহজ ক'রে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এই দেশে বিচার-কালে বিচারককে একটি দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেটি হ'লো ন্যায় দণ্ড নির্ধারণ করা। আইন কোনও ব্যক্তিকে সম্মান করে না। তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার

করা অসম্ভব যে আমি এ পর্যন্ত যাদের বিচার করেছি বা ভবিষ্যতে যাদের বিচার করবো, তাদের থেকে আপনি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষ। এই বিষয়টি অস্বীকার করা অসম্ভব যে, আপনি আপনার কোটি কোটি স্বদেশবাসীর চক্ষে একজন মহান্ দেশপ্রেমিক, একজন মহান্ নেতা। এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে যাঁদের মতৈক্য নেই, তাঁরাও আপনাকে উচ্চাদর্শের এবং সৎ, এমনকি সন্তুতুল্য জীবনের অধিকারী একজন মানুষ ব'লে মনে করেন। কিন্তু আমাকে আপনার একটি দিক মাত্র বিচার করতে হবে। অন্য কোনও দিক বিচার করা বা সমালোচনা করা আমার কর্তব্যের বাইরে। আপনাকে আমার বিচার করতে হবে আইনানুগ প্রজা রূপে, যে আইন ভঙ্গ করেছেন ব'লে আপনি নিজে স্বীকার করেছেন এবং যা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অপরাধ ব'লে প্রতীয়মান হবে সে সম্পর্কে। আপনি হিংসার বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে, আমার বিশ্বাস, হিংসা নিরোধ করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, একথা আমি বিস্মৃত হই নি। কিন্তু আপনি যে ধরনের রাজনৈতিক শিক্ষা দেন, যে ধরনের বহু লোকের কাছে আপনি ঐ শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাতে আপনি কিভাবে বিশ্বাস করলেন যে, তাতে হিংসা ও অরাজকতা অপরিহার্যরূপে দেখা দেবে না, তা আমার বোধশক্তির অগম্য।

"আপনি যে কোনও সরকারের পক্ষে আপনাকে মুক্ত রাখা অসম্ভব ক'রে তুলেছেন। এই ব্যাপারটির জন্য দুঃখিত নন, এমন মানুষ ভারতে সম্ভবত খুব অল্পই আছেন। কিন্তু তাই ঘটেছে। জনসাধারণের স্বার্থে যা করা আমার প্রয়োজন মনে হয়, তার বিরুদ্ধে আপনার যা প্রাপ্য, তার একটা ভারসাম্য করতে আমি চেষ্টা করছি। তাই রায় দেওয়ার জন্য আমি বারো বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত এই মামলার অনুরূপ একটি মামলার নজির অনুসরণ করতে চাই। আমি ঐ একই ধারায় মিঃ বালগঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে মামলাটির

কথা বলছি। তাঁকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল ছয় বছরের জন্যে বিনাশ্রম কারাদণ্ড। আমার মনে হয়, আপনাকে তিলকের শ্রেণীভুক্ত করলে এবং আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ পিছু দু বছর ক'রে বিনাশ্রম কারাদণ্ড অর্থাৎ সবশুদ্ধ ছ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিলে, তা আপনি অযৌক্তিক মনে করবেন না। এই দণ্ডই আমি উপযুক্ত মনে করি। আর এই সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে, ভারতবর্ষের ঘটনাবলী যদি আপনার দণ্ডকাল হ্রাস করতে বা আপনাকে মুক্তি দিতে সরকারকে সমর্থ করে, তাহ'লে আমি যতোটা খুশী হব, তেমনটি আর কেউ হবে না।"

শংকরলালকে বিচাপতি ব্রুমফীল্ড এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও তিন হাজার টাকার অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ছ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

২০শে মার্চ তারিখে গান্ধীজীকে ও শংকরলালকে সবরমতী জেল থেকে যারবেদা জেলে স্থানান্তরিত করা হ'লো। বিচারপতি ব্রুমফীল্ড সৌজন্য ও শ্রদ্ধা দেখালেও জেল কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীর প্রতি সাধারণ বন্দীর মতোই ব্যবহার করতে লাগলো। তাঁর শরীরের মাপজোখ নেওয়া হ'লো, তাঁর শরীরের বিশেষ চিহ্নাদি টুকে নিলো, তাঁকে লক-আপে ঢুকবার আগে জেলর তাঁর শরীর তল্লাস করলো। কটিবাস মাত্র তাঁর পরিধানে থাকলেও অনেক সময় জেলর তাঁর কোমরে হাত দিয়ে তল্লাস চালাতো, তাঁর কম্বল ঝেড়ে দেখতো, তাঁর পানাহারের পাত্র জুতো দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেখতো। গান্ধীজী জেলরের এইসব ব্যবহারের কঠোর প্রতিবাদ করলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হ'লো। জেল থেকে তাঁকে বছরে মাত্র চারখানি চিঠি লেখার অনুমতি দেওয়া হয়। গান্ধীজী এপ্রিল মাসে দুখানি চিঠি লেখেন—একখানি কস্তুরবাঈকে এবং একখানি হাকিম আজমল খাঁকে। কিন্তু চিঠি দু-খানি সেন্সর করায় গান্ধীজী পত্র লেখা বন্ধ করেন।

গান্ধীজী কারাগারে প্রায় দেড়শখানি বই পড়েন। তিনি আগাগোড়া মহাভারত পড়ে শেষ করেন। ষড়্দর্শন পড়েন। তিনি ইংরেজীতে মনুস্মৃতি ও উপনিষদ্গুলি পড়েন। তিনি শঙ্করাচার্য, জ্ঞানেশ্বর, তিলক ও শ্রীঅরবিন্দের গীতার ভাষ্য পাঠ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম, শিখধর্ম, ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম ও জরথুস্ত্রের ধর্ম সংক্রান্ত বহু বই পড়েন। কেবল ধর্মসংক্রান্ত বই নয়, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত বইও তিনি পড়েন। সেগুলির মধ্যে গিবনের Decline and Fall of Roman Empire, বেকনের Wisdom of the Ancients, বাকলের History of Civilisation, হেকেলের Evolution of Man, গুইজোর European Civilisation, জেম্‌সের Our Hellenese Heritage, কিডের Social Evolution, মোটলের Rise of the Dutch Republic, এচ. জি. ওএল্‌সের Outline of History, গেডেসের Evolution of Cities., লেকির European Morals ও রোজবেরির Life of Pitt বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজী বহু সাহিত্যও পড়েন। সেগুলির মধ্যে গ্যেটের 'ফাউস্ট', রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা', বার্নার্ড শর Man and Superman ও রাডিয়ার্ড কিপ্লিংয়ের Barrack-room Ballads প্রধান।

আঠারো

মাঝের পাঁচ বৎসর

৭ই জুন (১৯২২) তারিখে লখ্‌নৌয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো। এতে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার ও গান্ধীজীর কারাবাসের ফলে উদ্ভূত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হ'লো। সম্প্রতি মতিলাল নেহ্‌রু মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনিও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। হাকিম আজমল খাঁ, মতিলাল নেহ্‌রু, রাজাগোপালাচারী, ডাঃ আনসারী, বিঠলভাই প্যাটেল ও কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারকে নিয়ে আইন অমান্য তদন্ত কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হ'লো। অক্টোবর মাসের শেষাশেষি এই কমিটির রিপোর্ট তৈরি হ'য়ে গেল। ঐ সময় চিত্তরঞ্জন দাশ মুক্তি পেয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর কাছে ঐ রিপোর্ট পেশ করা হ'লো। ঐ রিপোর্টে আইন অমান্য আন্দোলনকে বর্তমান পরিস্থিতিতে বন্ধ রাখার যুক্তিযুক্ততা স্বীকৃত হ'লো এবং মতিলাল নেহ্‌রু, হাকিম আজমল খাঁ ও বিঠলভাই প্যাটেল কাউন্সিলে যোগদানের প্রস্তাব করলেন। তাঁরা বললেন, কংগ্রেস যদি এই পরিস্থিতিতে কাউন্সিল প্রবেশ বয়কট করে এবং জনসাধারণ যদি তাতে সাড়া না দিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, তবে তা কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার পরিপন্থী হবে, এবং সমগ্র আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ডিসেম্বর মাসে গয়ায় চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে বার্ষিক সম্মেলন হ'লো, তাতে চিত্তরঞ্জন কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ করলেন। তিনি বললেন, কংগ্রেসের লোকেরা সংখ্যাধিক্যে আইন-সভাগুলিতে প্রবেশ ক'রে আইনসভায় সরকারী ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করুক। কংগ্রেস যদি আইনসভাগুলিতে সংখ্যাধিক্য অর্জন করতে পারে, তবে সরকারকে হয় জনমতের কাছে

মাথা নত করতে হবে, নয় তাকে বিশেষ অধিকার বলে আইনগুলি পাশ করতে হবে। বিশেষ অধিকার বলে সরকার কিছু করলে তার প্রতিবাদে কংগ্রেস সদস্যরা পদত্যাগ করবেন এবং পুনরায় নির্বাচন চাইবেন। এইভাবে সরকারের প্রতিটি ব্যবস্থার প্রতিরোধ করা যাবে। সরকার যদি তাতেও মাথা না নোয়ায়, তখন ভোটারদের খাজনা বন্ধ করতে বলা হবে এবং আইন অমান্য আন্দোলনের পথ স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হবে। চিত্তরঞ্জন অসহযোগের সমস্ত কর্মসূচীকেই সমর্থন করলেন—কেবল ঐ আইনসভায় প্রবেশের প্রশ্নটি ছাড়া। কংগ্রেসের সম্পাদক রাজাগোপালাচারী কিন্তু অসহযোগের কর্মসূচীকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন এবং আইনসভায় প্রবেশের বিরোধিতা করতে লাগলেন। রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাবই ১৭৪০—৮৯০ ভোটে গৃহীত হ'লো। খিলাফত সম্মেলনও পূর্ণ অসহযোগের কর্মসূচীকে সমর্থন জানালো।

কিন্তু কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ও খিলাফত সম্মেলনে গৃহীত পূর্ণ অসহযোগের এই কর্মসূচীকে মতিলাল নেহ্‌রু ও চিত্তরঞ্জন দাশ মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কংগ্রেসের মধ্যেই আইনসভায় প্রবেশের সমর্থনে 'স্বরাজ দল' নামে একটি দল গঠন করলেন। মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সংকটটি চূড়ান্ত আকার ধারণ করলো। চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের সভাপতি পদে ইস্তাফা দিলেন। এখন ডাঃ আনসারি কংগ্রেসের সভাপতি হলেন এবং জওহরলাল নেহ্‌রু হলেন কংগ্রেসের সম্পাদক। ডাঃ আনসারি কংগ্রেসের মধ্যপন্থীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাও দীর্ঘস্থায়ী হ'লো না। কারণ, পূর্ণ-অসহযোগপন্থীদের ঘাঁটি গুজরাট এঁদের সকল নির্দেশ মেনে চলতে রাজী হলেন না। ফলে নাগপুরে আবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন বসলো।

মধ্যপন্থী ওয়ার্কিং কমিটি পদত্যাগ করলো। স্বরাজ দলের সমর্থন পেয়ে আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেসে স্বরাজ দল Pro-changers ও পূর্ণ অসহযোগের সমর্থকরা No-changers নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এখন এঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে লাগলো। সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হ'লো। লালা লজপত রায় ও মওলানা মহম্মদ আলি জেল থেকে সম্প্রতি খালাস পেয়েছিলেন। তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। মহম্মদ আলি বললেন যে, তিনি যারবেদা জেল থেকে গান্ধীজীর তার পেয়েছেন এবং তাতে গান্ধীজী স্বরাজ দলের সমর্থনে মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য পরে জানা যায়, গান্ধীজী এই ধরনের কোন তারবার্তা পাঠাননি এবং আগাগোড়া ব্যাপারটি মহম্মদ আলির কপোলকল্পিত ছিল। যাঁরা আইনসভায় প্রবেশ করতে চান, তাঁদের সে বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, এই মর্মে মহম্মদ আলি একটি প্রস্তাব আনলেন। প্রস্তাবটি এখন সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হ'লো। বল্লভভাই প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিরপেক্ষ থাকলেন। এইভাবে স্বরাজ দল আসন্ন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি পেলো।

স্বরাজ দল দ্রুত নির্বাচনী সংগঠন গ'ড়ে তুললো এবং নির্বাচনে কয়েকটি প্রদেশে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের কিছুকম অর্ধেক আসন পেলো। দেশবন্ধুর অসামান্য বাগ্মিতা ও মতিলাল নেহ্‌রুর সংগঠনী প্রতিভা তা সম্ভব করেছিল। ডিসেম্বর মাসে কোকনাডে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হ'লো, তাতে স্বরাজ দল ও গোঁড়া অসহযোগপন্থীদের মধ্যে একটি আপোসমূলক প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। এতে আইনসভায় যোগদানের যেমন অনুমতি দেওয়া হ'লো, তেমনি সংগঠনমূলক কর্মসূচীকে রূপায়িত ক'রে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্যে জনসাধারণকে

আহ্বান জানানো হ'লো। এই অপোসমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন রাজাগোপালাচারী, সমর্থন করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

কংগ্রেসে যেমন মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল, তেমনি সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতিতে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। খিলাফতের দাবী ও আন্দোলন এখন অপনা থেকেই বন্ধ হয়েছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তুর্কীরা তাদের জাতীয় নেতা মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল এবং নূতন খলিফা ধর্মীয় ছাড়া অন্য সকল ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। সুলতান একটি বৃটিশ জাহাজে ক'রে মাল্টায় পালিয়ে গিয়েছিলেন; তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন কামাল পাশা। ফলে খিলাফতের দাবী শূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং এই অবস্থাকে ভারতীয় মুসলমানদের মেনে না নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাই ভারতীয় মুসলমানদের নৈরাশ্যবোধ ছিল স্বাভাবিক। তাদের এই মানসিক অবস্থাকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী লোকেরা কাজে লাগালো এবং নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে দিলো। ভারতের বড় বড় বহু শহরেই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধলো। এইভাবে জাতীয় ঐক্যে ভয়ংকর ফাটল দেখা দিলো।

সন্ত্রাসবাদও আবার মাথা তুলে দাঁড়লো। বাংলাদেশের তরুণদের গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও সংগ্রামী আহ্বান সন্ত্রাসবাদের পথ থেকে সরিয়ে এনেছিল। এখন সংগ্রামে ভাটা পড়ায় বাংলার তরুণদের সংগ্রামী শক্তি ও উদ্দীপনা আবার হিংসা ও সন্ত্রাসবাদের পথ নিলো।

কারাগারে গান্ধীজী কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। হঠাৎ তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলো এবং তাঁর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছে জানা গেল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তাঁকে পুনার স্যাসুন

হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হ'লো। হাসপাতালের সার্জন দেখলেন, অবিলম্বে অপারেশন দরকার। তাঁর অবস্থা বিপজ্জনক হওয়ায় গান্ধীজী বাইরের কোন ডাক্তারের সাহায্য নিতে চান কিনা জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বোম্বাইয়ের ডাঃ দালাল ও ডঃ জীবরাজ মেটার কথা বললেন। ডাঃ মেটা ছিলেন বরোদায়। এঁদের কারও সঙ্গে টেলিফোনে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করা গেল না। রোগীর গায়ের তাপ ও নাড়ীর বেগ দেখে ডাক্তাররা অপারেশনে আর দেরী করা উচিত মনে করলেন না। গান্ধীজী এখন কার কার সঙ্গে দেখা করতে চান জানতে চাইলে তিনি শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ডাঃ ফাটাক, মিঃ এন. সি. কেলকর ও ডাঃ গোখলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

কেলকর সাতারায় ছিলেন। তাই সংবাদ পেয়ে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ডাঃ গোখলে ও ডাঃ ফাটাককে নিয়ে হাসপাতালে এসে পৌছলেন। গান্ধীজী তাঁদের জানালেন, ডাক্তাররা যখন অপারেশন করা প্রয়োজন মনে করছেন, তখন তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তিনি ডাক্তারদের সদয় ও সতর্ক ব্যবস্থা সম্পর্কেও উল্লেখ করলেন। তিনি একথাও বললেন যে, তাঁর অসুস্থতার কারণে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে জনসাধারণের পক্ষ থেকে যেন কোন আন্দোলন করা না হয়; ঐ রকম কোনও আন্দোলন হ'লে যেন জানানো হয় যে, কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি সযত্ন ব্যবহারই পেয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই। ডাক্তার গান্ধীজীকে অপারেশনে তাঁর সম্মতিসূচক একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে দিলেন। গান্ধীজী বিবৃতিটির ভাষা কিছু পরিবর্তন ক'রে দিলেন এবং এতে তিনি হাসপাতালের সার্জন-জেনারেল ডাঃ ম্যাডক ও অন্যান্য ডাক্তারদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথাও যোগ ক'রে দিলেন।

১২ই জানুয়ারি রাত্রিতে সার্জন-জেনারেল ডাঃ ম্যাডক গান্ধীজীর অপারেশন করলেন। অপারেশনের সময় বৈদ্যুতিক গোলযোগ ঘটায় অপারেশন-থিয়েটারের আলোগুলি নিবে গিয়েছিল। তা

সত্ত্বেও ডাঃ ম্যাডক হ্যারিকেনের আলোয় অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে অপারেশন শেষ করলেন। ১৩ই তারিখে সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হ'লো—"গত রাত্রিতে মিঃ গান্ধীকে বিপজ্জনক অ্যাপিণ্ডিসাইটিসের জন্যে অপারেশন করা হয়েছে।" সংবাদ প'ড়ে সারা ভারত উদ্বেগে মুহ্যমান হয়ে পড়লো।

গান্ধীজী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। ডাক্তার ও নার্সদের সতর্ক চিকিৎসা ও সেবাযত্নে তিনি অভিভূত হলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ও সি. এফ. এণ্ড্রুজ বসে গল্প করছিলেন, এমন সময় সার্জন-জেনারেল ডাঃ ম্যাডক এসে জানালেন যে, সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দিয়েছেন। গান্ধীজী সংবাদ শুনে কয়েক মিনিট চুপ ক'রে বসে রইলেন, তারপর মৃদু হেসে ডাঃ ম্যাডককে বললেন, "আমি আশা করি, আপনি আপনার রোগীকে আপনার অতিথিরূপে আরও কিছুদিন থাকতে দেবেন।" মুক্তিলাভের পরও কিছুদিন গান্ধীজী হাসপাতালে রইলেন এবং সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। ১০ই মার্চ তারিখে তিনি বোম্বাইয়ের কাছে সমুদ্রতীরে জুহুতে স্বাস্থ্য-পরিবর্তনের জন্যে গেলেন।

গান্ধীজীর কারাবাসের সময় থেকে 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবন' পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল। গান্ধীজী যখন জেলে গিয়েছিলেন, তখন ইয়াং ইণ্ডিয়ার প্রচার-সংখ্যা ছিল ২১৫০০। তখন তা কমে ৩০০০ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধু-বান্ধবের নিষেধ সত্ত্বেও গান্ধীজী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আবার পত্রিকা দুটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ইয়াং ইণ্ডিয়ায় গান্ধীজীর প্রবন্ধগুলি বেরুতে লাগলো। তিনি সকল বিষয়েই লিখলেন, কেবল কাউন্সিল-প্রবেশের বিতর্কমূলক বিষয় ছাড়া। স্বরাজ দল মতিলাল ও দেশবন্ধুর নেতৃত্বে আইনসভাগুলিতে চাঞ্চল্যকর সাফল্য লাভ করলেও গান্ধীজীর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই এপ্রিল

থেকে মতিলাল ও দেশবন্ধু জুহুতে গিয়ে গান্ধীজীকে রাজনৈতিক অবস্থা বোঝাতে চাইলেন। তাঁরা স্বরাজ দলের বক্তব্য বুঝিয়ে গান্ধীজীর কাছে সক্রিয় সাহায্য না হ'লেও অন্ততঃ সহানুভূতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু গান্ধীজীকে তাঁরা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারলেন না। অসহযোগ ও কাউন্সিল প্রবেশ যে একসঙ্গে চলতে পারে না, তাঁর এই পূর্বমতেই গান্ধীজী অবিচল রইলেন। তিনি এই মর্মে সংবাদপত্রসমূহে বিবৃতিও দিলেন। তাতে বললেন, স্বরাজ দলে যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকেরই দেশপ্রেম তাঁর চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। এবং তাঁরা অনেকে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি; তাঁরা দীর্ঘ ও গভীর চিন্তার পরই কাউন্সিলে প্রবেশের পথ গ্রহণ করেছেন। তাই এ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এঁরা যখন এঁদের ব্যবস্থার ব্যর্থতা বুঝতে পারবেন, তখন এঁরা তা নিজেরাই ত্যাগ করবেন। সুতরাং অসহযোগপন্থী বা No-Changer-দের স্বরাজ দলের বিরোধিতা করবার প্রয়োজন নেই। নো-চেঞ্জাররা তাঁদের কার্যসূচীতেই অটল থাকুন। কাউন্সিলের বাইরে গঠনমূলক কার্যগুলিতে নো-চেঞ্জার, প্রো-চেঞ্জার ও অন্যান্য সকলে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়োজন হ'লে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারেন।

২৯শে মে তারিখে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করলেন। অনেক প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানের তিক্ত সম্পর্কের পেছনে অর্থনৈতিক কারণ নিহিত ছিল। অনেক প্রদেশে হিন্দুরা ছিল জমিদার, মালিক ও মহাজন এবং মুসলমানরা প্রজা, কর্মচারী ও খাতক। স্বার্থ-প্রণোদিত কিছুসংখ্যক লোক এই সম্পর্ককে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালাতে ব্যবহার করলো। সংকীর্ণ ধর্মোন্মত্ততা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই ধর্মান্তরিত-করণে উৎসাহিত করেছিল। মুসলমানরা তাদের 'তাবলিক' বা ধর্মান্তকরণের অধিকারের দাবী করছিল। সেই সঙ্গে ছিল গোবধ ও

গোরক্ষার দ্বন্দ্ব। তেমনি হিন্দুরা ভারতের কোন কোন অংশে 'শুদ্ধির' অধিকার দাবী করছিল। এইসব অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণকে অনেক রাজনৈতিক দল তাদের জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধির উৎসাহে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিণত করছিল। সমগ্র বিষয়টি গান্ধীজী তাঁর প্রবন্ধে নিপুণ হস্তে বিশ্লেষণ করলেন এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবার জন্যে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন।

দেশবন্ধু ও মতিলালের নেতৃত্বে স্বরাজ দল উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু কাজ করেছিল। কংগ্রেসের বহু নেতা দেশের পৌরসভাগুলিতে সভাপতি হয়েছিলেন এবং তাঁদের নেতৃত্বে পৌরসভাগুলি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পথে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল। দেশবন্ধু কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। বিঠলভাই প্যাটেল বোম্বাই কর্পোরেশনের এবং বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদ পৌরসভার সভাপতি হয়েছিলেন। পুনা পৌরসভা সরকারের নির্দেশ অমান্য ক'রে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে লোকমান্য তিলকের মর্মরমূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বোম্বাই কর্পোরেশন ও আমেদাবাদ পৌরসভা মহাত্মা গান্ধীর সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিল। করাচী, বোম্বাই, কলকাতা ও পাটনার পৌরসভাগুলির সভাপতিরা বড়লাটের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। ভারতের সর্বত্রই পৌরসভাগুলি জাতীয়তাবাদীদের কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করছিল। কিন্তু কি আইনসভাগুলি, কি পৌরসভাগুলি স্থায়ী কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। ফলে দেশের জনসাধারণ প্রাথমিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখাবার পর ক্রমেই নৈরাশ্যবোধ করছিল এবং তারা আবার গান্ধীজীর নেতৃত্বের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। দেশের নাড়ীর বেগ গান্ধীজীর মতো কেউ বুঝতো না। তাই তিনি দেশকে পুনরায় পূর্ণ অসহযোগের পথে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন

২৭শে জুন আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো। গান্ধীজী এই অধিবেশনে চারটি প্রস্তাব আনলেন। এই প্রস্তাবগুলির কথা তিনি ১৯শে জুন তারিখে তাঁর 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখেছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে গান্ধীজী বললেন, সারা দেশে কংগ্রেস সদস্যরা সুতোকাটা ও খদ্দর বোনাকে অবহেলার চোখে দেখছেন ; অথচ কংগ্রেস এই কাজকে স্বরাজলাভের জন্যে অসহযোগের অপরিহার্য কার্যক্রমরূপে ঘোষণা করেছিল। তাই এখন থেকে প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যকে অসুস্থতা বা সফরকালে ছাড়া প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে আধঘণ্টা ক'রে সুতো কাটতে হবে এবং প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ১০ তোলা সুতো নিখিল ভারত খাদী বোর্ডের কাছে জমা দিতে হবে। কোন সদস্য নির্দিষ্ট দিনে বা তার আগে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতো জমা দিতে না পারলে তিনি কংগ্রেসের কোনও পদে নিযুক্ত থাকতে পারবেন না এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত কোনও পদে তাঁকে নির্বাচিত হ'তে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হ'লো, এই ধরনের অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে, কংগ্রেস সংগঠনের প্রাদেশিক সম্পাদকরা ও অন্যান্য কর্মীরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ ঠিকমত কার্যকর করছেন না। যাঁরা এই ধরনের নির্দেশ পালনে অসমর্থ হবেন, তাঁদের পদচ্যুত ব'লে গণ্য করা হবে, এবং তাঁরা পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত কোনও পদে নির্বাচনপ্রার্থী হ'তে পারবেন না। তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হ'লো—প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যকে কংগ্রেসের আদর্শ (creed) এবং কলে বোনা কাপড়, ইংরেজের আদালত ও স্কুল, খেতাব ও আইনসভা বর্জন সহ অসহযোগের প্রস্তাবগুলি কার্যকর করতে হবে। যাঁরা বর্জনের এই নীতিতে বিশ্বাস করেন না, বা কার্যকর করবেন না, তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে এবং ঐসব পদ পূর্ণ করবার জন্যে নূতন নির্বাচন হবে। চতুর্থ প্রস্তাবে গান্ধীজী সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করলেন।

গান্ধীজী জানতেন, এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে কংগ্রেসে তুমুল বিতর্ক হবে। তাতেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলেও স্বরাজ দল তাঁর তীব্র বিরোধিতা করলো। গান্ধীজী কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করতে চাইলেন। এ পর্যন্ত যে কেউ কংগ্রেস সংগঠনের ১ম ধারা এবং স্বরাজ ও অহিংসার আদর্শ মেনে নিলে ও চার আনা ক'রে চাঁদা দিলে সদস্য হ'তে পারতো। গান্ধীজী এখন সদস্য হ'তে হ'লে চার আনা চাঁদার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হাতে-কাটা সুতো দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করতে চাইলেন। কংগ্রেসের সংবিধান অনুসারে এই ধরনের পরিবর্তন সাধনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক্তিয়ার ছিল না। তবু গান্ধীজী এই দাবী করলেন।

মতিলাল গান্ধীজীর এই কাজকে স্বৈরতান্ত্রিক আখ্যা দিলেন এবং কংগ্রেস সংগঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহকে তিনি অধিকার-বহির্ভূত বললেন। মতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের এই নিয়ম সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অধিকাংশ সদস্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। পরদিন গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করলে মতিলাল নেহ্‌রু, চিত্তরঞ্জন দাশ ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে স্বরাজপন্থীরা অধিবেশন ত্যাগ করলেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে প্রস্তাবটি গৃহীত হ'লো। তবে শাস্তি সংক্রান্ত ধারাটি গান্ধীজী বাতিল করলেন। এর পর স্বরাজ দলের সঙ্গে গান্ধীজীর দীর্ঘ আলোচনা চললো এবং তাঁরা শেষ পর্যন্ত অধিবেশনে যোগ দিলেন। কলে তৈরী কাপড়, আদালত, স্কুল-কলেজ, খেতাব ও আইনসভা বর্জন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি গান্ধীজী কিছুটা পরিবর্তিত করলেন। তবে সন্ত্রাসবাদী গোপীনাথ সাহা সম্পর্কে নিন্দাসূচক প্রস্তাবটি নিয়ে অধিবেশনে তুমুল বিতর্ক বাধলো। চিত্তরঞ্জন এই প্রস্তাবের প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। প্রস্তাবটি মাত্র আট ভোটের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হ'লো। গান্ধীজী

দেখলেন তাঁর বহু ঘনিষ্ঠ সহকর্মীও তাঁর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। গান্ধীজী এতোই মর্মাহত হলেন যে, তিনি প্রকাশ্যে চোখের জল ফেললেন। তিনি পরাজিত হয়েছেন ও তাঁর দর্প চূর্ণ হয়েছে ব'লে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন।

প্রস্তাবগুলির মধ্যে সুতো কাটার প্রস্তাবটির উপরই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। কাউন্সিল বর্জনের উপর তিনি অন্যান্য নো-চেঞ্জারদের মতো বিশেষ জোর দিলেন না। তিনি লক্ষ্য করলেন, নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জারদের মধ্যে, কংগ্রেস ও উদারনৈতিকদের মধ্যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে, বর্ণ হিন্দু ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। তিনি সকলের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তাই তিনি অসহযোগের সংগ্রামী দিক্‌গুলিকে সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে কংগ্রেসকে সূতাকাটার, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও সম্প্রীতি সাধনে ও অস্পৃশ্যতা বর্জনে আত্মনিয়োগ করতে বললেন।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও ঐক্য সাধনের জন্যে গান্ধীজী বহু বক্তৃতা দেন, বহু প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনও ফল হয় না। সাম্প্রদায়িকতার তীব্র বিষ দেশের সর্বত্র জড়িয়ে পড়তে থাকে। আমেথি, সম্ভল, গুলবর্গা প্রভৃতি স্থানে মুসলমানরা হিন্দু মন্দির অপবিত্র করায় ভয়ংকর দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯২৪) কোহাটে ভয়ানক দাঙ্গা হয়। গান্ধীজী বিহ্বল হ'য়ে পড়েন এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে ২১ দিনব্যাপী অনশন শুরু করেন।

গান্ধীজীর অনশনের সংবাদ দেশের দায়িত্বশীল নাগরিকদের সচেতন ও উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে। গান্ধীজী দিল্লীতে মহম্মদ আলির বাড়িতেই অনশন করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নেতারা দ্রুত দিল্লীতে এসে পৌছেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে মতিলাল নেহ্‌রুর সভাপতিত্বে একটি ঐক্য সম্মেলন শুরু হয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রায় তিনশত নেতা সম্মেলনে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা সাম্প্রদায়িক শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য আবেদন করলেন। কয়েকদিন ধ'রে ঐক্য সম্মেলন চললো, অনেক প্রস্তাবও গৃহীত হ'লো। কিন্তু সম্মেলনে প্রকৃত কোন পথের সন্ধান মিললো না। সম্মেলনে বিভিন্ন দলের দর কষাকষিই প্রাধান্য পেলো। মওলানা আজাদ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের পথে একটি প্রধান অন্তরায় ছিল গোহত্যা বনাম গোরক্ষার প্রশ্ন। আজাদ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করলেন। তিনি মুসলমানদের বললেন, গো-কোরবানি ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। তিনি হিন্দুদের বললেন, বহু মুসলমান নেতা আছেন যাঁরা জীবনে গোমাংস স্পর্শ করেন নি এবং হিন্দুদের প্রতি সৌহার্দ্য দেখাবার জন্যে মুসলমানরা যাতে গোমাংসাহার ত্যাগ করেন, সেজন্যে চেষ্টা করছেন। আজাদের এই আবেদন কিছুটা ফলপ্রসূ হ'লো এবং সম্মেলনের শেষ কয়েকদিন অনেকটা শান্তি ও শুভেচ্ছার আবহাওয়ায় কাটলো। ৮ই অক্টোবর তারিখে গান্ধীজীর তিন-সপ্তাহব্যাপী অনশন শেষ হ'লো। মুসলমান নেতারা গান্ধীজীকে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ডাঃ আনসারি গান্ধীজীকে স্বহস্তে কমলার রস দিলে তা পান ক'রে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন।

অনশনভঙ্গের পর গান্ধীজী তাঁর মুসলিম সহকর্মীদের নিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিবাদের তদন্তের জন্যে কোহাটে যেতে চান। কিন্তু সরকার তাঁর কোহাট প্রবেশ নিষিদ্ধ করলো। বাংলাদেশে সরকার স্বরাজ দলের উপর কঠোর আঘাত হানতে সচেষ্ট হয়েছিল। গভর্নর ঘোষণা করলেন যে, দেশবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীরা দেশের শত্রু; তাঁরা বাংলা-দেশে শাসনব্যবস্থাকে প্রায় অচল ক'রে তুলেছেন। ২৫শে অক্টোবর

(১৯২৪) তারিখে গভর্নর একটি অর্ডিন্যান্স পাস ক'রে বাংলা দেশে ব্যাপক তল্লাসি ও গ্রেপ্তার চালালো। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ও দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ সুভাসচন্দ্র বসু প্রায় চল্লিশজন সহকর্মী সহ গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ বোমা, রিভলভার, বিস্ফোরক দ্রব্য প্রভৃতির জন্য তল্লাস চালাচ্ছে বললেও তারা ঐ ধরনের কিছু পেলো না। তারা স্বরাজ দলের কাগজপত্র ও বইগুলি নিয়ে গেল। ভারতের সর্বত্র ক্রোধ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো।

স্বরাজ দলের বিরোধীরাও সরকারী কাজের নিন্দা করলেন। গান্ধীজী তাঁর দুর্বল শরীরেও কলকাতা ছুটে এলেন। তাঁর উপস্থিতি বাংলার জনসাধাণকে সাহস ও মনোবল দিলো। গান্ধীজী, দেশবন্ধু ও মতিলাল মিলিতভাবে সরকারের এই দমননীতি প্রতিরোধের জন্য উপায় নির্ণয়ে সচেষ্ট হলেন। দেশের জনসাধারণ সকলে স্বরাজ চাইলেও তাঁরা বহু দলে ও মতে বিভক্ত ছিলেন। এমন কি কংগ্রেসও দ্বিধাবিভক্ত ছিল। তাই তাঁরা সকলের মধ্যে ঐক্যসাধনে সচেষ্ট হলেন। গান্ধীজী কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্যে স্বরাজ দলের নীতি বহুলাংশে মেনে নিলেন এবং তিনি বেলগাঁ কংগ্রেসে খদ্দর ব্যবহারের কঠোর নীতি এবং অসহযোগের অন্যান্য নীতি সাময়িকভাবে পরিত্যাগের সুপারিশ করলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে স্বরাজ দলের বিরুদ্ধে সরকারের আক্রমণ এলেও এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে তিনি আহ্বান জানালেন।

তাঁর এই আহ্বান অনুসারে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মওলানা মহম্মদ আলি বোম্বাইয়ে ২১শে নভেম্বর একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে প্রায় ৪০০প্রতিনিধি যোগ দিলেন। সম্মেলন বাংলায় সরকারী দমননীতির নিন্দা করলো এবং সকল রাজনৈতিক দলকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করবার জন্যে উপায় নির্ধারণের জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করলো। ঐক্য সম্মেলন

হওয়ার পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'লো। তাতেও গান্ধীজী, দেশবন্ধু ও মতিলালের প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বেলগাঁয় গান্ধীজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ঊনচত্বারিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'লো। দিল্লী ও বোম্বাইয়ে দুটি ঐক্য সম্মেলনের পর বেলগাঁ কংগ্রেসেও দেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্যে আহ্বান জানানো হ'লো। বেলগাঁ কংগ্রেসে গান্ধী-মতিলাল-দেশবন্ধু চুক্তিটি গৃহীত হ'লো। গান্ধী, মতিলাল ও দেশবন্ধুর ওপরই নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ভার পড়লো। গান্ধীজী নূতন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল ও শংকরলাল ব্যাংকারের মতো গোঁড়া নো-চেঞ্জারদের বাদ দিলেন এবং স্বরাজ দল থেকে বেশীর ভাগ সদস্য গ্রহণ করলেন। জওহরলাল নেহ্‌রু আবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি হলেন।

কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হওয়ার পরেই গান্ধীজী ব্যাপকভাবে ভারতের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং তাঁর উপস্থিতি ও ভাষণ জনমানসে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো। ২৩শে জানুয়ারি দিল্লীতে যে সর্বদলীয় সম্মেলন হ'লো, গান্ধীজী তাতে সভাপতিত্ব করলেন। সম্মেলনে মতিলাল নেহ্‌রু, জিন্না, মওলানা মহম্মদ আলি, মওলানা সওকত আলি, মিসেস অ্যানী বেসাণ্ট, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহ্‌রু, লাজপত রায়, পণ্ডিত কুঞ্জরু, চিন্তামণি, জয়াকর, মওলানা আজাদ প্রভৃতি নেতারা যোগ দিলেন। গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় এবং সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যসাধন ও স্বরাজ-লাভের উপায় নির্ধারণের জন্যে একটি সাবকমিটি গঠন করতে বললেন। চল্লিশজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি সাবকমিটি গঠিত হ'লো।

ফেব্রুয়ারিতে এই সাব-কমিটির প্রথম অধিবেশন হ'লো এবং হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিতে মতৈক্য না হওয়ায়

সাবকমিটির কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রইলো। ২৬শে মার্চ তারিখে গান্ধীজী ইয়াং ইণ্ডিয়াতে এ সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাতে মওলানা মহম্মদ আলি ও মওলানা সওকত আলি এবং গান্ধীজীর মধ্যে মতদ্বৈধ সুপষ্ট হয়ে ওঠে। কোহাট সম্পর্কে গান্ধীজী ও আলি-ভাইয়েরা পৃথক বিবৃতি প্রকাশ করলেন। এই-ভাবেই আলিভাইদের সঙ্গে গান্ধীজীর বন্ধুত্বের অবসান সূচিত হয়।

গান্ধীজী উত্তর ভারত ভ্রমণের পর দক্ষিণ ভারতে গেলেন। উত্তর ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সমস্যা যেমন তাঁকে চিন্তিত ক'রে তুলেছিল, তেমনি দক্ষিণ ভারতে তিনি অস্পৃশ্যতার সমস্যার সম্মুখীন হলেন। এইসব তথাকথিত অস্পৃশ্যদের মধ্যে ছিল এজাভা শ্রেণীর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ, পুলায়া শ্রেণীর প্রায় তিন লক্ষ চাষী, পারিয়া শ্রেণীর প্রায় তিন লক্ষ মজুর এবং শানার শ্রেণীর লোকেরা।

এই তথাকথিত অস্পৃশ্যরা মন্দিরের বা মন্দিরের আশপাশের পথ দিয়ে হাঁটলেও মন্দির অপবিত্র হয়েছে মনে করা হ'তো। তাই ঐসব পথ তাদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল। অথচ ঐ পথে অহিন্দুদের যাতায়াতে কোনও বাধা ছিল না। এই প্রথার বিরুদ্ধে বাইকমে সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল। সত্যাগ্রহে অস্পৃশ্যদের দাবী ছিল সীমাবদ্ধ; তারা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দাবী করেনি, তারা দাবী করেছিল ঐসব পথে চলাচলের অধিকার। এই অধিকার থেকে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের এক-ষষ্ঠাংশ অধিবাসী বঞ্চিত ছিল। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের শাসকরা বর্ণ হিন্দুদের সমর্থন করছিল এবং পুলিশ মন্দিরের নিকটবর্তী পথগুলিকে ঘিরে রেখেছিল। সত্যাগ্রহীরা স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য ক'রে নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ করছিল। চার সপ্তাহ ধরে পুলিসের নির্যাতন উপেক্ষা ক'রে এই সত্যাগ্রহ চলছিল এবং গান্ধীজী মনোযোগের সঙ্গে এর গতি লক্ষ্য করছিলেন। তিনি তাঁর 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' কাগজে সত্যাগ্রহীদের উৎসাহ ও পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কয়েক মাস সত্যাগ্রহ চলবার পর কর্তৃপক্ষ

সত্যাগ্রহীদের দাবী মেনে নিলো এবং পথগুলি তথাকথিত অস্পৃশ্যদের জন্য উন্মুক্ত ক'রে দিলো। সত্যাগ্রহীদের দাবী সামান্য হ'লেও তাদের জয়লাভকে গান্ধীজী অভিনন্দন জানালেন। গান্ধীজী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ব্যাপকভাবে সফর ক'রে বেড়ালেন। তিনি কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল পরিভ্রমণ করলেন। তিনি মার্চ মাসে ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ ক'রে গুজরাটে ফিরে এলেন।

এপ্রিলের শেষাশেষি তিনি বাংলা দেশে এলেন। ২রা মে তারিখে বরিশালে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। দেশবন্ধু অসুস্থ ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে কয়েকটি শর্তে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মতি প্রকাশ করেন। শর্তগুলি হ'লো সরকারকে বিশেষ ক্ষমতাবলী (discretionary powers) ত্যাগ করতে হবে; সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে; অদূরভবিষ্যতে কমনওয়েল্‌থের মধ্যে থেকে ভারতের স্বরাজলাভের অধিকারকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে; এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত স্বরাজের সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত ভিত্তি গ'ড়ে তুলতে হবে। ৩রা মে গান্ধীজী এই সম্মেলনে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, দেশবন্ধুর বাংলা বক্তৃতার ইংরেজী তরজমা তিনি পড়েছেন এবং দেশবন্ধু তাঁর (গান্ধীজীর) ভাবের ঘরে চুরি করেছেন। সম্মেলনে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর মতৈক্য প্রকাশ করলেন।

মে ও জুন মাসে গান্ধীজী বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি অসংখ্য জনসভায় বক্তৃতা করলেন। ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করলেন। এখানে অধিকাংশ সভায় তিনি হিন্দীতেই বক্তৃতা করেন। তবে কোনও কোনও সভায় তিনি বাঙ্গালীদের "দুঃখজনক ইংরেজীপ্রীতির জন্যে" ইংরেজীতেও বক্তৃতা দেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বাঙ্গালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই, যেমন ডাঃ (আচার্য)

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সতীশ দাসগুপ্ত, খাদি সম্পর্কে উৎসাহী হ'য়ে ওঠেন। এই সময়ে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনেও যান। গান্ধীজীর শরীর অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল ছিল। দেশবন্ধুর অনুরোধে তিনি পাঁচদিন বিশ্রামের জন্যে দার্জিলিং গেলেন। ৪ঠা জুন তারিখে (১৯২৫) দার্জিলিংয়ে দেশবন্ধুর গৃহটি চরকার ঘর্ঘর-ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। অসংখ্য লোক তাঁর ফটো তুলতে ও স্বলিপি নিতে এলেন। গান্ধীজী তাঁদের কাছে এর জন্যে অভিনব উপায়ে মূল্য দাবি করলেন। মূল্য হ'লো—রোজ আধঘণ্টা ক'রে সুতো কাটা ও খদ্দর পরবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। অনেকেই পশ্চাদ্‌পদ হলেন, অনেকে ভেবে দেখবেন বললেন, অনেকে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। এখানেও গান্ধীজী কয়েকটি মিটিং করেন। দার্জিলিং থেকে গান্ধীজী জলপাইগুড়ি, বরিশাল ও খুলনা যান—ঐ জায়গাগুলি তিনি আগের বারের সফরে দেখতে পারেন নি।

গান্ধীজী যখন খুলনা পৌঁছলেন, তখন সারা বাংলাদেশে শোকের কালো ছায়া নেমে এসেছিল। খুলনা পৌঁছেই তিনি শুনলেন যে, ১৬ই জুন দেশবন্ধু দার্জিলিংয়ে পরলোকগমন করেছেন। একটিমাত্র জনসভা ছাড়া সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। ঐ সভায় গান্ধীজী বললেন—"দেশবন্ধু ছিলেন একজন মহামানব।" ব'লেই তিনি ভেঙে পড়লেন। তারপর তিনি বললেন, "আমরা দেশবন্ধুর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে কি করব? চোখের জল ফেলানো সহজ; চোখের জলে আমাদের বা তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কারও কোন উপকার হবে না। তিনি যে কাজের মধ্যে বেঁচেছিলেন, যে কাজ ছিল তাঁর অস্তিত্ব, তা যদি আমরা হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান, যেই নিজেকে ভারতবাসী ব'লে থাকি, করবার জন্যে শপথ নিতে পারি, তবেই কিছু করা হবে।" গান্ধীজী তাঁর আসাম-সফরের সূচী বাতিল ক'রে দিয়ে দেশবন্ধুর শোক-শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্যে দ্রুত কলকাতা চ'লে এলেন। ১৮ই জুন দার্জিলিং

থেকে দেশবন্ধুর মরদেহ কলকাতায় আনা হ'লো। গান্ধীজী ও আজাদ শবাধারবহনে অংশগ্রহণ করলেন। ২০শে জানুয়ারি তারিখে স্বরাজদলের মুখপত্র 'ফরওয়ার্ডে' গান্ধীজী "দেশবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন্ "(Long Live Deshbandhu)" নামে একটি মর্মস্পর্শী প্রবন্ধ লিখলেন। উপসংহারে গান্ধীজী বললেন ;•"বাংলা আজ বিধবার মতো। নিষ্ঠুর নিয়তি যখন আমাদের কাছ থেকে লোকমান্যকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, তখন আমি নিঃস্ব বোধ করেছিলাম। সে আঘাত আমি আজও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আজ তাঁর ভক্তদের আমি প্রীতিকামনা ক'রে বেড়াচ্ছি। কিন্তু দেশবন্ধুর চ'লে যাওয়া আমাকে আরো দুরবস্থার মধ্যে ফেলেছে। কারণ লোকমান্য যখন চ'লে গিয়েছিলেন, তখন দেশ আশায় পূর্ণ ছিল। হিন্দু ও মুসলমানরা যেন চিরকালের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আমরা যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে ছিলাম। আর আজ?" গান্ধীজী দেশবন্ধু-স্মৃতিরক্ষার জন্যে তহবিল-সংগ্রহের জন্যে আবেদন জানালেন এবং দু মাসের মধ্যে তিনি দেশবন্ধুর বাসভবনকে নারী ও শিশুদের জন্য একটি হাসপাতালে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ ক'রে দিলেন। গান্ধীজী বাংলায় স্বরাজ দলের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। দেশবন্ধুর স্থানে তিনি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে অভিষিক্ত করলেন। দেশবন্ধুর মতোই যতীন্দ্রমোহন হলেন কলকাতার মেয়র, বঙ্গীয় স্বরাজ দলের সভাপতি এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

গান্ধীজী নিখিল বঙ্গীয় স্মৃতি-তহবিলে অর্থ সংগ্রহ ক'রে দিয়ে নিখিল ভারত দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষার দিকে মনোযোগ দিলেন। ২৩শে জুলাই তারিখে গান্ধীজী মতিলাল নেহরু, রবীন্দ্রনাথ ও আজাদের স্বাক্ষরিত আবেদন প্রকাশিত হ'লো 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' কাগজে। গান্ধীজী বাংলাদেশে আরও কিছুকাল রইলেন। গান্ধীজী সম্পর্কে স্বরাজ দলের যে সংশয় ও আতঙ্ক ছিল

তা সমূলে বিনষ্ট হ'লো। গান্ধীজী আবার বাংলার হৃদয় জয় করলেন।

স্বরাজ দল দেশবন্ধুর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হ'লেও গান্ধীজীর কংগ্রেসে ঐক্যসাধনের আন্তরিক ইচ্ছা তাদের শক্তি ও প্রাধান্য-লাভের পথে সহায় হ'লো। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের দিন ধার্য করলেন গান্ধীজী। নো-চেঞ্জাররা গান্ধীজীর কাছে অভিযোগ করতে লাগলেন যে, স্বরাজদল সুতো কাটার কর্মসূচীকে আবশ্যিক ভাবে গ্রহণ করেনি। সুতরাং কংগ্রেসে তাদের স্থান হওয়া উচিত নয়। গান্ধীজী তার উত্তরে বললেন, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, সুতো-কাটা ও কাউন্সিল প্রবেশ, এ দুই কর্মসূচীরই সুযোগ ও প্রয়োজন আছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে গান্ধীজী কংগ্রেস সংবিধানের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও লিখলেন।

২২শে সেপ্টেম্বর পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হ'লো তাতে ক্ষমতা স্বরাজ দলের হাতেই গেল। চার আনা চাঁদা বা নিজ-হাতে-কাটা ২০০০ গজ সুতো দিলে যে কেউ-ই কংগ্রেসের সদস্য হ'তে পারবেন, স্থির হ'লো। গান্ধীজীর প্রস্তাব ও ও পরামর্শ অনুসারে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মতিতে কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে নিখিল ভারত কাটুনি সংঘ (All India Spinners Association) প্রতিষ্ঠিত হ'লো। স্বরাজ দল কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও এবং সরকারের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করলেও স্বরাজ দলে দ্রুত ভাঙন দেখা দিলো।

গান্ধীজী ভারত সফর শেষ ক'রে নভেম্বর মাসে সবরমতী আশ্রমে ফিরে এলেন। এই সময় থেকে তিনি তাঁর অসংখ্য কাজের মধ্যেও তাঁর "সত্য নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাহিনী" (The Story of my Experiments with Truth) লিখতে

শুরু করলেন। প্রতি সপ্তাহে একটি ক'রে পরিচ্ছেদ। চার বছর আগে তিনি তার সহকর্মীদের উৎসাহে আত্মজীবনী লিখতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু এক পৃষ্ঠা লেখা না হ'তেই বোম্বাইয়ে হাঙ্গামা বাধায় (১৯২১) তিনি তা লেখা বন্ধ রেখেছিলেন। যারবেদা জেলেও তিনি আত্মজীবনী লিখবেন স্থির করেছিলেন। তাও হয়ে ওঠে নি। এবার সবরমতী আশ্রমে ফিরে তিনি ঐ কাজে আবার হাত দিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' কাগজে এই যুগান্তকারী রচনার প্রকাশ শুরু হ'লো।

২৬শে ডিসেম্বর কানপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হ'লো। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের সভানেত্রী হলেন। গান্ধীজী এটিকে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ব'লে বর্ণনা করলেন। কিন্তু তিনি এই কংগ্রেসে মাত্র পাঁচ মিনিট বক্তৃতা দিলেন। রাজনৈতিক কোনও বিতর্কে অংশ নিলেন না। তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সাময়িক ভাবে নিজেকে সে সরিয়ে নিচ্ছেন, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ঘোষণা করলেন, অন্ততঃপক্ষে আগামী ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি স্বাস্থ্য বা গুরুত্বপূর্ণ কোনও কারণ ভিন্ন আশ্রমের বাইরে যাবেন না। তিনি কানপুর কংগ্রেসে তাঁর প্রধান সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তের পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল—তাঁর দুর্বল জীর্ণশীর্ণ দেহকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়া; সবরমতী আশ্রমের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া; এবং নিখিল ভারত কাটুনি সংঘকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা। এই বৎসরটিকে (১৯২৬) গান্ধীজী তাঁর নীরবতার বৎসর আখ্যা দিয়েছেন। ২০শে ডিসেম্বর গান্ধীজী তাঁর "নীরবতা" ভঙ্গ করলেন এবং পুনরায় ভারত-সফর শুরু করলেন। তিনি অমরাবতী, নাগপুর ও গোণ্ডিয়া হয়ে গৌহাটি যাত্রা করলেন। পথে তিনি স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর রোগশয্যায় আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ার সংবাদ

পেলেন। স্বামীজীর এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ তাঁর কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক হ'লেও তিনি বললেন, স্বামীজীর রক্ত হিন্দু ও মুসলমানের মনের মালিন্য ধৌত করতে হয়তো সাহায্য করবে। ২৬শে ডিসেম্বর গৌহাটিতে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হ'লো। গান্ধীজী এই কংগ্রেসে পুনরায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে ফিরে গান্ধীজী কলকাতায়, সোদপুরে ও কুমিল্লায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত করলেন। তিনি কলকাতায় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্‌বোধন করলেন, কুমিল্লায় অভয় আশ্রমে দুদিন কাটালেন। জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি বেনারস গেলেন। এখানে কৃপালনী-পরিচালিত গান্ধী আশ্রমের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন এবং পণ্ডিত মালব্যের আমন্ত্রণে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজারেরও বেশি ছাত্রের এক সভায় ভাষণ দিলেন। ১৮ই জানুয়ারি থেকে তিনি আবার বিহার সফরে গেলেন। সফরকালে তিনি খাদির বাণী প্রচার করলেন, সংগঠন গড়ে তুললেন এবং অর্থ সংগ্রহ করলেন। সর্বত্রই তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন, সকলকে অস্পৃশ্যতার মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর হ'তে বললেন।

বিহার-সফর-শেষে তিনি মধ্যপ্রদেশে ও মহারাষ্ট্রে গেলেন। মার্চের মাঝামাঝি মহারাষ্ট্র সফর-শেষ হ'লে তিনি কাংড়িতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের স্মৃতিজড়িত 'গুরুকুলে' গেলেন। ২৩শে মার্চ তিনি বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছলেন। গান্ধীজীর এই কয়েকমাস বিন্দুমাত্র বিশ্রাম ছিল না। তিনি ট্রেনেই একটু-আধটু বিশ্রাম ক'রে নিতেন। বোম্বাইয়ে এসেও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ ক'রে চললেন। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বহু সভায় বক্তৃতা দিলেন। রাত্রি একটায় শুতে গেলেন। রোজ ভোর চারটায় তিনি প্রার্থনা করতেন, কিন্তু সেদিন পাঁচটার আগে প্রার্থনায় বসতে পারতেন না। তিনি অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ

করছিলেন। কিন্তু তার ওপরও ছিল সাক্ষাৎপ্রার্থী ও দর্শনার্থীদের অবিরাম ভীড়। তিনি ট্রেনে সাধারণতঃ একটু ঘুমিয়ে নিতেন। কিন্তু সেদিন সারাদিন অবিরাম কাজ ক'রে গেলেন। পাঁচটার সময়ে হঠাৎ তিনি মাথা ঘুরছে এবং শরীরের বাঁ দিকটা অবশ হয়ে গেছে বোধ করলেন। চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলেন। এই অবস্থাতেই তিনি কোনক্রমে পুণা থেকে বাঙ্গালোর মেলে কোলাপুর যাত্রা করলেন। ট্রেনে ঘুমোবার সুযোগ পেলেন এবং নিজেকে কিছুটা সতেজ বোধ করলেন। কোলাপুরে ঐ শরীরেই তিনি সাতটি সভায় ভাষণ দিলেন। ফলে রোগের আক্রমণ আবার দেখা দিলো। তাঁকে সকলেই বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর কর্ণাটক-সফরের প্রারম্ভে নিপানিতে পৌঁছে চারদিন বিশ্রাম নিলেন। ডাক্তাররা তাঁকে নিপানিতে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন, তিনি সৌভাগ্যক্রমে সন্ন্যাসরোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তাঁকে ডাক্তাররা সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন। ফলে গান্ধীজীর সফর-সূচী বাতিল করা হ'লো। তিনি একটু সুস্থ হ'লে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নন্দী পর্বতে গেলেন। জুন মাসের মাঝামাঝি তিনি নন্দী পর্বত থেকে নেমে বাঙ্গালোরে এলেন। শীঘ্রই তিনি আবার তাঁর সফর শুরু করবেন স্থির করলেন। ৩রা জুলাই তিনি দক্ষিণ ভারত খাদি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন। গান্ধীজী মহীশূরের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি দেখলেন এবং অগণিত মানুষের কাছে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। তিনি চারমাস মহীশূরে ছিলেন। ২৪শে আগস্ট থেকে তিনি তামিলনাড সফর শুরু করলেন। অক্টোবর মাসে দূর দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে ঘুরে বেড়ালেন। নভেম্বর মাসে তিনি হঠাৎ বড়লাটের আহ্বান পেয়ে বাঙ্গালোর থেকে এলেন দিল্লী।

দিল্লীতে গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলে বড়লাট একটি সরকারী দলিল তাঁর হাতে দিলেন। কেবল এইজন্যেই কি তাঁকে

ডেকে পাঠানো হয়েছে, তিনি এই প্রশ্ন করলে বড়লাট তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ"। এই সংবাদ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। এতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সাইমন কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ঘোষণাটি বোমার মতো এসে পড়লো এবং ভারতীয় রাজনীতিতে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটালো।

উনিশ

আবার সংগ্রামের প্রস্তুতি

সাইমন কমিশন নিয়োগের পশ্চাতে একটি দুরভিসন্ধি ছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে বলা হয়েছিল, দশ বৎসর পরে এই শাসন-ব্যবস্থার উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যে একটি কমিশন বসানো হবে। সেই হিসাবে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এই কমিশন নিয়োগের কথা। কিন্তু ইংলণ্ডে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তাতে শ্রমিক দলের ক্ষমতালাভের সম্ভাবনা থাকায় এবং শ্রমিক দলের অনেকে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ায় রক্ষণশীল সরকার অবিলম্বে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করলো। এই কমিশনে ভারতীয়দের কাউকে স্থান দেওয়া হলো না। ভারতের সকল রাজনৈতিক দলই এতে বিক্ষুব্ধ হলো। সাইমন কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণার প্রাক্কালেই ক্যাথেরিন মেয়ো তাঁর কুখ্যাত Mother India বইখানি লিখলেন। বইখানিতে ভারতের একটি কুৎসিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল এবং ভারত সরকার বিদেশে ভারতবিরোধী প্রচারের উদ্দেশ্যে এই বইখানি লেখার জন্যে লেখিকাকে নিয়োগ করেছিল। বইখানি ভারতীয়দের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। গান্ধীজী 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' কাগজে বইখানার তীব্র সমালোচনা করলেন। তিনি বইখানাকে "Drain Inspector's Report" আখ্যা দিলেন। তিনি কিন্তু সাইমন কমিশন সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করলেন না। তিনি খাদি প্রচার ও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে সিংহল রওনা হয়ে গেলেন।

১৩ই নভেম্বর গান্ধীজী কলম্বোতে পৌঁছলেন। সিংহলের সর্বত্রই জনসাধারণ গান্ধীজীকে বিপুল সংবর্ধনা জানালো। তিনি বহু

সভায় ও সংস্থায় ভাষণ দিলেন। সিংহলবাসীরা মুক্তহস্তে দান করলেন। ২৫শে নভেম্বর গান্ধীজী কলম্বো ত্যাগ করলেন। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে তিনি উড়িষ্যা সফরে এলেন। উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে তিনি ঘুরে বেড়ালেন। বালেশ্বরে তিনি দুদিন ছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি একটিমাত্র জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। কটকে তাঁর রক্তের চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর সফরসূচী বাতিল করতে হ'লো। তবু তিনি ডাক্তারের পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রে শ্রমিকদের একটি সভায় বক্তৃতা দিলেন। রাজনৈতিক কর্মী ও স্থানীয় নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করলেন। তাঁর রক্তের চাপ সকালে ছিল ১৮২, তা মধ্যরাত্রিতে বেড়ে হ'লো ১৯৫। তিনি হাসিমুখে ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা ক'রে উড়িষ্যা থেকে মাদ্রাজ রওনা হলেন। মাদ্রাজে ঐ সময় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হচ্ছিল।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ আনসারি ঘোষণা করলেন, "অসহযোগ আমাদের ব্যর্থ করে নি, আমরা অসহযোগকে ব্যর্থ করেছি। (The no-co-operation did not fail us, we failed no-co-operation.) তিনি কংগ্রেসকে ও দেশকে সাইমন কমিশন বয়কট করতে, ভারতের জন্যে একটি ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা করতে এবং ঐ সংবিধান গ্রহণের জন্যে একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করতে পরামর্শ দিলেন। জওহরলাল নেহ্‌রু তাঁর কুড়ি মাস ইউরোপভ্রমণের পরে ভারতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি কংগ্রেসে কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের প্রস্তাব তুললেন। এইসব প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীনতার দাবি, সম্ভাবিত বিশ্বযুদ্ধের বিপদ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক লীগের সঙ্গে সহযোগিতা প্রভৃতি ছিল। প্রস্তাবগুলি বিনা বাধায় কংগ্রেসে গৃহীত হ'লো। এতো সহজে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ায় জওহরলাল নিজেও বিস্মিত হলেন এবং বুঝলেন কংগ্রেস এইসব প্রস্তাবের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব সম্পর্কে

বিন্দুমাত্র অবহিত নয়। গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তার অধিবেশনগুলিতে অংশগ্রহণ করলেন না। তবে তিনি প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দিলেন। স্বাধীনতা ও সমস্ত ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট সম্পর্কে প্রস্তাবগুলি তাঁর মনঃপূত হয়নি। তাই তিনি সমালোচনা ক'রে বললেন যে, "কার্যকর করতে সমর্থ নয় জেনেও ঐ ধরনের সব প্রস্তাবকে কংগ্রেস বছরের পর বছর পাস ক'রে সন্তুষ্ট আছে। ঐ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে আমরা আমাদের নিজেদের অক্ষমতাই প্রদর্শন করি, সমালোচকদের হাসির খোরাক যোগাই এবং শত্রুদের ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠি। প্রস্তাবগুলি যদি সুচিন্তিত না হয়, সেগুলি যদি কাগজী প্রস্তাবমাত্র হয়, তবে কংগ্রেস যে অপ্রতিরোধ্য শক্তি ছিল বা হ'তে চায়, তা হ'তে পারবে না। আমরা প্রায় স্কুলের ছাত্রদের বিতর্ক-সভায় পরিণত হয়েছি।"

যাই হ'ক ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক পটভূমিকায় অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। সমগ্র দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও তরুণদের মধ্যে অসন্তোষ আবার দানা বেঁধে উঠেছিল এবং পুনরায় একটি ঐক্যের সুর আকাশে বাতাসে অনুরণিত হচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। শ্রমিক-অসন্তোষ দেশব্যাপী হয়ে উঠেছিল। বিংশ দশকের শেষভাগে অনেকগুলি স্ট্রাইক হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পে বাংলার পাটকলে ও জামসেদপুরের ইস্পাতকারখানায় স্ট্রাইকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একটি শ্রেণীসচেতন সংগ্রামী-সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশে কৃষকরাও নিজেদের দাবি সম্পর্কে সচেতন ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

বারদৌলিতে বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কৃষকরা খাজনা-বৃদ্ধির প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করেছিল। সরকার কৃষকদের মনোবল

ভাঙবার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এবং যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি জলের দামে বিক্রি ক'রে খাজনা আদায় শুরু করেছিল। সর্দার বল্লভভাই কৃষকদের বলেছিলেন, ইংরেজরা পারে তো তোমাদের জমি ইংলণ্ডে নিয়ে যাক, তোমরা কেউ জমি ছেড়ো না। সরকার কৃষকদের জমি বাজেয়াপ্ত করলেও কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করতে পারলো না। সরকার সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার ক'রে অসম্ভবরকম সব অভিযোগে দীর্ঘকালীন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলো। সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে সাতজন আইন পরিষদের সদস্য পদত্যাগ করলেন। বারদৌলির ৬৩ জন প্যাটেল ও ১১ জন তালাতি কাজে ইস্তফা দিলেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল গুজরাট থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি বড়লাটকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বললেন এবং বারদৌলি সত্যাগ্রহের জন্য এক হাজার টাকা দিলেন। গান্ধীজী বারদৌলি সত্যাগ্রহ গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। ২রা আগস্ট তিনি বারদৌলিতে পৌছলেন। সরকার তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিলো।

বল্লভভাই সত্যাগ্রহীদের অবিলম্বে মুক্তিদান, সকলপ্রকার দণ্ডমকুব করণ এবং কৃষকদের বাজেয়াপ্ত জিনিসের প্রচলিত মূল্য-দান প্রভৃতি দাবি করলেন। সরকার শেষ পর্যন্ত বন্দীদের মুক্তি দিল, কৃষকদের জমি প্রত্যর্পণ করলো, পদচ্যুত গ্রামীণ কর্মচারীদের পূর্বপদে বহাল করলো। ব্রুমফীল্ড ও ম্যাক্‌স্‌ওয়েল খাজনাবৃদ্ধির হার অত্যধিক ব'লে মত প্রকাশ করলেন। তাঁরা ২২ শতাংশের স্থলে ৫·৭ শতাংশ বৃদ্ধির সুপারিশ করলেন। এতে সকলে সন্তুষ্ট না হ'লেও সত্যাগ্রহ জয়যুক্ত হ'লো এবং ভারতীয় জনসাধারণ এই অহিংস সংগ্রামের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো।

দেশে তরুণদের মধ্যেও অভাবনীয় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুবসংঘ (Youth League) গ'ড়ে উঠেছিল। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র এদের মধ্যে এক নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনার

সঞ্চার করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে যুবসংঘগুলির সম্মেলন হ'লো। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এঁদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিল।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে স্বরাজ দল ও তার নীতি প্রাধান্য লাভ করলেও ক্রমেই সরকারের সঙ্গে সহযোগের মাত্রা নিয়ে এঁদের নিজেদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিল। মুসলিম সদস্যরা অনেকেই স্বরাজ দল ত্যাগ করলেন। লালা লজপত রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি স্বরাজ দলের নেতারা স্বরাজ দল ত্যাগ করলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে কেন্দ্রে ও প্রদেশে স্বরাজ দলের আসন-সংখ্যা ও শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেলো। ফলে মতিলাল নেহ্‌রুর নেতৃত্বে স্বরাজ দল কাউন্সিল প্রবেশ ও সহযোগের নীতি ত্যাগ ক'রে পুনরায় গান্ধীজীর অসহযোগের নীতিকেই নির্ভুল ব'লে গ্রহণ করলেন।

জিন্নার নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক মুসলিম নেতা দিল্লীতে মিলিত হয়ে কংগ্রেসের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁরা কতিপয় শর্তে কেন্দ্রে ও প্রদেশে যুক্ত নির্বাচনমণ্ডলকে (joint electorate) স্বীকার ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। শর্তগুলি ছিল : (১) সিন্ধুকে পৃথক একটি প্রদেশ করতে হবে ; (২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্থানকে অন্যান্য প্রদেশের সমমর্যাদা দিতে হবে। (৩) পাঞ্জাব ও বোম্বাইয়ে অধিবাসীসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে ; (৪) কেন্দ্রে মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের দিতে হবে। কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে যে ব্রিটিশবিরোধী যুক্তফ্রণ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মুসলিম নেতাদের এই সকল প্রস্তাবকে মোটামুটি গ্রহণ করেছিলেন। ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ পুনরায় প্রশস্ত হয়েছিল।

সাইমন কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষিত হওয়ায় এবং তাতে

ভারতীয়দের কাউকে স্থান না দেওয়ায়, নরমপন্থী ও উদারনৈতিক রাজনৈতিক নেতারাও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তেজবাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে লিবার্যাল ফেডারেশন সাইমন কমিশনের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। হিন্দু মহাসভাও সাইমন কমিশনকে বয়কট করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। মুসলিম লীগ ঐ বৎসর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। স্যার মহম্মদ শফির নেতৃত্বে লাহোরে একাংশের এবং মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে কলকাতায় অপরাংশের অধিবেশন বসেছিল। লাহোরে অনুষ্ঠিত সভায় সাইমন কমিশনকে স্বাগত জানানো হ'লেও লীগের কলকাতা অধিবেশনে সাইমন কমিশনকে বয়কটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে সাইমন কমিশনকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

তদানীন্তন ভারতসচিব বার্কেনহেড, যিনি সাইমন কমিশনের নিয়োগ করেছিলেন, বলেছিলেন, "আমি যে তিন বছর ভারতসচিব হয়েছি, সেই তিন বছরে দুবার আমি ভারতীয় সমালোচকদের সংবিধান সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে আহ্বান করেছি যাতে তাঁদের বিচার অনুযায়ী এই সংবিধানের কোন সংস্কার করা যায়। আমি আবার তাঁদের আহ্বান জানাচ্ছি।" বার্কেনহেডের এই উক্তি ভারতীয় নেতাদের কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল। এই চ্যালেঞ্জের জবাব রূপেই ভারতের একটি সংবিধান রচনার জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন আহূত হ'লো। সম্মেলন মতিলাল নেহ্‌রুর উপর একটি রিপোর্ট প্রণয়নের ভার দিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে লখ্‌নৌয়ে নেহ্‌রু রিপোর্ট আলোচনার জন্যে সর্বদলীয় সম্মেলন শুরু হ'লো। কংগ্রেস ও নরমপন্থী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতৈক্যবিধানের জন্যে মতিলাল তাঁর রিপোর্টে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-কে সুপারিশের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের তরুণ নেতারা ডোমিনিয়ন স্টেটাসের পরিবর্তে পূর্ণ-

স্বাধীনতাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে বললেন, এবং এই দাবিতে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হ'লো না এবং কংগ্রেসের মধ্যে স্বাধীনতার দাবির আদর্শকে সোচ্চার ক'রে তুলবার ইচ্ছায় তাঁরা স্বাধীনতা-সংঘ (Independence League) নামে একটি উপদল গ'ড়ে তুললেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হ'লো, তাতে প্রবীণ ও তরুণদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রাজনীতিতে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলেও গান্ধীজী ঐ বৎসরটি প্রায় আশ্রমেই কাটালেন। তিনি সর্বদলীয় সম্মেলনে বা নেহ্রু-রিপোর্ট প্রণয়নে বিন্দুমাত্র অংশগ্রহণ করেননি। যদিও নেহ্রু-রিপোর্ট সম্পর্কে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের গৌহাটি কংগ্রেসে বা ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মাদ্রাজ কংগ্রেসে কোনও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু এখন আর তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকা অসম্ভব ছিল।

৩রা ফেব্রুয়ারি (১৯২৮) সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে জাহাজ থেকে নেমেছিল এবং ভারতসফর শুরু করেছিল। সর্বত্রই জনতা তাকে কালো পতাকা ও বিক্ষোভের ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। আইনসভার সদস্যরা শুধু কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতাই বন্ধ করেননি, তাঁরা কমিশনকে সামাজিকভাবে বয়কটেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বোম্বাইয়ে পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের একটি মিছিল বেরিয়েছিল। পুলিস তার ওপর গুলী চালালো। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন দিল্লী পৌঁছলো। দিল্লী থেকে কলকাতা ও মাদ্রাজ এবং পরে আবার উত্তরে লাহোরে গেল। কলকাতায় ছাত্র ও পুলিসের মধ্যে হাতাহাতি হ'লো; মাদ্রাজে পুলিস জনতার ওপর গুলী চালালো। লাহোরে অবস্থা চূড়ান্ত

আকার ধারণ করলো। এখানে রাস্তার পাশে চৌষট্টি বছর বয়স্ক সর্ববরণ্যে জননেতা লালা লজপত রায় পথের ধারে মিছিলের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন ইংরেজ পুলিস ব্যাটন দিয়ে তাঁর বুকে আঘাত করলো। এই অমানুষিক আঘাতের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ১০ই নভেম্বর মারা গেলেন। লালাজীর মৃত্যুতে সারা দেশে ক্রোধ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। সর্বত্রই ইংরেজ-বিরোধী মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন চললো। পুলিস লাঠিচার্জ করলো, গুলী চালালো। জওহরলাল নেহ্‌রু ও গোবিন্দবল্লভ পন্থের মতো নেতারাও সেই নির্মম আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। ভারতীয় তরুণরা আবার সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়ালো, ডিসেম্বর মাসে লাহারের সহকারী পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট্‌ মিঃ সণ্ডার্স অফিস থেকে ফিরবার সময়ে সন্ত্রাসবাদীর গুলীতে নিহত হলেন। বামপন্থী চিন্তাধারা দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করলো। নবগঠিত ইয়ুথ লীগগুলি সাইমন কমিশন বয়কটে একটি মূল ভূমিকা নিলো। জওহরলাল নেহ্‌রু ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বামপন্থী তরুণ জননায়কগণ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁরা পূর্ণ স্বরাজ ও সমাজতন্ত্রের দাবিতে প্রচার করছিলেন। জওহর-লাল সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের আদর্শ ও চিত্রকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরলেন। রাশিয়া সম্পর্কে তিনি অনেকগুলি নিবন্ধও লিখলেন 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'তে। গুজরাট বিদ্যা-পীঠের ছাত্ররা গান্ধীজীর সঙ্গে বলশেভিক আদর্শ ও মতবাদ নিয়ে আলোচনা করলে তিনি বললেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিংসার উপর ভিত্তি ক'রে স্থায়ী কিছু গড়া যায় না। কিন্তু সে যাই হ'ক, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে, বলশেভিক আদর্শের পশ্চাতে অগণিত সর্বত্যাগী নরনারীর নির্মল আত্মদান রয়েছে এবং লেনিনের মতো মনীষীদের আত্মত্যাগের দ্বারা পবিত্র হয়েছে এমন কোন আদর্শ ব্যর্থ হতে পারে না। তাঁদের এই মহৎ আত্মদানের কথা চিরদিন

উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হবে এবং যতোই দিন যাবে ততোই ঐ আদর্শকে সজীব ও বিশুদ্ধ ক'রে তুলবে।"

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকী ছিল। এই সময়ে গান্ধীজী মুক্ত থাকায় সমগ্র রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তার প্রভাব ছিল অনিবার্য। ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হ'লো, তাতে গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মালব্য, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, অ্যানী বেসাণ্ট, সপ্রু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আজাদ উপস্থিত ছিলেন। ডোমিনিয়ন স্টেটাস সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গান্ধীজী নিজে উত্থাপন করলেন। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অথচ মতিলাল তাঁর রিপোর্ট সংখ্যাধিক্যে গৃহীত না হ'লে আসন্ন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে অসম্মত হলেন। এই অবস্থায় গান্ধীজী একটি আপোসের সূত্র আবিষ্কার করলেন। তিনি বললেন, যদি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নেহ্রু-রিপোর্টের সুপারিশগুলি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রহণ না করে, তবে পূর্ণ স্বাধীনতাই হবে কংগ্রেসের দাবি। তরুণ নেতারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে গান্ধীজী তাঁর সময়-সীমাকে হ্রাস ক'রে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর করলেন। কলকাতায় মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্ত সেখানে গৃহীত হ'লো, কিন্তু একবৎসরের জন্যে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবিতে কংগ্রেসকে পিছিয়ে দেওয়ায় যথেষ্ট বিরূপ আলোচনা ঘটলো। প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিকের একটি মিছিল সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে বিলম্বিত করবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো।

তরুণ ও প্রবীণ সকল নেতারাই জানতেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নেহ্রু রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণ করবে না এবং সেক্ষেত্রে বৎসরান্তে

সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের সংগ্রাম অনিবার্য। সুতরাং এই এক-বৎসর প্রকৃতপক্ষে ছিল আসন্ন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতির কাল।

গান্ধীজীর এই সময়ে ইউরোপ সফরের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় তিনি দেশত্যাগ সমীচীন মনে করলেন না। তিনি দেশের সর্বত্র খাদি প্রচারে মনোনিবেশ করলেন। খাদির তাৎপর্য যে এখনও কংগ্রেসের অনেকেই উপলব্ধি করেন নি, তা গান্ধীজী বুঝেছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন প্রতিনিধি মিলের কাপড় পরে ও খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে এসেছিলেন। ভোটাভুটির সময়ে তাঁকে চাদর পরে ভোট দিতে হয়েছিল। কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি যে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, তাতে চরখার চিহ্ন ছিল না। তাই গান্ধীজী খাদি প্রচারের মাধ্যমে বিদেশী বস্ত্রবর্জনের একটি পরিকল্পনা গ'ড়ে তুললেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গ'ড়ে তুলতে বলা হ'লো। এই স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামে ও শহরে দ্বারে দ্বারে গিয়ে বিদেশী বস্ত্রগুলি সংগ্রহ করবেন এবং খদ্দর বিক্রয় করবেন। যেখানে সম্ভব হবে, সেখানে সংগৃহীত বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করা হবে। বিদেশী বস্ত্র যারা বিক্রি করে, তারা বিদেশী বস্ত্র পরে আর যাতে না আনে সেজন্য তাদের কাছে গিয়ে জনে জনে অনুরোধ করতে হবে। বিদেশী বস্ত্রের দোকান-গুলিতে পিকেটিং করা হবে। বিদেশী বস্ত্র বয়কটের জন্যে কমিটিসমূহ গড়ে তুলতে হবে। ঐসব কমিটি বিদেশী বস্ত্র বয়কট ও খাদি ব্যবহার সম্পর্কে প্রচার চালাবে ও সংগঠন পরিচালনা করবে।

এই কর্মসূচী অনুসারে গান্ধীজী ১লা জানুয়ারি (১৯২৯) কলকাতায় খাদিভাণ্ডারের উদ্বোধন করলেন এবং গান্ধীজী স্বহস্তে খাদি বিক্রয় করলেন। এক ঘণ্টায় ৫০০০ টাকার খাদি বিক্রয় হ'লো এবং ক্রেতারা সকলে গান্ধীজীর স্বাক্ষরিত মেমো পেলো। কলকাতা থেকে গান্ধীজী আমেদাবাদে ফিরে গেলেন এবং ২রা

ফেব্রুয়ারি তিনি সিন্ধু-সফরে গেলেন। গান্ধীজী পক্ষকাল সিন্ধুতে সফর করলেন। অসংখ্য জনসভায় বক্তৃতা দিলেন এবং লালা লজপত রায় স্মৃতি-তহবিলের জন্যে সত্তর হাজার টাকা সংগ্রহ করলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্যে দিল্লী এলেন। ওয়ার্কিং কমিটি দীর্ঘ বার ঘণ্টা আলোচনার পর গান্ধীজীর পরিকল্পনা গ্রহণ করলো এবং গান্ধীজী, মতিলাল, জওহরলাল, পণ্ডিত মালব্য, ডাঃ আনসারি ও মওলানা আজাদকে নিয়ে বিদেশী বস্ত্র বয়কট কমিটি গঠিত হ'লো। দিল্লী থেকে গান্ধীজী আবার কলকাতা গেলেন। কলকাতায় ৪ঠা মার্চ তারিখে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন হয়েছিল। কলকাতার পুলিস আইন অনুসারে "খড় বা অন্যান্য জিনিস" রাস্তায় (Public Street or thoroughfare) পোড়ানো নিষিদ্ধ ছিল। তাই শ্রদ্ধানন্দ পার্কেই বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন হ'লো। গান্ধীজী সমবেত জনতার উদ্দেশে খাদির ব্যবহার ও বিদেশী বস্ত্র বর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বললেন। তারপর বিদেশী বস্ত্রের বিরাট স্তূপে অগ্নিসংযোগ করা হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসবাহিনী লাঠিচার্জ ক'রে জনতাকে সরিয়ে দিলো এবং আগুন নিবিয়ে ফেললো। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হ'লেন। গান্ধীজীর ব্রহ্মদেশ সফরের সূচীর দিন আগে থেকেই ঘোষিত ছিল। তাই পুলিস রেঙ্গুন থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মামলা মুলতুবি রাখলো। ৫ই মার্চ গান্ধীজী জাহাজে সাধারণ যাত্রীরূপে রেঙ্গুন যাত্রা করলেন। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলন নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা পেলো। দেশে সর্বত্রই বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব চললো।

গান্ধীজী যখন ব্রহ্মদেশে ছিলেন, তখন সরকার হঠাৎ ভারতীয় শ্রমিকদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ শক্তি ও ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী চেতনা সরকারকে ভীত ক'রে তুলেছিল। তাই সরকার ২০শে মার্চ তারিখে ৩৬ জন বিশিষ্ট

শ্রমিকনেতাকে গ্রেপ্তার করলো। এঁদের অর্ধেক ছিলেন কমিউনিস্ট। এঁদের রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হ'লো এবং দীর্ঘ চার বছর ধরে এঁদের বিচার চললো। এই মামলা "মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা" নামে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়েছে। গান্ধীজী এই গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা ক'রে বললেন, "সরকার যে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে, এগুলি তার লক্ষণ মাত্র।" তিনি ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে ২৪শে ফেব্রুয়ারি কলকাতার এক জনসভায় পুনরায় বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কথা বললেন। দশ মিনিট ধরে বিদেশী কাপড় সভায় বর্ষিত হ'তে লাগলো। গান্ধীজী জনসাধারণকে বিদেশী বস্ত্রগুলিকে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে বললেন। ২৭শে মার্চ তারিখে অন্য চারজন সহ গান্ধীজী শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বহ্ন্যুৎসবের অভিযোগে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হলেন। ম্যাজিস্ট্রেট শ্রদ্ধানন্দ পার্ককে public thoroughfare ব্যাখ্যা ক'রে গান্ধীজী ও তাঁর চারজন সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রত্যেককে একটাকা ক'রে জরিমানা করলেন। গান্ধীজীর অজ্ঞাতে কেউ জরিমানা দিয়ে দিলে এখানেই যবনিকা নামলো। গান্ধীজীর বিচারের দিন দেশের সর্বত্র বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব হ'লো।

সরকার যে সত্যই আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে তার প্রমাণ আরও মিললো। সরকার কেন্দ্রীয় আইনসভায় পাবলিক সেফ্‌টি বিলটি পাস করিয়ে নিতে চাইলো। কিন্তু আইনসভার সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল বললেন, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে এই বিল সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব নয়; কারণ, আলোচনাকালে বিচারাধীন (sub judice) বিষয়ের উল্লেখ ও প্রসঙ্গ উত্থাপন অনিবার্য। ৮ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট প্যাটেল বিল সম্পর্কে তাঁর রুলিং দেওয়ার সময়ে আইনসভাগৃহে কিছু লালরঙের প্রচারপত্র সহ দুটি বোমা নিক্ষিপ্ত হ'লো। বিস্ফোরণের ফলে প্রচণ্ড শব্দ ও ধোঁয়া হ'লেও কেউ বিশেষ আহত হলেন না। কিন্তু ভয়ে আইনসভার সদস্যরা পলায়ন

করলেন। বোমা নিক্ষেপের জন্যে ভগত সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত নামে দুজন যুবক গ্রেপ্তার হলেন। তাঁরা বললেন, কাউকে মারবার উদ্দেশ্যে তাঁরা বোমা নিক্ষেপ করেননি; যারা শুনতে পায় না তাদের শোনাবার জন্যে তাঁরা কিছু শব্দ করতে চেয়েছিলেন।

পরে সুরক্ষিত আইনসভায় প্রেসিডেণ্ট প্যাটেল বিলটির বিরুদ্ধে তাঁর রুলিং দিলেন। কিন্তু বড় লাট পাবলিক সেফ্‌টি বিলটিকে অর্ডিন্যান্স রূপে কার্যকর করলেন। বিচারে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হ'লো।

আকাশে অশনি-সংকেত দেখা দিলো। এদিকে বোম্বাইয়ে বস্ত্রশিল্পে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করলো। এই ধর্মঘট দুমাস ধ'রে চললো। জামসেদপুরে, পূর্ব রেলপথে, কলকাতার চটকলে ও ধাঙড়দের মধ্যে ধর্মঘট ঘটলো। সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, ব্যাপক গ্রেপ্তার ও তল্লাসি চালালো। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের বার্ষিকী দিবসে ভারতে ব্যাপক অভ্যুত্থানের কানাঘুষা সরকারী মহলে শোনা গেল। ৯ই মে তারিখে মীরাট শহর পুলিস ও সৈনিকে ছেয়ে গেল। মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ডের লেখা India in Bondage প্রবন্ধ ছাপানোর জন্যে গ্রেপ্তার হলেন। বাংলাদেশে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখবার জন্যে অর্ডিন্যান্স পাস হ'লো। সুভাষচন্দ্র সহ বহু কংগ্রেস কর্মী ভুয়া অভিযোগে দণ্ডিত হলেন। বাংলা ও পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠলো। সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সরকার বহু লোককে গ্রেপ্তার করলো এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটি মামলা ফেঁদে বসলো। জেলে বন্দীদের উপর অসহ্য নির্যাতন চালানো হ'লো। এর প্রতিবাদে বন্দীরা অনশন করতে লাগলেন। রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও যতীন দাস দুই মাসাধিক কাল অনশন করলেন। ৬১ দিন অনশন করবার ফলে যতীন দাসের

মৃত্যু হ'লো। এই ঘটনায় সমগ্র ভারতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিলো। প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক সমবেত হয়ে কলকাতায় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। ভারতের অন্যান্য স্থানেও লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হলেন।

গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল অন্ধ্র-সফরে গেলেন। অন্ধ্রে তিনি ছ সপ্তাহ সফর করলেন। কোনও প্রদেশে তিনি এর আগে এমন ব্যাপক-ভাবে সফর করেননি। ২৪শে মে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হ'লো, তাতে তিনি বললেন, আগস্টের পূর্বে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা কমপক্ষে সাড়ে সাত লক্ষ করতে হবে, এবং প্রতি গ্রামে কংগ্রেস সংগঠন গ'ড়ে তুলতে হবে। বোম্বাই থেকে গান্ধীজী সবরমতী আশ্রমে ফিরে এলেন। ১১ই জুন তিনি সবরমতী থেকে হিমালয় অঞ্চলে সফরের জন্যে বেরুলেন। ৬ই জুলাই তিনি আলমোড়া থেকে সবরমতী আশ্রমে ফিরে এলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্যে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হ'লো। কংগ্রেস সংগঠনের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করবার মতো তাঁর সময় নেই,—এই কারণ দেখিয়ে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির জন্যে জওহরলাল নেহ্‌রুর নাম প্রস্তাব করলেন। সভাপতি পদের জন্য দশটি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর নাম, পাঁচটি প্রদেশ কমিটি বল্লভভাইয়ের নাম এবং তিনটি প্রদেশ কমিটি জওহরলালের নাম প্রস্তাব করেছিল। সেপ্টেম্বর মাসে লখ্‌নৌয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হ'লো, গান্ধীজী তাতে জওহরলালের নাম বিশেষভাবে সুপারিশ করলেন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিও তা গ্রহণ করলেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল হিন্দু-মুসলিম-অনৈক্য। জিন্না ও আলি ভাইয়েরা সংগ্রাম ও ঐক্যের পথ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতির ভাব গ'ড়ে তুলবার জন্তে মওলানা আজাদ জাতীয় মুসলিম পার্টি (Nationalist Muslim Party) নামে একটি নূতন দল সৃষ্টি করলেন। শ্রীমতী নাইডু গান্ধীজীর সঙ্গে জিন্না ও আলি ভাইদের সাক্ষাৎকারের একটি ব্যবস্থা করলেন। তাঁদের সাক্ষাৎ বিশেষ ফলপ্রসূ হ'লো না। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে গান্ধীজী আগ্রায় পৌছলেন এবং সেখানে এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিলেন। তিনি সেখান থেকে কয়েকদিনের জন্যে ভূপাল দেশীয় রাজ্যে গেলেন এবং ফিরে এসে যুক্তপ্রদেশে ব্যাপকভাবে সফর শুরু করলেন। ২৪শে নভেম্বর তারিখে তাঁর যুক্তপ্রদেশ সফর শেষ হ'লো।

লাহোর কংগ্রেসকে বেশিদিন বাকী ছিল না। সরকারকে প্রদত্ত এক বছরের সুযোগের মেয়াদও উত্তীর্ণ হ'তে চলেছিল। ভারতে অশান্ত রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তৎকালীন বড়লাট লর্ড আরুইন সচেতন ছিলেন। ঐ সময়ে ইংলণ্ডে উদারনীতিক দলের সমর্থনে শ্রমিক দল সরকার গঠন করেছিল। লর্ড আরুইন পরামর্শের জন্যে ইংলণ্ডে গেলেন এবং অক্টোবরে ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে ব্রিটিশ ও ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একটি গোল টেবিল বৈঠকের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি এই বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললেন যে, ব্রিটিশ ও ভারতীয় নেতাদের মধ্যে আলোচনা-ক্রমে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, তা পার্লামেণ্টে প্রস্তাবরূপে পেশ করা হবে। তিনি ৩১শে অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত তাঁর বিবৃতিতে একথাও ঘোষণা করলেন যে, ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়াই ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য। এই ডোমিনিয়নের মর্যাদা ভারত কবে পাবে এবং তার রূপ কি হবে, সে সম্পর্কে কিছু না বলা হ'লেও এই সর্বপ্রথম লর্ড আরুইনই "ডোমিনিয়ন" শব্দটি ভারত সম্পর্কে উচ্চারণ করলেন। ভারতীয় অধিকাংশ নেতার উপর ঐ শব্দটি মন্ত্রের মতো কাজ করলো। বড়লাটের ঘোষণার সঙ্গে

সঙ্গেই দিল্লীতে প্রেসিডেন্ট প্যাটেলের গৃহে নেতাদের একটি সম্মেলন আহূত হ'লো। এই সম্মেলনে তিন ঘণ্টা আলোচনার পর গান্ধীজীর একটি খসড়া-প্রস্তাব সংশোধনসহ গৃহীত হ'লো। তাতে বৃটিশ সরকারকে তাদের সদিচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ জানালো হ'লো, তবে প্রস্তাবিত সম্মেলন সম্পর্কে কয়েকটি শর্তও আরোপ করা হ'লো: বৈঠকের সমস্ত আলোচনা ভারতের জন্য ডোমিনিয়নের পূর্ণ মর্যাদার ভিত্তিতেই করতে হবে; বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের অধিক সংখ্যায় স্থান দিতে হবে; সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে; এখন থেকে সম্ভবমতো ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা ডোমিনিয়ন শাসনব্যবস্থার আদর্শে পরিচালিত করতে হবে। প্রচারিত ইস্তাহারে গান্ধীজী, পণ্ডিত মালব্য, মতিলাল নেহ্রু, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, মিসেস অ্যানী বেসাণ্ট, ডাঃ আনসারি প্রভৃতি বহু নেতাই সই দিলেন। জওহরলাল নেহ্রু এই ইস্তাহারে প্রথমে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলেও পরে স্বাক্ষর করলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ কিচ্‌লু ও আবদুল বারি এতে স্বাক্ষর দিতে সম্মত হলেন না।

লর্ড আরুইনের 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' সংক্রান্ত ঘোষণা ইংলণ্ডে ঝড় তুললো। উদারনৈতিক সহযোগীদের চাপে শ্রমিকদলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ঘোষণা করলেন যে, তিনি ব্রিটেনের অনুসৃত নীতিতে কোনরূপ পরিবর্তন করবার কথা ভাবেন নি। তবু লাহোর কংগ্রেসের প্রাক্কালে সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা আপসের ভিত্তি রচনার চেষ্টা করা হ'লো। ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আরুইনের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন ধার্য হ'লো। ঐদিন লর্ড আরুইনের দিল্লী-প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর ট্রেনের তলায় একটি বোমা-বিস্ফোরণ ঘটলো। বড়লাট অনাহত অবস্থায় রক্ষা পেলেন। বড়লাট দিল্লীতে পৌঁছলে গান্ধীজী, বিঠলভাই প্যাটেল, মতিলাল নেহ্রু, তেজবাহাদুর সপ্রু ও মিঃ জিন্না বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করলেন। পূর্ণ ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনা হবে কিনা, গান্ধীজী সোজাসুজি বড়লাটকে প্রশ্ন করলে বড়লাট সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারলেন না। ফলে বড়লাটের সঙ্গে আর কোনও আলোচনা হ'লো না। এইভাবে কংগ্রেস নেতারা গোল টেবিল বৈঠকের ধারণা মন থেকে মুছে ফেললেন।

ডিসেম্বরের (১৯২৯) শেষ সপ্তাহে লাহোরে রাবী নদীর তীরে জওহরলাল নেহ্‌রুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। এই অধিবেশনে ত্রিশ হাজার প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। আলি ভাইয়েরা এই কংগ্রেসে যোগ দিলেও কংগ্রেস যদি অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় শুরু করে, তাতে মুসলিম জনসাধারণ অংশ নেবে না, এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করবার জন্যেই উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ আনসারি কংগ্রেসের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগত থাকলেও এই রকম সংগ্রামের ফলাফল সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তবে মওলানা আজাদ ও খান আবদুল গফর খান সংগ্রামী মুসলমানদের প্রতিনিধি-রূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ গান্ধীজীই স্থগিত রেখেছিলেন। তাই গান্ধীজীই এই কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব তুললেন। ৩১শে ডিসেম্বর কংগ্রেসে বিতর্ক হ'লো এবং পূর্ণ স্বরাজ ও তা অর্জনের পন্থা সম্পর্কে প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হ'লো। ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কণ্ঠে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" ধ্বনির মধ্যে রাবী নদীর তীরে স্বাধীনতার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড্ডীন হ'লো।

কংগ্রেস তথা ভারত পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের শপথ গ্রহণ করলো।

বিশ

সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি তার অধিবেশনে আগামী ২৬শে জানুয়ারি রবিবারকে সমগ্র দেশে পূর্ণ স্বরাজের শপথগ্রহণের দিবস রূপে ঘোষণা করলো। বড়লাট কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত প্রস্তাব ও সংগ্রামের সংকল্প সম্পর্কে ২৫শে জানুয়ারি তারিখে কেন্দ্রীয় আইনসভায় বললেন,—বর্তমান অসুবিধাগুলির সমস্যা সমাধানের জন্যে ব্রিটেন ও ভারত যাতে সহযোগিতা করে এই ইচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের থাকলেও আইন-শৃঙ্খলা ও কর্তৃত্বরক্ষার জন্যে করণীয় সকল কিছুই তিনি করবেন। মহম্মদ আলি, সওকত আলি, সাফ দাউদি ও ইসমাইল খাঁ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে মুসলমানদের কংগ্রেসের কোনও মিছিল বা বিক্ষোভ-গ্রহণে অংশ নিতে নিষেধ করলেন। কিন্তু 'স্বাধীনতা দিবস' এলো এবং সমগ্র দেশ যেন একবাক্যে চকিতে তার অন্তরের ব্যাকুল বাসনা প্রকাশ করলো। দেশের সর্বত্র হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়ে স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুগম্ভীর পরিবেশে সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করলো।

গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখতেও প্রস্তুত ছিলেন, যদি ব্রিটিশ সরকার স্বায়ত্তশাসনকে নামে না হ'লেও কার্যত স্বীকার ক'রে নিতো। তিনি সেজন্যে সরকারের কাছে এগারো দফা দাবী তুললেন। তার মধ্যে মাদক দ্রব্য বর্জন, খাজনা অর্ধেক পরিমাণে হ্রাস, লবণকর রহিতকরণ, সামরিক ব্যয়হ্রাস, বিদেশী বস্ত্রের বিরুদ্ধে সংরক্ষণমূলক শুল্কব্যবস্থা, রাজবন্দীদের মুক্তি, আত্ম-রক্ষার জন্যে বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সুবিধা দান প্রভৃতি ছিল। গান্ধীজীর দাবী ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রচণ্ড ঝড় তুললো। ভারতবর্ষেও তাঁর সমালোচকরা গান্ধীজীকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তির

দায়ে অভিযুক্ত করলেন। গান্ধীজী এখন স্বাধীনতার কথা দূরে থাক, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের কথাও বলছেন না, তিনি কিনা মাত্র এগারো দফা দাবীতেই সন্তুষ্ট হ'তে চাইছেন। গান্ধীজী বললেন, "স্বাধীনতা বলতে জনসাধারণের কাছে যদি কিছু বোঝায়, তবে তা অন্ততঃপক্ষে ঐ এগারো দফার মধ্যে আছে। কেবল ইংরেজদের চলে যাওয়াই স্বাধীনতা নয়।"

ফেব্রুয়ারি মাসে সবরমতীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসলো। এই অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে অহিংস পন্থায় যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরাই আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা ও পরিচালনা করবেন। এখন আইন অমান্য কথাটি সর্বত্র ধ্বনিত হ'তে থাকলেও কি ধরনের আকার নেবে এই আইন অমান্য আন্দোলন, সে প্রশ্ন সকলের মনেই দেখা দিলো। গান্ধীজী ইয়াং ইণ্ডিয়া পত্রিকার একটি নিবন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত দিলেন। জল আর নুন ভিন্ন এমন কোনও জিনিস নেই যার উপর কর বসিয়ে সরকার দেশের ক্ষুধার্ত, রুগ্‌ণ, বিকলাঙ্গ ও অসহায় কোটি কোটি মানুষ পর্যন্ত তার হস্ত প্রসারিত করতে পারে। মানুষের বুদ্ধি যে সর্বাধিক অমানুষিক জিজিয়া কর উদ্ভাবন করতে পারে, সেটি হ'লো এই লবণকর। এক ঘৃণা একচেটে অধিকারে কিভাবে আঘাত হানা যায়, তা-ই গান্ধীজী ভাবতে লাগলেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখলেন, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হ'লে তাঁর গ্রেপ্তার অনিবার্য। সেই অবস্থায় কি করণীয় সে সম্পর্কে তিনি বিশদ নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, তাঁর গ্রেপ্তারের পর সক্রিয় ধরনের অহিংস যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যাতে অহিংসায় বিশ্বাসী কেউ এই ক্রীতদাসত্ব থেকে দেশ মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত কারাপ্রাচীরের বাইরে মুক্ত অবস্থায় না থাকেন। তিনি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে কতকগুলি কঠোর নিয়মকানুনও ইয়াং ইণ্ডিয়াতে প্রকাশ করলেন:

সত্যাগ্রহীর হৃদয়ে ক্রোধের তিলমাত্র স্থান থাকবে না, শত্রুর ক্রোধ তাকে সহ্য করতে হবে, কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে প্রদত্ত কোনও আদেশের কাছে সে মাথা নত করবে না; সত্যাগ্রহী কাউকে অপমান বা গালাগালি করবে না, সে শত্রুকে জীবন দিয়েও অবমাননা ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তারের বা তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের প্রতিরোধ করবে না; কিন্তু কোনও সম্পত্তি যদি ন্যাসরূপে তার কাছে থাকে, তবে তা রক্ষার জন্য সে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেবে। বন্দীরূপেও তার ব্যবহার দৃষ্টান্তস্বরূপ হবে।

২রা মার্চ তারিখে গান্ধীজী বড়লাটকে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্কালে তাঁর ঐতিহাসিক পত্রটি লিখলেন। এই পত্রে তিনি ইংরেজদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং ইংরেজদের ভারত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর তীব্র ঘৃণার কথা জানালেন। তিনি ইংরেজদের প্রতি তাঁর ভালবাসার অন্যতম কারণরূপে বললেন, ইংরেজদের অকপট ও সাহসী রচনাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাকে সচেতন ক'রে দিয়েছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তাঁর তীব্র ঘৃণার কারণ রূপে তিনি বললেন, তা কোটি কোটি ভারতবাসীকে নির্লজ্জভাবে পেষণ করছে। তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালেন, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী যখন ইংলণ্ডবাসীর মাথাপিছু গড় দৈনিক আয় ছুটাকা হওয়ায় দৈনিক ১৮০ টাকা মাইনে নেন, সেখানে ভারতের বড়লাট ভারতবাসীর মাথাপিছু গড় দৈনিক আয় মাত্র ছু আনা হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক বেতন নেন ৭০০ টাকা। সমগ্র ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাই একটি শোষণব্যবস্থা। তিনি ভারতে রায়তদের শোচনীয় অবস্থার কথাও বললেন। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থার তিনি অবসান চান। তিনি একথাও বললেন, কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের সংকল্প ঘোষণা করেছে সত্য, কিন্তু নিজে পূর্ণ স্বরাজ ও ডোমিনিয়ন স্টেটাসের মধ্যে বিশেষ

পার্থক্য দেখেন না। কারণ বড় বড় ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌রা ডোমিনিয়ান স্টেটাসকে স্বাধীনতার সমতুল্য ব'লেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী ঘোষণার মধ্যে নূতন কোনও দাবী নেই।

বড়লাট দ্রুত গান্ধীজীর পত্রের উত্তর দিলেন এবং তাঁর আইন-অমান্য আন্দোলন শুরুর পরিকল্পনাতে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

গান্ধীজী তাঁর আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করবার প্রস্তাব করলেন। আশ্রম থেকে দুশ' মাইল দূরে সমুদ্রতীরে ডাণ্ডি নামে একটি গ্রামে তিনি আইন অমান্য করবেন স্থির হ'লো। আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়েই আইন অমান্য শুরু করবার কথা ঘোষিত হ'লেও ভারতের দিগ্‌দিগন্ত থেকে সত্যাগ্রহীরা স্বেচ্ছাসেবক রূপে যোগ দেওয়ার জন্যে নাম পাঠালেন। গান্ধীজী সবরমতী আশ্রমবাসী 'অভিজ্ঞ সত্যাগ্রহীদের মধ্য থেকেই তাঁর প্রথম দলটি নির্বাচিত করলেন। এই প্রথম দলে ৭৯ জন সত্যাগ্রহী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, যুক্তপ্রদেশ, কচ্ছ, সিন্ধু, কেরল, রাজপুতানা, অন্ধ্র, কর্নাটক, বোম্বাই, তামিলনাড, বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, নেপাল ও ফিজি দ্বীপের লোক। তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন মুসলমান, একজন খ্রীষ্টান ও বাকীরা হিন্দু; হিন্দুদের মধ্যে দুজন হরিজন। সত্যাগ্রহীদের বয়স ছিল ১৬ থেকে ৬১। গান্ধীজীই ছিলেন সর্ববয়োজ্যেষ্ঠ।

সবরমতী আশ্রমের সত্যাগ্রহীদের উপর আন্দোলন সূচনার দায়িত্ব ন্যস্ত হ'লেও সারা ভারতে সাজসাজ রব পড়ে গেল। গান্ধীজী তাঁর ডাণ্ডি পৌঁছা পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের অপেক্ষা করতে বললেন। সবরমতী থেকে ডাণ্ডি অভিযানপথে গান্ধীজীর বিপুল সংবর্ধনার ব্যবস্থা হ'লো। সর্দার প্যাটেল এই ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন। সরকার তাঁকে ৭ই মার্চ গ্রেপ্তার করলো। ১০ই মার্চ সোমবার গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে, বুধবার অভিযান

শুরু হবে। অগণিত মানুষ আশ্রমে উদগ্র আগ্রহ নিয়ে আসতে লাগলেন। দিনের পর দিন গান্ধীজী বারে বারে তাঁদের এই সংগ্রামের গভীর তাৎপর্য ও কর্মসূচী বুঝিয়ে বললেন।

১২ই মার্চ সকাল সাড়ে ছটায় ডাণ্ডি-যাত্রা শুরু হ'লো। গান্ধীজী তাঁর ৭৯ জন অনুচরসহ রওনা হলেন। এক বিশাল জনতা চললো তাঁর পিছুপিছু। সে দৃশ্য দেখে মতিলাল নেহ্রু বললেন রামচন্দ্রের সসৈন্যে লঙ্কাযাত্রার মতো এ ঘটনাও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বললেন, মুসার নেতৃত্বে ইহুদীদের অভিযানের কথা তাঁর মনে পড়ছে।

৬১ বৎসর বয়সেও গান্ধীজীর কর্মশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি রোজ দশ-বারো মাইল পথ হেঁটে যেতেন এবং বহু পথ-সভা করতেন। রাত্রি নটায় বিশ্রাম নিতেন। কিন্তু ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনা চলতো। তাঁর সঙ্গীদের ঘুম থেকে উঠবার বহু আগেই তিনি ঘুম থেকে উঠতেন এবং চিঠিপত্র লেখা শেষ করতেন। ছটায় প্রভাতী প্রার্থনা শুরু হ'তো। সাড়ে ছটায় আবার শুরু হ'তো যাত্রা। তাঁর সঙ্গীরা অনেকেই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছিলেন। তাই গান্ধীজী কয়েকদিন বাদে প্রতি সোমবার বিশ্রামের জন্যে নির্দিষ্ট করলেন। দশ দিনে তাঁরা শতাধিক মাইল অতিক্রম করলেন এবং সবরমতী ও ডাণ্ডির মাঝামাঝি গজরাতে গিয়ে পৌঁছলেন। মতিলাল ও জওহরলাল পথে জম্বুসরে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং মতিলাল তাঁর এলাহাবাদের বিশাল বাসভবনটি জাতির উদ্দেশে দান করলেন। ঐ বাসভবনের নাম ছিল আনন্দভবন; এখন এর নামকরণ হ'লো স্বরাজভবন। ১লা এপ্রিল গান্ধীজী সুরাটে পৌঁছলেন এবং তাপ্তী নদীর তীরে প্রায় আশি হাজার নরনারীর এক জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁদের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ ক'রে লবণ আইন ভঙ্গ ক'রে ব্রিটিশ শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে

আহ্বান জানালেন। ৫ই এপ্রিল তাঁরা ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সমুদ্রতীরে ডাণ্ডিতে পৌঁছলেন। ৬ই এপ্রিল গম্ভীর পরিবেশে আইনসভার কাজ শেষ হ'লো। গান্ধীজী বললেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'লে সত্যাগ্রহীরা আব্বাস তায়েবজীর নেতৃত্বে চলবেন। তায়েবজী গ্রেপ্তার হ'লে নেতৃত্ব করবেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

প্রার্থনাসভা-শেষে গান্ধীজী ও তাঁর সঙ্গীরা সমুদ্রে স্নান করলেন। সাড়ে আটটায় গান্ধীজী কিছুটা স্বভাবজ লবণ হাতে তুলে নিলেন। সমবেত অগণিত মানুষের জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমতী নাইডু তাঁকে "আইনভঙ্গকারী" ব'লে অভিনন্দন জানালেন। ঘটনাস্থলে পুলিস উপস্থিত ছিল না। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে একটি বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয়েছে; এখন যিনি ইচ্ছা করবেন, এবং দণ্ডের ঝুঁকি নেবেন, তিনিই লবণ আইন ভঙ্গ করতে পারবেন।

গান্ধীজীর এই ঘোষণা বিদ্যুদ্‌গতিতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। এই সংকেতের জন্য উদগ্র আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল সারা দেশ। ৬ই তারিখে সরকার কাউকে গ্রেপ্তার করলো না। ৭ই এপ্রিল সারা গুজরাটে ও বোম্বাই শহরে লবণ আইন ভঙ্গ করা হ'লো; এখন আইনভঙ্গকারীদের গ্রেপ্তার শুরু হ'লো। গ্রেপ্তার শুরু হওয়ায় গান্ধীজী সরকারকে অভিনন্দন জানালেন। গান্ধীজী ৮ই এপ্রিল তারিখে আতাতে আবার লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। তাঁর আসন্ন গ্রেপ্তারের জনরব ছড়িয়ে পড়লো।

সরকার এখন কঠোরভাবে লবণ আইন ভঙ্গের প্রতিরোধে এগিয়ে এলো। শুরু হ'লো গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ, নির্মম নির্যাতন। সমগ্র জাতি নির্ভীকভাবে সকল অত্যাচার বুক পেতে নিলো। ১৪ই এপ্রিল তারিখে জওহরলাল নেহ্‌রু গ্রেপ্তার হলেন এবং জেলেই তাঁর বিচার হ'লো। বিচারে তাঁর ছমাসের কারাদণ্ড হ'লো। জওহরলাল নেহ্‌রুর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের আদেশে সমগ্র দেশ

এক নূতনতর উদ্দীপনায় মেতে উঠলো। সারা ভারতে চললো ব্যাপক গ্রেপ্তার ও লাঠিচার্জ; কলকাতায়, মাদ্রাজে ও করাচীতে চললো গুলী। জনসাধারণ লবণ-আইন ভঙ্গ ক'রেই বিরত থাকলো না। স্বেচ্ছাসেবকরা বিলাতী কাপড়ের দোকানে ও মদের দোকানে পিকেটিং করতে লাগলো। আন্দোলন কয়েক দিনের মধ্যে সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। সরকার কেন, মতিলাল নেহ্‌রুর মতো গান্ধীজীর একান্ত অনুরাগীরাও লবণ-আইন ভঙ্গের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা দেখে সকলেই স্তম্ভিত হলেন। বিঠলভাই প্যাটেল কেন্দ্রীয় আইনসভায় সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন।

কয়েকদিন আন্দোলন সুন্দর ও সুপরিকল্পিত ভাবে চললো। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা, করাচী ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে গোলযোগ দেখা দিলো। তাতে গান্ধীজী উদ্বেগ বোধ করলেন। ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে পুলিস-অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হ'লো। পেশোয়ারে গণবিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করলো। ২৮শে এপ্রিল সেখানে বিশাল শোভাযাত্রা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো। খুদা-ই-খিদ্‌মতগার বা লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নেতা খান আবদুল গফর খাঁ গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে যেখানে আটক রাখা হয়েছিল, হাজার হাজার পাঠান তা ঘিরে ধরলো এবং পেশোয়ারে বিশাল জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো। জনতাকে ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সরকার সাঁজোয়াগাড়ি পাঠালো। উত্তেজিত জনতা একটি সাঁজোয়াগাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলো। ফলে জনতার উপর নির্বিচারে গুলী চালানো হ'লো। তাতে কয়েক শত লোক হতাহত হ'লো। কিন্তু গাড়োয়ালী রাইফেলবাহিনীর দুটি পল্টনের হিন্দু সিপাইরা মুসলিম জনতার উপর গুলী চালাতে অস্বীকৃত হ'লো এবং অনেকেই অস্ত্র ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। এই ঘটনার পরে অবিলম্বে পেশোয়ার থেকে সরকার পুলিস ও সৈন্যবাহিনী

সরিয়ে নিতে বাধ্য হ'লো। ২৫শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে পর্যন্ত পেশোয়ার শহরে জনতার রাজত্ব চললো। এই সময়ে সরকার বিমানবাহিনী ও গোরা সৈন্যদের পেশোয়ারে পাঠালো। পেশোয়ারে পুনরায় ব্রিটিশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লো। গাড়োয়ালী বাহিনীর ২৭ জন সৈনিক গুরুদণ্ড পেলো।

২৭শে এপ্রিল তারিখে বড় লাট একটি অর্ডিন্যান্স পাস ক'রে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করলেন।

গান্ধীজী বললেন, "আমরা বুঝি আর না বুঝি, আমরা একটি প্রচ্ছন্ন সামরিক আইনের মধ্যে বাস করছি।" সরকারের দমননীতি কঠোর থেকে কঠোরতর হ'লো। গান্ধীজী এর নাম দিলেন "গুণ্ডারাজ"। তিনি লিখলেন, "এখন ডায়ারী ব্যবস্থাও এর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। জনসাধারণের কর্তব্য সুস্পষ্ট। দুঃসহ যন্ত্রণা-ভোগের মাধ্যমে জনসাধারণকে এই সংঘবদ্ধ গুণ্ডাতন্ত্রের জবাব দিতে হবে।" গান্ধীজী ধর্ষণাতে পুনরায় লবণ আইন অমান্যের সঙ্কল্প করলেন এবং সে বিষয়ে বড়লাটের উদ্দেশে একটি বিজ্ঞপ্তি-ও লেখা হয়ে গেল। কিন্তু এই সত্যাগ্রহ শুরু করবার আগেই ৪ঠা মে তারিখে গান্ধীজীকে অদ্ভুতভাবে গ্রেপ্তার করা হ'লো। অদ্ভুত এই কারণে যে, ইতিপূর্বে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সরকার কখনও এমন ব্যাপক প্রস্তুতি করে নি। গান্ধীজী ছিলেন ডাণ্ডি থেকে তিন মাইল দূরে কারাদি শিবিরে। রাত্রি পৌনে একটার সময়ে সুরাটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দুজন পিস্তলধারী পুলিস অফিসার এবং প্রায় ত্রিশজন রাইফেলধারী পুলিস সহ গোপনে রাত্রির অন্ধকারে গান্ধীজীর শিবির ঘেরাও করলো এবং একজন পুলিস অফিসার টর্চের আলোতে ঘুমন্ত গান্ধীজীকে জাগিয়ে তুললো। ম্যাজিস্ট্রেট জানালো, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫নং বিধি অনুসারে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। পুলিস তাঁকে একটি লরিতে ক'রে যারবেদা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে গেল। সেখান থেকে তাঁকে পুণায় অন্তরীণ রাখা হ'লো।

গান্ধীজীর এই গ্রেপ্তার ও তাঁকে অন্তরীণ রাখায় সারা ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। সর্বত্র হরতাল ও ধর্মঘট হ'লো। বোম্বাইয়ে প্রায় ষাট হাজার কাপড়ের মিলের শ্রমিক ধর্মঘট করলো। রেলওয়ে কর্মীরা বিক্ষোভে যোগ দিলো। বস্ত্রব্যবসায়ীরা ছ'দিনের জন্য একটানা হরতালের সংকল্প গ্রহণ করলো। দেশের সর্বত্র অসংখ্য বিক্ষোভ-মিছিল বেরুলো। কলকাতায় সামান্য অজুহাতে পুলিস বিক্ষোভ-মিছিলের ওপর গুলী চালালো। দিল্লীতেও গুলী চললো। পেশোয়ার শহর সামরিক বাহিনী ঘিরে রইলো। কংগ্রেসের নেতাদের পুলিস গ্রেপ্তার করলো। কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর যেখানেই ভারতীয়রা বাস করছিলেন, সর্বত্রই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হ'লো। রোমাঁ রোলাঁ-রচিত মহাত্মা গান্ধী বইখানি ইউরোপকে সচেতন ক'রে তুলেছিল। ফরাসী ও জার্মান কলেজ-গুলিতে গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ রাখবার সংবাদ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সমগ্র সভ্য দুনিয়া সচেতন হয়ে উঠলো। ইংলণ্ডে ডাঃ হোমসের নেতৃত্বে একশতজন খ্রীষ্টান যাজক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁকে একটি আপস-মীমাংসা ক'রে ফেলতে অনুরোধ জানালেন।

দেশের সর্বত্র অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও মরিয়া ভাব দেখা গেল। শহরবাসীরা শোলাপুর শহরকে সপ্তাহকাল অধিকার ক'রে রইলো এবং স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করলো। সরকার সেখানে সামরিক আইন জারী করতে বাধ্য হ'লো। ময়মনসিং, কলকাতা, করাচী, লখ্‌নৌ, মুলতান, দিল্লী, রাওলপিণ্ডি, মর্দান ও পেশোয়ারে গোলযোগ দেখা দিল। সরকার গোলযোগ দমনের জন্যে কয়েক শত সৈন্যবাহিনী, বিমানবহর, কামান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি আমদানি করতে কুণ্ঠিত হ'লো না। জুন মাসে সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৫০০ টন বোমা ফেললো। কিন্তু তাতেও নির্ভীক

পাঠানেরা ভয় পেলো না। লালকোর্তাদের সংখ্যা কয়েকশত থেকে আশি হাজারে গিয়ে পৌঁছলো। পাঞ্জাবে সরকারী দমননীতি নির্ভীক মুসলিম সংগঠন আহ্‌রর পার্টির জন্ম দিলো।

১২মে তারিখে গান্ধীজীর স্থলাভিষিক্ত নেতা আব্বাস তায়েবজী কারাদিতে লবণ আইন অমান্যের সংকল্প ঘোষণা করলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁর সহ-সত্যাগ্রহীরা পথেই বন্দী হলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আব্বাস তায়েবজীর স্থলাভিষিক্তা হলেন। তিনি ২১শে মে তারিখে দু হাজার স্বেচ্ছাসেবক সহ বোম্বাই থেকে ১০০ মাইল দূরে ধর্ষণায় পৌঁছে লবণ গোলায় হানা দিলেন। শ্রীমতী নাইডু তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদের বললেন, "তোমরা কোনও অবস্থাতেই হিংসার আশ্রয় নেবে না। তোমরা প্রস্তুত থাকবে, কিন্তু প্রতিরোধ করবে না, এমনকি আঘাত ঠেকাবার জন্যেও হাত তুলবে না।" লবণগোলাটি গভীর পরিখায় ও কাঁটাতারের বেড়ায় সুরক্ষিত ছিল। পাহারায় নিযুক্ত ছিল প্রায় চারশত দেশীয় পুলিস ও কয়েকজন ইংরেজ অফিসার। বেড়ার ভেতরে বহু রাইফেলধারী পুলিসও ছিল। সত্যাগ্রহীরা পরিখা পার হয়ে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে গিয়ে পৌঁছলে পুলিস অফিসার তাদের স্থানত্যাগ করতে নির্দেশ দিলো। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা তা উপেক্ষা ক'রে অগ্রসর হলেন। তখন পুলিস লাঠি নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সত্যাগ্রহীরা কেউ বাধা দেওয়ার জন্য একটি আঙুলও তুললেন না। সকলেই লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী হলেন। প্রথম দল এইভাবে ধরাশায়ী হ'লে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্বিতীয় দল তাঁদের স্থান পূর্ণ করলেন। এইভাবে অহিংস সংগ্রাম চললো কয়েক মাস ধরে। সত্যাগ্রহীদের রক্তে ধর্ষণার প্রান্তর রক্তাক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে গেল। শ্রীমতী নাইডু ও গান্ধীজীর পুত্র মণিলাল গ্রেপ্তার হলেন। ধর্ষণায় সত্যাগ্রহীদের এই অভূতপূর্ব নির্ভীক সংগ্রাম এবং পুলিসের এই

পৈশাচিক আক্রমণ জনৈক মার্কিন সাংবাদিক অদূরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর বিশদ বিবরণ পৃথিবীর ১৩৫০টি সংবাদপত্রে মুদ্রিত হ'লো এবং দেশে দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। অনুরূপ ভাবে ১৮ই মে তারিখে বোম্বাইয়ের নিকট ওয়াদালা লবণ গোলাতেও প্রায় পাঁচ শত সত্যাগ্রহী অহিংস সংগ্রাম করলেন। এখানে পর পর সত্যাগ্রহীরা কয়েকবার হানা দিলেন। পুলিস লাঠিচার্জ ক'রেই ক্ষান্ত হ'লো না, গুলীও চালালো। তাতেও সত্যাগ্রহীদের মনোবল ভাঙা সম্ভব হ'লো না। ১লা জুন তারিখে প্রায় পনেরো হাজার সত্যাগ্রহী ও দর্শক এই লবণ গোলায় হানা দিলেন। সত্যাগ্রহীরা পুলিস-অবরোধ-মুক্ত লবণ গোলায় প্রবেশ ক'রে লবণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। এই ধরনের লবণ গোলায় হানা কর্ণাটাক মণিকাট্টা লবণ গোলাতেও হ'লো। সেখানে পুলিসের লাঠি ও গুলি উপেক্ষা ক'রে প্রায় দশ হাজার সত্যাগ্রহী ও দর্শক প্রায় এক হাজার মণ লবণ সংগ্রহ করলেন। ভারতীয় সত্যাগ্রহী ও জনসাধারণের এই নির্ভীক দুঃখ ও মৃত্যু বরণ সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত ক'রে দিলো।

আইন অমান্য চলতে লাগলো। অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকার সচেতন ছিল। ভারতের উদারনৈতিক নেতারা বড়লাট আরুইনের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে অতি সত্বর ডোমিনিয়ন স্টেটাস সম্পর্কে আলোচনার জন্যে অনুরোধ করলেন। তাঁরা কংগ্রেসকেও আইন অমান্য বন্ধ রাখতে পরামর্শ দিলেন। এখন বড়লাট ঘোষণা করলেন যে, অক্টোবর মাসে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক বসাবার জন্যে ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে তিনি একথাও ঘোষণা করলেন যে, গত নভেম্বর মাসে সরকারের নীতি সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছেন, কোনও অবস্থাতেই বৃটিশ সরকার তা থেকে একচুলও বিচ্যুত হবেন না।

জুন মাসে এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো।

তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস বিদেশী দ্রব্যের পূর্ণ বয়কট, খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ, প্রতি সপ্তাহে লবণ আইন অমান্যকরণ, বৃটিশ ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স, জাহাজ ও অন্যান্য সংস্থাকে সম্পূর্ণ বর্জন ও মদের দোকানে পিকেটিং-এর একটি বিশদ কর্মসূচী রচনা করলো। সেই সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যেসব ভারতীয় পুলিস ও সৈন্য-বাহিনীতে কাজ করে, তাদেরও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশভাগী হ'তে আহ্বান জানালেন। পিকেটিং, খাজনাবন্ধ ও সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্য নষ্ট করবার চেষ্টা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বড়লাট দ্রুত দুটি কঠোর অর্ডিন্যান্স পাস করলেন। এ ছাড়াও আরও বহু অর্ডিন্যান্স পাস হ'লো। অর্ডিন্যান্সগুলি জারী হওয়ায় সেগুলিকে অমান্য করবার সুযোগও বাড়লো। চারিদিকে চললো সত্যাগ্রহ, মিছিল, লাঠিচার্জ, গুলী, হরতাল, ধর্মঘট, গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, গান্ধীদিবস, পেশোয়ার দিবস, গাড়োয়াল দিবস প্রভৃতির মতো দেশব্যাপী অনুষ্ঠান। বিদেশী বস্ত্র, মদ্য ও বিলাতী জিনিস বয়কট পরিপূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করলো। পিকেটিংয়ের অভিযোগে হাজার হাজার নরনারী কারাবরণ করলেন। অনেক সময় স্বেচ্ছাসেবকরা মোটর গাড়ির সামনে নিজেদের নিক্ষেপ ক'রে মানুষকে ঐ সব জিনিস ক্রয় ও ব্যবহার থেকে বিরত করলেন। প্রতিদিন প্রভাত-ফেরি চললো—ভারতের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে বিদেশী বস্ত্রের আমদানি এক-সিকিতে নেমে এলো। সিগারেটের আমদানি দাঁড়ালো ছয় ভাগের এক-ভাগে। বোম্বাইয়ে বৃটিশ মালিকানায় ১৬টি মিল বন্ধ হয়ে গেল। অন্য পক্ষে ভারতীয় মিলগুলিতে দ্বিগুণ কাজ বৃদ্ধি পেলো। খাদি ভাণ্ডারের সংখ্যা এক বৎসরে দ্বিগুণ হ'লো। ডেলি মেইল পত্রিকা লিখলো, "ল্যাংকাশায়ারের ভারতীয় বাণিজ্য

প্রায় বন্ধ হ'তে চলেছে।" সরকারের আয় হ্রাস পেলো শতকরা ৭০ ভাগ।

সরকার ৩০শে জুন কংগ্রেসের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট মতিলাল নেহ্‌রুকে গ্রেপ্তার করলো এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ব'লে ঘোষণা করলো। বন্দীতে কারাগারগুলি পূর্ণ হয়ে উঠলো; রাজবন্দীদের স্থান সংকুলানের জন্মে ফৌজদারী মামলায় দণ্ডিত গুরুতর অপরাধীদেরও ছেড়ে দিতে হ'লো। জেলেও যখন রাজবন্দীদের স্থানসংকুলান সম্ভব হ'লো না, তখন তাদের কাঁটা-তারে ঘেরা জায়গায় আটকে রাখা হ'লো। জুলাই মাসে ৬৭টি জাতীয় সংবাদপত্র ও ৫৫টি ছাপাখানা সরকারের আদেশে বন্ধ হ'লো। নবজীবন প্রেস বাজেয়াপ্ত হ'লো। 'নবজীবন' ও 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' সাইক্লোস্টাইলে ছাপা হয়ে বেরুতে লাগলো।

জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বেরুলো। এতে বড়লাট ডোমিনিয়ন স্টেটাস সম্পর্কে যে অস্পষ্ট আভাস দিয়েছিলেন, তা-ও ছিল না। এতে প্রদেশগুলিকে সামান্য কিছু সুবিধা দিতে ও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় ও কঠোর করতে বলা হয়েছিল। এতে সৈন্যবাহিনীতে বৃটিশ সৈনিক ও অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে ভারতীয় বাহিনীকে সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীন করতে সুপারিশ করা হ'লো। এই ধরনের সুপারিশগুলি ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও হতাশ করলো। পণ্ডিত মালব্য ও আনের মতো উদারনৈতিক নেতারাও কংগ্রেসের সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাবরণ করলেন।

৯ই জুলাই বড়লাট রাজ্যপরিষদ ও আইনসভার যুক্ত অধিবেশনে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সকল দলকে নিয়ে একটি বৈঠকের কথা ঘোষণা করলেন এবং বললেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস সম্পর্কে প্রদত্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি বহাল আছে। আইনসভার উদারনৈতিক ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা এম. আর. জয়াকরকে

কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে একটা আপোস-মীমাংসা ঘটাবার জন্যে ভার দিলেন। সপ্রু ও জয়াকর যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে জেলে গান্ধীজী, মতিলাল ও জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তারও ব্যবস্থা হলো। ২৩শে ও ২৮শে জুলাই সপ্রু ও জয়াকর যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সঙ্গে দীর্ঘকাল আলোচনা করলেন। গান্ধীজী মতিলাল ও জওহরলালকে একটি পত্র দিলেন। ঐ পত্র নিয়ে সপ্রু ও জয়াকর নৈনি জেলে মতিলাল ও জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দুদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনা চললো। মতিলাল বললেন, তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে, বিশেষতঃ গান্ধীজীর সঙ্গে, পরামর্শ না ক'রে কোনও চূড়ান্ত মতামত দিতে পারবেন না। ফলে মতিলাল ও জওহরলালকে যারবেদা জেলে আনা হ'লো এবং তিন দিন ধরে আলোচনা চললো। গান্ধীজী, মতিলাল ও জওহরলাল জানালেন, এ বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত ওয়ার্কিং কমিটি বা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিই দিতে পারেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা বলতে পারেন, কয়েকটি শর্ত মেনে না নিলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এই শর্তগুলি হ'লো—বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ইচ্ছা করলে ভারত বেরিয়ে আসতে পারবে, ভারতের এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে; গান্ধীজী বড়লাটকে লিখিত পত্রে যে এগারো দফা দাবীর উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলি এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধিকার সহ ভারতীয় জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে; ভারতের জাতীয় ঋণ প্রভৃতি সম্পর্কে বৃটেন যেসব দাবী করে, সেগুলির ন্যায্যতা বিচারের জন্যে ভারত নিরপেক্ষ কোনও সালিসের কাছে তাদের বক্তব্য উত্থাপন করতে পারবে। বড়লাট এইসব দাবী পত্রপাঠ অগ্রাহ্য করলেন, এবং সরকার তার দমননীতি চালিয়ে যেতে লাগলো। সারা ভারতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ হ'লো এবং কংগ্রেস নেতাদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার চললো। কংগ্রেস নেতারা আত্মগোপন

করলেন, কিন্তু আন্দোলন চলতে লাগলো। বোম্বাইয়ের মতো শহরে দুটি শাসনব্যবস্থা চালু হ'লো—একটি সরকারের ও অপরটি কংগ্রেসের।

ভারতে ইউরোপীয়রা আরও কঠোর দমননীতি অনুসরণের জন্যে চেঁচামেচি করতে লাগলো। কিন্তু বড়লাট লর্ড আরুইন ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বললেন যে, "আমরা আইন অমান্য আন্দোলনকে যতোই নিন্দা ও ঘৃণা করি না কেন, তাকে যদি আমরা খাটো ক'রে দেখি এবং ভারতীয়রা আজ যে জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে একথা স্বীকার না করি, তবে একটি মারাত্মক ভুল করবো।" বৃটিশ সরকার ইতিমধ্যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই একটি গোলটেবিল বৈঠক বসাবার জন্যে ব্যবস্থা করেছিল। ভারতে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন ও সুকঠোর দমননীতির পটভূমিতেই প্রথম গোল টেবিল বৈঠক বসলো। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর এই বৈঠকের উদ্বোধন হ'লো। এই সর্বপ্রথম ভারতীয় সমস্যা নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে ইংলণ্ডের রাজা সভাপতিত্ব করলেন। এই বৈঠকে বড়লাট কর্তৃক মনোনীত দেশীয় রাজা, বড় বড় জমিদার, বড় বড় ধনী, এবং সাম্প্রদায়িকতা-বাদী ও উদারনৈতিক কিছু নেতা উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আড়াই মাস ধ'রে বৈঠক চললো। বৃটিশ সরকারের কাছে সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কিছু আবেদন-নিবেদন পেশ করা ছাড়া এই বৈঠকের সদস্যদের কোনও অধিকার ছিল না। সাইমন কমিশনের সদস্যরা কেউ এতে অংশগ্রহণ করেন নি। ক্ষমতাশালী রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিরূপে চার্চিল এতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাইমন কমিশনের রিপোর্ট সমর্থন করলেন। বল্ডুইন তাঁর পার্টির তরফ থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি কিছু কিছু পূরণ করতে এবং বৃটেনের হাতে যাতে নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকে তার জন্যে রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করতে বললেন। প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড

"ধরি মাছ না-ছুঁই পানি" নীতি গ্রহণ করলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বৈঠক শেষ হ'লো। কিন্তু কোনও ফলোদয় হ'লো না।

ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চলতে লাগলো। মওলানা মহম্মদ আলি রাজা পঞ্চম জর্জের কাছে একটি আবেদনে বললেন, তাঁর পূর্বপুরুষ কিভাবে আমেরিকার উপনিবেশগুলি হারিয়েছিলেন, তা যেন সম্রাট স্মরণ রাখেন। মওলানা মহম্মদ আলি হিন্দু ও মুসলমানদের তাঁদের বিবাদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য একটি আবেদনও লিখলেন। কিন্তু ঐ সময় (৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৩১) লণ্ডনে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হ'লো। ২৫শে জানুয়ারি তারিখে বড়লাট কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ একটি আলোচনার ইচ্ছা জানিয়ে বিবৃতি দিলেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা মুক্তি পেলেন। ২৬শে জানুয়ারি সারা ভারতে স্বাধীনতা দিবস বিরাট উদ্দীপনার মধ্যে উদ্‌যাপিত হ'লো।

গান্ধীজী বোম্বাইয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ক'রে মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে এলাহাবাদ গেলেন। মতিলাল অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের আশা ছিল না। কংগ্রেস নেতারাও একে একে এলাহাবাদে এসে পৌঁছলেন। মতিলালকে শেষ চিকিৎসার জন্যে লখ্‌নৌ নিয়ে যাওয়া হ'লো। ৬ই ফেব্রুয়ারি সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটলো। গান্ধীজী সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন, তাঁর অবস্থা বিধবার চেয়েও খারাপ হয়েছে। কিন্তু তাঁর শোকপ্রকাশের যথেষ্ট সময় ছিল না। উদারনৈতিক নেতারা গোল টেবিল বৈঠক শেষে ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাইয়ে জাহাজ থেকে নামলেন। নেমেই তাঁরা বললেন, "ভারতের ডোমিনিয়ন স্টেটাস অর্জন সম্পর্কে আর কোনও মতদ্বৈধ নেই।" তাঁরা—শাস্ত্রী, সপ্রু ও জয়াকর—এলাহাবাদে এসে

পৌঁছলেন। ৮ই থেকে ১৪ই পর্যন্ত আলোচনা চললো এবং ওয়ার্কিং কমিটির ইচ্ছানুসারে গান্ধীজী বড়লাট লর্ড আরুইনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভার নিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী দিল্লী পৌঁছলেন এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারি লর্ড আরুইনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হ'লো।

গান্ধীজী শান্তির আপোস-আলোচনার জন্মে ন্যূনতম ছটি শর্ত দিয়েছিলেন, সাধারণভাবে সকল দণ্ড মকুব করণ, অবিলম্বে দমন-নীতির প্রত্যাহার, বাজেয়াপ্ত ধনসম্পত্তি প্রত্যর্পণ, রাজনৈতিক কারণে পদচ্যুত রাজকর্মচারীদের পুনরায় গ্রহণ, লবণ উৎপাদন এবং মদের ও বিদেশীবস্ত্রের দোকানে পিকেটিংয়ের অধিকার এবং পুলিস কর্তৃক অমানুষিক কার্যকলাপের তদন্ত ব্যবস্থা। প্রথম দিন গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাটের সাড়ে তিন ঘণ্টা ও দ্বিতীয় দিন তিন ঘণ্টা ধ'রে আলোচনা হ'লো। দুজনেই সাময়িকভাবে আলোচনা স্থগিত রাখতে চাইলেন। কারণ বড়লাট চাইলেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিবের সঙ্গে আলাপ করতে এবং গান্ধীজী চাইলেন ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে। আইন অমান্য ও সরকারী দমননীতি চলতে লাগলো। ১৯শে তারিখে গান্ধীজী বড়লাটভবন থেকে ফিরে এসে জওহরলাল নেহ্‌রু, বল্লভভাই প্যাটেল, মওলানা আজাদ ও ওয়াকিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। পরদিন প্রার্থনাসভায় লক্ষাধিক নরনারী সমবেত হয়েছিল। গান্ধীজী তাদের বললেন, "আমি এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, আলাপ-আলোচনা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে। ফলাফল কি হবে আমি বলতে পারি না। তা ভগবানের হাতে।"

কিন্তু কিছুদিন বড়লাট-ভবন থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আপোস-আলোচনার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সকলেই সন্দিহান হয়ে উঠলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

নিয়ে আলোচনা করলেন এবং নিজ নিজ প্রদেশের দিকে রওনার জন্যে প্রস্তুত হলেন। হঠাৎ ২৭শে ফেব্রুয়ারি গান্ধীজীকে আবার বড়লাট-ভবনে ডেকে পাঠানো হ'লো। বড়লাট ও গান্ধীজীর মধ্যে তিন ঘণ্টা ধ'রে আলোচনা চললো এবং আলাপ-আলোচনা যাতে বন্ধ হয়ে না যায়, সেজন্যে লর্ড আরুইন আন্তরিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তিনি কংগ্রেসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ১লা মার্চ তারিখে জানতে চাইলেন। ১লা মার্চ দুপুর আড়াইটায় গান্ধীজী বড়লাট-ভবনে গেলেন। আপোসের পথে অন্তরায় ছিল অনেক। ভারতের পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা প্রায় সকলেই ছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে আপোসের বিরুদ্ধে। তাছাড়া ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল প্রবল বিরোধিতা করছিল। চার্চিল সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, "ভারতকে হারানো আমাদের পক্ষে চূড়ান্ত ও মারাত্মক হবে। ইংলণ্ডকে একটি ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিণত করবার প্রক্রিয়া ছাড়া ও আর কিছুই হ'তে পারে না।" পুলিসের দুষ্কার্যাবলীর তদন্ত সম্পর্কেও লর্ড আরুইন সম্মত হলেন না। ফলে অবস্থা নৈরাশ্যজনক হয়ে উঠলো। গান্ধীজী বড়লাট-ভবনে কিছু খেজুর ও ছাগদুগ্ধ খেয়ে ফিরে এলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হ'লো। ইতিমধ্যে সপ্রু ও জয়াকর পুলিসের বাড়াবাড়িগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথা লর্ড আরুইনকে বোঝালেন। পরদিন মধ্যরাত্রিতে গান্ধীজী আবার বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং রাত্রি ১টার সময় প্রায় হতোদ্যম হয়ে ফিরে এলেন। পরদিন সোমবার ছিল, তাই তিনি মৌন অবলম্বন করলেন। ৩রা মার্চ বড়লাট লবণ কর হ্রাস করতে রাজী হলেন। কিন্তু বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের প্রশ্নে আলোচনা আবার ব্যর্থ হ'তে চললো। লর্ড আরুইন বারদৌলির কৃষকদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বোম্বাই সরকারকে আলোচনা করতে নির্দেশ দেবেন বললেন। তিনি পিকেটিং ও

বন্দীমুক্তি সংক্রান্ত দাবী সম্পর্কে আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গোল টেবিল বৈঠকে জানুয়ারি মাসে প্রদত্ত প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা হবে—এই ভরসা পেয়ে গান্ধীজী লণ্ডনে যেতে রাজী হলেন। তবু অন্তরায় গেল না। সরকার আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের দাবী তুললে, গান্ধীজী বললেন, তা প্রত্যাহার সম্ভব নয়, তবে তা স্থগিত রাখা হবে। বড়লাট 'স্থগিত' কথাটিতে আপত্তি করলেন। শেষ পর্যন্ত স্থগিতের পরিবর্তে 'বন্ধ রাখা' হবে শব্দ ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান হ'লো। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট হলেন না। বল্লভভাই প্যাটেল সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের দাবীতে অনড় রইলেন। জওহরলাল পূর্ণ স্বরাজের ভিত্তিতে ভিন্ন অন্য কোনও ভিত্তিতে আলোচনা চালাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটিকে রাজী করালেন।

গান্ধী-আইরুন চুক্তির দলিল ২৭শে আগস্ট (১৯৩১) সন্ধ্যা সাতটায় স্বাক্ষরিত হ'লো। বোম্বাই থেকে ২৯শে আগস্ট জাহাজ ছাড়বে। তাই আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করবার সময় ছিল না। গান্ধীজী যাতে যথাসময়ে বোম্বাইয়ে পৌঁছতে পারেন, সেজন্যে সিমলা থেকে কাল্‌কা পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা হ'লো। তিনি যাতে অন্যান্য ট্রেনগুলি ধরতে পারেন, সেজন্যেও সেগুলিকে বিলম্বিত করা হ'লো। গান্ধীজী যথাসময়ে ইংলণ্ডগামী 'রাজপুতানা' জাহাজ ধরলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে গেলেন পণ্ডিত মালব্য, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মহাদেব দেশাই, পিয়ারেলাল, দেবদাস গান্ধী, মীরাবেন প্রভৃতি। গান্ধীজী বললেন, "আমার সম্মুখে দিগন্ত যতোখানি অন্ধকার হ'তে পারে তাই। আমার শূন্যহাতে ফিরে আসবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা আছে।...তবু আমি আশা নিয়েই যাচ্ছি। ফল যাই হ'ক না কেন, তাতে জাতির পক্ষে ভালোই হবে।"

আডেনে ভারতীয়রা ও আরবরা গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করলো। আডেনের ইংরেজ রেসিডেন্ট সংবর্ধনা-সভায় জাতীয় পতাকা ব্যবহারের সম্মতি না দিলে গান্ধীজী এই অবস্থায় অভিনন্দন নিতে পারবেন না জানিয়ে একটি বাণী পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত রেসিডেন্ট নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে সংবর্ধনা-সভায় গান্ধীজী যোগ দিলেন এবং ভারতীয়রা ও আরবরা তাঁকে একটি মানপত্র ও ৩২৮ গিনির একটি তোড়া দিল। গান্ধীজী সুয়েজে পৌঁছলে মিশরের ওয়াফদ্ পার্টির পক্ষ থেকে মাদাম জগলুল পাশা ও নাহাস পাশা "ভারতের মহান নেতা আল্ মহাত্মা গান্ধী"কে অভিনন্দন জানালেন। ওয়াফদ্ পার্টিও কংগ্রেসের মতোই বৃটেনের বিরুদ্ধে মিশরের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চালাচ্ছিল।

১১ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের মার্সেঈ বন্দরে জাহাজ নোঙর করলে বিখ্যাত লেখক ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনীকার রোমাঁ রোলাঁ অসুস্থ থাকায় তাঁর ভগিনী মাদলিন রোলাঁ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ফরাসী সাংবাদিকরা গান্ধীজীর কটিবাস ও শীতবস্ত্র মাত্র পরিচ্ছদ দেখে বিস্মিত হ'লো। মার্সেঈয়ের ছাত্ররা তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানালো এবং তাঁকে 'ভারতের আধ্যাত্মিক দূত' ব'লে বর্ণনা করলো। তিনি ইংলণ্ডে নামলে তাঁর সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলি মুখর হয়ে উঠলো। অনেক সংবাদপত্রে অনেক আজগুবি কথাও প্রকাশিত হ'লো; অনেক সংবাদপত্র তাঁকে "নির্বোধ" (simpleton) ও ধাপ্পাবাজ (humbug) ব'লেও বর্ণনা করলো। গান্ধীজীকে লণ্ডনে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হ'লো। এই সংবর্ধনা-সভায় ধর্মপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দলসমূহ, শিল্প ও সাহিত্য সংস্থা-সমূহ, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও নারী সংঘের প্রায় একহাজার প্রতিনিধি যোগ দিলেন। গান্ধীজী "জাতীয় অতিথি" ব'লে বর্ণিত হলেন। কিংস্‌লে হলে তিনি আমেরিকার উদ্দেশে একটি ভাষণ দিলেন। কিংস্‌লে হল সাংবাদিক ও বেতার সংস্থার লোকে

ভ'রে গিয়েছিল। গান্ধীজী মাইকের সাম্‌নে মুখ রেখে বললেন, "এটাতেই কথা বলতে হবে?" সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে ক্যালিফর্নিয়ায় ধ্বনিত হ'লো। এইটিই গান্ধীজীর প্রথম বেতার ভাষণ। গান্ধীজী প্রায় আধঘণ্টা বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি মার্কিন জনসাধারণের কাছে ভারতীয়দের অবস্থা, তাদের সংগ্রামের পন্থা ও আদর্শ সম্পর্কে বললেন। "হিংসা নয়, রক্তপাত নয়, কূটনীতি বলতে আজকাল যা বোঝায়, তা নয়—শুধুমাত্র সত্য ও অহিংসা।" পরদিন সংবাদপত্রগুলি গান্ধীজীর সংবাদে পূর্ণ হয়ে উঠলো। যারা তাঁর সম্পর্কে বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করেছিল, তারাও তাঁর ছবিতে কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করলো।

গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনের আগেই ইংলণ্ডে শ্রমিক সরকারের স্থলে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক সংকটই ইংলণ্ডের নেতাদের ব্যস্ত রেখেছিল। গোল টেবিল বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন কমিটির ১৪ই সেপ্টেম্বর যে অধিবেশন হ'লো, তাতেই গান্ধীজী প্রথম যোগ দিলেন। ঐদিন ছিল সোমবার, গান্ধীজীর মৌন পালনের দিন। তাই অধিবেশনে তিনি কিছু বললেন না, শুধু দু-একটি লিখিত প্রশ্ন দিলেন এবং কমিটির সভাপতি লর্ড শ্যাংকি সেগুলির জবাব লিখে দিলেন। পরদিন গান্ধীজী এই কমিটির কাছে প্রথম কংগ্রেসের বক্তব্য রাখলেন। পরদিন তিনি হাউস অব কমন্‌সে শ্রমিক দলের সদস্যদের একটি সভায় ভারতের দাবী তুলে ধরলেন। তিনি ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলাপ করলেন। তিনি তাঁদের বললেন, "প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার না পেলে, আমরা যা পাবো তা স্বাধীনতা তো নয়ই, তা খুব নরম গোছের স্বায়ত্তশাসনাধিকারও নয়। বর্তমানে যেসব রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে দেশের রাজস্বের শতকরা আশীভাগ বিদেশীদের হাতে চলে যাবে এবং মাত্র

শতকরা বিশ ভাগ আমাদের হাতে থাকবে। তা দিয়ে আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির বিভাগগুলি চালাতে হবে। এধরনের স্বাধীনতা আমি ছোঁব না।" গান্ধীজী বৈঠকের যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন কমিটি ও সংখ্যালঘু-কমিটির কয়েকটি অধিবেশনেও যোগ দিলেন।

অক্টোবর মাসের শেষাশেষি ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন হ'লো। এতে রক্ষণশীলরা দলে ভারী হলেন; তবে শ্রমিক দলের নেতা র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে দ্বিতীয় জাতীয় সরকার গঠিত হ'লো। সপ্রু ও অন্যান্য ভারতীয় নেতারা ভারত সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের নীতি কি তা অবিলম্বে ঘোষণা করার জন্যে দাবী জানালেন। কিন্তু সরকার সে বিষয়ে নীরব থাকলো। ভারতীয় প্রতিনিধিদের খুশী করবার জন্যে তাঁদের বাকিংহাম প্রাসাদে রাজা-রানীর সঙ্গে করমর্দন করবার জন্যে আমন্ত্রণ করলো। গান্ধীজীকে চুপি চুপি বলা হ'লো তিনি যেন এই অনুষ্ঠানে দরবারের উপযুক্ত পোশাক পরে যান; গান্ধীজী জানালেন, তিনি তাঁর অভ্যস্ত পোশাকেই যাবেন, নইলে যাবেন না। গান্ধীজী এই অনুষ্ঠানে তাঁর অভ্যস্ত পোশাকেই গেলেন। তাঁর গায়ের পশমী শালটির ছেঁড়া অংশগুলিতে খদ্দরের তালি লাগানো ছিল। রাজা পঞ্চম জর্জের সঙ্গে গান্ধীজী সহজভাবেই আলাপ করলেন। রাজা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "আপনারা আমার ছেলেকে বয়কট করেছিলেন কেন?" গান্ধীজী বললেন, "আপনার ছেলেকে বয়কট করা হয় নি; করা হয়েছে বৃটিশ রাজত্বের প্রতিনিধিকে।" রাজা তখন বললেন যে, বিদ্রোহ চলতে দেওয়া যায় না, তাকে দমন ক'রে রাজশাসন স্থায়ী রাখা দরকার। গান্ধীজী বিনীত অথচ দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, "এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করি, তা আপনি নিশ্চয় আশা করেন না।"

৯ই নভেম্বর গান্ধীজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে এই মর্মে একটি জরুরী তার পেলেন যে, তাঁর আর ঐ বৈঠকে যোগ

দেওয়ার প্রয়োজন নেই। গান্ধীজীকে তাঁরা বাংলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতিতে অবস্থার দ্রুত অবনতির কথা জানালেন। তাই তাঁরা বললেন, গান্ধীজীর কালক্ষয় না ক'রে ভারতে ফেরা প্রয়োজন। এদিকে বৈঠকে প্রায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনও সমাধান হচ্ছিল না। সংখ্যালঘু কমিটিতে ও কমিটির বাইরে সকল আলাপ-আলোচনাই ব্যর্থ হ'লো। ডাঃ আম্বেদকর তপশীলভুক্ত হিন্দুদের জন্য নির্বাচন-ক্ষেত্র দাবী করলেন। শিখ ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ও অনুরূপ দাবী করলো। প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড ১৩ই নভেম্বর তাঁর ভাষণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির দাবীকেই সমর্থন করলেন। গান্ধীজী বললেন, ভারতীয় প্রতিনিধিরা কি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সাধনের জন্যই এই ছ হাজার মাইল পথ ছুটে এসেছেন ?

২৮শে নভেম্বর বৈঠকের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হ'লো। এতে ম্যাকডোনাল্ড সভাপতিত্ব করলেন। গান্ধীজী এই অধিবেশনে দুপুর রাত্রিতে প্রায় সত্তর মিনিট বক্তৃতা দেন। এটি তাঁর অন্যতম স্মরণীয় বক্তৃতা। কিন্তু তাঁর এই বক্তৃতা বিফল হ'ল। তিনি নিজেও বললেন; "আমার আজকের এই বক্তৃতা যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারবে, আমি তা মনে করি না। সম্ভবত সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়ে গেছে।"

১লা ডিসেম্বর র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড গোল টেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে বললেন, তাঁর সরকার জানুয়ারি মাসে ঘোষিত তাঁদের নীতিতেই অবিচল আছেন। তাঁরা সর্বভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দ্বারাই ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হ'তে পারে মনে করেন। অর্থাৎ অবস্থা যথাপূর্বই রইলো।

গান্ধীজী শূন্যহাতে ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে ভারতে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। গান্ধী-আরুইন

চুক্তির শর্তগুলি কংগ্রেসের দিক থেকেই পালিত হয়েছিল— সরকার তা পদে পদে লঙ্ঘন করছিল। আগের মতোই দমন-নীতি কঠোর ছিল। যুক্তপ্রদেশ ও বাংলার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। হিজলি বন্দীশিবিরে গুলীচালনার ফলে দু'জন বন্দী নিহত এবং বিশজন বন্দী আহত হয়েছিল। বাংলাদেশের ক্রোধ সন্ত্রাসবাদীদের উৎসাহ দিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফুর খান গ্রামে গ্রামে ঘুরে পাঠানদের যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলছিলেন। পেশোয়ারে লালকোর্তাদের শিক্ষাশিবির খোলা হয়েছিল। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দরবারে খান আবদুল গফুর খান ও তাঁর ভাই ডাঃ খান সাহেবকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁরা দরবারে যোগ দিতে অস্বীকার করলে সরকার অবিলম্বে অর্ডিন্যান্স পাশ করে খান আবদুল গফুর খান ও তাঁর সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করলো। যুক্তপ্রদেশে সম্ভাবিত খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের প্রতিরোধ-কল্পে সরকারী অর্ডিন্যান্স পাশ হ'লো এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও যুক্তপ্রদেশের কৃষাণ আন্দোলনের নেতা জওহরলাল নেহ্‌রুকে এলাহাবাদ শহরের বাইরে না যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হ'লো। তাঁর পক্ষে সভাসমিতিতে ভাষণ দেওয়া ও সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়া বা কিছু লেখা নিষিদ্ধ হ'লো। জওহরলাল এই আদেশ অমান্য ক'রে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে বোম্বাই রওনা হ'লে তিনি পথে গ্রেপ্তার হলেন।

গান্ধীজী বোম্বাইয়ে নেমেই বললেন, এইসব অর্ডিন্যান্স ও নিষেধাজ্ঞাকে তিনি কংগ্রেসকে যুদ্ধে আহ্বান ব'লেই মনে করেন। তিনি সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ ও সরকারী দমননীতির কঠোর নিন্দা করলেন। তিনি আজাদ ময়দানে এক জনসভায় বললেন, ক্ষীণতম আশা থাকলেও তিনি আপোসের জন্যে আলোচনা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু তাতে যদি তিনি ব্যর্থ হন, তবে তিনি

জনসাধারণকে তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান জানালেন। তিনি কালবিলম্ব না ক'রে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ব'সে সমস্ত পরিস্থিতি আলোচনা করলেন। সদস্যদের অধিকাংশই এই মত প্রকাশ করলেন যে, সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছে; এই অবস্থায় আলাপ-আলোচনা চালানোর উপযোগিতা নেই। গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে অধিকাংশ সদস্যই তাতে আপত্তি করলেন এবং বড়লাটকে কংগ্রেসের মনোভাব জানিয়ে তার পাঠাবার জন্যে গান্ধীজীকে অনুরোধ করা হ'লো। গান্ধীজী বড়লাটকে প্রেরিত তারে জানালেন যে, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে অর্ডিন্যান্স জারী ও গুলীচালনা প্রভৃতি থেকে তিনি কি বুঝবেন যে কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবসান হয়েছে। দুদিন বাদে বড়লাটের জবাব এলো। বড়লাট জানালেন, গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে অর্ডিন্যান্স জারি ও অন্যান্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে। গান্ধীজী ঐ সময় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্যে ভারতে অনুপস্থিত থাকায়, কংগ্রেসের কার্যসমূহের দায়িত্ব থেকে মুক্ত বলা হ'লো। তবে ভারত সরকার বৃটিশ সরকারের অনুমোদন নিয়ে বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে, সে সম্পর্কে বড়লাট গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করতে অস্বীকার করলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি বড়লাটকে লেখা একটি উত্তরে গান্ধীজী জানালেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংবিধানের প্রশ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেছে। কংগ্রেস দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চাইছে, বড়লাটের এই অভিযোগও তিনি অস্বীকার করলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, বড়লাটের জবাব থেকে বোঝা যায়, সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের

সহযোগিতা আর সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে বিদেশী বস্ত্র বর্জন, মদের দোকানে পিকেটিং ও বিবেকবিরোধী আইনগুলিকে অমান্য করায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতে কংগ্রেস আহ্বান জানালো। প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা কংগ্রেসের দাবীর দিক থেকে সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক ও অপ্রচুর। কংগ্রেস আবার আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করছে বলে জানিয়ে সরকার কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করলো এবং ৪ঠা জানুয়ারি শেষ রাত্রিতে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলো। গান্ধীজীকে বোম্বাই থেকে যারবেদা জেলে নিয়ে গিয়ে সেখানেই আটক রাখা হলো। ঐদিনই বল্লভভাই প্যাটেলও গ্রেপ্তার হলেন এবং বিচারে জওহরলালের দু' বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে আরও চারটি অর্ডিন্যান্স পাশ হ'লো। নাগরিক অধিকার ব'লে আর কিছু রইলো না। ইচ্ছামতো গ্রেপ্তার ও আটক এবং ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার অবাধ অধিকার দেওয়া হ'লো।

বল্লভভাই গ্রেপ্তার হওয়ায় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁকে ৫ই জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হ'লো। তাঁর স্থলে ডাঃ আনসারি কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। তাঁকেও ৮ই জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হ'লো। ১০ই জানুয়ারির মধ্যে ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। কংগ্রেস নিষিদ্ধ ঘোষিত হ'লো। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সকল সংস্থাই বেআইনী ঘোষিত হ'লো। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রায় সাত হাজার ব্যক্তি কারান্তরালে গেলেন। নূতন অর্ডিন্যান্স-বলে অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের অপরাধের জন্য তাদের অভিভাবকদের দণ্ডের ব্যবস্থা হ'লো। সরকার নির্বিচারে ধন-সম্পত্তি, বাসগৃহ, আসবাবপত্র, মোটর প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করতে লাগলো। কারাগারে রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের সীমা রইলো না। সাধারণ কয়েদীরা যে সুযোগ-সুবিধা পায়, তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হ'লো।

তা সত্ত্বেও বিদেশী বর্জন, পিকেটিং ও আইন অমান্য আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলতে লাগলো। বহু স্থানে অভ্যুত্থান, ধর্মঘট ও হাঙ্গামা ঘটলো। জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে প্রায় আশী হাজার লোক জেলে গেলেন। অনেক স্থানে শোভাযাত্রীদের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ বাধলো। জওহরলালের বৃদ্ধা মাতাও পুলিসের নিদারুণ আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। কংগ্রেস নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দিল্লীতে চাঁদনি চকে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। এই অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। তিনি দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার হলেন। অধিবেশনে প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। পুলিস তাঁদের মধ্যে ১৮০ জনকে গ্রেপ্তার করলো এবং লাঠিচার্জ ক'রে সভা ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলো।

পৌরসভাগুলিতে যেখানে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উড়তো, সেখানে সরকার ইউনিয়ন জ্যাক উড়াতে পৌরকর্তৃপক্ষকে বাধ্য করলো। এই সংগ্রামে যুক্তপ্রদেশ, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সর্বাধিক নিপীড়ন সইলো। প্রায় সকল প্রদেশেই পাইকারী জরিমানা ধার্য হ'লো। বাংলাদেশে নরনারী এবং বালক-বালিকাদের তাদের পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে বেরুবার নিয়ম চালু হ'লো। সান্ধ্য আইন, সূর্যাস্ত আইন জারী হ'লো। সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ ও অভিযান দেখিয়ে মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করা হ'লো। বহু স্থানে পাইকারী জরিমানা আদায়ের জন্য স্থায়িভাবে পুলিস মোতায়েন রাখা হ'লো। সাইকেল চড়া বেআইনী হ'লো; নিজ নিজ গতিবিধি থানায় জানাবার হুকুম এলো। নির্যাতন ও নিপীড়ন চললো নির্বিচারে। এই দুঃসহ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীরা নীরব রইলো না। তারাও সুযোগ মতো প্রতিশোধ নিলো। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে সরকার দমননীতিকে কঠোর থেকে কঠোরতর করলো।

এই নৃশংস দমননীতি চালিয়েই সরকার ক্ষান্ত হ'লো না। ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" নামে কুখ্যাত ব্যবস্থা চালু করবার সিদ্ধান্ত নিলো: এতে হিন্দু সম্প্রদায়কে বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত হিন্দু নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে তাদের জন্যেও পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্রের ব্যবস্থা হ'লো। গান্ধীজী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরকে পত্র দিলেন। ১৬ই এপ্রিল স্যার স্যামুয়েল হোরের জবাব এলো। তিনি গান্ধীজীকে স্তোকবাক্য দিলেন। কিন্তু ১৭ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে বললেও বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্রের ব্যবস্থা হ'লো। তপশীলভুক্ত হিন্দুদের এখন পৃথক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে তাদের জন্যেও পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্রের ব্যবস্থা হ'লো। তাদের জন্যে কেবল সংরক্ষিত আসনগুলিই রইলো না, তারা সেই সঙ্গে সাধারণ নির্বাচন-ক্ষেত্রগুলিতেও ভোট দেওয়ার অধিকার পেলো। গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা ভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। চারিদিক থেকেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রদের জন্য দাবী এলো। তপশীলভুক্ত হিন্দুদের নেতা এম. সি. রাজা ১৩ই সেপ্টেম্বর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নিন্দা ক'রে বিবৃতি দিলেন। ডাঃ আম্বেদকর ছাড়া অন্যান্য তপশীলভুক্ত নেতারাও শ্রীরাজাকে সমর্থন জানালেন। কিন্তু আম্বেদকর গান্ধীজীর ঘোষণাকে 'রাজনৈতিক ধাপ্পা' বলে বর্ণনা ক'রে পৃথক নির্বাচনক্ষেত্রের দাবীতে অনড় রইলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রদের দাবীতে সভা হ'লো। কিন্তু বৃটিশ সরকার অনড় রইলো তার সিদ্ধান্তে।

১৯শে তারিখে বোম্বাইয়ে হিন্দু নেতৃ-সম্মেলন হ'লো। এই সম্মেলনে সপ্রু, জয়াকর, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এম. সি. রাজা, ডাঃ আম্বেদকর, স্যার চিমনলাল শীতলবাদ, এম. এস. আনে, ডাঃ মুঞ্জে, পি. বালু, কুঞ্জুরু প্রভৃতি নেতারা যোগ দিলেন এবং সভাপতিত্ব করলেন পণ্ডিত মালব্য। সভায় যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হ'লো, তাতে বলা হ'লো যে, গান্ধীজীর জীবন বাঁচাতেই হবে এবং অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ করতে হবে। ২০শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী শেষ রাত্রিতে রবীন্দ্রনাথকে একটি তারবার্তায় জানালেন যে, তিনি দ্বিপ্রহরে তাঁর কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ কামনা করলেন। কিন্তু তারবার্তা পাঠাবার আগেই রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী এসে পৌঁছলো। গান্ধীজী দ্বিপ্রহরে তাঁর বিঘোষিত অনশন শুরু করলেন।

মুহূর্তে যুগযুগান্তের অচলায়তন যেন ভেঙে পড়লো। দেশের সর্বত্র বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্যরা আলিঙ্গনবদ্ধ হ'লো এবং গান্ধীজীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা ক'রে সভাসমিতি, উপাসনা ও অনেকে অনশন করলো।

হিন্দু নেতাদের মধ্যে পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চললো। ডাঃ আম্বেদকর পৃথক নির্বাচনক্ষেত্রের দাবীতে অনমনীয় রইলেন। কতিপয় নির্দিষ্ট আসনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক নির্বাচনের কথা বললেন; এতে, গান্ধীজী বললেন, যুক্ত নির্বাচন-ক্ষেত্রও থাকবে, অথচ তপশীলভুক্ত শ্রেণীগুলি নিজেদের মনোমত প্রার্থী নির্বাচন করতে পারবে। ডাঃ আম্বেদকর এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেও তিনি বেশী আসনে এই ব্যবস্থার দাবী করলেন। সপ্রু, জয়াকর, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারী, দেবদাস গান্ধী ও ঘনশ্যাম দাস বিড়লা ২১শে তারিখে গান্ধীজীর সঙ্গে যারবেদা জেলে দেখা করলেন। গান্ধীজী সপ্রুর এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও শেষ

নেওয়ার আগে ডাঃ আম্বেদকর ও এম. সি. রাজার সঙ্গে

দেখা করতে চাইলেন। গান্ধীজী এই প্যানেল-ব্যবস্থাকে সমস্ত আসনেই সম্প্রসারিত করতে বললেন।

পণ্ডিত মালব্যের বাসভবনে নেতারা আবার মিলিত হলেন। প্যানেল-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করতে সকলেই রাজী হলেন। এখন তপশীলভুক্ত আসনের সংখ্যা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। ম্যাক্‌ডোনাল্ড তপশীলভুক্ত শ্রেণীর জন্যে ৭১টি আসন দিয়েছিলেন। ডাঃ আম্বেদকর ১৯৭টি আসন দাবী করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যার অনুপাতে তপশীল শ্রেণীর জনসংখ্যা অনুসারে ১৪৭টি আসনে রফা হ'লো। কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্যে বৃটিশ ভারতের সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্রের শতকরা ১৮ ভাগ তপশীলভুক্ত শ্রেণীকে দেওয়া হ'লো। এই ব্যবস্থা কতদিন থাকবে, তা নিয়েও মতদ্বৈধ দেখা দিলো।

এদিকে গান্ধীজীর শরীরের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো এবং সমগ্র ভারতে উদ্বেগের ছায়া নেমে এলো। নেতারা দ্রুত পুণার যারবেদা জেলে পৌঁছলেন। ডাঃ আম্বেদকর গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। গান্ধীজী অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করছিলেন। তাঁর আলোচনা করতেও কষ্ট হচ্ছিল। তাই আলোচনা শেষ হ'লো না। শেষ পর্যন্ত নেতারা সময়-সীমা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, পরবর্তী কোনও সময়ে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা এর মীমাংসা করা যাবে। ২৪শে ডিসেম্বর চূড়ান্ত মতৈক্য হ'লো। যাতে সরকার এই মতৈক্যের ভিত্তিতে গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গের জন্যে ব্যবস্থা করেন, সেজন্য নেতারা সরকারকে অনুরোধ করলেন। তাঁরা লণ্ডনে সি. এফ. এনড্রুজ্‌কে তার ক'রে জানালেন যে, এই চুক্তি যদি অপরিবর্তিতরূপে বৃটিশ সরকার মেনে নেন, তবে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করবেন। সপ্রু, মালব্য ও আম্বেদকরও প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে জরুরী তারবার্তা পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ মন্ত্রিসভা এই চুক্তি মেনে নিতে সম্মত হ'লো ২৬শে সেপ্টেম্বর

এই মর্মে ভারতে ও ইংলণ্ডে সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হ'লো।

গান্ধীজীর জীবনরক্ষা সম্পর্কে ডাক্তাররা সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, গান্ধীজী এখন অনশন ভঙ্গ করলেও তাঁর জীবন সংশয় দূর হবে না। তাই সারা দেশে উদ্বেগের সীমা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে পুণায় গিয়ে পৌঁছলেন। বিকালে প্রতীক্ষিত সরকারী দলিল এসে পৌঁছল। পুণা চুক্তি পুরোপুরি মানা হয়েছে, এ বিষয়ে সকলে মতৈক্য প্রকাশ করলে গান্ধীজী তাঁর অনশন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত জানালেন। জেলেই ২৬শে সেপ্টেম্বর সায়াহ্নে এক মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠানের মধ্যে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে অস্পৃশ্যতা বর্জন সপ্তাহ পালিত হ'লো। সমস্ত সভাসমিতিতেই এই চুক্তির তাৎপর্য বুঝানো হ'লো এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপকে সমূলে উৎপাটনের শপথ নেওয়া হ'লো।

আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। গান্ধীজীর অনশনের পর কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর মুক্তির জন্যে ভারতীয় নেতারা আইন পরিষদ ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে দাবী জানাতে লাগলেন। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত না হওয়ায় সরকার তাতে রাজী হ'লো না। গান্ধীজী যাতে জেলে থেকে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারেন, সেজন্যে সরকার তাঁকে সুযোগ-সুবিধা দিল। গান্ধীজীকে গোঁড়া বর্ণহিন্দুদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। গান্ধীজী তাঁদের যুক্তিগুলি খণ্ডন ক'রে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন। অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন। তিনি যখন অনশন শুরু করেছিলেন,

তখন এলাহাবাদের মন্দিরগুলিতে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত মন্দিরেই যাতে অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পায়, সেজন্যে গান্ধীজী সচেষ্ট হলেন। এই দাবীতে তিনি পুনরায় অনশনের সিদ্ধান্ত করলেন। মন্দিরে প্রবেশাধিকারের দাবীতে গান্ধীজীর জীবনের ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না ব'লে ডাঃ আম্বেদকর তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলেও গান্ধীজীর ইচ্ছা ক্রমেই সংকল্পে পরিণত হ'লো।

দক্ষিণ ভারতে গুরুবায়ার মন্দির অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের একটি ঝটিকাকেন্দ্র ছিল। কারণ, এই অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় অস্পৃশ্যরা বাস করতেন এবং স্থানীয় বর্ণ-হিন্দুদের অধিকাংশই অস্পৃশ্যদের মন্দিরগুলিতে প্রবেশাধিকারের দাবী সমর্থ করছিলেন। রাজাগোপালাচারী হিন্দুদের মতামত জানবার জন্যেও এখানে একটি গণভোটের আয়োজন করেছিলেন। তাতে দেখা গিয়েছিল, মন্দির প্রবেশের সমর্থনে শতকরা ৫৬টি ভোট ও বিরুদ্ধে শতকরা ৯টি ভোট পড়েছিল। শতকরা ৮টি ভোট ছিল নিরপেক্ষ এবং শতকরা ২৭টি ভোট পড়ে নি। গান্ধীজী একটি আপোসের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তিনি বললেন, পুরোহিত প্রয়োজন মনে করলে প্রবেশার্থীকে 'শুদ্ধ' ক'রে নেবেন; অন্য কারো সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশে কারো অনিচ্ছা থাকলে তিনি অন্য সময়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ কালিকটের জামোরিন (রাজা) ও তাঁর অনুচররা আইনের আশ্রয় নিলেন। তাঁরা বললেন, এই মন্দির ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সুতরাং মন্দিরের মালিক জনমত গ্রাহ্য না-ও করতে পারেন। গান্ধীজী বললেন, গুরুবায়ার মন্দির ব্যক্তিগত মন্দির নয়; তা জনসাধারণের মন্দির, এবং প্রত্যেক হিন্দুর সেখানে উপাসনার অধিকার আছে। জামোরিন বললেন, মন্দিরের ন্যাসরক্ষক হিসাবে তাঁরা মন্দিরের চিরাচরিত প্রথা রহিত করতে পারেন না। সেজন্যে আইনের প্রয়োজন। তখন মাদ্রাজ

আইনসভায় ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় উত্থাপনের জন্যে দুটি বিল রচিত হ'লো। মাদ্রাজ আইনসভায় উত্থাপিত বিলটির জন্যে বড়লাটের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। ঐ অনুমতি সম্পর্কে বড়লাটের সিদ্ধান্ত ১৫ই জানুয়ারির (১৯৩৩) আগে পাওয়া যাবে না ব'লে জানা গেল। গান্ধীজী ২রা জানুয়ারি থেকে অনশন করবেন স্থির করেছিলেন। তিনি বড়লাটের সিদ্ধান্ত জানবার জন্যে অনশন স্থগিত রাখলেন।

গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনকেও ম্লান ক'রে দিলো। অবশ্য, আইন অমান্য আন্দোলন তখনো চলছিল। সরকার ছ সপ্তাহের মধ্যে যে আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে ব'লে মনে করেছিল, তাদের কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও তা সম্ভব হ'লো না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে লণ্ডনে পুনরায় গোল টেবিল বৈঠক বসলো। এই বৈঠকে কেবল কংগ্রেসকেই বাদ দেওয়া হ'লো না, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সি. ওয়াই. চিন্তামনের মতো উদারনৈতিক নেতাদের এবং জিন্নার মতো মুসলিম নেতাদেরও বাদ দেওয়া হ'লো। তাই বৈঠক প্রকৃত পক্ষে গোল টেবিল বৈঠকের ছায়ামাত্র ছিল।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের বার্ষিকী দিবস। অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সারা দেশে ঐ দিন উদ্‌যাপনের জন্যে ডাক দিলেন। সারা দেশে লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তারের মধ্যে ঐ দিবসটি পালিত হ'লো। কিন্তু কর্মীদের সামনে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী না থাকায় সকলেই বিভ্রান্ত বোধ করছিলেন।

২৩শে জানুয়ারি কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিল উত্থাপনের অনুমতি দিলেন বড়লাট। গান্ধীজী বললেন, মন্দির প্রবেশের দাবী এখন আর কেবল গুরুবায়ার মন্দিরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সুদূর দক্ষিণে গুরুবায়ার মন্দির থেকে তা সুদূর উত্তরে হরিদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'হরিজন' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ'লো। গান্ধীজী "হরিজন" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে বললেন, এটি তাঁর নিজের উদ্ভাবন নয়। কয়েক বছর আগে তিনি তাঁর 'নবজীবন' পত্রিকায় 'অস্পৃশ্য' শব্দটি ব্যবহার করলে কয়েকজন পত্রলেখক এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। গান্ধীজী তখন তাঁদের একটি উপযুক্ত নামকরণ করতে বললে একজন অস্পৃশ্য পত্রলেখক তাঁকে জানান যে, গুজরাটের প্রথম সন্ত-কবি 'হরিজন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নামটি গান্ধীজীর ভালো লাগে, তাই তিনি এই নাম গ্রহণ করেছেন।

মন্দির প্রবেশ নিয়ে গোঁড়া হিন্দুরা প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেন। আইনসভাতেও তাঁরা এর বিরোধিতা করতে থাকেন। বড়লাটকে এ বিষয়ে অনেকে পত্রও লেখেন। গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় বিরোধীদের সমস্ত যুক্তিতর্ক খণ্ডন করেন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের নিজ নিজ মতপ্রকাশের সুযোগ দেন। সপ্রু ও জয়াকরের মতো উদারনৈতিক নেতারা অস্পৃশ্যতাবিরোধী-আইন প্রণয়নের উপযোগিতার কথা 'হরিজন' পত্রিকায় লেখেন। তাতে গান্ধীজীর প্রতি গোঁড়া হিন্দুদের আক্রমণের ধার অনেক কমে যায়। 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী রাজনৈতিক বিষয় সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলেন এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্যে 'হরিজন' সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করে।

গোঁড়া বর্ণ-হিন্দুদের আন্দোলন ও অপপ্রচার কিন্তু চলতে থাকে। বাংলার বর্ণহিন্দুরা আইন পরিষদে পুণা চুক্তির নিন্দা ক'রে একটি প্রস্তাব পাস করে। ডাঃ আম্বেদকরও প্রস্তাবিত প্যানেল-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এইভাবে পুণা চুক্তি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ২৯শে এপ্রিল (১৯৩৩) তারিখে গান্ধীজী তাঁর সঙ্গীদের হাতে একটুকরা কাগজ দেন। তাতে তিনি তাঁর পুনরায় একুশ দিনব্যাপী অনশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং

অনশন থেকে বিরত করবার জন্যে তাঁদের কোনরূপ চেষ্টা করতে নিষেধ করেন। ১লা মে তারিখে ভারত সরকারকে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে জানান যে, তিনি ৮ই মে থেকে ত্রিসপ্তাহব্যাপী অনশনের সংকল্প করেছেন। তাঁর এই অনশনের সঙ্গে সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই; তিনি এই অনশন হরিজনদের জন্যেই করছেন।

গান্ধীজীর দুর্বল শরীরে পুনরায় অনশনের সিদ্ধান্তে সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁকে অনশন থেকে বিরত থাকবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে দেশ-বিদেশ থেকে তারবার্তা ও পত্র আসতে লাগলো। তাঁর এককালীন প্রবল প্রতিপক্ষ জেনারেল স্মাট্‌স্‌ও তাঁকে অনশন থেকে বিরত থাকতে লিখলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁদের প্রীতিপূর্ণ ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ সংকল্পে অটল রইলেন।

৮ই মে সোমবার দ্বিপ্রহরে যারবেদা জেলের আমবাগানে উপাসনান্তে গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন। ঐদিন রাত সাড়ে নটায় একটি সরকারী বিবৃতিতে বলা হ'লো যে, গান্ধীজীর অনশনের উদ্দেশ্য ও তাঁর মনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে ভারত সরকার তাঁকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গান্ধীজীকে এই সংবাদ দুঘণ্টা আগেই দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী জেলে সান্ধ্য উপাসনা শেষ ক'রে জেল থেকে বাইরে এলেন এবং পুণায় লেডী থ্যাকারসের 'পর্ণকুটি' ভবনে উঠলেন।

মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী একমাসের জন্যে আইন অমান্য বন্ধ রাখবার কথা ঘোষণা করলেন এবং সরকারকে সকল রাজ-বন্দীদের মুক্তি দিতে ও অর্ডিন্যান্সগুলি প্রত্যাহার ক'রে নিতে অনুরোধ করলেন। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস সভাপতি এম. এস. আনে অনুমোদন করলেন এবং তিনি আইন অমান্য আন্দোলন দেড়মাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্ত বহু কংগ্রেস নেতার মনঃপূত হ'লো না। ইউরোপ থেকে সুভাষচন্দ্র বসু ও বিঠলভাই প্যাটেল গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তের

সমালোচনা করলেন। হরিজন আন্দোলনের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার অনেকের কাছেই বিসদৃশ ঠেকল। অনেকে এর মধ্যে গান্ধীজীর নিজের ব্যর্থতার স্বীকৃতিই লক্ষ্য করলেন।

গান্ধীজী তাঁর বয়স ও দুর্বল শরীর সত্ত্বেও ত্রিসপ্তাহব্যাপী অনশন ব্রত উদ্‌যাপন করলেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি পুত্র দেবদাসের সঙ্গে রাজা-গোপালাচারীর কন্যা লক্ষ্মীর অসবর্ণ বিবাহ দিলেন।

তিনি একটু সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলে যেসব কংগ্রেস নেতা জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁদের নিয়ে পুণায় ১২ই থেকে ১৪ই জুলাই পর্যন্ত একটি সম্মেলন করলেন। এই সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ১৫০ জন প্রতিনিধি যোগ দিলেন। গান্ধীজী বললেন, পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়েছে বা সরকারের সুমতি হয়েছে ব'লে তিনি এই সম্মেলন ডাকেন নি। এই সম্মেলন ডেকেছেন, কারণ, তাঁর অনশন ও মুক্তিলাভের ফলে বিশেষ একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি প্রতিনিধিদের তাঁদের অভিমত অকপটে ব্যক্ত করবার জন্যে বললেন। যাঁরা কংগ্রেসের নীতির পরিবর্তন চাইছিলেন, তাঁরা সরকার রাজবন্দীদের মুক্তি দিক্ না দিক্ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করলেন। তৃতীয় দিন গান্ধীজী সম্মেলনে দীর্ঘ আশী মিনিট কাল ভাষণ দিলেন। যাঁরা বিনা শর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হ'লো। যাঁরা ব্যক্তিগত আইন অমান্যের কথা বলছিলেন, তাঁদের প্রস্তাবও বাতিল হ'লো। গান্ধীজীকে বড়লাটের সঙ্গে বিনা শর্তে সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করবার জন্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'লো।

১৫ই জুলাই গান্ধীজী শান্তিস্থাপনের উপায় সন্ধানের উদ্দেশ্যে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা ক'রে তারবার্তা পাঠালেন। বড়লাট তাঁর জবাবে সম্মেলনের উল্লেখ ক'রে জানালেন যে

কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে না নিলে সাক্ষাৎকারে কোনও লাভ হবে না। ১৭ই জুলাই তারিখে গান্ধীজী বড়লাটকে পুনরায় একটি তারবার্তা পাঠালেন। তাতে তিনি বললেন, "সরকার সংবাদপত্রে একটি ঘরোয়া সভার বেসরকারী সংবাদের উপর ভিত্তি ক'রে সাক্ষাৎকার নামঞ্জুর করবেন, তা আমি আশা করি নি। যদি সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করা হ'তো, তবে আমি দেখাতে পারতাম যে, সম্মেলনে যা আলোচনা হয়েছিল, তাতে সকলেই সম্মানজনক আপোসই চেয়েছিলেন।"

উত্তরে বড়লাটের সেক্রেটারি জানালেন, "মহামান্য বড়লাট মনে করেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন হ'লো বে-আইনী কার্য-কলাপের দ্বারা সরকারকে বাধ্য করবার উপায় মাত্র। সুতরাং যে সংস্থা ঐরূপ আন্দোলন ত্যাগ না করেছে, তার কোনও প্রতি-নিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কোন প্রশ্ন ওঠে না।"

গান্ধীজীর শান্তিপ্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় অন্য প্রকারে সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো। তাতে যাঁরা নিজ দায়িত্বে ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করতে ইচ্ছুক ও সমর্থ, তাঁরাই আইন অমান্য করবেন। কংগ্রেস সভাপতি আনের নির্দেশমতো কংগ্রেসের সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম পরিষদগুলিকে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হ'লো এবং কংগ্রেস কর্মীদের সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলা হ'লো।

২৬শে জুলাই গান্ধীজী তাঁর সবরমতী আশ্রম তুলে দেওয়ার ইচ্ছা জানালেন। তিনি বললেন, "এখন থেকে আশ্রমবাসীদের প্রত্যেকেই চলমান আশ্রমে পরিণত হবেন। তাঁরা জেলে বা জেলের বাইরে যেখানেই থাকুন, সেখানেই আশ্রমের আদর্শগুলিকে দায়িত্বের সঙ্গে কার্যে পরিণত করবেন।" তারপর গান্ধীজী আশ্রম-বাসী তেত্রিশজন সঙ্গী নিয়ে আশ্রম ত্যাগ ক'রে গ্রাম থেকে

গ্রামে অভিযানের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাঁর এই সংকল্প কার্যে পরিণত হওয়ার আগেই ১লা আগস্ট তারিখে তিনি, কস্তুরবাঈ, মহাদেব দেশাই ও অন্য তিনজন আশ্রমবাসী গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের সবরমতী জেলে রাখা হ'লো। সবরমতী জেল থেকে গান্ধীজীকে যারবেদা নিয়ে যাওয়া হ'লো। ৪ঠা আগস্ট তিনি মুক্তি পেলেন। কিন্তু পুণা শহরের সীমার বাইরে তাঁর যাওয়া নিষিদ্ধ হ'লো। গান্ধীজী এই নিষেধাজ্ঞা পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আবার গ্রেপ্তার হলেন। যারবেদা জেলে বিচারে তিনি এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে ব্যক্তিগত আইন অমান্য সুরু হ'লো। ১৪ই আগস্ট কংগ্রেস সভাপতি আনে গ্রেপ্তার হলেন। প্রথম সপ্তাহে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্যে কয়েক শত কংগ্রেস কর্মী জেলে গেলেন।

এবারে যারবেদা জেল থেকে গান্ধীজীকে হরিজন সংক্রান্ত কাজ করতে সরকার দিলো না। কৈফিয়ত স্বরূপ সরকার বললো, আগে গান্ধীজী বিনা বিচারে আটক ছিলেন, তাই ঐ সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এখন তিনি আইনত দণ্ডিত ব্যক্তি। সুতরাং এই সুযোগ তাঁকে দেওয়া যায় না। গান্ধীজী বোম্বাই সরকারকে জানালেন, হরিজনসেবার সুযোগ না পেলে তাঁর বেঁচে থাকার কোনও আগ্রহ নেই। তাই এখন থেকে তিনি শুধুমাত্র নুন ও জল খেয়েই থাকবেন। সরকার এর ফলে তাঁকে সামান্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে চাইলো। তাতে হরিজনসেবা বিন্দু-মাত্রও হবে না জেনে গান্ধীজী ১৬ই আগস্ট থেকে আমৃত্যু অনশন শুরু করলেন।

গান্ধীজী যদি রাজনৈতিক কার্যকলাপ ত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণরূপে হরিজন সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে সরকার তাঁকে মুক্তি দেবে জানালে গান্ধীজী শর্তাধীনে মুক্তি নিতে অস্বীকার করলেন।

অনশনের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হ'তে লাগলো। তখন বন্দী অবস্থায় তাঁকে সাসুন হাসপাতালে পাঠানো হ'লো। তাঁর স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটলো। বাঁচবার ইচ্ছাও যেন তিনি হারিয়ে ফেললেন। তিনি তখন জলপানও বন্ধ করলেন এবং মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। তাঁর মৃত্যু আসন্ন মনে হ'লো। তাঁর সঙ্গে যে দু-একটি জিনিস ছিল, তাও তিনি নার্সদের বিলিয়ে দিলেন। ২৩শে আগস্ট তাঁর জীবন-সংশয় যখন চরমে এলো, তখন সরকার হঠাৎ তাঁকে ছেড়ে দিলো। গান্ধীজী উপাসনান্তে সামান্য কমলার রস খেয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন। তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে 'পর্ণকুটি'তে নিয়ে যাওয়া হ'লো। গান্ধীজী বললেন, "এই মুক্তিতে আমি আনন্দ পাইনি। আমি সঙ্গীদের নিয়ে জেলে গিয়েছিলাম। অনশন ক'রে একাই বেরিয়ে এলাম। এটা লজ্জার ব্যাপার।"

এই সময় জওহরলাল মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি পুণায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ছ বছর পরে তাঁদের আবার দেখা হ'লো। তাঁদের মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনা হ'লো। গান্ধীজী ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ভারতীয়দের অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে জওহরলালের সঙ্গে একমত হলেন। ৪ঠা আগস্ট তাঁর এক বৎসরের কারাদণ্ড হয়েছিল। তিনি ঘটনাচক্রে কারাগারের বাইরে এলেও ঐ এক বৎসর কাল, অর্থাৎ ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট পর্যন্ত, আইন অমান্য আন্দোলন থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

বাইশ

হরিজনসেবা—গ্রামোদ্যোগ—কংগ্রেস ত্যাগ

গান্ধীজী সেপ্টেম্বর মাসেই ওয়ার্ধার সত্যাগ্রহ আশ্রমে চ'লে এলেন এবং হরিজন সেবক সমাজকে সবরমতী আশ্রমটি দিতে চাইলেন। তাঁর শরীর এখন অত্যন্ত দুর্বল ছিল। তাই আরও কয়েক সপ্তাহ তিনি বিশ্রাম নিলেন। তারপর সারা ভারতে "হরিজন সফরে" বেরুলেন। ওয়ার্ধার রামমন্দির থেকেই তাঁর সফর শুরু হ'লো। তাঁর অনশনের সময়ে এই মন্দিরে প্রথম হরিজনদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ওয়ার্ধার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরেও গেলেন। এই মন্দিরটির দ্বার ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হরিজনদের কাছে উন্মুক্ত ছিল। পথে ওয়ার্ধার নিকটবর্তী একটি গ্রামে, সেলুতে, তিনি একটি মন্দির হরিজনদের জন্যে উন্মুক্ত করলেন। পরের দুদিন তিনি নাগপুরে কাটালেন।

প্রথম এক সপ্তাহে তিনি প্রায় দু'শ মাইল পথ অতিক্রম করলেন এবং বহু সভা করলেন। সভাগুলিতে হরিজন সেবার জন্যে তিনি অর্থও সংগ্রহ করলেন। এই সপ্তাহে তিনি প্রায় পনের হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। এই সময়ে দুই-একটি আপাতঃদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র হ'লেও স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। বাটোলে এক গরীব লোক গান্ধীজীর সংগ্রহে একটি কড়ি দিয়েছিলেন। দরিদ্রের এই দানকে গান্ধীজী মহামূল্য বলেছিলেন। তিনি সভাস্থলে এটি নিলামে দিলে একশ এগারো টাকায় বিক্রি হ'লো। তিনি মেথরদের একটি পল্লীতে একটি সভা করেছিলেন। সেখানে শ্রীমতী অভয়ংকর নামে এক মহিলা তাঁর শেষ সম্বল হাতের দুখানি সোনার বালা তাঁকে দান করেছিলেন। এই দানও তাঁকে অভিভূত করেছিল। গান্ধীজী আবার নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল দেহ আবার যেন নববলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল।

এই সফরে তাঁর শরীরের উপর খুবই চাপ পড়ছিল। তিনি ভোর তিনটায় ঘুম থেকে উঠতেন এবং রাত দশটার আগে বিশ্রাম নিতেন না। সকাল ছটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত চলতো কেবলই তাঁর যাত্রা ও সভা। পথে হাজার হাজার মানুষ তাঁর 'দর্শন' পাওয়ার জন্য সমবেত হ'তো। সর্বত্রই তিনি মানুষকে হরিজন সেবার জন্যে দান করতে বলতেন—"এক পয়সা দাও, দু পয়সা দাও।" তাঁকে যেসব মানপত্র ও উপহার দেওয়া হ'তো, সেগুলিও তিনি সভাস্থলে নিলাম ক'রে অর্থ সংগ্রহ করতেন।

১৬ই নভেম্বর গান্ধীজী অমরাবতী পৌঁছলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি দুশ মাইল সফর করলেন, সংগ্রহ করলেন ন হাজার টাকা। অনেক সভায় সনাতনপন্থীরা গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করলো, অনেক সময় তারা মন্দিরদ্বারে শুয়ে থেকে মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশে বাধা দিলো। কিন্তু গান্ধীজী তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না। নভেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি ১৪০০ মাইল পথ অতিক্রম করলেন, এবং সংগ্রহ করলেন ৩২০০০ টাকা। এই ঝটিকা সফরে গান্ধীজীর শরীর ভেঙে পড়ছিল। তিনি ৮ই ডিসেম্বর জব্বলপুরে পৌঁছলে ডাঃ আনসারি তাঁকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, তাঁর রক্তের চাপ বেড়েছে। গান্ধীজী চারদিন জব্বলপুরে থেকে একটু বিশ্রাম নিলেন। এখানেও তিনি কয়েকটি সভায় ভাষণ দিলেন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গান্ধীজী ৬০০ মাইল পথ অতিক্রম করেন এবং ২১০০ টাকা সংগ্রহ করেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি পাঁচ দিন দিল্লীতে থাকেন। এখানে তিনি হরিজনদের বসতিগুলিতে যান। শহরের অন্যান্য অংশের তুলনায় এই বসতিগুলির শোচনীয় অবস্থা তাঁকে বিচলিত ক'রে তোলে। একমাত্র দিল্লীতেই তিনি ১২০০০ টাকা সংগ্রহ করেন এবং দেড় মাসে তাঁর তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় নব্বই হাজার টাকা।

ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি গেলেন দক্ষিণ ভারতে। তাঁর সফর শুরু হ'লো অন্ধ্রের বেজওয়াড়া থেকে। বেজওয়াড়ায়

তিনি বিভিন্ন ছয়টি স্থানে গেলেন এবং বারোটি জনসভায় বক্তৃতা দিলেন ও পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করলেন। পরদিন তিনি গেলেন মসুলিপট্টম। পথে হরিজনদের শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্ত কুটিরগুলি দেখে তিনি অভিভূত হলেন। সেখান থেকে তিনি তিনদিনের জন্যে গেলেন মাদ্রাজে। পৌরসভার মানপত্রের উত্তরে তিনি ঝাড়ুদার ব'লে নিজের পরিচয় দিলেন। মাদ্রাজে সমুদ্র-তীরে যে জনসভা হ'লো তাতে লক্ষাধিক নরনারী যোগ দিলো। মাদ্রাজে দ্বিতীয় দিনে হরিজন পল্লীগুলি ঘুরে দেখলেন। তিনি ঐদিন শ্রমিকদের কয়েকটি সভাতেও ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, অন্ততঃ শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। এই সপ্তাহে গান্ধীজী সাত শ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন এবং সংগ্রহ করেছিলেন সাতাশ হাজারেরও বেশি টাকা।

গান্ধীজী মাদ্রাজ থেকে আবার অন্ধ্রে ফিরে এলেন। গেলেন গুণ্টুর, কোকোনাড, এলোর, রাজামুন্দ্রি, ভিজগাপট্টম ও অন্যান্য স্থানে। তিনি পক্ষকাল অন্ধ্রে কাটালেন, ১০২৪ মাইল ভ্রমণ করলেন, ষাটটি জনসভায় বক্তৃতা দিলেন, ৬৮ হাজারেরও বেশী টাকা সংগ্রহ করলেন।

১৯৩৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তিনি মহীশূর রাজ্যে প্রবেশ করলেন। সর্বত্রই তিনি বললেন, "যদি বর্ণহিন্দুরা এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করে, তবে হিন্দুধর্ম যে ধ্বংস হবে, তাতে আমার কণামাত্র সংশয় নেই।" গান্ধীজী বাঙ্গালোরে তিনদিন বিশ্রাম নিলেন। তিনি বাঙ্গালোর থেকে গেলেন মালাবারে—"অস্পৃশ্যতার মানচিত্রের কৃষ্ণতম অংশে।" গান্ধীজী পালঘাটে নেমেই একটি জনসভায় অস্পৃশ্য নায়াডি সম্প্রদায়ের শোচনীয় অবস্থার কথা বললেন। সকলের জন্য ব্যবহার্য পথ নায়াডিদের কাছে রুদ্ধ; তাকে নগ্নপায়ে ক্ষেত ভেঙে সন্তর্পণে যাতায়াত করতে হয়।

আগের বার যখন তিনি মালাবারে এসেছিলেন, তখন একজন নায়াডির সঙ্গে অনেক চেষ্টায় কথা বলতে পেরেছিলেন। লোকটির সেই ভীত ত্রস্ত মুখখানি গান্ধীজী ভোলেন নি। গান্ধীজীকে বলা হ'লো, নায়াডিদের সমস্যা খুব তীব্র নয়, কারণ তাদের সংখ্যা চারশ'র বেশী হবে না। গান্ধীজী বললেন, "তারা কোটি কোটি হোক এবং সমস্ত ভারত ছেয়ে ফেলুক, তা আমরা চাই না। কিন্তু তারা সংখ্যায় কম ব'লেই আমাদের লজ্জা কম নয়। আমাদের যে মনোভাব তাদের অস্পৃশ্য ও অদ্রষ্টব্য ক'রে রেখেছে সেটাই আসল কথা। জন্মের জন্য একটি মানুষও যতোদিন অস্পৃশ্য থাকবে, ততোদিন আমাদের সংগ্রাম চলবে।"

১৬ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় তিনি ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন সফরে রওনা হলেন। ২০শে জানুয়ারি ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছলে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য সরকার ঘোষণা করলেন যে, পথঘাট, কূপ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে অবারিত করা হ'লো। গান্ধীজী সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, অস্পৃশ্যতার স্বীকৃতি আছে এমন সামান্যতম নিয়মকানুন যতোদিন থাকবে, ততোদিন সংগ্রাম চলবে।

গান্ধীজী যখন দক্ষিণ ভারতে সফরে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ১৫ই জানুয়ারি (১৯৩৪) তারিখে উত্তর বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হ'লো। এই ভূমিকম্প কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে যে ভয়ংকর ধ্বংসলীলা ঘটালো তা মানুষকে হতবাক ক'রে দিলো। ১৭ই তারিখে বিহার সরকার রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণকার্য চালাবার জন্যে মুক্ত ক'রে দিলো। ২১শে জানুয়ারি রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধীজীকে তারবার্তায় এই ভূমিকম্প মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, মজফ্‌ফরপুর ও মতিহারিতে যে প্রলয় ঘটিয়েছে, তা জানালেন। মজফ্‌ফরপুর ও মতিহারি জেলা দুটি ভূগর্ভ থেকে উত্থিত জলে ভেসে গিয়েছিল। সব জেলাগুলিতেই ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছিল; ধনসম্পদ্ ও ফসল বিনষ্ট হয়েছিল, দশ থেকে পনের হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল,

আহতদের সংখ্যা ছিল অগণিত। গান্ধীজী রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লিখলেন, "কি লিখব; কি সান্ত্বনা দেব?"

গান্ধীজী এখন বিহার ত্রাণ তহবিলের জন্যে অর্থসংগ্রহ করতে লাগলেন। ২৫শে জানুয়ারি তিনি মাদুরায় পৌঁছলেন। গান্ধীজী নীলগিরি পাহাড়ে একসপ্তাহ রইলেন। কিন্তু তাঁর বিশ্রাম ছিল না। তিনি ২রা ফেব্রুয়ারি 'হরিজন' পত্রিকায় "বিহার ও অস্পৃশ্যতা" নামে প্রবন্ধটি লিখলেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, "বিহারে যে ধরনের প্রচণ্ড বিপদ ঘটেছে, তা মানুষের মহাপাপের ফলেই ঘটে থাকে, এই ধরনের বিশ্বাসের আমিও অংশীদার। এবং এই বিশ্বাস যখন অন্তরে আসে, তখন মানুষ প্রার্থনা করে, উপাসনা করে, প্রায়শ্চিত্ত করে। আমি মনে করি, অস্পৃশ্যতা এই ধরনের একটি মহাপাপ যার ফলে মানুষ ভগবানের কাছে কঠিনতম দণ্ড লাভ করে।"

ভূমিকম্প সম্পর্কে গান্ধীজীর এই ধরনের উক্তি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হ'লো। রবীন্দ্রনাথ বললেন, তবে নিষ্পাপ শিশু ও অস্পৃশ্যরাই বা এই প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার বলি হ'লো কেন? ভগবানকে করুণাময় না ভেবে নিষ্করুণ দণ্ডদাতা ব'লে কল্পনা করাও ভুল।

গান্ধীজী বিহার ভূমিকম্পের পর আরও প্রায় সাত সপ্তাহ দক্ষিণ ভারতে কাটালেন। তিনি হরিজন তহবিলের জন্যে সাড়ে তিন লাখ টাকারও বেশী সংগ্রহ করলেন। তারপর ৯ই মার্চ বিহারে রওনা হলেন।

তিনি ১১ই মার্চ পাটনায় এসে পৌঁছলেন। পরদিন ছিল তাঁর মৌন দিবস। তবু হাজার হাজার নরনারী তাঁর বাসগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হ'লো। পরদিন গান্ধীজী পাটনার বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি দেখতে গেলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'লো না। সর্বত্রই হাজার হাজার মানুষ ভীড় ক'রে এলো, এমন কি

তিনি মোটর থেকে নামতেও পারলেন না। ১২ই মার্চ তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে মতিহারি গেলেন। পথে তিনি সকলকে বললেন, "যারা কেন্দ্রীয় ত্রাণ দপ্তর থেকে কাজ পেয়েছ, তারা ভালো ক'রে কাজ করো। যারা করছ না, তারা কাজে লেগে যাও। মন্দ কাজের জন্যে বা বিনা কাজে মজুরি দেওয়া ও মানুষকে ভিক্ষুকে পরিণত করা, একই কথা।" তিনি সকলকে মনেপ্রাণে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে বললেন। গভীর রাত্রিতে অবসন্ন দেহে তিনি মতিহারিতে গিয়ে পৌঁছলেন। পরদিন ভোরেই তিনি গ্রামাঞ্চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, চারিদিকে মরুভূমির মতো বালুকাময় প্রান্তর, বালিয়াড়ি এবং গভীর গহ্বর। মতিহারি শহরে গিয়ে দেখলেন, সমস্ত শহর ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে, কে যেন সারা শহরটা ভেঙে-চুরে মুচড়ে রেখে গেছে। গান্ধীজী বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ত্রাণকার্য দেখলেন এবং এ বিষয়ে খুঁটিনাটি পরামর্শ দিলেন। তাঁর উপস্থিতি মানুষের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও উৎসাহ সঞ্চার করলো। তিনি ছাপড়ায় একটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। ছাপড়া থেকে গেলেন মজফ্‌ফরপুর। পথে তাঁকে দেখবার জন্যে মানুষ ভীড় ক'রে এলো। তিনি যে ট্রেনে যাচ্ছিলেন, তার পাদানি-গুলিতে অসংখ্য মানুষ জীবন বিপন্ন ক'রে ঝুলে রইলো। মজফ্‌ফরপুর থেকে গেলেন দ্বারভাঙা। দ্বারভাঙা থেকে মধুবনী। তারপর ভাগলপুর। ৩রা এপ্রিল তিনি মুঙ্গেরে পৌঁছলেন। মুঙ্গের থেকে ফিরে এলেন পাটনায়। সর্বত্রই তাঁকে দেখবার জন্যে অসংখ্য মানুষের ভীড়। এক-এক স্থানে ষাট-সত্তর হাজার লোকও জমায়েত হ'তো।

৪ঠা এপ্রিল পাটনায় তাঁর সঙ্গে ডাঃ আনসারি, ভুলাভাই দেশাই ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এসে দেখা করলেন। তাঁরা আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বরাজ দলকে আবার জীইয়ে তুলতে চাইলেন। গান্ধীজী তাতে সম্মতি দিলেন এবং আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখতে পরামর্শ দিলেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল গান্ধীজী আসাম সফরে গেলেন। আসাম থেকে ফিরে তিনি ২৫শে এপ্রিল থেকে দক্ষিণ বিহারে হরিজন সফরে গেলেন। সনাতনপন্থীরা কালো পতাকা নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলো, জসিডিতে ইঁট মেরে তাঁর গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে দিলো। গান্ধীজী গাড়ি থেকে নেমে সনাতনপন্থীদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে খর রৌদ্রে একমাইল হেঁটে গেলেন। দেওঘরে পাণ্ডারা সদলবলে তাঁর পিছু নিলো। তিনি এপ্রিলের শেষাশেষি রাঁচিতে পৌছলেন। এখানে চারদিন অক্লান্তভাবে কাজের মধ্যে কাটাবার পর ৪ঠা মে উড়িষ্যা রওনা হলেন।

উড়িষ্যা সফরকালেই তাঁর পদব্রজে ঘুরে বেড়াবার সংকল্প মনে এলো। জসিডি ও দেওঘরে বিরুদ্ধবাদীদের হিংসাত্মক আচরণই তাঁকে এ বিষয়ে প্রেরণা যোগালো। ৮ই মে তারিখে পুরী থেকে তিনি পদব্রজে সফর শুরু করলেন। তিনি পূরীতে পায়ে হেঁটেই জনারণ্যের মধ্য দিয়ে সভায় গেলেন। ৯ই মে তিনি পূরী থেকে গেলেন হরিকৃষ্ণপুর। পথে সনাতনপন্থীরা তাঁকে কালো পতাকা দেখালো এবং হরিজনরা শঙ্খধ্বনি দিয়ে পুষ্পবৃষ্টি ক'রে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। হরিকৃষ্ণপুর থেকে সন্ধ্যায় তিনি গেলেন চন্দনপুর। ঐদিন তিনি দশ মাইল পথ অতিক্রম করলেন। তিনি গ্রামের উপকণ্ঠে গাছতলায় খড়ের বিছানায় রাত কাটালেন। ১০ই মে তিনি কড়ুয়া হয়ে সন্ধ্যায় বীরপুরুষোত্তমপুরে পৌছলেন। এইভাবে গ্রামের পর গ্রাম তিনি অতিক্রম করলেন। সঙ্গে কতিপয় অনুচর। অদূরে মানুষের ভীড়। সকালে কয়েক মাইল পথ হেঁটে সভা করা ও সন্ধ্যায় কয়েক মাইল পথ হেঁটে সভা করা। ১৬ই মে তিনি কটকে এসে পৌছলেন এবং নাগরিকদের একটি সভায় বক্তৃতা দিলেন। সেখান থেকে চার মাইল পথ হেঁটে স্টেশনে গেলেন। পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হচ্ছিল। তাতে যোগ দেওয়ার জন্যে ট্রেনযোগে পাটনা রওনা হলেন।

পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দু-দিনব্যাপী অধিবেশনে কংগ্রেসের আইনসভায় প্রবেশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো। গান্ধীজী ২০শে মে পদব্রজে পুনরায় উড়িষ্যা সফর শুরু করবার জন্যে পাটনা ত্যাগ করলেন। পরদিন ভোরে তিনি ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চশাপুরহাটে গান্ধী সেবা আশ্রমে গেলেন। ৫ই জুন গান্ধীজী গেলেন ভদ্রকে। শহরে হরিজনদের বসতিগুলি নোংরা থাকায় তিনি সেগুলিকে তাঁর অনুচরদের দিয়ে পরিষ্কার করালেন এবং হরিজনদেরও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে উৎসাহী ক'রে তুললেন। ৮ই জুন তারিখে তাঁর উড়িষ্যা সফর শেষ হ'লো।

গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানাবার দু মাস পরে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন সরকার কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলো। কিন্তু কংগ্রেসের বহু শাখা সংস্থার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রইলো। যেমন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লালকোর্তা দল। কংগ্রেসের সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সাধারণ সম্পাদক জওহরলাল নেহ্‌রু, খান্ আবদুল গফুর খান্ প্রভৃতি নেতারা জেলেই রইলেন। ১২ই ও ১৩ই জুন ওয়ার্ধায় এবং ১৭ই ও ১৮ই জুন বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হ'লো। তাতে কংগ্রেস কর্মীদের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলা হ'লো। বোম্বাইয়ে গান্ধীজী হরিজন পল্লীগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং সেগুলির উন্নতির জন্যে কি ব্যবস্থা করা যায়, তা নিয়ে ডাঃ আম্বেদকরের সঙ্গে আলাপ করলেন।

১৯শে তারিখে তিনি পুনায় গেলেন। পুনা পৌরসভা ২৫শে জুন তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। গান্ধীজী পৌরসভা ভবনে যাওয়ার সময়ে তাঁর গাড়ী মনে ক'রে অন্য একটি গাড়িতে সনাতনপন্থীদের কেউ বোমা নিক্ষেপ করলো। ঐ গাড়িতে পৌরসভার একজন কর্মচারী ও দুজন পুলিশ কনষ্টেবল সহ সাতজন আহত হ'লো। গান্ধীজীর গাড়িটি ঐ গাড়ির পেছনে থাকায় তিনি

আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। পুনা থেকে তিনি গেলেন আমেদাবাদে, সেখান থেকে আজমীড়ে ও ভবনগরে। সর্বত্রই তাঁকে সনাতনপন্থীরা কালো পতাকা দেখালো। ৫ই জুলাই আজমীড়ে গান্ধীজীর জন্যে আয়োজিত একটি সভায় গান্ধীজীর আসবার আগে সনাতনপন্থীদের নেতা পণ্ডিত লালনাথ উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করলে সভার লোকে লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করলো। গান্ধীজী ঘটনাস্থলে এসে এই কাজের তীব্র নিন্দা করলেন এবং পণ্ডিত লালনাথকে সভায় বক্তৃতা করার জন্যে আহ্বান জানালেন। তাঁর সভায় এই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটবার জন্যে তিনি সাতদিন অনশন করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন—তিনি ৫ই আগস্ট ওয়ার্ধায় ফিরবেন এবং ৭ই আগস্ট মধ্যাহ্ন থেকে এই অনশন শুরু হবে।

আজমীড় থেকে গান্ধীজী করাচী, লাহোর, কলকাতা, কানপুর ও লখ্নৌ ঘুরে বেনারসে পৌঁছলেন। ২৯শে জুলাই তিনি বেনারসে তাঁর ন-মাসব্যাপী হরিজন সফর শেষ করলেন। বেনারসে সনাতনপন্থীরা তাঁর ফটো দাহ করলো, গান্ধীজীকে জীবন-নাশের ভয় দেখিয়ে নোংরা ভাষায় প্ররোচনাপূর্ণ বহু প্রচারপত্র বিলি করলো। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা ও পুলিশ গান্ধীজীর নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। গান্ধীজীর বিশাল সভায় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কোনও ঘটনা ঘটলো না, কেবল সনাতনপন্থী পণ্ডিত দেবনায়কাচার্য গান্ধীজীর বক্তৃতার আগে তাঁর বক্তব্য শ্রোতাদের কাছে রাখতে চাইলেন। গান্ধীজী তাতে সানন্দে সম্মত হলেন। কিন্তু পণ্ডিত দেবনায়কাচার্য যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ায় গান্ধীজী বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। এই সময় পণ্ডিত দেবনায়কাচার্য সভায় উপস্থিত হ'লে গান্ধীজী বক্তৃতা থামিয়ে তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর বক্তব্য রাখতে বললেন। আচার্য দেবনায়কাচার্য তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করলে গান্ধীজী তাঁকে

অভিনন্দন জানালেন। পণ্ডিত মালব্যও গান্ধীজীর সমর্থনে বক্তৃতা করলেন।

গান্ধীজী ৫ই আগস্ট ওয়ার্ধায় ফিরে এলেন এবং ৭ই আগস্ট থেকে তাঁর পূর্ব-ঘোষিত সপ্তাহব্যাপী অনশন শুরু হ'লো। ১৪ই আগস্ট তাঁর অনশন ব্রত নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপিত হ'লো। কিন্তু গান্ধীজীর দুর্বল শরীর আরও দুর্বল হ'য়ে পড়লো। গান্ধীজী কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেন। এই সময়ে ভারতের আর একটি সমস্যার দিকে তিনি গভীরভাবে মনোযোগ দিলেন—গ্রামের শোচনীয় অবস্থা ও তার প্রতিকার।

গান্ধীজী ভারতের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর ক'রে গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই সঙ্গে দেখেছিলেন গ্রামের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অশিক্ষা। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি অনেক আগে পড়লেও এবং এর প্রতিকারের জন্যে তিনি আগে সচেষ্ট হ'লেও এখন এ বিষয়ে বিশেষভাবে মনযোগী হলেন।

প্রাচীন অর্থনীতির উন্নতির জন্যে তিনি সুতো কাটা একটি প্রধান উপায় ব'লে মনে করতেন। এতে বহু বেকার বা সাময়িক-ভাবে বেকার মানুষের অন্নের সংস্থান হ'তে পারে। তাই তিনি কংগ্রেসেরই একটি শাখারূপে নিখিল ভারত কাটুনি সংঘ স্থাপন করেছিলেন এবং সুতো কাটাকে কংগ্রেসের একটি অপরিহার্য আদর্শে পরিণত করেছিলেন। এখন তিনি গ্রামের অন্যান্য শিল্পের প্রতিও মনোযোগ দিলেন। আখ-মাড়া, গুড়শিল্প, ধানভানা, যাঁতার কাজ, চর্মশিল্প প্রভৃতি যাতে কলের প্রতিযোগিতায় গ্রামগুলি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায়, সেগুলি যাতে পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে, সেদিকে কর্মীদের বিশেষভাবে নজর দিতে বললেন। তিনি সকল প্রকার মুমূর্ষু গ্রামীণ শিল্পকে আবার বাঁচিয়ে তোলার জন্যে যত্নবান হ'তে বললেন। দরিদ্র গ্রামবাসীদের অন্নসংস্থানের এই উপায়গুলি যাতে

অন্তর্হিত না হয়, সেজন্যে সকলকে যত্নবান্ হতে আহ্বান জানালেন। গান্ধীজী বললেন, "একদা আমি বলেছিলাম, চরকায় স্বরাজ আছে; পরে বলেছিলাম, মাদক বর্জনেই স্বরাজ আছে। তেমনিভাবে বলব, ষোল আনা স্বদেশীতেই স্বরাজ আছে। অবশ্য, এটা যেন গল্পের সেই অন্ধদের হাতির বর্ণনা দেওয়া। তারা সবাই ঠিকই বলছিল, কিন্তু পুরোপুরি ঠিকও বলেনি। আমরা যদি আমাদের সকল প্রকার সুযোগ-সম্পদের সদ্ব্যবহার করি, তবে আমরা পৃথিবীতে সর্বাধিক ধনী দেশে পরিণত হ'তে পারবো, যা এ দেশ, আমার মনে হয়, একদিন ছিল।"

চর্মশিল্প সম্পর্কে তিনি বললেন, "চর্মশিল্প আমাদের দেশে অনাদিকাল থেকে ছিল। কবে যে এই কাজ মানুষকে ছোট করলো কে জানে। আজ এই কাজ করবার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বংশপরম্পরায় অস্পৃশ্য হয়ে আছে। সেদিনই আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে অমঙ্গলের সূচনা হয়েছে, যেদিন আমরা কাজকে ঘৃণা ও অবহেলা করতে শুরু করেছি, যারা দুনিয়ার প্রাণ, যাদের শ্রমের উপর এই দেশের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাদের নীচ শ্রেণী ব'লে আমরা মনে করেছি এবং অতি সামান্যসংখ্যক অলস মানুষ সুযোগ-সুবিধাগুলি অধিকার করেছে। তার ফলেই ভারত নৈতিক ও বৈষয়িক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

এখন গান্ধীজীর বেশির ভাগ সময় গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সমস্যা নিয়ে ব্যয়িত হ'তে লাগলো। সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্মীরা তাঁর কাছে গঠনমূলক কাজ সম্পর্কে উপদেশ পরামর্শ নেওয়ার জন্যে ওয়ার্ধায় এসে নিত্য জড়ো হ'লো।

গান্ধীজী গঠনমূলক কাজে এইভাবে আত্মনিয়োগ করায় জনরব ছড়িয়ে পড়লো যে, তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করছেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর এই জনরবের সত্যতা স্বীকার ক'রে

তিনি একটি বিবৃতি দিলেন। তিনি তাঁর কংগ্রেস ত্যাগের কারণ রূপে বললেন, তাঁর মনে হয়েছে, তাঁর ও বহু কংগ্রেস সদস্যের দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট বাড়ছে। কংগ্রেস সদস্যদের অনেকেই তাঁর নীতিতে বিশ্বাস না করলেও তাঁর প্রতি অবিচল আছেন, আনুগত্য দেখিয়ে এসেছেন। তিনি কংগ্রেসে থাকলে তাঁদের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হবে, এবং কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হবে। অন্যপক্ষে, অহিংসাই তাঁর জীবনের ব্রত ও আদর্শ। ও বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে তিনি অবাধ স্বাধীনতা চান।

বোম্বাইয়ে ২৬শে অক্টোবর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসলো। করাচী কংগ্রেসের সাড়ে তিন বৎসর পরে কংগ্রেসের এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সভাপতির ভাষণে অহিংস গণ-আন্দোলনকেই স্বাধীনতা লাভের ধ্রুব উপায় ব'লে বর্ণনা করলেন। গান্ধীজীর সুপারিশ অনুসারে এই অধিবেশনে কংগ্রেসের শাসনতন্ত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হ'লো। এই অধিবেশনেই কংগ্রেস সভাপতিকে তাঁর কার্যনির্বাহক সমিতির ষোল জন সদস্যকে মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হ'লো।

অধিবেশনের শেষ দিন, ২৮শে অক্টোবর তারিখে, গান্ধীজী কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সরকারীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করবার জন্যে সভামঞ্চে এলেন। এই মহান্ নেতাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে উপস্থিত আশী হাজার নরনারী উঠে দাঁড়ালেন। গান্ধীজীর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশ ক'রে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। প্রয়োজন হ'লেই গান্ধীজী কংগ্রেসকে পরামর্শ দেবেন ও পথপ্রদর্শন করবেন, তাঁর এই আশ্বাসবাণীতেও সন্তোষ প্রকাশ করা হ'লো। গান্ধীজী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের উপসংহারে বললেন, "আমার লক্ষ্য হ'লো অহিংস অনানুগত্যের শক্তি গ'ড়ে তোলা। অনানুগত্য সম্পূর্ণরূপে অহিংস হ'লে তাতে প্রতিহিংসার কোনও স্থান থাকতে পারে না।"

গান্ধীজী তলা থেকে দেশকে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে ও দেশকে যে ব্যাপকতর অহিংস সংগ্রামের জন্যে গ'ড়ে তুলতেই কংগ্রেস থেকে অবসর নিয়েছিলেন, এমন সন্দেহ সরকারেরও ছিল। তাই গোপন নির্দেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, "মিঃ গান্ধী নিজেকে আবার অতীব বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতারূপে প্রমাণ করেছেন। তাঁর মানসিক ও রাজনৈতিক শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি ব'লে খবর পাওয়া গেছে।"

গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেকে গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নে ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করলেন। এখন তাঁর বাসস্থান ওয়ার্ধার সত্যাগ্রহ আশ্রম ভারতের সর্বত্র থেকে আগত কর্মী ও সমাজসেবীদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠলো। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখে তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন, "গ্রামীণ শিল্পগুলি লোপ পেলে ভারতের সাত লক্ষ গ্রাম ধ্বংস হবে।"

কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে ওয়ার্ধায় ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প সংঘের প্রতিষ্ঠা হ'লো। যমুনালাল বাজাজ এই সংঘের কাজের জন্যে বাড়িসহ প্রচুর জায়গা দিলেন। গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবনই হ'লো এই সংঘের আদর্শ ও কাজ। এই সংঘের পরিচালনার পরিপূর্ণ দায়িত্ব গান্ধীজীর উপরই ন্যস্ত হ'লো। এই সংঘের ব্যবস্থাপক-মণ্ডলীর মধ্যে রইলেন জে. সি. কুমারাপ্পা, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার ও ডাঃ খান সাহেব। পরামর্শদাতাদের মধ্যে রইলেন রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার সি. ভি. রামন, ডাঃ আনসারি প্রভৃতি। সংস্থাটি কংগ্রেসের সৃষ্ট হ'লেও এটিকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা হ'লো।

গান্ধীজী যা প্রচার করতেন, তা তিনি নিজের জীবনেও অক্ষরে

অক্ষরে পালন করতেন। তাই ওয়ার্ধা থেকে কিছুদূরে সেগাঁও নামে একটি অজ পাড়াগাঁয়ে একটি কুটিরে গিয়ে তিনি নিজের বাসা বাঁধলেন। দেখতে দেখতে সেগাঁও গান্ধীজীর গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলো, এর নূতন নামকরণ হ'লো 'সেবাগ্রাম'।

সেবাগ্রামের কাহিনী আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বলব।

তেইশ

কংগ্রেসের নেপথ্যলোকে

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় জানুয়ারি মাসে দিল্লীর নূতন আইন-সভার অধিবেশন বসলো। আইনসভায় বিভিন্ন দলের আসন-সংখ্যা ছিল: কংগ্রেস ৪৪, কংগ্রেস জাতীয় দল ১১, স্বতন্ত্র দল ২২, ইউরোপীয় উপদল ১১, সরকারী ২৬, মনোনীত বে-সরকারী ১৩। এই অবস্থায় সরকার ইউরোপীয়, সরকারী ও মনোনীত ৫০টি ভোটের উপর নির্ভর করতে পারতো। কংগ্রেস নির্ভর করতে পারতো কংগ্রেস ও জাতীয় দলের ৫৫টি ভোটের উপর। ফলে জিন্নার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র দলই আইনসভার ভারসাম্য রক্ষা করছিল। চূড়ান্ত ক্ষমতা বড়লাটের হাতে থাকায় সরকারের বিশেষ অসুবিধা হ'তো না। কিন্তু ভোটাভুটির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র দলের মনোভাবের উপরই ফলাফল নির্ভর করতো। কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র দল মিলিতভাবে বহু সরকারী বিলকে আইনসভায় অগ্রাহ্য করেছিল এবং বড়লাট তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে কংগ্রেস স্বতন্ত্রদলের সমর্থন ও সহযোগিতা পেত না। কংগ্রেসকে অনেক সময় সহযোগিতার মূল্যরূপে স্বতন্ত্র দলের মতেই সায় দিতে হ'তো।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র যখন চালু হয়েছিল, তখন স্থির হয়েছিল, এই শাসনতন্ত্র কিভাবে কাজ করেছে, দশ বছর বাদে তা বিচার ক'রে দেখা হবে এবং সেই অনুসারে শাসনতন্ত্র সংশোধিত হবে। দশ বছরের আগেই সাইমন কমিশন নিয়োগ হয়েছিল। সাইমন কমিশন তার রিপোর্টও যথাসময়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে শাসনতন্ত্রের আর কোনও সংশোধন বা পরিবর্তন হয়নি। ভারতীয় প্রশ্নটি ইংলণ্ডের ঘরোয়া রাজনীতিতেও প্রভাব

বিস্তার করেছিল। রক্ষণশীল দল ও তার নেতা মিঃ উইনস্টন চার্চিল ভারতকে কণামাত্র স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। তিনি গান্ধী-আরুইন চুক্তি ও লর্ড আরুইনের ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বৃটিশ সরকার কিন্তু অন্য মত পোষণ করতেন। তাঁরা ভারতকে এমন একটি শাসনতন্ত্র দিতে চেয়েছিলেন, যাতে ভারতীয়রা সেই শাসনতন্ত্রকে স্বায়ত্তশাসন মনে করে এবং ইংরেজরা তাকে মনে করে "বৃটিশরাজ"। সেইভাবে ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ভারতের জন্যে একটি নূতন শাসন-তন্ত্র সংক্রান্ত বিল পার্লামেণ্টে আনলেন এবং ঐ বিল ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন নামে পাস হ'লো।

এই আইনে দুটি অংশ ছিল—যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ ও প্রাদেশিক অংশ। যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশে বলা হয়েছিল বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য-গুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে এবং বৃটিশ ভারতের ও দেশীয় রাজ্যের রাজাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় আইনসভার মোট আসন-সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দেশীয় রাজাদের প্রতিনিধিরা পাবেন। ভারতের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মত হলেন। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিকারও ছিল সীমাবদ্ধ। সামরিক ব্যয়, রাজকর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত ব্যয়, সুদের জন্য দেয় অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার কোনও অধিকার ছিল না। প্রাদেশিক অংশে অবশ্য প্রদেশের নির্বাচিত আইনসভার কাছে দায়ী মন্ত্রীদের উপর অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তবে এখানেও প্রদেশের গভর্নরদের দেওয়া হয়েছিল বিশেষ ক্ষমতা—যে ক্ষমতাবলে তাঁরা মন্ত্রিসভার ও আইনসভার সিদ্ধান্তকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় যখন এই নূতন শাসনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা হ'লো তখন কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্রকে গ্রহণের অযোগ্য ব'লে

ঘোষণা করলো। জওহরলাল এই শাসনতন্ত্রকে "দাসত্বের সনদ" ব'লে বর্ণনা করলেন। জিন্নার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র দল এই নূতন শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশকে অগ্রাহ্য করলো; কিন্তু প্রাদেশিক অংশ সম্পর্কে সমালোচনা করলেও তা গ্রহণে সম্মত হ'লো। ফলে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক অংশকে স্বীকৃতি দিতে রাজী হ'লো। এই ভাবে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের প্রাদেশিক অংশ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চালু হওয়ার ব্যবস্থা হ'লো এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ আপাতত তোলা রইলো। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারেও কংগ্রেসকে স্বতন্ত্র দলের দাবী মেনে নিতে হ'লো। জিন্না দাবী করলেন যে, সাম্প্রদায়িক দাবী সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে যতোদিন পর্যন্ত কোনও আপোস-মীমাংসা না হয়, ততোদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নেওয়া হ'ক। কংগ্রেস তাতেই রাজী হলেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গান্ধীজী বরসাদ তালুকে গেলেন। সেখানে আবার প্লেগের মহামারী দেখা দিয়েছিল। বল্লভভাই তাঁর স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে সেখানে সেবাকার্য করছিলেন। চার বছর ধরে ক্রমাগত প্লেগ হচ্ছিল এখানে। বরসাদের দেড় লক্ষ অধিবাসীকে প্লেগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে গান্ধীজী আহ্বান জানালেন। তিনি অহিংসায় গভীর বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ইঁদুর ও পোকা-মাকড় মেরে গ্রামগুলিকে পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলতে বললেন। তিনি স্থানীয় অধিবাসীদেরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'তে উপদেশ দিলেন।

বরসাদ থেকে ফেরবার পথে তিনি সবরমতী জেলে বন্দী খান্ আবদুল গফর খানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি যেদিন সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রম থেকে ডাণ্ডি অভিযান করেছিলেন, সেদিন শপথ নিয়েছিলেন, ভারত স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি এই আশ্রমে ফিরবেন না। তাই তিনি সবরমতী আশ্রমে গেলেন

না। কিন্তু আশ্রম-সংলগ্ন হরিজন বিদ্যালয়টি দেখতে গেলেন। বরসাদ থেকে ফিরবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কোয়েটায় ভয়ংকর ভূমিকম্পের সংবাদ পেলেন। এই ভূমিকম্পে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ চক্ষের নিমেষে নিহত হয়েছিল এবং ঘরবাড়ি, ধনসম্পত্তি, ও পথঘাটের ক্ষয়-ক্ষতি ছিল ভয়াবহ। গান্ধীজী কোয়েটা যেতে চাইলেন। কিন্তু কোয়েটা সম্পূর্ণরূপে সামরিক নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাই তাঁকে সেখানে যেতে দেওয়া হ'লো না। গান্ধীজী আবার হরিজন ও গ্রামোন্নয়ন সমস্যায় মগ্ন রইলেন।

তিনি অনেকদিন ধ'রে কঠোর পরিশ্রম করছিলেন। তার ওপর বার বার দীর্ঘকাল অনশন করায় তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বয়সও ছেষট্টি বৎসর হয়েছিল। তা সত্ত্বেও গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি রাত দুটোয় বিছানা ছেড়ে উঠতেন এবং প্রায় অবিরাম রাত নটা পর্যন্ত কাজ করতেন। আহারের সময়ে বা প্রাতর্ভ্রমণ ও সান্ধ্যভ্রমণের সময়েও গণ্যমান্য সাক্ষাৎ-কারীদের সঙ্গে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতেন। এর ফলে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়লো, রক্তের চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলো। ফলে সকলেই তাঁকে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করলেন। যমুনালাল বাজাজ নিজে তাঁর কুটিরদ্বারে প্রহরী থেকে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের বিরত করলেন। তাঁর সমস্ত কর্মসূচী বাতিল করা হ'লো। গান্ধীজী ধীরে ধীরে আবার সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলেন এবং পূর্ণোদ্যমে হরিজন ও গ্রামোন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জওহরলাল নেহরু তাঁর পত্নী কমলা দেবীর মৃত্যুর পর ইউরোপ থেকে ভারতে ফিরে এলেন। ইতিপূর্বেই তিনি ঐ বৎসরের জন্যে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইউরোপে যে রাজনৈতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠছিল, তার প্রভাব জওহরলালের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত

করেছিল। তিনি এপ্রিলে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর সমাজবাদী আদর্শ দেশবাসীর সামনে রাখলেন। তিনি ইউরোপে যে ফ্যাসিবাদ মাথা তুলে উঠেছে তার সম্পর্কে সকলকে সচেতন করলেন। তিনি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে শক্তি জেগে উঠেছে, ভারতকে তার সঙ্গে সামিল হ'তে এবং দেশের জাগ্রত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে কংগ্রেসের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন। তিনি সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা হ্রাস পেয়ে মাত্র সাড়ে চার লক্ষে দাঁড়িয়েছে। নেহ্রু নিজেকে সমাজতন্ত্রী ব'লে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, সমাজতন্ত্রের দ্বারাই ভারত তথা বিশ্বের সমস্যাবলীর সমাধান হ'তে পারে। সেই সঙ্গে তিনি বললেন, ভারতে সমাজতন্ত্র অচিরে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সর্বাগ্রে চাই দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্যে অর্থনৈতিক আদর্শ ও মতামত নির্বিশেষে সকলকে সংঘবদ্ধ হ'তে হবে। নেহ্রুজী বললেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে যুদ্ধই করুক না, তা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই হবে; সুতরাং আমাদের এইসব যুদ্ধ থেকে বাইরে থাকতে হবে। তিনি বললেন, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক অংশ চালু হ'লে কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তবে ঐ আইনে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাতে কংগ্রেস শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করবে না। কারণ, ক্ষমতা না পেয়ে দায়িত্ব নেওয়া বিপজ্জনক।

কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে ওয়ার্কিং কমিটি নেহ্রুজীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেও বিষয় নির্বাচক সমিতি সেগুলির অনেকগুলি গ্রহণে অসম্মত হ'লো। নেহ্রুজী শ্রমিক ও কৃষক সংস্থাগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করবার যে প্রস্তাব করেছিলেন, সেটি অগ্রাহ্য হ'লো। তার পরিবর্তে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের প্রশ্নে একটি কমিটি নিয়োগ করলো।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনের প্রাদেশিক অংশ চালু হ'লে কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। তবে কংগ্রেস শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করবে কিনা তা পরে যথাসময়ে বিচারের ভার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর দেওয়া হ'লো। এ থেকে নেহ্‌রুজী বুঝলেন যে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই প্রবীণ নেতৃত্বেরই অনুগামী। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়েও তিনি যথেষ্ট বেদনাবোধ করলেন। কংগ্রেসের সভাপতিই তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন বটে, তবে তিনি কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যদের মতামতকেও উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই নেহ্‌রুজী পদত্যাগ করতে চাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেন এবং তাঁর ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচন্দ্র বসু, নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অচ্যুত পটবর্ধনকে নিলেন। গান্ধীজী কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক কোন আলোচনায় অংশ নিলেন না। তবে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্যে যে নিখিল ভারত কাটুনি সংঘ ও নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প সংঘের প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল, তাতে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি এই প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করলেন। এই প্রদর্শনী বার বার দেখবার জন্যে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। ওয়ার্ধা ফেরবার পথে তিনি নাগপুরে নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। এই সময়েই তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি একটি গ্রামে গিয়ে থাকতে চান। তিনি যতোক্ষণ তা করতে না পারছেন, ততক্ষণ তাঁর মন শান্তি পাচ্ছে না।

গান্ধীজী ওয়ার্ধা থেকে পাঁচ মাইল দূরে সেগাঁও নামে একটি অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু এই গ্রামে পথঘাট, দোকান ও ডাকঘর না থাকায় এবং এখানকার পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় সকলেই আপত্তি করলেন।

কিন্তু ঐ কারণগুলিই গান্ধীজীর কাছে আকর্ষণ হয়ে উঠল। তাঁকে অনেকে গুজরাটে কোনও গ্রামে গিয়ে থাকতে বললেন। নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প সংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল মগনওয়াড়িতে। সেগাঁও মগনওয়াড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকায় ঐ গ্রামটিকে তিনি নিজের বাসের জন্য নির্বাচন করলেন। ৩০শে এপ্রিল সকালে তিনি মগনওয়াড়ি থেকে সেগাঁও যাত্রা করেন। এই পাঁচ মাইল পথের চার মাইল তিনি পায়ে হেঁটে ও এক মাইল গোরুরগাড়িতে যান। তাঁর সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর কয়েকজন সহকর্মীও তাঁর অনুসরণ করেন। পথে তাঁর একজন সঙ্গী তাঁকে বললেন যে, তিনি হরিজন সফর ক'রে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রেও তিনি ঐ ধরনের সফর করলে ফল বেশি হ'তো। জবাবে গান্ধীজী বললেন, "ঐ দুটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নেই। হরিজন-সেবার কাজে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক দুটি দিক্ই একত্র করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি কেবলই তত্ত্বের কথাই বলছি। গ্রামে কাজ করবার বিষয়ে বলছি, পরামর্শ দিচ্ছি, কিন্তু গ্রামের কাজে যেসব অসুবিধা আছে তা ব্যক্তিগতভাবে কিছুই জানি না। আমি যদি কয়েক মাস গ্রামে গ্রামবাসীদের সঙ্গে থাকি, তবে একবছর বাদে এমন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে কথা বলতে পারব, যা এখন আমার নেই।"

সেগাঁওয়ে পৌছেই গান্ধীজী কাজে লেগে গেলেন, যদিও তখন তাঁর মাথা গুঁজবার মতো একটি কুঁড়েও সেখানে তৈরি ছিল না।

মে মাসে গান্ধীজী সংবাদ পেলেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিলাল গান্ধী ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন। হরিলালের স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল না। তাই গান্ধীজী এই সংবাদে ব্যথিত হলেন এবং হরিজন পত্রিকায় "মুসলিম বন্ধুদের" লিখলেন যে, সব ধর্মই সমান, তাই হরিলাল ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে তিনি দুঃখিত নন। কিন্তু তিনি দুঃখিত এই কারণে যে, হরিলাল দুশ্চরিত্র, সে শুদ্ধচিত্তে ধর্মের

জন্যে ধর্মগ্রহণ করছে না। "যাঁরাই আমার ছেলে হরিলালকে চেনেন, তাঁরাই জানেন যে, সে বহুদিন যাবৎ পানাসক্ত ও বেশ্যাসক্ত হয়েছে। বহুদিন যাবৎ সে বন্ধুবান্ধবের অকৃপণ করুণার উপর নির্ভর ক'রে বেঁচে আছে। সে কয়েকজন কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে কড়া সুদে টাকা ধার নিয়েছে। এই সেদিন পর্যন্ত ঐসব কাবুলিওয়ালা মহাজনদের হাতে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার ভয়ে সে বোম্বাইয়ে কাটিয়েছে। এখন সে বোম্বাই শহরে নায়ক হয়ে উঠেছে। তার এক অতিশয় অনুগতা পত্নী রয়েছে, যে পত্নী তার সকল অপরাধ ক্ষমা করেছে। তার তিনটি বয়স্ক সন্তান রয়েছে, দুটি কন্যা ও একটি পুত্র, তাদের ব্যয়বহন সে অনেক আগেই বন্ধ করেছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে খ্রীষ্টান বা মুসলমান হয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে সংবাদপত্রে একটি পত্র লিখেছিল। এই পত্রের ফলে একজন হিন্দু তাকে নাগপুর পৌরসভায় একটি চাকরি দিয়েছিলেন। ফলে সংবাদপত্রে আর একটি পত্র লিখে পূর্ব পত্রের বক্তব্য অস্বীকার ক'রে তার পূর্বপুরুষের ধর্মে সে বিশ্বাস প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এখন ঘটনাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে, তার আর্থিক উচ্চাশা মেটেনি। সেই উচ্চাশা পূরণের জন্য সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখনও সে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ভোগবিলাসে আনন্দ পায়। তার যদি কোনও পরিবর্তন হ'তো, তবে সে আমাকে লিখে আনন্দ দিতো। আমি আমার সকল সন্তানকেই চিন্তা ও কাজের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। নিজের ধর্মকে যে চক্ষে দেখে, সেই চক্ষে অন্যান্য সকল ধর্মকে দেখবার শিক্ষাই তারা পেয়েছে। হরিলাল জানে, সে যদি আমাকে জানাতো যে সে ইসলামের মধ্যে তার নির্ভুল জীবনের পথ ও শান্তির সন্ধান পেয়েছে, তবে আমি তাকে বিন্দুমাত্র বাধা দিতাম না। কিন্তু আমরা কেউ কিছুই জানি না। তার চব্বিশ বছর বয়স্ক পুত্র আমার কাছে আছে। সেও কিছুই জানে না। এইসব

ব্যাপার আমাকে মর্মাহত করেছে। তাকে নিয়ে যে হৈচৈ হচ্ছে, তার পেছনে কোনও ধর্মীয় মনোভাব নেই। হরিলালকে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করিয়েছেন, তাঁরা এসব ক্ষেত্রে যে সামান্য সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন তা-ও করেন নি। হরিলালের ধর্মত্যাগে হিন্দুধর্মের কোনও ক্ষতি হবে না। যদি সে আগের মতোই দুশ্চরিত্র থাকে, তবে তাতে ইসলামের দুর্বলতারই কারণ ঘটবে।"

এই সময়ে গান্ধীজীর প্রিয় বন্ধু ও দীর্ঘদিনের সহকর্মী ডাঃ আনসারী ও আব্বাস তায়েবজীর মৃত্যু ঘটে।

জুন মাসে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে। গান্ধীজী রোজই সকালে সেগাঁও থেকে পায়ে হেঁটে এসে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগ দেন। এই সময়ে ওয়ার্কিং কমিটিতে সংকট দেখা দিয়েছিল। ওয়ার্কিং কমিটির প্রবীণ সদস্যরা জওহরলালের সমাজবাদী প্রচারে ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী তাঁদের বিরত করলেন। কিন্তু নেহ্রুজীর সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধ দূর হ'লো না। জুলাই মাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'লো যে, গান্ধীজীর সঙ্গে নেহ্রুজীর মতাদর্শের বিরোধ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। গান্ধীজী তার প্রতিবাদে 'হরিজন' পত্রিকায় "আমরা কি প্রতিদ্বন্দ্বী" নামে প্রবন্ধটি লিখলেন এবং তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে যে জনরব প্রচারিত হয়েছে, তা অসত্য ব'লে ঘোষণা করলেন। গান্ধীজী নেহ্রুজীকে সমর্থন করায় সভাপতির সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির যে বিরোধ চলছিল, তা হ্রাস পেলো। কংগ্রেস সমাসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে যে ইস্তাহার রচনা করলো, তাতে প্রগতিশীল চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটলো। তাতে পূর্ণ স্বাধীনতা-ও গণ-পরিষদের দাবীকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হ'লো এবং সাম্রাজ্যবাদী সংবিধানের তীব্র নিন্দা করা হ'লো। তাতে নাগরিক অধিকার ও সমান অধিকার দাবী করা হ'লো।

সাধারণ মানুষের মনে সাড়া জাগায় এমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীও স্থান পেলো।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই থেকে নির্বাচনী অভিযান শুরু হয়েছিল। তা অব্যাহত গতিতে চললো। গান্ধীজী কিন্তু রাজনীতি থেকে দূরে থেকে সের্গাওয়ে তাঁর গ্রামসেবার কাজে নিমগ্ন রইলেন। দেশ-বিদেশের বহু গুণী মানী মানুষ তাঁর কাছে এলেন। সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। চিকিৎসার জন্যে তিনি সের্গাও ছেড়ে কোথাও গেলেন না এবং ধীরে ধীরে নিজের চিকিৎসায় সেরে উঠলেন। তিনি নিজে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় সের্গাওকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। এর কিছুদিন পরে গ্রামে ব্যাপক জ্বরাতিসার দেখা দিল। গান্ধীজী স্বহস্তে তাদের চিকিৎসা করলেন এবং তাঁর জলচিকিৎসা-পদ্ধতি রোগীদের নিরাময় ক'রে তুললো। তিনি সমগ্র গ্রামটিকে ও গ্রামবাসীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে তুললেন এবং স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলতে উদ্‌বুদ্ধ করলেন।

১৯৩৬ সাল শেষ হয়ে এলো। তাই এবার কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলো। নেহ্‌রুজীর অসামান্য জনপ্রিয়তা তাঁকেই কংগ্রেসের সভাপতি পদের যোগ্যতম ব্যক্তি ক'রে তুলেছিল। কিন্তু তাঁর সমাজবাদী মতবাদ প্রবীণ কংগ্রেসীদের মনঃপূত ছিল না। তাঁরা বল্লভভাই প্যাটেলকে সভাপতি করতে চাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্দার প্যাটেল নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করলেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের অর্থ এই নয় যে, তিনি সকল বিষয়ে জওহরলালের সঙ্গে একমত। তিনি সমাজবাদের বিরোধী এবং পুঁজিবাদকে শোধন করা যায়, এই মতে বিশ্বাসী। এইভাবে জওহরলাল ১৯৩৭ সালের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। গান্ধীজী প্রস্তাব করলেন, এবার কংগ্রেসের অধিবেশন অন্যান্য বারের

মতো কোন বড় শহরে না হয়ে গ্রামাঞ্চলে হ'ক। এইভাবে মহারাষ্ট্রের ফৈজপুর গ্রামেই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হবে স্থির হ'লো। তিনি এখানেও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে বললেন এবং শিল্পী নন্দলাল বসুকে ফৈজপুরে একটি আদর্শ ভারতীয় গ্রামের প্রতিচ্ছবি গ'ড়ে তুলতে আহ্বান জানালেন। ফৈজপুরে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্যে যে শিবির গ'ড়ে উঠলো, তার নাম দেওয়া হ'লো তিলকনগর। ২৫শে ডিসেম্বর গান্ধীজী এখানে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করলেন।

২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হ'লো। নিকট ও দূর থেকে প্রায় একলক্ষ মানুষ জড়ো হলেন তিলক নগরে। সভাপতির ভাষণে নেহ্‌রুজী ইউরোপের ফ্যাসিবাদের দ্রুত অভ্যুত্থান এবং তার ভয়াবহ ফলরূপে যুদ্ধের আসন্নতার উপর জোর দিলেন। আবিসিনিয়ায় ইতালির নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও উৎপীড়ন এবং স্পেনে গণতান্ত্রিক শক্তির বেদনাদায়ক অবস্থার কথাও বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি ভারতীয় সমস্যাগুলির আলোচনা করলেন; ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষিত সংবিধানের তীব্র সমালোচনা করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেস আইনসভায় যাবে সংবিধানকে কার্যকর করবার জন্যে নয়, সংবিধানের বিরোধিতা করবার জন্যে। শাসনকার্যে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিল ফৈজপুর কংগ্রেসে। অধিকাংশ সদস্যই নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখতে চাইলেন। গান্ধীজী কংগ্রেসের আলোচনায় বা বিতর্কে যোগ দিলেন না। তবে প্রদর্শনী ময়দানে ২৭শে ডিসেম্বর তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বললেন, "আমি আগের মতোই শক্তিশালী আছি। যখন সময় আসবে, আমি তা প্রমাণ করব।" তিনি বললেন, "চরকার বয়স হ'লো ১৮ বছর। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি বলেছিলাম যে, চরকা দিয়েই আমরা স্বরাজ পেতে পারি। চরকার শক্তিতে আমার বিশ্বাস পূর্বের মতোই

উজ্জ্বল আছে। বিগত এই বৎসরগুলিতে আমার অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার ফল বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে চরকা ও চরকার জন্য খাদির তাৎপর্য বুঝতে হবে। কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে খাদি পরা বা বিদেশী বস্ত্রের পরিবর্তে খাদি পরাই যথেষ্ট নয়—যদি আমাদের চারিদিকে সব জিনিস বিদেশী হয়। খাদি হ'লো প্রকৃত স্বদেশী মনোভাব, দেশে কোটি কোটি উপবাসী মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ।...আমার স্বদেশীর ধারণা সম্পর্কে কোনও বিভ্রান্তি রাখবেন না। আমার স্বরাজ হ'লো বিদেশীর নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি এবং পরিপূর্ণ অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা। সুতরাং এর একদিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, অন্যদিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা।...রাজনৈতিক স্বাধীনতা বললে আমি বৃটেনের হাউস অব কমন্স, রাশিয়ার সোভিয়েট শাসন, ইতালির ফ্যাসিবাদী শাসন বা জার্মানির নাৎসী শাসনের অনুকরণ মনে করি না। ঐগুলি তাদের নিজ নিজ দেশের প্রকৃতির উপযুক্ত। আমাদের স্বাধীনতা হবে আমাদের প্রকৃতির উপযুক্ত। তা কিরকম হবে, তা আমি বলতে পারি না। আমি একে 'রামরাজ' বলে বর্ণনা করেছি, বিশুদ্ধ নৈতিক কর্তৃত্বের ভিত্তিতে জনসাধারণের সার্বভৌমতা। তারপর ধরুন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এটা আধু-নিক বা পাশ্চাত্য ধরনের কলকারখানার ফসল হবে না। ভারতীয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি ভারতের প্রতিটি নরনারীর নিজের সচেতন প্রয়াসের দ্বারা নিজের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন।... এ থেকেই সমাজবাদের কথা এসে পড়ে। প্রকৃত সমাজবাদ আমাদের পূর্বপুরুষরা দিয়ে গেছেন। তাঁরা এই শিক্ষা দিয়েছেন : সকল ভূমি ভগবানের, তবে সীমারেখা কেন ? মানুষ যে সীমারেখা সৃষ্টি করেছে, মানুষ তা ধ্বংস করতে পারে।...আমরা সকল দেশেই এই সমস্যার সমাধান অহিংসপথেই করতে পারি।...ভূমি ও অন্য সকল সম্পদই তার, যে তা কাজে লাগাবে।...সংসদীয় কর্মসূচীর হাওয়া বইছে। ঠিকই বইছে, বইবেও। কিন্তু এতে আমাদের

স্বাধীনতা আসবে না। এর কাজ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ সফল হ'লে সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করতে বা আমাদের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা অনুমোদিত কোনও অগ্রগতিকে ব্যাহত করবার মতো কোনও ব্যবস্থা করতে পারবে না। সুতরাং জনসাধারণের উচিত কংগ্রেসের প্রার্থীদের ভোট দেওয়া। কারণ ঐ সব প্রার্থী কংগ্রেসের আদেশ অমান্য ক'রে জনস্বার্থবিরোধী কোনও বিষয়ে ভোট দিতে পারবেন না। এই কর্মসূচীর সাফল্য অনেক ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও সহায়তা করতে পারে—যেমন সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্তরীণ ব্যক্তিদের মুক্তিলাভ। কিন্তু তা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনও স্বাধীনতাই নয়।"

ফৈজপুর কংগ্রেস গান্ধীজীর ভাষণ দিয়েই শেষ হলো: "আমরা চাই গ্রামগুলির সঙ্গে এই যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। কংগ্রেস অধিবেশন হয়ে উঠবে কুম্ভমেলার মতো, যেখানে লক্ষ লক্ষ নরনারী তীর্থযাত্রীর মতো আসবেন। তবে এই মেলা মুসলিম, শিখ, পার্শী ও অন্যান্য সকলকে স্বাগত জানাবে এবং সকলকে একসঙ্গে স্বরাজের জন্য প্রার্থনা করতে ঐক্যবদ্ধ করবে। তোমাদের গণপরিষদের অধিবেশন যেখানে ইচ্ছা হ'ক না কেন, প্রকৃত গণ-পরিষদ্ হবে ফৈজপুরের মতো গ্রামগুলিতে।"

ফৈজপুর কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর কংগ্রেসের নেতারা সকলেই নির্বাচনী অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গান্ধীজী আবার ডুবে গেলেন তাঁর গ্রামসেবার কাজে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি দক্ষিণ ভারতে গেলেন হরিজনদের মন্দির-প্রবেশের অভিযান চালাতে। জানুয়ারি মাসের শেষে আবার সেগাঁওয়ে ফিরে আসেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের ফলাফল জানা গেল। কংগ্রেস নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করলো। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় নিরঙ্কুশ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো। আসামে ১০৮টি আসনের মধ্যে ৩৫টি পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হ'লো। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত ৩৬টি আসনের মধ্যে ১৫টি পেলো। বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশেই কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করতে পারলো না। উদারনৈতিক দল, গণতান্ত্রিক স্বরাজ দল, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হ'লো। মুসলিম লীগ অপেক্ষাকৃত সাফল্যলাভ করলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো মুসলমানপ্রধান প্রদেশেও তাদের প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারলো না। কংগ্রেসের এই জয়লাভ ইংলণ্ডেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো।

ফেব্রুয়ারির শেষে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসলো। বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্ন আইনসভাগুলিতে কংগ্রেস সদস্যদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনতন্ত্রের সঙ্গে অসহযোগিতার নীতির কথাই ঘোষিত হ'লো। গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় যোগ দিলেন, তিনি তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় এ সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করলেন না। তিনি 'হরিজন' কাগজে অস্পৃশ্যতা, জাতীয় ভাষা, ম্যালেরিয়া, বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন।

মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্য দিল্লী গেলেন। মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃত্ব এখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণপন্থী নেতারা এই অভিমত পোষণ করছিলেন যে, কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন ক'রে এই সংবিধানের বিরুদ্ধে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে লড়তে পারবে। কিন্তু নেহ্‌রুজী, সুভাষ-চন্দ্র বসু প্রভৃতি বামপন্থী নেতারা মন্ত্রিত্বগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। গান্ধীজী এই বিরোধের মীমাংসাকল্পে একটি সূত্র দিলেন। তাতে বলা হ'লো যে, কংগ্রেস যেসব প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

পেয়েছে, সেখানে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবে, তবে আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতাকে ঘোষণা করতে হবে যে, গভর্নর তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না সে বিষয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। গান্ধীজীর এই প্রস্তাব ১২৭—৭০ ভোটে গৃহীত হ'লো।

গান্ধীজী ২৬শে মার্চ মাদ্রাজে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে গেলেন। এখানে তিনি একমাত্র হিন্দীই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হ'তে পারে এই অভিমত প্রকাশ করলেন। ঐ সময় এখানে ভারতীয় সাহিত্য পরিষদেরও অধিবেশন হচ্ছিল। গান্ধীজী তাতে সভাপতির ভাষণে 'দেবনাগরী' লিপিকেই ভারতের একমাত্র লিপিরূপে গ্রহণের সুপারিশ করলেন। গান্ধীজীর পরামর্শ অনুসারে এখানে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। তাতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে এই মর্মে অনুরোধ করা হ'লো যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটি যেন তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্যবিধিতে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দী-হিন্দুস্থানী ব্যবহার করেন। যিনি হিন্দী-হিন্দুস্থানীতে নিজের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারবেন না, তাঁরাই ইংরেজীতে বলতে পাবেন। কোনও সদস্য নিজের মাতৃভাষায় বলতে চাইলেও তিনি সে সুযোগ পাবেন। তবে তাঁর বক্তব্য হিন্দী-হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ ক'রে দেওয়া হবে।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলগুলির নেতাদের গভর্নররা মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ডেকে পাঠালেন। গভর্নরদের কাছে প্রতিশ্রুতি চাওয়ার একটি বয়ান গান্ধীজী রচনা ক'রে দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, মহামান্য গভর্নর এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, "তিনি মন্ত্রীদের সংবিধানসম্মত কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর হস্তক্ষেপের বিশেষ ক্ষমতাবলী প্রয়োগ করবেন না বা মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করবেন না।" গভর্নররা কেউ এই প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হলেন না। ফলে নেতারাও মন্ত্রিসভা গঠনে অগ্রসর হলেন না।

কংগ্রেস-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে এইভাবে অচলাবস্থার সৃষ্টি হ'লো। গভর্নররা অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। কিন্তু আইনসভায় তাদের সমর্থন না থাকায় আইনসভার অধিবেশন ডাকা গেল না। গভর্নরদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দাবী করায় ভারতে ও ইংলণ্ডে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো এবং যে তুমুল বিতর্ক ও মতবিরোধ দেখা দিলো তার ফলে গান্ধীজীকে আবার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে হ'লো। ভারতে ও ইংলণ্ডে আইনবিদ্‌রা দুই বিরোধী দলে বিভক্ত হলেন। তেজবাহাদুর সপ্রু কংগ্রেসের দাবীকে অযৌক্তিক ব'লে বর্ণনা করলেন। কিন্তু অধ্যাপক কীথ্‌ গান্ধীজী তথা কংগ্রেসকে সমর্থন করলেন। ৩০শে মার্চ তারিখে গান্ধীজী একটি বিবৃতি দিয়ে বর্তমান অচল অবস্থাটিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখালেন। ১লা এপ্রিল ছিল নূতন শাসন আইন চালু হওয়ার দিন। ঐদিন সমস্ত ভারতে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হ'লো। হরতাল পালিত হ'লো। কংগ্রেসের সভা-মঞ্চগুলি থেকে সুস্পষ্টভাষায় ঘোষণা করা হ'লো যে, এই আইনের দ্বারা বৃটেনের শাসন ও শোষণকে চিরস্থায়ী করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরবর্তী তিন মাস কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে বিবৃতি ও প্রতি-বিবৃতি দান চলতে লাগলো। কংগ্রেস ও সরকার উভয়েই নিজ নিজ দাবীতে অবিচল রইলো। এদিকে অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা-গুলির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছিল। আইনসভাগুলি ডাকা সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ প্রথম ছ মাসের মধ্যেই আইনসভার অধিবেশন বসা এবং বাজেট পাস হওয়া চাই। বড়লাট কংগ্রেস-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে ৯৩ ধারা বলবৎ ক'রে সংবিধান স্থগিত রাখবার ভয় দেখালেন। ফলে কংগ্রেসের সুরও কিছুটা নরম হ'লো। শেষ পর্যন্ত গভর্নররা মন্ত্রিসভার দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এই মর্মে বড়লাট একটি প্রতিশ্রুতি দিলেন। এখন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী হ'লো। কংগ্রেস মাদ্রাজ, বোম্বাই,

যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় মন্ত্রিসভা গঠন করলো। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশে আটজন সদস্য কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সেইখানেও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হ'লো। জওহরলাল নেহ্রু সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, "মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের দ্বারা দাসত্বের এই সংবিধান-গ্রহণ কণামাত্রও বোঝায় না।"

'হরিজন' পত্রিকার মাধ্যমে গান্ধীজী এতোদিন কোনও রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করেন নি। ১৯৩৭ সালের ১৭ই জুলাই সর্বপ্রথম তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সমর্থনে মতামত প্রকাশ করলেন। "ভারত শাসন আইন সম্পর্কে সকলের অভিমত এই যে, স্বাধীনতা লাভের পক্ষে এটি আদৌ সন্তোষজনক নয়। তবু একে অস্ত্রের দ্বারা শাসনের পরিবর্তে অধিকাংশের দ্বারা শাসন প্রবর্তনের, সীমাবদ্ধ ও দুর্বল হ'লেও, প্রয়াস ব'লে মনে করা যেতে পারে। কারণ, তিন কোটি নরনারীর নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি ও তাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতাদানকে অন্য কোন নাম দেওয়া যায় না।" পরিষদীয় ব্যবস্থা পরিচালনার ভার মওলানা আজাদ, সর্দার প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর থাকলেও গান্ধীজী সেগাঁও থেকে তাঁদের অনুপ্রেরণা যোগাতে লাগলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের করণীয় কি, তা-ও তিনি বাৎলে দিলেন। ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হ'লো তাতে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীরাও যোগ দিলেন। গান্ধীজী মাদকবর্জনকে মন্ত্রিসভাসমূহের আশু কর্মসূচীতে স্থান দিতে বললে ওয়ার্কিং কমিটি ঐ মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। গান্ধীজীর পরামর্শ অনুসারেই ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রীদের বেতন মাসিক ৫০০ টাকার বেশি না করবার নির্দেশ দিলেন। আইনসভাগুলির কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে গভর্নরদের সংবর্ধনাসভা বিদায়-অভিনন্দনসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। যেসব প্রদেশের আইনসভায় কংগ্রেস সংখ্যালঘু

আছে সেইসব প্রদেশে কংগ্রেসী সদস্যদের কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী অনুসারে বিল আনতে পরামর্শ দেওয়া হ'লো। বলা হ'লো, এর দ্বারা দেশবাসীকে কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলা যাবে।

আইনসভায় প্রবেশ সম্পর্কে তখনো কংগ্রেসের অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল। মন্ত্রিত্বগ্রহণের প্রশ্ন নিয়েও মতবিরোধ বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে বেলগাঁওয়ের হুডলিতে গান্ধী-সেবাসংঘের অধিবেশন বসলো। যাঁরা আইনসভার সদস্য হয়েছেন তাঁরা গান্ধী-সেবাসংঘের সদস্য থাকতে পারবেন কিনা, এ নিয়ে তীব্র মতদ্বৈধ দেখা দিল। সংঘের সভাপতি কিশোরলাল মশরুওয়ালা ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ আইনসভার সদস্যদের গান্ধী সেবা সংঘের সদস্য থাকার বিরোধিতা করতে লাগলেন। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও তাঁর সমর্থকরা এরকম বাধা সৃষ্টির কোনও যৌক্তিকতা দেখলেন না। মশরুওয়ালা ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, কংগ্রেসের আইনসভায় প্রবেশের বিরোধিতার ফলেই এক সময় গান্ধী-সেবাসংঘের সৃষ্টি হয়েছিল; এখন তবে আইনসভার সদস্যরা কিভাবে এই সংঘের সদস্য থাকতে পারেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা গান্ধীজী নিজেই করলেন। তিনি বললেন, "মনে রাখতে হবে যে, আইনসভা বর্জনটা সত্য বা অহিংসার মতো কোনো চিরন্তন নীতি নয়।...প্রশ্নটা হ'লো সম্পূর্ণরূপে রণকৌশলগত।" মশরুওয়ালা ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর মতই মেনে নিলেন এবং আইনসভার সদস্যদের জন্যও গান্ধী-সেবাসংঘের দ্বার উন্মুক্ত রইলো।

গান্ধীজী এই সময়ে শিক্ষা-নীতির এবং দেশে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। তিনি দেশে যে নূতন শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বললেন, তা "বুনিয়াদী শিক্ষা" নামে পরিচিত হয়েছে। গান্ধীজীর এই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা রুশোর শিক্ষাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল—"কাজের

মাধ্যমেই (by doing) যতোখানি সম্ভব শিক্ষা দাও ; যখন কাজ সম্ভব নয়, তখনই কেবল কথার উপর (on words) নির্ভর করো।”

গান্ধীজীর এই শিক্ষানীতি তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হ'লো। অনেকেই ভাবলেন, গান্ধীজী অন্যান্য শিক্ষার পরিবর্তে কেবল হাতের কাজ শেখার কথাই বলছেন; গান্ধীজী যে কাজকেই সকল শিক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে বলছেন, তা তাঁরা লক্ষ্য করলেন না। গান্ধীজী আক্ষরিক জ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখাচ্ছেন, তাঁরা এমন অভিযোগও করলেন। গান্ধীজী তাঁর নূতন শিক্ষা-নীতি ব্যাখ্যা ক'রে বললেন যে, কাজের মাধ্যমেই আক্ষরিক শিক্ষা দিতে হবে। তিনি যে বললেন, “আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কারণ দেশের ছেলেদের বুদ্ধিবৃদ্ধির অপচয় ঘটছে। ছেলেরা স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে কি করবে খুঁজে পায় না। প্রকৃত শিক্ষা হ'লো তাই যা ছেলেমেয়েদের মানসিক, বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির বিকাশসাধন করে। এই শিক্ষা তাদের পক্ষে কর্মহীনতার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হয়ে উঠবে।”

কেবল নীতিগতভাবে নয়, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থায় এই শিক্ষা-ব্যবস্থাই যে দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা দূর করতে পারে, তাও তিনি বুঝিয়ে বললেন। প্রথমত, গ্রামের কৃষক ও কারিগররা তাদের ছেলেদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে নিজেদের সঙ্গে রাখে এবং কাজ শেখায়। শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি কর্মভিত্তিক হয়ে ওঠে, সেখানে যদি বিভিন্ন ধরনের কাজ শেখানো হয়, তবে অভিভাবকরা সহজে ও স্বেচ্ছায় ছেলেদের স্কুলে পাঠাবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের মতো দরিদ্র দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্বব্যাপী ক'রে তুলতে হ'লে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা এই শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা সহজেই সংকুলান করা যাবে। কারণ কর্মভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যা উৎপন্ন করবে, তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বিদ্যালয়গুলি সহজেই আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে।

গান্ধীজীর এই নূতন শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে ১৯৩৭ সালের ২২শে অক্টোবর থেকে ওয়ার্ধায় একটি শিক্ষা-সম্মেলন শুরু হ'লো। এই অধিবেশনে ডাঃ জাকির হোসেন, আর্যনায়কম্ প্রভৃতি শিক্ষাব্রতীরা, কংগ্রেসের শিক্ষামন্ত্রীরা এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করলেন। অধিবেশন দু দিন ধরে চললো। গান্ধীজী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য, আদর্শ ও উপযোগিতার কথা সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ জাকির হোসেন বললেন, "যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছেন, তাঁরা গান্ধীজীর এই পরিকল্পনাকে অভিনব কিছু ব'লে মনে করবেন না। তাঁরা জানেন, প্রকৃত শিক্ষা কেবল কর্মের মাধ্যমেই দেওয়া যেতে পারে। এই শিক্ষা-প্রণালীকে আমেরিকায় বলা হয় প্রোজেক্ট মেথড (Project Method) এবং রাশিয়ায় বলা হয় কমপ্লেক্স্ মেথড (Complex Method)। আমরা নিশ্চয় ছেলেমেয়েদের তকলি চরকা বা অন্য কোনও উপযুক্ত হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারি। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করবার সবচেয়ে বড় অন্তরায় হবে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। আমেরিকায় অধ্যাপক ডিউই অনুরূপ পরিকল্পনাই করেছিলেন এবং তা উৎসাহভরে অভিনন্দিতও হয়েছিল; কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই তাঁকে তাঁর স্কুল বন্ধ ক'রে দিতে হ'লো; কারণ এই স্কুল চালাবার মতো লোক পাওয়া গেল না।" তিনি স্কুলের আত্মনির্ভর হওয়ার বিরুদ্ধেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। বললেন, "শিক্ষকরা ছেলেদের ক্রীতদাসের মতো খাটাতে পারে এবং এইভাবে গরীব ছেলেদের শ্রমকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে।"

অধ্যাপক কে. টি. শাহ্ও বললেন, শিক্ষা আত্মনির্ভর হবে, এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। কায়িক শ্রমের ওপর কিছুটা জোর দেওয়া উচিত সত্য, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, এটা যন্ত্রযুগ; প্রশ্নটা অধিকতর উৎপাদনের নয়,—সম্পদের

ন্যায়সংগত বণ্টনের। তা ছাড়া অন্যান্য প্রশ্নও আছে; ছেলেদের মালমসলা বিনামূল্যে দিতে হবে; তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করতে হবে; তাদের পেশাদার কারিগরদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'তে হবে। এই শিক্ষা-পরিকল্পনা তখনই কেবল কার্যকর হ'তে পারে, যদি সমস্ত বিদেশী বর্জন করা হয় এবং কলে উৎপন্ন দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হয়। তা অসম্ভব। সমস্ত শিল্পের জাতীয়করণ ও সমাজীয়করণ প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষা স্বনির্ভর হবে, একথা ভাবা অলীক কল্পনাই নয়, এটা অসংগত-ও।

বিনোবা ভাবে বললেন, প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও স্বনির্ভর হওয়া উচিত। এটা অভিনব কিছু না হ'তে পারে, কিন্তু এটা যে নূতন আলোকে প্রতিভাত, তা অনস্বীকার্য। মানুষের আজ এই দুর্গতির মূল কারণ, মানুষ কায়িক শ্রম ত্যাগ করেছে। গান্ধীজীর এই বিপ্লবী প্রস্তাব একটি আঘাতেই সকল দুঃখ-দুর্দশা দূর করবে। তিনি বললেন, আইন প্রণয়নের দ্বারা শিক্ষাকে আবশ্যিক করা যাবে না। তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। ছাত্ররা সাত বছর শিক্ষালাভ ক'রে তাদের পরিবারকে সাহায্য করতে পারবে এমন অবস্থা যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি, তবেই এই সমস্যার সমাধান হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ—তাদের বই, তাদের চলন-বলন, বসা, হাঁটা সব কিছুই পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষকরা ছাত্রদের গোলামি করাবেন, এটা অসম্ভব। অন্যপক্ষে, এই ব্যবস্থায় শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের আগ্রহ উৎসাহ বাড়বে, তাঁরা বিদ্যালয়গুলির ওপর নজর রাখবেন। অবশ্য সরকারকে উপযুক্ত শিক্ষক ও উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হবে।

দু-দিনব্যাপী অধিবেশনে এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থার সকল দিক্ বিচার ক'রে দেখা হ'লো এবং একটি খসড়া প্রস্তাব রচিত হ'লো। তাতে বলা হ'লো—(১) এই সম্মেলনের মতে সমস্ত জাতির জন্য সাতবৎসরব্যাপী একটি অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

প্রবর্তন করতে হবে; (২) শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা; (৩) সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা কায়িক শ্রম ও উৎপাদনকে কেন্দ্র ক'রে গঠিত হবে গান্ধীজীর এই প্রস্তাব সম্মেলন সমর্থন করে; (৪) এই শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে কালক্রমে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে, সম্মেলন এরূপ আশা রাখে।

কংগ্রেস যে সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিল, সেগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হ'লো; জরুরী ক্ষমতা ও আইনগুলি বাতিল করা হ'লো; সংঘ ও সভাসমিতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হ'লো; সংবাদপত্রগুলি মতামতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা পেলো; চাষীদের ঋণের বোঝা হ্রাস করবার ব্যবস্থা হ'লো; শিক্ষা-ব্যবস্থা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার নানাপ্রকার সংস্কার সাধিত হ'লো। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নিলেই রাতারাতি কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে, এমন একটি আশা ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে আশা অবিলম্বে পূর্ণ না হওয়ায় কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অশান্ত ভাব দেখা দিল। নানাস্থানে কিষাণ আন্দোলন চললো এবং শ্রমিকরাও বহুক্ষেত্রে ধর্মঘট করলো। ১৯৩৭ সালেই প্রায় ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেছিল এবং প্রায় নব্বই লক্ষ কাজের দিন নষ্ট হয়েছিল। অনেক জায়গায় শান্তি-শৃঙ্খলাও ভঙ্গ হ'লো। গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, "Civil liberty is not criminal liberty."

অক্টোবরের শেষাশেষি কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'লো। গান্ধীজী কলকাতা এলেন এবং অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথও ঐ সময় অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তবু তিনি গান্ধীজীকে দেখবার জন্যে ছুটলেন; তাঁকে চেয়ারে বসিয়েই গান্ধীজীর উপাসনাসভায় নিয়ে যেতে হ'লো। তিনি গান্ধীজীর

পাশে অনেকক্ষণ বসলেন, তারপর তাঁকে স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরলেন। গান্ধীজীকে এবার বেশ কিছুদিন কলকাতায় থেকে যেতে হ'লো। তিনি সুভাষচন্দ্রের গৃহেই অতিথিরূপে রইলেন। তিনি রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয়ে গভর্নর এণ্ডারসন ও মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপ করলেন। তাঁর চেষ্টায় সরকার ১১০০ রাজবন্দীকে মুক্তি দিলো। তবু কয়েক শ বন্দী মুক্তি পেলেন না। গান্ধীজী চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া সত্ত্বেও তাঁর শরীরের বিশেষ উন্নতি হ'লো না। ডিসেম্বর মাসে ডাক্তাররা তাঁকে বোম্বাইয়ে জুহুতে বায়ুপরিবর্তনে যেতে পরামর্শ দিলেন।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে বোম্বাইয়ে জওহরলালের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসলো। একমাস জুহুতে থেকে গান্ধীজী সেবাগ্রামে ফিরে এলেন। তাঁর রক্তের চাপ কখনও বাড়ছিল কখনও কমছিল। তা সত্ত্বেও তিনি রোজ এক ঘণ্টা ক'রে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করলেন, পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সেটুকুও তাঁর দুর্বল শরীরের পক্ষে যথেষ্ট অনিষ্টকর হ'লো।

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গুজরাটে তাপ্তী নদীর তীরে হরিপুরায় সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হ'লো। সুদীর্ঘ কয়েক মাস নীরবতার পর গান্ধীজী এখানে নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প ও খাদি প্রদর্শনীর উদ্বোধন ক'রে ভাষণ দিলেন। হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে হঠাৎ যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সংকটের সম্মুখীন হ'লো। এখানে মন্ত্রিসভা সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে চাইলে গভর্নররা তার বিরোধিতা করলেন। বড়লাটও গভর্নরদের সমর্থন জানালেন। ফলে ১৫ই ফেব্রুয়ারি যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলো। গান্ধীজী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে গভর্নর তথা

বড়লাটের এই হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করলেন। এর পর বড়লাটের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ শুরু হ'লো। শেষ পর্যন্ত বড়লাট রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আপোসমূলক মনোভাব দেখালেন এবং হরিপুরা কংগ্রেস থেকে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীরা স্ব স্ব প্রদেশে ফিরলে গভর্নররা তাঁদের ডাকলেন এবং বন্দীমুক্তি সম্পর্কে একটি মীমাংসায় উপনীত হলেন। এইভাবে গান্ধীজীর চেষ্টায় যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে সংকটমোচন হ'লো।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি গান্ধীজী কলকাতায় গেলেন এবং সেখানে অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালালেন। সরকারের অনমনীয়তায় জনসাধারণ ক্রোধে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। বন্দীরা অনশন করবার কথা ভাবছিলেন। গান্ধীজী জনসাধারণকে ধৈর্য ধারণ করতে অনুরোধ জানিয়ে উড়িষ্যা রওনা হ'লেন।

উড়িষ্যার দেলাংয়ে গান্ধী-সেবাসংঘের অধিবেশন বসেছিল। গান্ধীজী দুর্বল শরীর ও মন নিয়ে মার্চ মাসের মাঝামাঝি সেখানে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে এখানে এমন একটি ঘটনা ঘটলো, যা গান্ধীজীকে অত্যন্ত মর্মাহত করলো। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির হরিজনদের জন্যে উন্মুক্ত ছিল না। তাই গান্ধীজী ঐ মন্দিরে যান নি। কিন্তু ২৮শে মার্চ তারিখে কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাইয়ের স্ত্রী দুর্গাবেন গান্ধীজীর অজ্ঞাতে ঐ মন্দিরে দেবদর্শনে গেলেন। গান্ধীজী এই সংবাদ পেয়ে সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটালেন এবং মহাদেব দেশাই ও তাঁর স্ত্রী দুর্গাবেন এবং কস্তুরবাকে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত চাইলেন। কস্তুরবা ও দুর্গাবেন তাঁদের দোষ স্বীকার করলেন। গান্ধীজী বলেন, কস্তুরবার বয়স হয়েছে, এখন তাঁকে এসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু দুর্গাবেনের বয়স অল্প, মহাদেব তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে নিজের কর্তব্যে অবহেলা করেছেন।

১লা এপ্রিল গান্ধীজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্যে কলকাতা এলেন। এখানে তিনি বেশির ভাগ সময়ই রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ব্যয় করলেন। কিন্তু ফলোদয় বিশেষ কিছুই হ'লো না। তিনি আলাপ-আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিলেন। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তিনি সেবাগ্রামে ফিরে এলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কাজকর্ম সম্পর্কে, বিশেষতঃ আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও স্বজন-পোষণ প্রভৃতি সম্পর্কে নানা খবর তাঁর কানে এসেছিল। জওহরলালও এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজীর মন ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। এ ব্যাপারে তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় কংগ্রেসী মন্ত্রী ও আইনসভার সদস্যদের উদ্দেশে একটি নিবন্ধ লিখলেন এবং তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ক'রে দিলেন।

ইতিমধ্যে উড়িষ্যাতেও মন্ত্রিত্ব সংকট দেখা দিল। উড়িষ্যার গভর্নর স্যার হিউব্যাক ছুটি নিলে তাঁর স্থলে একজন সাধারণ সিভিলিয়ান মিঃ ডায়ানকে অস্থায়ী গভর্নর করার প্রস্তাব উঠলে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এটিকে ইচ্ছাকৃত অবমাননা মনে ক'রে পদত্যাগ করতে চাইলেন। গান্ধীজী মন্ত্রিসভার মনোভাব সমর্থন করলেন। শেষ পর্যন্ত স্যার জন হিউব্যাক ছুটি নিলেন না এবং এই সংকটজনক পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হ'লো।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছিল। ইতিমধ্যে যুক্তপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও ঘটেছিল। কলকাতায় মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের যে বিশেষ অধিবেশন হ'লো তাতে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে "মুসলমানদের দুর্দশা ও মুসলমানদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অন্যায়" সম্পর্কে তদন্তের জন্যে পীরপুরের রাজাসাহেবের নেতৃত্বে একটি কমিটি

নিযুক্ত হ'লো। মুসলিম লীগ আইনসভাগুলিতে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত গাওয়া এবং স্কুলে বুনিয়াদী শিক্ষা ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি জানালো। কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গে তাদের মতদ্বৈধ দূর করবার জন্যে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত ২৮শে এপ্রিল গান্ধীজী ও জিন্নার মধ্যে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হ'লো। বোম্বাইয়ে জিন্নার বাড়িতে গান্ধীজী জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন। আলোচনা-শেষে তাঁরা সংক্ষেপে একটি যুক্ত বিবৃতি দিলেন। "আমরা হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে তিন ঘণ্টা ধ'রে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ করেছি। এ বিষয়ে আরো আলাপ-আলোচনা চলবে।"

গান্ধীজী দুর্বল শরীরে বোম্বাই থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাড়ি দিলেন। পথে পাঞ্জাবে তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁকে যে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হ'লো, তাতে তাঁর দুর্বল শরীর আরও অবসন্ন হ'য়ে পড়লো। হৈচৈ তাঁর কাছে এতোই অসহ্য হ'লো যে, তিনি প্রায়ই দু কানে তুলো গুঁজে রইলেন। ১লা মে তিনি নৌসেরায় এসে পৌঁছলেন। এখানে আবদুল গফর খাঁর নেতৃত্বে লাল কোর্তারা যে বিপুল সংবর্ধনা জানালেন, তাতে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা বা চেঁচামেচি ছিল না। পেশোয়ারেও জনতা নীরবে শান্তভাবে পথের দুই পাশে দাঁড়িয়ে থেকে গান্ধীজীকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলো। গান্ধীজী ডাঃ খান সাহেবের বাড়িতে রইলেন। সেখানেও উপাসনা-সভাগুলি অত্যন্ত শান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হ'লো। গান্ধীজী নিজের দুর্বল শরীরে পেশোয়ার থেকে মর্দান পর্যন্ত বিস্তৃত অনেকগুলি গ্রামে সফর করলেন। ৮ই মে তিনি সীমান্ত সফর শেষ ক'রে বোম্বাইয়ে জুহুতে বিশ্রামের জন্যে ফিরে এলেন। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসলো। গান্ধীজী তখন জুহুতে থাকলেও প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নেওয়া হ'লো। ২৬শে এপ্রিল

গান্ধীজী কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন। জিন্না হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে বললেন। কেবল তাই নয়, তিনি মুসলিম লীগের চৌদ্দ দফা দাবী উত্থাপন করলেন, সেই সঙ্গে বললেন যে, ওই দাবীর সংখ্যা বাড়তে পারে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মুসলিম লীগ এগারো দফা দাবী কংগ্রেসের কাছে রাখলো—(১) 'বন্দে মাতরম্' গান বাদ দিতে হবে; (২) এখন যেসব প্রদেশে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু আছে, সেইসব প্রদেশের কোনরকম পুনর্বিন্যাস চলবে না; (৩) গোহত্যার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চলবে না; (৪) মুসলিমদের 'আজান' বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে কোন-রকম বিঘ্ন ঘটানো চলবে না; (৫) মুসলমানদের আইন ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে সাংবিধানিক গ্যারান্টি দিতে হবে; (৬) রাজ্যের চাকরিতে মুসলমানদের অনুপাত সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট ক'রে দিতে হবে; (৭) কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতা ত্যাগ করতে হবে; (৮) উর্দুর ব্যবহার কমানো হবে না, এ বিষয়ে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি দিতে হবে; (৯) স্থানীয় সংস্থাগুলিতে মুসলমানদের অনুপাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় প্রদত্ত অনুপাত অনুসারে করতে হবে; (১০) তেরঙ্গা ঝাণ্ডা বদলাতে হবে বা মুসলিম লীগের পতাকাকে সমমর্যাদা দিতে হবে; (১১) মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা ব'লে স্বীকৃতি দিতে হবে।

ফলে একটি অচল অবস্থার উদ্ভব হ'লো।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় সংকট দেখা দিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের মারাঠী ভাষা ও হিন্দী ভাষা অঞ্চলের মধ্যে যে বিবাদ বেধেছিল, তার ফলে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খারে তাঁর দুজন সহকর্মীসহ পদত্যাগ করেছিলেন এবং সংসদীয় নিয়ম অনুসারে অন্য তিনজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলেছিলেন।

কিন্তু ঐসময় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আসন্ন হওয়ায় তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির পরামর্শের প্রতীক্ষায় রইলেন ও পদত্যাগ করলেন না। গভর্নর তখন তাঁদের কার্যকাল শেষ ব'লে ঘোষণা করলেন এবং ডাঃ খারেকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানালেন। ডাঃ খারে ২৩শে জুলাই তারিখে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ না ক'রেই নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। ডাঃ খারের এই কাজ যে অবৈধ হয়েছে, তা ডাঃ খারেকে বোঝানো হ'লো এবং সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ অনুসারে তিনি গভর্নরের কাছে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। এখন ওয়ার্কিং কমিটি খারেকে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস দলের নেতৃপদ ত্যাগ করতে বললেন। ডাঃ খারে তাতে রাজী হলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নেতানির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সংকল্পও জানালেন। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁকে এই পন্থা অনুসরণে নিষেধ ক'রে ব্যর্থ হ'লে সুভাষচন্দ্র তাঁকে নিয়ে সেবাগ্রামে গান্ধীজীর কাছে গেলেন। গান্ধীজী ডাঃ খারেকে এ বিষয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিতে পরামর্শ দিলেন। ডাঃ খারে প্রথমে রাজী হলেন, কিন্তু পরে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতে চাইলেন না। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হ'লো। শুক্লা মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে যথেষ্ট বাক্‌বিতণ্ডা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো। পুণায় এক জনসভায় ডাঃ খারে কংগ্রেস নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করলেন। ৬ই আগস্ট তারিখে গান্ধীজী ডাঃ খারের আচরণ এবং মধ্যপ্রদেশের গভর্নরের হটকারীসুলভ কার্যের তীব্র সমালোচনা ক'রে একটি বিবৃতি দিলেন। তখন গান্ধীজীর সমালোচনায় ডাঃ খারে, তাঁর সমর্থকরা ও কংগ্রেসবিরোধীরা এক-জোট হলেন। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর কার্যে পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

গান্ধীজীর শরীর আদৌ ভালো যাচ্ছিল না। তাঁর রক্তের চাপের অনিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি অত্যন্ত উদ্‌বেগের কারণ হয়েছিল। সেজন্য

তিনি ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাস থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মৌন অবলম্বন করলেন। এই সময়ে চীন থেকে অধ্যাপক তাও এসেছিলেন। তিনি চীনের উপর জাপানের নৃশংস আক্রমণ সম্পর্কে গান্ধীজীর পরামর্শ চাইলে গান্ধীজী তাঁকে লিখে জানালেন, "আমি এখন এই সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না। আমার' পদ্ধতি এমন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যে, তা আপনাদের এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য। আপনি রাতারাতি কোনও সংগ্রামের গতি পরিবর্তন করতে পারেন না। সশস্ত্র কোন জাতি কখনও অকস্মাৎ অস্ত্রত্যাগ ক'রে অহিংসাকে হাতিয়াররূপে গ্রহণ করতে পারে না।"

আগস্ট মাসের শেষাশেষি একদল হরিজন মন্ত্রিসভাগুলিতে একজন ক'রে হরিজন সম্প্রদায়ের মন্ত্রী নেওয়ার দাবীতে সেবাগ্রামে গান্ধীজীর আশ্রমে এসে সত্যাগ্রহ করলো। গান্ধীজী তাদের জানালেন, এ বিষয়ে তাঁর করণীয় কিছু নেই ; তবে তিনি নিজের আশ্রমে তাদের থাকবার ও সত্যাগ্রহ করবার জন্যে স্থান ক'রে দেবেন। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য থেকে গণ-আন্দোলনের সংবাদ আসতে লাগলো। মহীশূরে গণ-আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল এবং গান্ধীজী ও কংগ্রেসের চেষ্টায় সেখানে প্রজাদের জাতীয় আন্দোলনের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছিল। মহীশূর রাজ্যের দেখাদেখি জাতীয় আন্দোলন ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়লো। ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদে দেশীয় রাজারা প্রজাদের উপর চরম নির্যাতন শুরু করলো। গান্ধীজী তাঁর "হরিজন" পত্রিকায় "রাজ্যসমূহ ও দায়িত্ব" শীর্ষক একটি নিবন্ধ লিখলেন। দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে রাশি রাশি পত্র আসতে লাগলো গান্ধীজীর কাছে। মহাদেব দেশাই ও পিয়ারেলালের মতো সচিবরাও সেগুলির চাপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো এবং তাতে ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ, ঢেনকানল, তালচের ও কাশ্মীরে দেশীয়

রাজন্যবর্গের দমননীতির তীব্র নিন্দা করা হ'লো। ব্রহ্মদেশ, প্যালেস্টাইন ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে যেসব ঘটনা ঘটছিল, সেগুলি সম্বন্ধেও ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করলো। যেসকল কংগ্রেস কর্মী নাগরিক অধিকারের নামে হিংসাত্মক কার্যের প্ররোচনা দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। গান্ধীজীর মৌন চলতে থাকলেও তিনি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মনোযোগের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করলেন। ইউরোপে হিটলার কর্তৃক চেকো-স্লোভাকিয়া অধিকারের ফলে যে যুদ্ধের কালো ছায়া নেমে এসেছিল সেদিকে লক্ষ্য রেখে দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন দীর্ঘতর হ'লো। কিন্তু ৩০শে সেপ্টেম্বর মিউনিক চুক্তি হওয়ায় যুদ্ধের কালো ছায়া আপাততঃ সরে গেল এবং ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনশেষে গান্ধীজী দিল্লী ত্যাগ ক'রে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সফরে গেলেন। সারা অক্টোবর মাস তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ঘুরে বেড়ালেন এবং নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেবাগ্রামে ফিরলেন।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসলো। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব সংক্রান্ত প্রস্তাবটির খসড়া গান্ধীজী নিজে প্রস্তুত ক'রে দিলেন। প্যালেস্টাইনে আরবদের অবস্থা, ইউরোপে ইহুদীদের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাবগুলি 'হরিজনে' গান্ধীজীর লিখিত নিবন্ধের সূত্র অনুসারেই রচিত হ'লো। ওয়ার্কিং কমিটি হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগকে সাম্প্রদায়িক সংস্থা ব'লে ঘোষণা ক'রেও প্রস্তাব গ্রহণ করলো। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পাটনায় মুসলীম লীগের যে অধিবেশন হ'লো, তাতে বলা হ'লো হিন্দু-মুসলিম সমস্যা-সমাধানের সকল চেষ্টাই কংগ্রেসের শিলাপৃষ্ঠে চূর্ণিত হয়েছে এবং গান্ধী কংগ্রেসকে একটি পুরোপুরি সাম্প্র-দায়িক হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। অন্য পক্ষে হিন্দু

মহাসভার নাগপুর অধিবেশনে সভাপতি সাভারকর ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেস থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে, কারণ কংগ্রেস ক্রমেই অধিকতর হিন্দুবিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে।

এইভাবে ধীরে ধীরে ১৯৩৮ সাল অতিবাহিত হ'লো। এই সময়টা সেবাগ্রামে গান্ধীজীর আশ্রম বৈদেশিক অতিথিতে প্রায়ই পূর্ণ থাকতো।

চব্বিশ

অন্তর্দ্বন্দ্ব—দেশীয় রাজ্য—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বড়ভাবে দেখা দিলো, সেটা হ'লো কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের জন্যে সভাপতি-নির্বাচন। নির্বাচন হওয়ার কথা ২৯শে জানুয়ারি। সভাপতি-পদের প্রার্থীরূপে মওলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র ও ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার নাম শোনা যেতে লাগলো। সকলেই আশা করতে লাগলেন, এঁদের মধ্যে দুজন প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করবেন এবং তৃতীয়জন সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হবেন। শেষ পর্যন্ত আজাদ স্বাস্থ্যের কারণে প্রার্থী হ'তে অসম্মত হলেন এবং ডঃ সীতারামাইয়ার প্রার্থীপদ সমর্থন করলেন।

সুভাষচন্দ্র পরদিন সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে জানালেন, কংগ্রেসের সভাপতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমেই নির্বাচিত করা উচিত। কারণ সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম যতোই তীব্রতর হচ্ছে, ততোই নূতন ধ্যান-ধারণা, নূতন চিন্তা, নূতন সমস্যা, নূতন কর্মসূচী দেখা দিচ্ছে। তাই এই অবস্থায় অন্যান্য সকল স্বাধীনদেশের মতোই সমস্যা ও কর্মসূচীর ভিত্তিতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন হ'ক।

সুভাষচন্দ্রের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তাবের উপযোগিতা অস্বীকার ক'রে গান্ধীজীর পরামর্শমতো ওয়ার্কিং কমিটির সাতজন সদস্য—সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যমুনালাল বাজাজ, জয়রামদাস দৌলতরাম, শঙ্কররাও দেও, ভুলাভাই দেশাই ও কৃপালনী—বারদৌলি থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করলেন। তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি-পদপ্রার্থী না হ'তে এবং ডঃ সীতারামাইয়া যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন, সে চেষ্টা করতে অনুরোধ জানালেন। ওয়ার্কিং কমিটি বহু চিন্তা-বিবেচনার পর ডঃ

সীতারামাইয়াকে সভাপতি-পদের জন্য নির্বাচিত করেছেন ব'লেও বিবৃতিতে বলা হ'লো।

প্রত্যুত্তরে সুভাষচন্দ্র জানালেন, "ডঃ সীতারামাইয়ার সমর্থনে ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলা হয়েছে; অথচ আমি ও ওয়ার্কিং কমিটির আমার কতিপয় সহকর্মী এ সম্পর্কে কিছুই জানলাম না। তাই আমার মতে, বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর দিয়েছেন, তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে নয়, ব্যক্তিগত কংগ্রেসকর্মীরূপে এই বিবৃতি দিলেই ভালো করতেন। তাছাড়া সভাপতি নির্বাচন-ব'লে যদি প্রকৃত কিছু করা হয়, তবে তাতে নৈতিক জুলুম বাদ দিয়ে ভোটদানের স্বাধীনতা থাকা উচিত। অন্যথায় এই নির্বাচন ব্যবস্থারই বা প্রয়োজন কি, ওয়ার্কিং কমিটিই সভাপতি নির্বাচন করলে পারেন। কোনও ব্যক্তিকে বিশেষ পরিস্থিতিতে ভিন্ন সভাপতিপদে পুনর্নির্বাচিত করা হয় না, এইরকম নিয়ম আছে ব'লে যা বলা হচ্ছে, তা-ও নূতন শুনছি। কংগ্রেসের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একই ব্যক্তি একাধিক বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কংগ্রেসের সভাপতি চিরকাল সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন, এ কথা শুনেও বিস্মিত হচ্ছি। কারণ, আমার স্মরণ আছে, আমি একজন প্রার্থীর তুলনায় অন্য প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভোট দিয়েছিলাম। সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন-সম্প্রতিই শুরু হয়েছে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের নূতন সংবিধান গ্রহণের পর অন্ততঃপক্ষে তত্ত্বগতভাবে সভাপতিই তাঁর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোনীত ক'রে থাকেন। ঐ বছর থেকেই কংগ্রেসের সভাপতিকে উচ্চতর আসন দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, এই নূতন রীতি কংগ্রেস সভাপতি ও তাঁর নির্বাচনকে কেন্দ্র ক'রে বিকাশ লাভ করবে। এখন আর সভাপতির পদ সভার সভাপতিদের সমতুল্য নয়। এখন সভাপতির পদ প্রধান মন্ত্রী বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

যাঁরা নিজেদের মন্ত্রিসভা মনোনয়ন করেন, তাঁদের পদের অনুরূপ।”

তিনি আরও বললেন যে, “নীতি ও কর্মসূচীর প্রশ্ন অবান্তর নয়। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন অনেক আগেই দেখা দিত। দেখা দেয় নি, কারণ, ১৯৩৪ সালের পর প্রতি বৎসরই একজন বামপন্থীই দক্ষিণ-পন্থী ও বামপন্থীদের মিলিত সমর্থনে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু এ বৎসর তার ব্যতিক্রম হয়েছে, একজন দক্ষিণপন্থীকে সভাপতিপদের জন্য দাঁড় করানো হচ্ছে। তা অর্থহীন নয়। একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ সম্পর্কে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে সমঝওতা হ’তে পারে। এইজন্যই, পাছে একজন বামপন্থী সভাপতি তাঁদের সমঝওতার জন্যে আলাপ-আলোচনার পথে কণ্টকস্বরূপ হন, তাই দক্ষিণপন্থীরা কোন বামপন্থীকে সভাপতি করতে চান না।......সুতরাং এমন একজনের সভাপতি হওয়া চাই, যিনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরোধী।” সুভাষচন্দ্র সেই সঙ্গে বললেন, আচার্য নরেন্দ্র দেবের মতো কোনও বামপন্থীকে সভাপতি-পদের জন্যে প্রার্থী করলে তিনি প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে রাজী আছেন।

২৭শে জানুয়ারি জওহরলাল একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন যে, কংগ্রেস যখন সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের বিরোধী, তখন নীতি ও কর্মসূচীর এই প্রশ্ন কেন উঠছে তিনি বুঝতে পারছেন না। কারণ, কংগ্রেস বা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিই নীতি নির্ধারণ করে এবং সভাপতি সেই নীতিকে কার্যে পরিণত করেন।

২৮শে জানুয়ারি তারিখে গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় “অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়” নামে একটি নিবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি কংগ্রেসে ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খলাভঙ্গের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন।

শেষে বললেন, "কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা থেকে আমি কেবল দেশের সম্মুখে অরাজকতা ও রক্তাক্ত ধ্বংসের পথই দেখতে পাচ্ছি।"

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি-পদে প্রার্থীরূপে অবিচল রইলেন। তিনি ডঃ সীতারামাইয়াকে ২০৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত ক'রে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ৩১শে জানুয়ারি এই ফলাফল ঘোষিত হ'লে বারদৌলি থেকে গান্ধীজী "এই পরাজয়ে আমি আনন্দিত" ব'লে একটি বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন, তিনি সুভাষচন্দ্রের পুনরায় সভাপতি নির্বাচনের বিরোধিতা করলেও তাঁর জয়লাভে তিনি আনন্দিত। যেহেতু তিনিই ডঃ সীতারামাইয়াকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে দেননি, সেইহেতু ডঃ সীতারামাইয়ার পরাজয় তাঁরই পরাজয়, গান্ধীজীর এই মন্তব্যে কিন্তু সুভাষচন্দ্র ব্যথিত হলেন। তিনি বললেন, গান্ধীজীর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে। "আমি যদি অন্যান্য লোকের বিশ্বাস অর্জন করতে পারি, কিন্তু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে না পারি, তবে তা আমার পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক হবে।"

এদিকে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে আন্দোলন ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছিল। দেশীয় রাজারাও আন্দোলন দমনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে রাজকোটেও আন্দোলন চলছিল। রাজকোটের সঙ্গে গান্ধী-পরিবারের সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। রাজকোটের বর্তমান ঠাকুরসাহেবের বাবার সঙ্গে গান্ধীজীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল এবং গান্ধীজীকে তিনি পিতার মতো ভক্তি করতেন। রাজকোটের বর্তমান ঠাকুরসাহেব সর্দার বল্লভভাইয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কাছে মাথা নুইয়েছিলেন এবং প্রজাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। চুক্তি অনুসারে স্থির হয়েছিল, ঠাকুরসাহেব শাসন-সংস্কারের জন্যে এগারোজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করবেন এবং ঐ এগারোজন সদস্যের সাতজনকে সর্দার প্যাটেল মনোনীত

করবেন। কিন্তু ঠাকুরসাহেব সর্দার প্যাটেল-মনোনীত মাত্র চারজন সদস্যকে কমিটিতে স্থান দিলে সর্দার প্যাটেল এই চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে পুনরায় আন্দোলন শুরু করলেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজীকে জরুরী কারণে সেবাগ্রামে ফিরে যেতে হ'লো। কস্তুরবা বারদৌলি থেকে রাজকোটে গেলেন। রাজকোটে তাঁর শ্বশুরবাড়িই নয়, পিত্রালয়ও। তাই রাজকোটের এই আন্দোলন থেকে তিনি দূরে থাকতে পারলেন না। মণিবেন প্যাটেল প্রভৃতি মহিলারা কারাবরণ করলে কস্তুরবাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং গ্রেপ্তার হলেন। গান্ধীজী কস্তুরবার গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ, কস্তুরবা ছিলেন রুগ্ণা এবং কারাগারের কঠোর দুঃখবরণের বয়সও তাঁর ছিল না। ৩১শে জানুয়ারি গান্ধীজী রাজকোট সম্পর্কে যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখলেন, তাতে তিনি রাজকোটের এই অবস্থার জন্যে রাজকোটের বৃটিশ রেসিডেন্টকেই পুরোপুরি দায়ী করলেন। তিনি দেখালেন, কিভাবে বৃটিশ রেসিডেন্ট ঠাকুরসাহেবকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বাধ্য করেছেন এবং কিভাবে ঠাকুরসাহেবকে বন্দীপ্রায় রেখে সত্যাগ্রহীদের উপর উৎপীড়ন-অত্যাচারের তাণ্ডব শুরু করেছেন।

কাশ্মীর থেকে মহীশূর পর্যন্ত সমস্ত দেশীয় রাজ্যেই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলো। বড়লাট নিজে দেশীয় রাজ্যগুলি সফর ক'রে বেড়াতে লাগলেন। দেশীয় রাজারা প্রায় সকলেই শাসন-সংস্কারের কথা ঘোষণা করলেন এবং সেই সঙ্গে আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন তীব্র থেকে তীব্রতর ক'রে তুললেন।

এদিকে কংগ্রেসের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠলো। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শের জন্যে সেবাগ্রামে গেলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হ'লো। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তার কোন সমাধান না হ'লেও সমাধানের দু-একটি

সূত্রের সন্ধান করা হ'লো। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে বললেন, "দেশের সর্বাধিক মঙ্গল হ'তে পারে ব'লে যাতে তুমি বিশ্বাস করো, তাকে আমার মতের বশীভূত করা তোমার পক্ষে আত্মদমন হবে। তোমাকে যদি সভাপতিরূপে কাজ করতে হয়, তবে তোমার হাত বাঁধা থাকলে চলবে না। দেশের এই পরিস্থিতিতে মধ্যপন্থার কোন সুযোগ নেই।" সেই সঙ্গে এ-ও জানানো হ'লো যে, ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের কর্মসূচী আলোচনার জন্যে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে। সুভাষচন্দ্র সেবাগ্রাম থেকে কলকাতা ফিরে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে পারলেন না। সুভাষচন্দ্র তাঁর অনুপস্থিতিতে যাতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া না হয়, সেজন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বন্ধ রাখবার জন্যে তারবার্তা পাঠালেন। ২২শে তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য—সর্দার প্যাটেল, মওলানা আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, ভুলাভাই দেশাই, ডঃ সীতারামাইয়া, শঙ্কররাও দেও, মহাতাব, কৃপালনী, দৌলতরাম, বাজাজ ও খান গফর খান—পদত্যাগ করলেন। পরে জহরলালও তাঁদের অনুসরণ করলেন। এঁদের এই আকস্মিক পদত্যাগ জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। তাঁরা সভাপতির উদ্দেশে লিখিত এক যুক্ত পত্রে বললেন, "আমরা মনে করি, কংগ্রেসের বিরোধী উপদলগুলির আপোসের ভিত্তিতে নয়, একটি সুস্পষ্ট কর্মনীতির ভিত্তিতেই দেশের পরিচালিত হওয়ার উপযুক্ত এসেছে। সুতরাং আপনার স্বমতবাদী লোকদের নিয়েই মন্ত্রণাপরিষদ্ গঠন করাই উচিত, কারণ তাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রতিফলিত হবে।" গান্ধীজীই এই চিঠির খসড়া ক'রে দিয়েছিলেন ব'লে অনেকে মনে করেন। নেহেরুজীও একটি পত্র লেখেন। তা থেকে জানা যায়, তিনি সভাপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণপন্থীদের সম্পর্কে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ নিয়ে

যে মন্তব্য করেছিলেন, তা সুভাষচন্দ্রকে প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তা না করায় ওয়ার্কিং কমিটির তেরোজন সদস্য পদত্যাগ করেছেন এবং গান্ধীজীও তা অনুমোদন করেছেন। এই অবস্থায় জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন না; তবে তিনি তাঁর পূর্বে যাঁরা পদত্যাগ করেছেন, তাঁদের সঙ্গেও সহযোগিতা করবেন না।

এদিকে রাজকোট থেকে সত্যাগ্রহীদের কারাগারে নির্যাতন ও অনশনের সংবাদ এসে পৌঁছেছিল। রাজকোটের সরকার তার সত্যতা অস্বীকার করলেও গান্ধীজী ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাজকোট রওনা হয়ে গেলেন। তিনি ২৮শে ফেব্রুয়ারি রাজকোটে পৌঁছে রাজকোট সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন এবং জেলগুলি ঘুরে দেখলেন। রাজকোট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হৃদ্যতার মধ্যে শুরু হ'লেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লো। ৪ঠা মার্চ তারিখে গান্ধীজী বড়লাটকে রাজকোটের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র লিখলেন। যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও সিন্ধুর মুখ্য মন্ত্রীরাও বড়লাটকে অনুরূপ অনুরোধ জানিয়ে তারবার্তা পাঠালেন। গান্ধীজী রাজকোট কর্তৃপক্ষের কার্যের প্রতিবাদে অনশন শুরু করেছিলেন। তাঁর অনশনের তৃতীয় দিনে কয়েকটি প্রদেশের মন্ত্রিসভা পদত্যাগেরও ভয় দেখালেন। গান্ধীজী ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়লেন। কস্তুরবাকে জেল থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে গান্ধীজীর বাসভবনে আনা হ'লো। অন্যান্য মহিলা সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দেওয়া হয়নি জেনে গান্ধীজী কস্তুরবাকে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। ৬ই মার্চ তারিখে গান্ধীজীর অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগ-জনক হয়ে উঠলো। বড়লাট তাঁর রাজস্থান সফর বন্ধ রেখে দ্রুত দিল্লীতে ফিরলেন এবং ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গায়ারকে রাজকোটের ব্যাপারে সালিস নিযুক্ত করবার কথা ঘোষণা করলেন। ৭ই মার্চ তারিখে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন।

এদিকে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়েছিল। ৭ই মার্চ সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থাতেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। ১০ই মার্চ কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে প্রায় দু'লক্ষ নরনারী যোগ দিলো। কিন্তু সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় অধিবেশনে যোগ দিতে পারলেন না এবং মওলানা আজাদ তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু সভাপতির লিখিত ভাষণটি পাঠ করলেন। ভাষণটি সংক্ষিপ্ত হ'লেও তাতে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন যে, যদি বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর দাবী ছ মাসের মধ্যে মেনে না নেয়, তবে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে। তিনি একথাও বললেন যে, এখন ভারতের ইংরেজ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতা করছে। তাই হরিপুরা কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তা সংশোধন ক'রে দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসাধারণের আন্দোলনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করা হ'ক। অধিবেশনের শেষ দিনে যুক্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ গান্ধীজীর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশ ক'রে এবং কংগ্রেসে তাঁর মহান্ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা ক'রে একটি প্রস্তাব আনলেন। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী রাজাগোপালাচারী তা সমর্থন করলেন। এই প্রস্তাবটি নিয়ে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হ'লেও বিপুল ভোটাধিক্যে তা গৃহীত হ'লো।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হ'লে দেশবাসীর দৃষ্টি আবার রাজকোটের দিকে নিবদ্ধ হ'লো। গান্ধীজী অনশনশেষে দিল্লী যাওয়ার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল থাকায় ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে তাঁকে কয়েকদিন রাজকোটে রয়ে যেতে হ'লো। অবশেষে ১৫ই মার্চ তিনি দিল্লীতে পৌঁছলেন এবং বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য থেকে

নির্যাতন ও নিপীড়নের সংবাদ ক্রমাগত আসতে লাগলো। গান্ধীজী অধীর হয়ে উঠলেন। ৩রা এপ্রিল ভারতের প্রধান বিচারপতি গান্ধী ও প্যাটেলের বক্তব্য সমর্থন ক'রেই রায় দিলেন। ৪ঠা ও ৫ই তারিখে গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ৭ই এপ্রিল তারিখে বড়লাট গান্ধীজীকে লিখিতভাবে জানালেন যে, ঠাকুরসাহেব যাতে তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করেন, সে বিষয়ে তিনি ব্যবস্থা করবেন। দিল্লীতে কাজ শেষ হওয়ায় তিনি রাজকোট রওনা হলেন।

গান্ধীজী রাজকোটে পৌঁছে ঠাকুরসাহেবকে প্রধান বিচারপতির রায় অনুসারে সর্দার প্যাটেলের মনোনীত সাতজন সদস্য সহ অবিলম্বে শাসনসংস্কার কমিটি গঠনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলেন। ঠাকুরসাহেব কমিটিতে দুজন মুসলিম ও একজন ভায়াট সদস্য নেওয়ার যৌক্তিকতা দেখিয়ে ঐ সদস্যদের সর্দার প্যাটেলের মনোনীত সদস্যদের মধ্যে স্থান দিতে বললেন। গান্ধীজী ঐ সদস্যদের ঠাকুরসাহেবকে তাঁর মনোনীত সদস্যদের মধ্য থেকেই নিতে পরামর্শ দিলেন। ফলে অচলাবস্থা দেখা দিল। গান্ধীজী রাষ্ট্রীয় শাসন ময়দানে প্রতিদিন উপাসনাসভা করতেন। খবর এলো মুসলিম ও ভায়াট সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে কালো পতাকা দেখাতে ও তাঁর গলায় জুতোর মালা দিতে আসবে। যাই ঘটুক না কেন, তাঁর সভায় আসতে কাউকে যেন বাধা দেওয়া না হয়, গান্ধীজী এই মর্মে একটি নির্দেশ দিলেন। গান্ধীজী মোটরে ক'রে ময়দানে পৌঁছলে প্রায় ছ শ জন বিক্ষোভকারী কালো পতাকা ও গালাগালিপূর্ণ প্ল্যাকার্ড নিয়ে এসে উপাসনা-প্রাঙ্গণ ঘিরে দাঁড়ালো। গান্ধীজী তাদের নমস্কার জানিয়ে উপাসনায় বসলেন। উপাসনা চলাকালে বিক্ষোভকারীরা সারাক্ষণ চীৎকার ও চেঁচামেচি করতে লাগলো। গান্ধীজী উপাসনা শেষ হ'লে চ'লে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। এখন বিক্ষোভকারীরা প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগলো। গান্ধীজী গাড়িতে না গিয়ে ভীড়ের মধ্য দিয়েই এগিয়ে

চললেন। গান্ধীজীর সঙ্গীরা তাঁকে ঘিরে একটি বেষ্টনী রচনা করবার চেষ্টা করলে তিনি বাধা দিয়ে বললেন, আমি একাই ওদের মধ্য দিয়ে যাব। হঠাৎ তিনি কোমরে দুঃসহ বেদনা অনুভব করলেন এবং মূর্ছিত হয়ে পড়বার উপক্রম করলেন। খুব মানসিক চাপ বোধ করলে এরকম তাঁর প্রায়ই হ'তো। তিনি সেই জনতার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিশ্চল হয়ে চোখ বুজে লাঠিতে ভর দিয়ে কয়েক মূহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন ও নীরবে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। কিছুটা সুস্থ বোধ করলে তিনি ভীড়ের মধ্য দিয়েই একাকী অগ্রসর হওয়ার দৃঢ় সংকল্প জানালেন। তিনি একজন ভায়াট সম্প্রদায়ের লোককে বললেন, আমি তোমার সঙ্গেই যেতে চাই, আমার অনুচরদের সঙ্গে নয়। ভায়াট সম্প্রদায়ের অনেকেই গান্ধীজীর শারীরিক অবস্থা লক্ষ্য করেছিল, তারা গান্ধীজীকে পথ ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলো। গান্ধীজী ভায়াট সম্প্রদায়ের লোকটির কাঁধে ভর রেখে এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

কিন্তু সমস্যা আরও দুরূহ হয়ে উঠলো। মিঃ জিন্না মুসলিম সম্প্রদায়কে শাসন সংস্কার কমিটিতে যোগদানে বিরত থাকার জন্যে ফতোয়া জারী করলেন। আম্বেদকর ছুটে এলেন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে কমিটিতে গ্রহণের জন্যে চাপ দিলেন। রাজকোট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চললো। কিন্তু কোন ফলোদয় হ'লো না। গান্ধীজী তিতিবিরক্ত হয়ে রাজকোট ত্যাগ ক'রে বোম্বাই রওনা হলেন। রাজকোট ত্যাগকালে তিনি বললেন, "রাজকোট আমার যৌবন কেড়ে নিয়েছে। আমি যে বৃদ্ধ হয়েছি, এতোদিন তা বুঝিনি; এখন অনুভব করছি।"

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্রের সনির্বন্ধ অনুরোধক্রমে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যোগদানের জন্যে গান্ধীজী কলকাতা রওনা হলেন। ২৯শে এপ্রিল অধিবেশন সুরু হ'লো। সুভাষচন্দ্র জানালেন যে, গান্ধীজী এবং পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির

কতিপয় সদস্যের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি গান্ধীজীর একটি পত্র সভায় পড়ে শোনালেন :

"তুমি আমাকে পণ্ডিত পন্থ কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম দিতে বলেছ। আমি তোমাকে আমার চিঠিপত্রে ও তারবার্তাগুলিতে জানিয়েছি, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর অনেক কিছুই ঘটেছে। তোমার নিজস্ব মতামত জানি এবং মূল নীতির সঙ্গে অধিকাংশ সদস্যের মতপার্থক্য রয়েছে, তা-ও জানি। এই অবস্থায় আমি যদি তোমাকে নামগুলি দিই, তবে তা তোমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। এই অবস্থার কথা আমি বিশদভাবে আমার পত্রগুলিতে জানিয়েছি। এই তিন দিন ধ'রে আমাদের যে ঘনিষ্ঠ আলোচনা হয়েছে, তাতে-ও আমার মতামতের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। আমি তোমাকে পুরাতন সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছি; তাতে পরস্পরের মধ্যে সমঝওতা সম্ভব; এবং তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছ, এটা জানতে পারলে আমার মতো সুখী আর কেউ হবে না। তারপর কি ঘটেছে, তা আমি আলোচনা করতে চাই না। তুমি এবং উপস্থিত পূর্বতন সদস্যরা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে অবস্থাটা সুস্পষ্ট ক'রে তুলতে পারবে। পারস্পরিক মীমাংসা যে হয় নি, সেটাই আমার কাছে সর্বাধিক পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। আশা করি, যাই করা হ'ক না কেন, তা পরস্পরের শুভেচ্ছা নিয়েই করা হবে।"

এই পত্রটি পড়ার পর সুভাষচন্দ্র সভাপতি-পদে ইস্তফা দিয়ে একটি বিবৃতি পাঠ করলেন। তাতে তিনি সামনে যে সংগ্রামের দিনগুলি আসছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে একটি দক্ষিণপন্থী ও বাম-পন্থীদের ঐক্যবদ্ধ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের একান্ত প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করলেন এবং ঐরূপ একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে তাঁর অক্ষমতার দরুনই তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করছেন ব'লে ঘোষণা করলেন।

তিনি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ জানালেন। জওহরলাল এই অবস্থায় উপস্থিত সদস্যগণকে সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার ক'রে পূর্ব বৎসরের (১৯৩৮) ওয়ার্কিং কমিটিকেই পুনরায় মনোনীত করবার জন্যে অনুরোধ করতে বললেন। সুভাষচন্দ্র নেহরুজীর এই পরামর্শগ্রহণে সম্মত হলেন না। সভায় হৈ হৈ হট্টগোল শুরু হ'লো এবং চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঐদিনের অধিবেশন শেষ হ'লো।

পরদিন পুনরায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো। নেহরু জানালেন যে, তিনি যে প্রস্তাব করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল এই সংকটজনক সমস্যার সমাধান করা,—সুভাষচন্দ্রের ঘাড়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটিকে চাপিয়ে দেওয়া নয়। সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাব অনুমোদন না করলে এই প্রস্তাবের কোনও মূল্য নেই। সুতরাং জানা দরকার সুভাষচন্দ্র পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে এবং পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুমোদন দিতে ইচ্ছুক কিনা।

সুভাষচন্দ্র বললেন, নেহরুজী তাঁকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে বলায় তিনি গৌরব বোধ করছেন। কিন্তু তিনি গভীরভাবে চিন্তা ক'রেই পদত্যাগ করেছেন; সুতরাং এখন তা প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

এই অবস্থায় শ্রীমতী নাইডু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে একজন নূতন সভাপতি নির্বাচন করতে বললেন। সভায় রাজেন্দ্র-প্রসাদ বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্যে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতির আসন থেকে ঘোষণা করলেন যে, পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিই বহাল থাকবে এবং এ বিষয়ে তিনি গান্ধীজীর অনুমোদন পেয়েছেন; তবে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল উভয়ে এই কমিটিতে থাকতে অসম্মত হয়েছেন।

অধিবেশন শেষ হওয়ার পর ৩রা মে তারিখে সুভাষচন্দ্র

কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে একটি উপদল গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। এই উপদলের নাম হ'লো ফরওয়ার্ড ব্লক। এর উদ্দেশ্য হ'লো দেশের সমস্ত প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা।

কলকাতা থেকে গান্ধীজী বৃন্দাবনে গান্ধীসেবাসংঘের অধিবেশন উদ্বোধন করতে গেলেন। ১০ই মে সংঘের অধিবেশন শেষ হ'লো। ১২ই মে গান্ধীজী বৃন্দাবন থেকে রাজকোটে ফিরে এলেন। প্রধান বিচারপতির রায়ের ফলে সমস্যার সমাধান হয় নি, বরং পারস্পরিক সন্দেহ ও রেষারেষি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই তিনি ঐ রায়কে বাদ দিয়েই ঠাকুরসাহেবের সততার উপর সমস্ত বিষয়টি ছেড়ে দিলেন। গান্ধীজীর অনুগামীরা প্রথমে হতচকিত, এমন কি ক্ষুব্ধও হলেন। কিন্তু শীঘ্রই সুফল দেখা গেল। ঠাকুরসাহেব মীমাংসার পথই বেছে নিলেন।

গান্ধীজী রাজকোট থেকে ফিরে এলে ৩রা জুন একটি পানবর্জন-বিরোধী প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বোম্বাইয়ে ১লা আগস্ট থেকে পানবিরোধী আইন চালু হওয়ার কথা ছিল। তাই প্রতিনিধিদল জানালেন যে, পানবিরোধী আইন চালু হ'লে হাজার হাজার পার্শী পরিবার বেকার হয়ে পড়বে, ফলে তাদের দারিদ্র্য-দুর্দশার সীমা থাকবে না। এই আইন চালু হ'লে চোরাই কারবারও বাড়বে; কেবল তাই নয়, ১লা আগস্টের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট লাখ টাকার সঞ্চিত মদ্য বিক্রয় করাও সম্ভব নয়। গান্ধীজী প্রতিনিধি-দলকে জানালেন যে, তাঁদের উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা নীতি-গত ভাবে পানবর্জনবিরোধী নয়; তাঁরা কেবল এই ব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত কয়েকটি অসুবিধার কথা বলছেন। এইসব অসুবিধা বিবেচনা ক'রে দেখবার জন্যে মন্ত্রিসভা আছেন, তাঁরাই এর সদুত্তর দিতে পারবেন। তবে নীতিগতভাবে যা তিনি ভালো মনে করেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি তা সকল ক্ষতির বিনিময়েও ত্যাগ করতে

প্রস্তুত। প্রতিনিধিদলের একজন তাড়ি তৈরি বন্ধ ক'রে দিলে অনেক তাড়িওয়ালা বেকার হয়ে যাবে, এই প্রশ্ন তুললে, তিনি তাল ও খেজুর রস থেকে তাড়ি না ক'রে তাদের গুড় তৈরি করতে পরামর্শ দেন এবং এ বিষয়ে বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের উল্লেখ করেন। স্যার কোয়াসজী জাহাঙ্গীর, স্যার জে. সি. কোয়াজী, স্যার এচ. পি. মোদি, মিঃ খারেঘাট, মিঃ এ. ডি. শ্রফ ও মিঃ সকলতওয়ালাকে নিয়ে গঠিত আরও একটি পানবর্জনবিরোধী প্রতিনিধিদল গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন; তাঁদের কেউ কেউ বললেন, আমরা ব্যক্তিগতভাবে মদ্যপান করি না, কিন্তু সরকারের ওই ধরনের বাধ্যতামূলক আইনের বিরোধী; আবার কেউ কেউ বললেন, তাঁরা অল্পস্বল্প মদ্যপান করেন; অনেকেই যাঁরা পানবর্জনের কথা বলেন, তাঁরাও অনেকে গোপনে ক'রে থাকেন; তাছাড়া, খাদ্যপানীয় (bread and wine) দেওয়া তাঁদের সামাজিক রীতি; এতে হস্তক্ষেপ অন্যায়।

গান্ধীজী ওঁদের বললেন, "দাদাভাইয়ের কাছে মাদকবর্জন শিখেছি। মদ্যপানবর্জন ও মাতাল না হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ; কারো ভোলা চলে না যে, সে সামাজিক জীব, তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পদে পদে খর্ব করতে হয়। আমি আপনাদের একটি বিষয়ে বিবেচনা ক'রে দেখতে বলব। আপনাদের সংখ্যা কত? পঁয়ত্রিশ কোটির মধ্যে বড়জোর এক লাখ। আপনারা পারস্যের নয়, ভারতের অধিবাসী রূপে জগতে খ্যাতিলাভ করেছেন। আপনাদের আমি বিষয়টিকে এক লাখের দিক থেকে নয়, সারা ভারতের দিক থেকে বিবেচনা ক'রে দেখতে বলি। আপনারা এই সুমহৎ পরীক্ষাকে কিভাবে ব্যাহত ও বিনষ্ট করতে চান? আপনারা বলছেন, এই অভ্যাস আপনারা ছাড়তে পারবেন না। এতে আপনারা নিজেদের প্রতি সুবিচার করছেন না। আপনারা কতো কি তো ছেড়েছেন। আপনারা

আপনাদের ভাষা ছেড়ে গুজরাটী নিয়েছেন; আপনাদের পোশাক বদলেছেন; বহু রীতিনীতিও রদবদল করেছেন। তবে এই দুর্বলতাটাই বা আঁকড়ে থাকবেন কেন? আপনারা ভারতের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন, এটুকুও বিসর্জন দেন।"

বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসেছিল, তাই গান্ধীজী জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে পৌঁছলেন। ২৪শে জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উদ্দেশে কংগ্রেস সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে বললেন: "বিশ্ব তথা ভারত যে সংকটমুহূর্তের সম্মুখীন হ'তে চলেছে, তাতে আমরা সারা ভারতের স্বাধীনতার জন্যে উদ্বেগ বোধ করি ও কংগ্রেসকে একটি শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সংগঠনরূপে অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই। আমাদের সকল ক্ষুদ্র মতভেদ ত্যাগ ক'রে কর্মের ঐক্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। যুদ্ধের আশঙ্কা সর্বদাই রয়েছে, হয়তো কয়েক মাসের মধ্যেই তা বাস্তবে পরিণত হবে। তা বিশ্বের পক্ষে বিপদ্ হবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তা ঘটে থাকে, তবে ভারতকে যুদ্ধে জড়িত করবার চেষ্টা হওয়াও সম্ভব। সুতরাং আমাদের এই সংকটের মোকাবিলা করবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এই যুদ্ধে আমাদের জড়িত করবার সকল চেষ্টার প্রতিরোধ করতে হবে; আর এইভাবেই কংগ্রেসের বহুঘোষিত নীতিকে কার্যকর করা যাবে।"

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। এক, প্রদেশ কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া কোনও কংগ্রেস-কর্মী ভারতের কোনও প্রদেশে কোন প্রকারের সত্যাগ্রহ করতে বা সংগঠন করতে পারবেন না। অন্য প্রস্তাবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পর্কও সুনির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'লো। সুভাষচন্দ্র বসু ও সমাজতন্ত্রীরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও প্রস্তাব দুটি প্রচুর ভোটাধিক্যে গৃহীত হ'লো।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শেষ হ'য়ে গেলে

গান্ধীজী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উদ্দেশে রওনা হলেন। তিনি ট্রেনে চড়বার পর তাঁকে বোম্বাইয়ের ভাণ্ডারী সম্প্রদায়ের থেকে একটি আবেদন দেওয়া হ'লো। ঐ আবেদনে বলা হ'লো যে, ১৬৭২ সাল থেকে বৃটিশ শক্তির অনুকূলে সামরিক কার্য করবার ফলে ভাণ্ডারী সম্প্রদায় তাড়ি করবার অধিকার পেয়েছিল। ঐ সুযোগ থেকে পরে তারা বঞ্চিত হ'লেও এখনও প্রায় ৮০০০ লোক ঐ জীবিকার ওপর নির্ভরশীল। ভাণ্ডারী সম্প্রদায় নীতিগতভাবে পান-বর্জনবিরোধী নয়; তবে তারা ধীরে ধীরে ঐ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী, যাতে তাদের আর্থিক দুঃখদুর্দশার সম্মুখীন হতে না হয়। সরকার যদি ভাণ্ডারী সম্প্রদায়ের এই আবেদনে কর্ণপাত না করেন, তবে ঐসব অশিক্ষিত লোক কি করবে, তা বলা যায় না। তারা কংগ্রেস প্রদর্শিত অহিংস উপায়ে বা হিংসার দ্বারা ঐ ব্যবস্থার প্রতিরোধে অগ্রসর হ'তে পারে।

গান্ধীজী ট্রেনে ঐ আবেদনটি পড়ে হরিজন পত্রিকার জন্যে একটি নোট লিখে দিলেন। তাতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের জীবন বিপন্ন ক'রেও সকল ভীতিপ্রদর্শনকে উপেক্ষা ক'রে কাজ ক'রে যেতে বললেন। পেশোয়ারে পৌঁছবার অব্যবহিত পরেই তাঁকে একটি অপ্রীতিকর কাজ করতে হ'লো। সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কতিপয় প্রস্তাবের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভা যে পানবিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন, তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষতি হবে। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের এই "বিপজ্জনক খেলা" (A Dangerous Game) সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। জুলাইয়ের শেষাশেষি গান্ধীজী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে ফিরে এলেন।

বাংলাদেশে রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। গান্ধীজী এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে মহাদেব দেশাইকে পাঠালেন।

রাজবন্দীরা গান্ধীজীর সমর্থন প্রার্থনা করলে গান্ধীজী জানালেন যে, এই ধরনের অনশন যুক্তিযুক্ত নয় ব'লেই তিনি মনে করেন। এইরকম অনশন ধর্মঘট যদি যত্রতত্র চলতে থাকে, তবে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে এবং শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে সরকারের কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। গান্ধীজী রাজবন্দীদের দাবী ন্যায্য এবং তাদের ধৈর্য ধরা প্রয়োজন ব'লেও জানালেন। রাজবন্দীরা গান্ধীজীর পরামর্শে ও সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় অনশন ত্যাগ করলেন।

৯ই আগস্ট তারিখে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসলো। ৬ই জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সমর্থকরা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব দুটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা করেছিলেন। এই ধরনের সভা সম্পর্কে তাঁকে কৈফিয়ত চাওয়া হ'লে সুভাষচন্দ্র বললেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে কোনও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের তাঁর সাংবিধানিক অধিকার আছে। এই সাংবিধানিক অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হ'লে তার অর্থ হবে কংগ্রেসে নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তাঁর এই কৈফিয়ত যদি ওয়ার্কিং কমিটির মনঃপূত না হয়, তবে এই কাজের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর এবং তিনি শৃঙ্খলাভঙ্গের দণ্ড হাসিমুখেই গ্রহণ করবেন।

ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রের নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ওই প্রস্তাবের খসড়া গান্ধীজীই করেছিলেন। এই প্রস্তাবে বলা হ'লো: "শ্রীসুভাষ বসুর পত্রে যা যুক্তি বলে প্রদর্শিত হয়েছে, অর্থাৎ কংগ্রেস সংবিধানকে সদস্যরা নিজ নিজ অভিরুচি মতো ব্যাখ্যা করতে পারে, তা সত্য হ'লে কংগ্রেসের মধ্যে পুরাপুরি অরাজকতা দেখা দেবে এবং কংগ্রেস অচিরে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়বে। ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, শ্রীসুভাষ বসু প্রকাশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে যে শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছেন, তা যদি উপেক্ষা করা হয়, তবে কার্যে অবহেলা করা হবে। তাই ওয়ার্কিং কমিটি

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, তাঁর গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে তিন বছরের জন্য বাংলা প্রদেশ কমিটির সভাপতি-পদের এবং কংগ্রেস কমিটির কোনও নির্বাচনমূলক পদের জন্য অযোগ্য (disqualified) ঘোষণা করা হচ্ছে। ওয়ার্কিং কমিটি বিশ্বাস করে যে, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু তাঁর কাজের ভুল বুঝতে পারবেন এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য প্রদত্ত দণ্ড আনুগত্যের সঙ্গে গ্রহণ করবেন।”

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আকাশ ঘনঘটাপূর্ণ হয়ে উঠলো। হিটলার কর্তৃক পোলাণ্ডকে চরমপত্র দান এবং হিটলার-জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের অনাক্রমণ-চুক্তি অবস্থাকে দ্রুত ঘোরালো ক'রে তুললো। জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করায় ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। ঐদিনই ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না ক'রেই বড়লাট ভারতকে যুদ্ধরত দেশ ব'লে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি অর্ডিন্যান্সও জারী হ'লো। বড়লাট অবশ্য আলোচনার জন্যে ভারতীয় নেতাদের ডেকে পাঠালেন। ৫ই জানুয়ারি গান্ধীজী সিমলা পৌঁছলেন। তিনি বড়লাটকে জানালেন যে, তিনি তাঁর নিজের ছাড়া অন্য কারও প্রতিনিধি নন। তবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও সহানুভূতি সুবিদিত। ৮ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী সিমলা থেকে সেবাগ্রামে ফিরে এলেন এবং জার্মান-অধিকৃত পোল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট পাডেরেওয়স্কির একটি তারবার্তা পেলেন। তাতে নাৎসী-পদদলিত পোল্যাণ্ড ভারতের সহানুভূতি কামনা করেছে।

যুদ্ধ বাধায় যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তা পর্যালোচনা করবার জন্যে সেপ্টেম্বর মাসেই ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। এই অধিবেশনে মিঃ জিন্নাকেও আমন্ত্রণ জানানো হ'লো। কিন্তু তিনি অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় এলেন না। বিশেষ

আমন্ত্রণ পেয়ে সুভাষচন্দ্র, আনে, নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ যোগ দিলেন। জওহরলাল নেহ্রু সুভাষচন্দ্রের নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনসমস্যা নিয়ে সেই গোলোযোগের পর থেকে ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন না। তিনি জাপান-আক্রান্ত চীনসফরে মাত্র কয়েক্ দিন পূর্বে গিয়েছিলেন। তিনিও চীন থেকে দ্রুত দেশে ফিরে এসে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিলেন। গান্ধীজী বৈঠকে আগাগোড়ো উপস্থিত রইলেন। চারদিন ধরে আলোচনা চললো। আলোচনা-শেষে ওয়ার্কিং কমিটি একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করলো। বিবৃতির খসড়া রচনা করলেন জওহরলাল নেহরু। এতে মূলতঃ বলা হ'লো :

"বৃটিশ সরকার ভারতকে যুদ্ধরত দেশ ব'লে ঘোষণা করেছে, অর্ডিন্যান্সসমূহ জারী করেছে, ভারত শাসন আইন সংশোধন বিল পাস করেছে, এবং এই ধরনের আরও অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে যা ভারতবাসীর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত; তাছাড়া প্রাদেশিক সরকারসমূহের ক্ষমতা ও কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ক'রে দিয়েছে। অথচ এইসব বিষয়ে ভারতীয় জনসাধারণের কোন সম্মতি নেওয়া হয়নি; এইসব বিষয়ে তাদের ঘোষিত ইচ্ছাকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।...কংগ্রেস বারবার ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদ এবং তাদের যুদ্ধ, হিংসা ও মানবিকতার পদদলনকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে দেখাবার চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে নিন্দা করেছে। যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী এত বৎসর ধ'রে সংগ্রাম করছে, ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে সেই সাম্রাজ্যবাদেরই তীব্রতর রূপকে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং কংগ্রেস বিনা দ্বিধায় জার্মানির নাৎসী সরকারের পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে এবং যারা এই আক্রমণের প্রতিরোধ করছে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে।...কংগ্রেস আরও বলেছে যে, ভারতের জন্য যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্নে ভারতবাসীরাই সিদ্ধান্ত নেবে, বাইরে থেকে তাদের ওপর কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে

দেওয়া চলবে না; তাছাড়া ভারতবাসী তাদের সহায়-সম্পদকে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে ব্যবহৃত হ'তে দেবে না। যদি সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তবে উভয়ে সেই লক্ষ্যকে সহযোগিতার উপযুক্ত মনে করলে সমান দুই পক্ষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই সেই সহযোগিতা হবে। যে স্বাধীনতা ভারতকে দিতে অস্বীকার করা হয়েছে এবং যেটুকু সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা তার ছিল তাও যখন নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তখন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করা হচ্ছে বললেই ভারত সেই যুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারে না।...ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে সচেতন আছে যে, বৃটেন ও ফ্রান্স গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্যে এবং আক্রমণ চিরতরে বন্ধ করবার জন্যে যুদ্ধ করছে ব'লে তারা ঘোষণা করছে। কিন্তু উচ্চারিত উক্তি ও ঘোষিত আদর্শের সঙ্গে যে প্রকৃত অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য রয়েছে, সাম্প্রতিক অতীতের ইতিহাস তার দৃষ্টান্তে পূর্ণ।...যদি এই যুদ্ধ স্থিতাবস্থা, সাম্রাজ্যবাদী অধিকারসমূহ, উপনিবেশসমূহ, কায়েমী স্বার্থসমূহ ও সুযোগসুবিধাগুলি রক্ষা করবার জন্যে হয়ে থাকে, তবে এর সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক নেই। যদি গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যবস্থার প্রশ্নে যুদ্ধ হয়ে থাকে তবে এতে ভারত গভীরভাবে আগ্রহী। যদি গ্রেট বৃটেন গণতন্ত্রের রক্ষা ও প্রসারের জন্যে যুদ্ধ ক'রে থাকে, তবে তাকে অচিরে তার নিজের অধিকৃত স্থানসমূহে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে হবে, ভারতে পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং ভারতীয় জনগণ বাইরের বিনা হস্তক্ষেপেই গণ-পরিষদের মাধ্যমে তার নিজের সংবিধান রচনার দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করবে এবং নিজের নীতি নিজেই নির্ধারিত করবে।...যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী রীতিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং যে যুদ্ধের দ্বারা ভারতে ও অন্যান্য স্থানে সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়তর করতে চাওয়া হচ্ছে, সেই যুদ্ধের সঙ্গে এই কমিটি নিজেকে জড়িত

করতে বা সহযোগিতা করতে পারে না।...কংগ্রেস কমিটি তাই বৃটিশ সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার যুদ্ধের উদ্দেশ্যসমূহ...এবং এই উদ্দেশ্যসমূহ কিভাবে ভারতে প্রযোজ্য হবে এবং বর্তমানে কতখানি কার্যকর করা হবে তা ঘোষণা করতে আহ্বান জানাচ্ছে।"

ওয়ার্কিং কমিটি নেহরু, আজাদ ও প্যাটেলকে নিয়ে যুদ্ধের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে লক্ষ্য রাখবার জন্যে একটি সাব-কমিটি গঠন করলো। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ণাঙ্গ বিবৃতিটি মস্কো বেতারে প্রচারিত হ'লো। কিন্তু বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে দ্রুত কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কেবল বড়লাট ভারতের জনাপঞ্চাশেক শীর্ষস্থানীয় নেতাকে আবার সাক্ষাৎকারের জন্যে ডেকে পাঠালেন। এই নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী, নেহরুজী, সুভাষচন্দ্র, সর্দার প্যাটেল ও মিঃ জিন্নাও রইলেন। কিন্তু এই আলোচনাও মূল প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেল।

১৭ই অক্টোবর তারিখে বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো যে ঘোষণা দিলেন, তাতে মুসলিম লীগকেই ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি-স্থানীয় সংস্থা বলে কার্যত ধ'রে নিলেন। যুদ্ধ-উদ্দেশ্যসমূহ প্রসঙ্গে বললেন, ভারতে ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রতিষ্ঠাই বৃটিশের অনুসৃত নীতি। যুদ্ধের পরে ভারতীয়গণের অভিমত ও সংখ্যালঘুদের মতামতের আলোকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংস্কার করা হবে। এখন ভারতে বর্তমান কর্মপন্থা অনুসরণের জন্যে ভারতের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরামর্শসভা গঠন করা হবে। বড়-লাটের এই বিবৃতি একেবারেই সন্তোষজনক নয় ঘোষণা ক'রে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সঙ্গে সঙ্গে একটি বিবৃতি দিলেন। তাতে বলা হ'লো, বড়লাটের বিবৃতি পুরাতন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র; বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতভেদ, সংখ্যা-লঘু সমস্যা প্রভৃতি বিষয়গুলির যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা-ও আসল দুরভিসন্ধিকে ঢাকবার জন্যে। ওয়ার্কিং কমিটি তার প্রস্তাবে সুস্পষ্ট-

ভাবে জানালো যে, "এই অবস্থায় কমিটি গ্রেট বৃটেনকে কোনও সহায়তা দিতে পারে না; কারণ, যে সাম্রাজ্যবাদী নীতির অবসান ঘটাবার জন্যে কংগ্রেস সংগ্রাম করছে, তাতে সেই নীতিকেই সমর্থন করা হবে। এই বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপরূপে কমিটি কংগ্রেস মন্ত্রি-সভাগুলিকে পদত্যাগপত্র পেশ করতে নির্দেশ দিচ্ছে।" সেই সঙ্গে কংগ্রেস কমিটি সমগ্র জাতিকে অভ্যন্তীণ বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হ'তেও আহ্বান জানালো এবং কংগ্রেস কমিটিসমূহকে ও কংগ্রেসকর্মীদের যে কোনও অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকতে, বাক্যে ও কার্যে সংযত হ'তে নির্দেশ দিলো। কোনরকম আইন অমান্য, রাজনৈতিক ধর্মঘট প্রভৃতি থেকে নিরস্ত থাকবার জন্যও কংগ্রেস-কর্মীদের বলা হ'লো।

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীজী আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন। পরে "নিউজ ক্রনিক্‌ল্" পত্রিকা থেকে তাঁকে কংগ্রেসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে বলা হ'লে তিনি বললেন, "কংগ্রেস যা চেয়েছে, তা ভারতের স্বাধীনতার দাবীর জবাব নয়; যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে হের হিটলারের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ, সেই গণতন্ত্রের মধ্যে ভারতের স্থান আছে কিনা তা ঘোষণা করতে বৃটেন অবহেলা করছে, সেটুকুই ভারত বৃটেনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ...যে নৈতিক সমর্থন কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য এবং যা তার দেওয়ার একমাত্র সম্বল, তা দিয়েই কংগ্রেস বৃটেনকে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু বৃটেনের রাজনৈতিক সততা সুপ্রমাণিত না হ'লে কংগ্রেস তা দেবে না। আমি চাই বৃটিশ সরকার বুঝুন যে, ভারত তার স্বাধীনতা ভিক্ষা করছে না। বৃটেন ভারতের স্বাধীনতা রোধ করবে না, 'এই কথা বলুক, কংগ্রেস এইটুকু মাত্র চায়। হিন্দু-মুসলিম ও অন্যান্য সমস্যা যে আছে তা তর্কাতীত। কিন্তু প্রশ্ন হ'লো, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, বৃটেন পাশে সরে দাঁড়িয়ে ভারতকে তাঁর নিজের পন্থায় তার নিজের সমস্যার সমাধান করতে দেবে

কিনা। তাই কংগ্রেস ভারতের নূতন সংবিধান রচনার জন্যে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি গণ-পরিষদের কথা বলেছে।...” গান্ধীজী নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌, ডেইলি হেরাল্ড, প্যারিস সোয়ার, পপুলো দ্‌’ইতালি, ন্যাসন্যাল ট্রাইডেণ্ট, ইঅরমিরি সিমবুন, তাস সংবাদ সংস্থা প্রভৃতির কাছেও কংগ্রেসের বক্তব্য ব্যাখ্যা ক’রে বিবৃতি দিলেন। ২৪শে অক্টোবর তিনি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখলেন যে, অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ভার ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর হাতেই ন্যস্ত করেছেন; দেশবাসী যেন সকল ত্যাগ ও দুঃখ-দুর্দশার জন্যে প্রস্তুত থাকেন।

১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসের শেষাশেষি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করলো। ৩০শে অক্টোবর গান্ধীজী সম্পাদকীয় নিবন্ধে “পরবর্তী পদক্ষেপ” সম্পর্কে লিখলেন:

“বৃটিশ সরকারের সঙ্গে বর্তমানে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সম্পর্কে দায়িত্বের যে গুরুভার আমি বোধ করছি, তেমনটি পূর্বে কখনও করিনি। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ যে কি, তা আদৌ স্পষ্ট নয়। কংগ্রেসকর্মীরা একটা বড় কিছু ব্যবস্থা প্রত্যাশা করছেন। অনেক পত্রলেখক আমাকে লিখছেন, আমি যদি একবার ডাক দিই, তবে সারা ভারত তাতে সাড়া দেবে, যেমনটি আগেও হয়েছে। তাঁরা এই ভরসাও দিয়েছেন যে, জনসাধারণ অহিংস থাকবে। তাঁদের এই ভরসার বেশি তাঁদের উক্তির সমর্থনে আর কিছু নেই। কিন্তু আমার নিজের কাছে যেসব প্রমাণ আছে, তা সম্পূর্ণ বিপরীত। যতক্ষণ না আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে, কংগ্রেস-কর্মীরা অহিংসায় পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন, তার অর্থ কি সম্পূর্ণরূপে বোঝেন এবং আমার বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত নির্দেশগুলি ঠিকমতো মেনে চলবেন, ততোক্ষণ আমি আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারি না।...কংগ্রেস-কর্মীদের অহিংসা মেনে চলবার

অনিশ্চয়তা ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে; সেটি হ'লো মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে মুসলমানদের শত্রু ব'লে মনে করে। এই ব্যাপারটি কংগ্রেসের পক্ষে আইন অমান্যের দ্বারা কোনও অহিংস বিপ্লব ঘটানো প্রায় অসম্ভব ক'রে তুলেছে। এর অর্থ নিশ্চয় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা।...আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব নিয়েছি, কিন্তু আমায় সীমাবদ্ধ দেখে আমি নিজেই ভয় পাই। আমি পূর্বে যে ভাবে ঘুরে বেড়াতাম, আমার শারীরিক অবস্থা তা আমার পক্ষে অসম্ভব ক'রে তুলেছে। জনসাধারণের সঙ্গে বাহিরের সকল যোগাযোগ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন। এমন কি এখনকার কংগ্রেসকর্মীদেরও আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তাদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। চিঠিপত্র লেখাও আমাকে যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ করতে হয়েছে। তাই আমি প্রাথমিক নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে কংগ্রেসকর্মীদের যে পরামর্শ দিচ্ছি, তা পালনের প্রয়োজন ও কর্তব্যবোধ যদি কংগ্রেস-কর্মীরা নিজেদের মধ্য থেকে অনুভব না করেন, তবে আমার এই পথপ্রদর্শন কেবল ব্যর্থ হবে না, অনিষ্টকরও হবে। এতে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।...আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, বৃটিশ সরকার যখন তাদের নিজের কাজের দ্বারা তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সহযোগিতা অসম্ভব ক'রে তুলেছে, তখন তাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা কংগ্রেসের উচিত হবে না। আমি ভারতে অরাজকতা চাই না। অরাজকতার মধ্য দিয়ে কখনই স্বাধীনতা আসবে না। আমি বৃটিশের পরাজয় চাই না; আবার জার্মানিরও পরাজয় চাই না। ইউরোপের জনসাধারণ অসহায়ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু শীঘ্রই তাদের মোহ ভঙ্গ হবে। যাই হ'ক, আমি যে মতামত পোষণ করি, তাতে আমি তাড়াহুড়ো ক'রে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবো না। কংগ্রেস-কর্মীদের প্রতি আমার নির্দেশ হ'লো, তাঁরা সংগঠনগুলিকে দুর্বলতামুক্ত ক'রে

মধ্যে আলাপ-আলোচনার কথা চলছিল। জিন্নার এই মনোভাবে তা পরিত্যক্ত হ'লো।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক বসলো, তাতে কংগ্রেসের দাবী ও বক্তব্য পুনরুচ্চারিত হ'লো। ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪০ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস পালনের জন্যে যে শপথবাক্য রচনা করলেন, তাতে সুতো কাটা ও চরকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হ'লো।

স্বাধীনতার শপথবাক্যে সুতোকাটা ও চরকার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মনে ক'রে বামপন্থীরা আপত্তি জানালেন। সুভাষচন্দ্র সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে সুতোকাটা ও চরকাকে রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়াররূপে প্রাধান্য দানের নিন্দা করলেন এবং ফরোয়ার্ড ব্লক তাই স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতা-দিবস পালন করবেন ব'লে ঘোষণা করলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, সম্পূর্ণানন্দ প্রভৃতি সমাজবাদীরাও এই শপথবাক্যের সমালোচনা করলেন।

শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই গুরুগম্ভীর পরিবেশে স্বাধীনতা-দিবস অনুষ্ঠিত হ'লো। সমাজবাদীরা তাঁদের আপত্তি প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের কিছু সদস্য তাঁদের আপত্তিতে অটল রইলেন। কলকাতায় বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যে সভার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে শপথবাক্য থেকে সুতোকাটা ও চরকার অংশ বাদ দেওয়া হ'লো। বাংলাদেশে বামপন্থীদের প্রভাব ওয়ার্কিং কমিটিকে বেশ উদ্বিগ্ন করলো।

গান্ধীজী গান্ধী-সেবাসঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্যে যাওয়ার পথে দু'দিনের জন্যে শান্তিনিকেতনে গেলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি গান্ধীজীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন রবীন্দ্রনাথ। ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ববঙ্গের মালিকাণ্ডায় গান্ধী-সেবা-সংঘের সাতদিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন শুরু হ'লো। পথে ও সংঘের

অধিবেশন চলাকালে নানারকম গান্ধীবিরোধী ধ্বনি দেওয়া হ'লো। গান্ধীজী কর্মীসম্মেলনে বললেন :

"আমাদের বুঝতে হবে, আবহাওয়া বিষাক্ত রয়েছে। আমরা কিভাবে এর বিরুদ্ধে লড়বো? যারা এইসব ধ্বনি দিচ্ছে তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হোক, কি পাঁচ শ হোক, আমরা তাদের উপেক্ষা করতে পারি না। তাদের ক্ষোভ কিসের, তা আমাদের সন্ধান করতে হবে। আমরা যদি সত্যই অহিংসায় বিশ্বাসী হই, তবে তাদের ঘৃণা করলে চলবে না।...তারা ভাড়াটে, এটা কোনও জবাব নয়। তোমরা নিশ্চিত হ'তে পারো যে, ট্রেনভাড়া বা পারিশ্রমিক দিলেই সবাই এতো পথ ছুটে আসবে না। তারা নিশ্চয় কিছুটা হ'লেও তাদের আদর্শে বিশ্বাস করে। তাদের মনের পেছনে এই ভাবটা নিহিত রয়েছে যে, তারা যা প্রিয় মনে করে, 'গান্ধীবাদ' তা ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে তারাও 'গান্ধীবাদের' ধ্বংস চাইতে পারে। জিনিসটা আমরা এইভাবে যদি দেখি, তবে আমরা আমাদের মেজাজ ঠিক রাখতে পারি। তখন আমরা তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করতে চেষ্টা করতে পারি, বোঝাতে পারি যে, আমরা তাদের কাজে বাধা দিতে চাই না।...সুতরাং ঐসব ধ্বনিতে তোমরা ক্রুদ্ধ হবে না। কেউ ভেবো না যে, 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' ধ্বনি দিয়েই ঐ ধ্বনিকে ডুবিয়ে দিতে পারবে।"

মালিকাণ্ডায় গান্ধীজীর অবস্থানকালে কিছুসংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা ক'রে নোয়াখালিতে হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থার কথা জানালেন। গান্ধীজী বললেন, "নোয়াখালিতে যে ধরনের গুণ্ডামি চলছে বলা হচ্ছে, আমার ধারণা, তা কোনও জনপ্রিয় নির্বাচিত সরকারের পক্ষে দমন করা সম্ভব নয়। এটা মূলতঃ আত্মরক্ষার ব্যাপার। আত্মসম্মান ও মর্যাদা অপরের দ্বারা রক্ষিত হ'তে পারে না। তা প্রত্যেককে নিজের চেষ্টায় রক্ষা করতে হবে।

সরকার বড়জোর অপরাধ ঘটে যাওয়ার পর অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে।...আত্মরক্ষা হিংসাত্মক বা অহিংস হ'তে পারে। আমি সর্বদাই অহিংস আত্মরক্ষার কথাই বলেছি। কিন্তু এটাও আমি মনে করি যে, হিংসাত্মক আত্মরক্ষার মতোই অহিংস আত্মরক্ষাও শিখতে হয়। হিংসাত্মক আত্মরক্ষায় যে ধরনের শিক্ষা দরকার হয়, তা থেকে স্বতন্ত্র ধরনের শিক্ষা লাগে এতে। সুতরাং, অহিংস আত্মরক্ষার ক্ষমতা যদি না থাকে, তবে হিংসাত্মক উপায়ের আশ্রয় নিতে ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।"

গান্ধীজী মালিকাণ্ডা থেকে পাটনা গেলেন ২৮শে ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্যে। ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করলো, সে সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে গান্ধীজী বললেন:

"লণ্ডন থেকে প্রশ্ন এসেছে যে, কংগ্রেস আলাপ-আলোচনা ও আপোস-মীমাংসার দ্বার রুদ্ধ করেছে কিনা। এই প্রস্তাবের আমি যে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে বলব কংগ্রেস দ্বার রুদ্ধ করে নি। দ্বার রুদ্ধ করেছেন (ভারত সচিব) লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড। তাঁর শর্ত অনুযায়ী ভারত কোনও আলোচনা চালাতে পারে না। ভারত তার নিজের শোষণের ও পরাধীনতার অসহায় অংশীদার হ'তে পারে না। ভারত যতোদিন না বৃটেনের মতো একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়, ততোদিন কংগ্রেস শান্ত হবে না। বৃটেন, যা একদা সমুদ্র শাসন করেছে আজ তার স্বাধীনতা হারাবার বিপদ দেখা দিয়েছে। আমি যে প্রতিকারব্যবস্থা দিয়েছি, তা অতিনির্বোধেও বুঝতে পারে। কংগ্রেসের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আসবে কি না তা অন্য প্রশ্ন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যে আপোস-মীমাংসায় ভারতকে স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু দেওয়া হ'লে তাতে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করবে না। আরেকটা জিনিস কংগ্রেস স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দৃঢ়তর করাই যখন বৃটেনের লক্ষ্য বলে জানা গেছে, তখন কংগ্রেস তাকে তার যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য

করতে পারে না। অর্থাৎ কংগ্রেস বৃটেনকে তার নৈতিক সমর্থন দিতে পারে না। তৃতীয় যে জিনিসটি যা কংগ্রেসের প্রস্তাব সুস্পষ্ট ক'রে দিয়েছে, তা হ'লো যখন সংগ্রাম শুরু হবে, তখন তা কঠোরভাবে অহিংসই হবে।"

মার্চ মাসের মাঝামাঝি বিহারের রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে জালিয়ানওয়ালাবাগ-কুখ্যাত স্যার মাইকেল ও'ডোয়ার লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডও আহত হলেন। গান্ধীজী এই সন্ত্রাসবাদের নিন্দা ক'রে বললেন, "আমি একে উন্মত্ততা ব'লেই মনে করি।"

১৭ই মার্চ কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী-সভার অধিবেশন হ'লো। তাতে "ভারত ও যুদ্ধসংকট" সম্পর্কে রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি প্রস্তাব আনলেন। রামগড় কংগ্রেসে মওলানা আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং কংগ্রেসে যে একটিমাত্র প্রস্তাব গৃহীত হ'লো, তাতে বলা হ'লো "পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু ভারতের জনসাধারণ গ্রহণ করবে না এবং গণপরিষদের মাধ্যমে ছাড়া কোন স্থায়ী সমাধানও সম্ভব নয়। কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণের ছ বৎসর পরে রামগড়েই সর্বপ্রথম গান্ধীজী কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বিশ হাজার প্রতিনিধির উদ্দেশে বললেন: অবিলম্বে অভিযান শুরু করবার মতো অবস্থা অনুকূল নয়। তার কারণ হিসাবে বাইরের ও দেশের ভেতরের অসুবিধাগুলির উল্লেখ করলেন। তবে অভ্যন্তরীণ অসুবিধাগুলির ওপরই তিনি বেশি জোর দিলেন। "আমি প্রায়ই বলেছি যে বাইরের অসুবিধাগুলির জন্যে সত্যাগ্রহীর ভয়ের কিছু নেই। বরং বাইরের অসুবিধাগুলি তার উত্তম বৃদ্ধি করে, সে দ্বিগুণ উৎসাহ ও শক্তি নিয়ে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হয়।...আমাদের ভেতরের অসুবিধাগুলি বাড়ছে। আমাদের কংগ্রেসের তালিকাগুলি

বাজে সদস্যের নামে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এইসব বাজে সদস্যের আসবার কারণ, তারা জানে কংগ্রেসে প্রবেশ ক্ষমতালাভের একটা পথ। তাই যারা পূর্বে কখনও কংগ্রেসে ঢোকার কথা ভাবে নি, তারা কংগ্রেসে ঢুকেছে এবং কংগ্রেসকে কলুষিত করেছে। লোকে স্বার্থপর অভিসন্ধি নিয়ে এসে বলছে, কোনও গণতান্ত্রিক সংস্থায় তাদের প্রবেশ কিভাবে রোধ করা যায়?"

কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে রামগড়ে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে "আপোস-বিরোধী সম্মেলনও" হ'লো। তাতে সুভাষ-চন্দ্র বললেন, "গত দেড় বৎসর ধরে যা আমাদের পীড়া দিচ্ছে ও আমাদের কাছে দুর্বোধ্য লাগছে, তা হ'লো যখন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা কড়া কড়া প্রস্তাব পাস করছেন ও বিবৃতি দিচ্ছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতারা এমন সব মন্তব্য করছেন বা বিবৃতি দিচ্ছেন যা সাধারণ মানুষের মনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারণা সৃষ্টি করছে। তার ফলে বৃটিশ সরকার আর কংগ্রেসের কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে না; তাদের এই ধারণা হয়েছে, ওরা যতোই বড় বড় কথা বলুক, লড়াইয়ে নামছে না।"

১৯৪০ সালের মার্চ মাসের শেষাশেষি লাহোরে মুসলিম লীগের যে অধিবেশন হ'লো, তাতে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের পরিকল্পনা তুলে ধরলো এবং মিঃ জিন্না তাঁর ভারতে দ্বিজাতির তত্ত্ব প্রচার করলেন। "ইসলাম ও হিন্দুধর্ম ধর্ম বলতে ঠিক যা বোঝায়, তা নয়; প্রকৃতপক্ষে এ দুটি হ'লো দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র সমাজ-ব্যবস্থা। হিন্দু ও মুসলমানরা একই জাতীয়তাবোধ গ'ড়ে তুলবে, এটা স্বপ্নমাত্র।" তিনি বললেন, "ভারতের বর্তমান যে ঐক্য, তা বৃটিশের সৃষ্টি এবং বৃটিশের সঙ্গীনই তাকে রক্ষা করছে। গণতন্ত্র ভারতের পক্ষে উপ-যোগী নয় এবং জাতির যে কোনও সূত্র অনুসারে মুসলমানরা একটি জাতি, তাদের চাই একটি বাসভূমি, তাদের দেশ, তাদের রাষ্ট্র।" জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লীগ পাকিস্তান-প্রস্তাব গ্রহণ করলো।

এপ্রিল মাসে দিল্লীতে এর প্রতিবাদে ভারতের সমস্ত জাতীয়তাবাদী দলগুলির প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন। তাঁরা কংগ্রেসের গণপরিষদ প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং ভারতকে খণ্ডিত করবার মুসলিম লীগ প্রস্তাবের নিন্দা করলেন। তাঁরা অন্যান্য দেশবাসীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করলেন।

মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গান্ধীজী বললেন,

"আমি বিশ্বাস করি না যে, কার্যত যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসবে তখন মুসলমানরা ভারতের ব্যবচ্ছেদ চাইবে। সুবুদ্ধি তাদের বাধা দেবে। তাদের স্বার্থবোধ তাদের বিরত করবে। দেশবিভাগের অর্থ যে আত্মহনন, তা করতে তাদের ধর্মই নিষেধ করবে। "দ্বিজাতি তত্ত্ব" একটি অসত্য। ভারতে অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত হয়েছেন বা ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বংশধর। কেউ ধর্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য জাতীয় হয়ে যায় না। বাঙ্গালী হিন্দু যে ভাষায় কথা বলে, বাঙ্গালী মুসলমানও সেই ভাষায় কথা বলে; বাঙ্গালী মুসলমানরা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের মতোই একই খাদ্য খায়, একই প্রকার আমোদ-প্রমোদ করে। তারা একই রকম পোশাক পরে। আমি প্রায়ই বাইরে থেকে দেখে কে বাঙ্গালী হিন্দু, কে বাঙ্গালী মুসলমান বুঝতে অসমর্থ হয়েছি। ঐ একই অবস্থা আমি দক্ষিণ ভারতে গরীব লোকদের মধ্যে দেখেছি, যে গরীবরাই ভারতের জনসাধারণ। আমি যখন প্রথম পরলোকগত স্যার আলি ইমামকে দেখেছিলাম, তখন আমি জানতাম না যে, তিনি হিন্দু নন। তাঁর পোশাক, চালচলন, খাবার তাঁকে যেসব হিন্দুদের মধ্যে আমি দেখেছিলাম, তাঁদের অধিকাংশের মতোই ছিল। তাঁর নামই তাঁকে মুসলমান ব'লে জানিয়েছিল। কায়েদ-ই-আজম জিন্নার ক্ষেত্রেও তাই। তাঁর পদবী একজন হিন্দুরও

পদবী হ'তে পারতো। তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়েছিল তখন জানতাম না যে, তিনি মুসলমান। তাঁর পুরো নাম থেকেই তা দেখেছিলাম। তাঁর জাতি লেখা ছিল তাঁর মুখে চোখে, তাঁর চালচলনে। পাঠকরা শুনলে অবাক হবেন যে, অনেক মাস না হ'লেও অনেক দিন তো বটেই, আমি বিঠলভাই প্যাটেলকে মুসলমান ব'লেই মনে করতাম। কারণ তাঁর ছিল দাড়ি এবং তিনি ব্যবহার করতেন তুর্কী টুপি। হিন্দুদের উত্তরাধিকার আইন অনেক মুসলমানের মধ্যেও প্রচলিত। স্যার মহম্মদ ইকবাল তাঁর ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষদের কথা গর্বভরেই বলতেন। ইকবাল ও কিচলু পদবী হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই প্রচলিত। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি নয়। ভগবান যাদের এক ক'রে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তাকে কখনও বিভক্ত করতে পারবে না।"

বামপন্থীরা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা অবিলম্বে আন্দোলন শুরু করবার জন্যে বলছিলেন। গান্ধীজী তাঁদের বললেন, "Not yet (এখনও সময় হয়নি)। আমি যদি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করি, তবে আইন অমান্যের সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। বর্তমানে যে আবহাওয়া রয়েছে, তাতে আইন অমান্যের মাধ্যমে ইংরেজদের ঠিকপথে আনা যাবে না।"

মে মাসে গ্রেট বৃটেন নরোয়েতে জার্মানির হাতে পর্যুদস্ত হলো। জার্মানি হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ আক্রমণ করলো। চার্চিল এখন চেম্বারলেনের স্থলে প্রধান মন্ত্রী এবং মিঃ আমেরি লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের স্থলে ভারতসচিব হলেন। হাউস অব কমন্‌সে প্রশ্ন করা হ'লে নূতন ভারতসচিব ২৩শে মে তারিখে বললেন, বৃটিশ নীতির লক্ষ্য হ'লো ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতকে কমন্‌ওয়েলথে সমান অংশীদারের আসন দেওয়া। ১৭ই জুন তারিখে ফ্রান্স জার্মানির কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলো। ঐদিন ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলছিল। বৃটেনের বারবার পরাজয়ে এখন

ভারতের আত্মরক্ষার প্রশ্নও কংগ্রেসের নেতাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিলো। সে ক্ষেত্রে অনেক নেতাই কেবল অহিংস সংগ্রামের নীতি ও আদর্শের মাধ্যমেই কংগ্রেসকে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন না। তাঁরা সশস্ত্রভাবে শত্রুর প্রতিরোধের প্রয়োজনের কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। ২১ শে জুন তারিখে ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলেন যে, জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও কংগ্রেস অহিংসার আদর্শকে সম্প্রসারিত করতে অসমর্থ। ওয়ার্কিং কমিটি জানালেন যে, তবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম অহিংস পদ্ধতিতেই চলবে। কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ বললেন, "ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রয়োজনমতো মহাত্মা গান্ধী পরামর্শ দেবেন ও পথনির্দেশ করবেন।" নেহ্‌রু দেশবাসীকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, "গান্ধীজীর আদর্শ ও ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে যে ফারাক ঘটেছে তা থেকে যেন কেউ মনে না করেন যে, গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ঘটেছে।"

জুলাই মাসের গোড়ায় দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির যে জরুরী বৈঠক হ'লো, তাতে আবার বৃটিশ সরকারকে অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে আহ্বান জানানো হ'লো। বলা হ'লো যে, বৃটিশ সরকার যদি ভারতে একটি সাময়িক জাতীয় সরকার গঠন করে, তবে কংগ্রেস প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করবে। 'প্রতিরক্ষা' বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে অবশ্য মতদ্বৈধ দেখা দিল। মওলানা আজাদ ও রাজাগোপালাচারী বললেন, কংগ্রেসের প্রস্তাব সুস্পষ্ট, বৃটিশ সরকার যদি কংগ্রেসের শর্ত মেনে নেয়, তবে কংগ্রেস পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। নেহ্‌রুজীও ঐ মতের সমর্থন করলেন। আবদুল গফর খান্‌ কঠোরভাবে অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী হওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন।

৭ই জুলাই তারিখে "অরণ্যে রোদন" নামে একটি নিবন্ধ

লিখলেন গান্ধীজী গুজরাটী ভাষায়। তিনি ঘোষণা করলেন যে, এখন থেকে তিনি গুজরাটীতেই লিখবেন এবং তাঁর লেখার প্রামাণিক অনুবাদ ইংরেজীতে ও হিন্দুস্থানীতে প্রকাশিত হবে।

ভারত রক্ষা আইন অনুসারে সারা ভারতে বামপন্থীদের পুরোদমে গ্রেপ্তার চলছিল। বাংলাদেশে সুভাষচন্দ্র বসু হলওএল মনুমেণ্ট সম্পর্কে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির নীরব থাকা সম্পর্কে গান্ধীজীকে এক তরুণ প্রশ্ন করেন। ঐদিন তাঁর মৌন-দিবস থাকায় তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় ঐ প্রশ্নের উত্তর দেন। তাতে তিনি বললেন :

"এ কথা সত্য যে, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের পর পর দুইবার নির্বাচিত একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। তিনি বহু আত্মত্যাগের অধিকারী। তিনি একজন জাত নেতা। কিন্তু এ সমস্ত গুণই কেবল তাঁর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কারণ হ'তে পারে না। প্রতিবাদের উপযুক্ত কারণ থাকলে ওয়ার্কিং কমিটি তা করতে বাধ্য। সুভাষবাবু কংগ্রেসের অনুমতি নিয়ে আইন অমান্য করেন নি। বরং তিনি অকপটভাবে ও নির্ভীকভাবে ওয়ার্কিং কমিটিকেও অমান্য করেছেন। বর্তমান মুহূর্তে যদি তিনি কোনও গৌণ প্রশ্ন নিয়ে সংগ্রামের জন্যে অনুমতি চাইতেনও, আমার মনে হয় কমিটি তাতে সম্মতি দিত না। এর চেয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ শত শত প্রশ্ন আবিষ্কার করা যেতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে জাতির সমগ্র মনোযোগ একটি মাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ আছে। সেই বিষয়ে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হ'লে সরাসরি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটিকে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হ'লে তাকে নিন্দাসূচক ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে হ'তো। কমিটি তা করতে চান না। তরুণটির মন্তব্যও আমি উপেক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু আমি মনে করলাম, এই গ্রেপ্তারকে তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করলে কোনও ক্ষতি হবে না। সুভাষবাবুর মতো একজন

বিশিষ্ট ব্যক্তির গ্রেপ্তার সামান্য ব্যাপার নয়। কিন্তু সুভাষবাবু তাঁর সংগ্রামের পরিকল্পনাটি চিন্তা ক'রেই এবং সাহসের সঙ্গেই রচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, তাঁর পথই সর্বোত্তম পথ। তিনি সততার সঙ্গেই মনে করেন, ওয়ার্কিং কমিটির পথ ভুল, এই 'দীর্ঘসূত্রিতায়' কোনও সুফল হবে না। তিনি অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আমাকে বলেছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি যা করতে পারেন নি, তা তিনি করবেন। বিলম্বে তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনায় যদি আমার জীবদ্দশায় স্বরাজ আসে, আমার কাছ থেকেই তিনি সর্বপ্রথম তারবার্তায় অভিনন্দন পাবেন। আর তাঁর অভিযান চলাকালে আমি যদি তাঁর মত মেনে নিই, তবে আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁকে আমার নেতা ব'লে ঘোষণা করবো এবং তাঁর পতাকাতলে গিয়ে দাঁড়াবো। কিন্তু আমি তাঁকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলাম যে, তাঁর পথ ভুল। আমার মতের মূল্য অবশ্য সামান্য। সুভাষবাবু যতোক্ষণ একটি বিশেষ কর্মধারাকে নির্ভুল মনে করবেন, ততোক্ষণ কংগ্রেস তা পছন্দ করুক বা না করুক, তা অনুসরণ করবার সকল অধিকার তাঁর আছে এবং অনুসরণ করা তাঁর কর্তব্যও। আমি তাঁকে বলেছিলাম, তিনি কংগ্রেস থেকে একেবারে পদত্যাগ করলেই আরও ভালো করতেন। কিন্তু আমার পরামর্শ তাঁর পছন্দ হয় নি। তা সত্ত্বেও, তাঁর প্রচেষ্টা যদি ফলবতী হয়, ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা পায়, তবে তাঁর এই বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গতই হবে; এবং কংগ্রেস তাঁর বিদ্রোহকে কেবল নিন্দাই করবে না নয়, তাঁকে পরিত্রাতা রূপে স্বাগতও জানাবে।"

জুলাই মাসের শেষভাগে পুনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন বসলো, তাতে দিল্লীতে গৃহীত ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটি ৯৫-৪৭ ভোটে গৃহীত হ'লো, প্রস্তাবে বলা হ'লো কংগ্রেস স্বাধীনতা-সংগ্রামে অহিংসার নীতিতে অটল থাকলেও বর্তমান

পরিস্থিতিতে ভারতের জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও অহিংসাকে সম্প্রসারিত করতে অসমর্থ। গান্ধীজী এবার পুনাতে আসেন নি। গান্ধীজীর একনিষ্ঠ অনুগামীদের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শঙ্কররাও দেও নিরপেক্ষ রইলেন। বামপন্থীরা এই প্রস্তাবকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণের নামান্তর বলেই ঘোষণা করলেন। নেহরুজী বৃটিশ সরকারকে প্রদত্ত তাঁদের প্রস্তাবের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে বললেন। কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আজাদ ঘোষণা করলেন যে, "আজ কংগ্রেসে এমন একটি লোকও নেই, যে সম্ভব হলে মহাত্মা গান্ধীর পথেই চলতে উদ্‌গ্রীব নয়; কিন্তু আমরা বাস্তবতাকে চোখ বুজে থেকে উপেক্ষা করতে পারি না। আমাদের সেই সাহস নেই যে, আমরা বলতে পারি আমরা এই দেশে এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করবো যাতে সশস্ত্র বাহিনী থাকবে না। যদি বলতাম, তা আমাদের দিক্ থেকে ভুলও হতো। মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংসার বাণী জগৎকে দিয়েছেন। সুতরাং তা প্রচার করা তাঁর কর্তব্য। কিন্তু আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ভারতীয় জাতির প্রতিনিধিরূপে যারা মিলিত হয়েছি, আমাদের নিজেদের অবস্থা বিচার ক'রে দেখতে হবে। কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক সংগঠন, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভে অঙ্গীকারবদ্ধ। কংগ্রেস বিশ্ব-শান্তি সংগঠনের সংস্থা নয়। সত্য বলতে কি, গান্ধীজী আমাদের যতোখানি অগ্রসর হ'তে বলেন, আমরা ততোখানি অগ্রসর হ'তে পারি না। আমরা স্বীকার করি, এ আমাদের দুর্বলতা; কিন্তু এই দুর্বলতায় আমরা সমগ্র মানবজাতির দুর্বলতারই অংশীদার। আমরা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হব, তার প্রত্যেকটি আমাদেরই সমাধান করতে হবে। কংগ্রেসের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বিচ্ছেদের এই কঠিন সত্যকে আমাদের মেনে নিতেও হবে এবং সাহসের সঙ্গেই তা আমাদের সহ্য করতে হবে।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বিচ্ছেদ সত্য ছিল না। কংগ্রেসকর্মীদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী বললেন, "১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে আমি যদি কংগ্রেস থেকে অবসর নিয়ে থাকি, তবে তাতে বেশী পরিমাণেই দেশসেবা করেছি, ঘটনাবলী আমার অবসরগ্রহণের ন্যায্যতা প্রমাণ করেছে। আজকের এই একাকিত্বের পেছনেও সেই একই উদ্দেশ্য আছে। অদূর ভবিষ্যতে আমি যা দেখতে পাচ্ছি তাতে সত্যাগ্রহ যদি হয়, তবে তা আমার নির্বাচিত কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অবশিষ্টরা আমি যে পথ নেবো, তাতে হস্তক্ষেপ করবেন না ব'লেই আশা করব।"

গান্ধীজী এইভাবেই সমাসন্ন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সংকেত দিলেন।

পঁচিশ

আবার সংগ্রামের পথে

১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে বড়লাট ঘোষণা করলেন যে, ভারতের যে নূতন সংবিধান হবে, তা রচনার দায়িত্ব প্রধানতঃ ভারতীয়দেরই। তবে বৃটেনের কতকগুলি দায়-দায়িত্ব আছে, সেগুলি তাকে পূরণ করতে হবে; সংখ্যালঘুদের মতামতকেও অগ্রাহ্য করা চলবে না। সেই সঙ্গে তিনি আরও বললেন যে, যুদ্ধ চলাকালে সংবিধান-সংক্রান্ত প্রশ্নের কোনও সমাধান সম্ভব নয়। তবে যুদ্ধের পরে সংবিধান রচনার জন্যে ভারতীয়দের নিয়ে একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা গঠন করা হবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং একটি যুদ্ধ-উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে। এতে কংগ্রেস প্রস্তাবিত সাময়িক জাতীয় সরকারের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হ'লো। তাই এই প্রস্তাব কংগ্রেস বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করলো। মওলানা আজাদকে এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্যে বড়লাট লিন-লিথগো আমন্ত্রণ করলে আজাদ তাতে সম্মত হলেন না। গান্ধীজী আজাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন ক'রে জানালেন, "ভগবানের অভিপ্রেত নয় যে ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক।"

মুসলিম লীগ অবশ্য বড়লাটের প্রস্তাবে আনন্দিত হ'লো। তারা অর্থ করলো যে, মুসলিম লীগের সম্মতি ছাড়া সাময়িক বা চূড়ান্ত কোন সংবিধানই রচিত হ'তে পারবে না। তবে তারা ভারতের অখণ্ডতার বিষয়ে তাদের প্রতিবাদ জানালো, বললো, "ভারত-বিভাগই একমাত্র সমাধান।" হিন্দুমহাসভা বড়লাটের প্রস্তাবকে সমর্থন জানালো। ডোমিনিয়ন স্টেটাসকেই তারা যুদ্ধোত্তর ভারতের রূপ ব'লে মেনে নিলো; তবে সংখ্যালঘুদের খাতিরে যাতে সংখ্যাগুরুদের উপেক্ষা করা না হয়, সেজন্যে অনুরোধ জানালো।

১৩ই আগস্ট তারিখে গান্ধীজী 'নিউজ ক্রনিক্‌ল্' কাগজের অনুরোধে একটি তারবার্তা পাঠালেন। তাতে তিনি বললেন, "কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকায় আমি বড়লাটের সাম্প্রতিক ঘোষণা সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বিরত আছি। কিন্তু ইংলণ্ডে আমার বন্ধুদের ও এখানকার আমার সহকর্মীদের চাপে আমাকে সাড়া দিতে হচ্ছে। বড়লাটের ঘোষণাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এর দ্বারা কংগ্রেস যে-ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে তার সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যবধানই বেড়েছে। কংগ্রেসের বাইরেও যে বুদ্ধিজীবী ভারতে রয়েছে তা-ও এই ঘোষণাকে স্বাগত জানায় নি। আমার নিজের আশঙ্কা হ'লো এই যে, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হচ্ছে। ইংল্যাণ্ড যদি ভারতের প্রতি ন্যায়পরায়ণ না হয়, তবে সে ন্যায়ের সমর্থক ব'লে দাবী করতে পারে না। ভারতের রোগ এতোই গভীরে বদ্ধমূল যে, কোনও ছলাকলা বা জোড়াতালি ব্যবস্থার কাছে তা মাথা নোয়াবে না।"

১৮ই তারিখে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির যে সম্মেলন হ'লো তাতে বলা হ'লো যে, কংগ্রেসের প্রস্তাব বাতিল করায় প্রমাণিত হয়েছে যে বৃটিশ সরকার তরবারির দ্বারা ভারতকে পদানত রাখতে দৃঢ়সংকল্প। ওয়ার্কিং কমিটি ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকলো। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এটা পুনরায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, কংগ্রেসের নেতারা সাময়িকভাবে গান্ধীজীর প্রতি আনুগত্যে শৈথিল্য দেখালেও আবার তাঁরই প্রদর্শিত পথকেই একমাত্র পথ ব'লে স্বীকার করছেন। আজাদ ঘোষণা করলেন, "পরবর্তী পদক্ষেপের" সময় সমাগত। তিনি গান্ধীজীকে আবার কংগ্রেসের নেতৃত্বগ্রহণের জন্যে আহ্বান জানালেন। তিনি সেই সঙ্গে একথাও ঘোষণা করলেন যে, এখন যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে গান্ধীজীর মতদ্বৈধ আর নেই এবং গান্ধীজী নেতৃত্বগ্রহণেও

সম্মত হয়েছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হ'লো, গান্ধীজীই তার খসড়া ক'রে দিলেন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন পণ্ডিত নেহ্‌রু এবং সমর্থন করলেন সর্দার প্যাটেল। প্রস্তাবে বলা হ'লো :

"...ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অহিংসায় অঙ্গীকারবদ্ধ।" তাই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের এই গুরুতর সংকটকালে কংগ্রেস কি পন্থা অবলম্বন করবে তা প্রদর্শনের জন্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীকে অনুরোধ জানাচ্ছে। দিল্লীতে গৃহীত যে প্রস্তাব পুনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অনুমোদন করেছিল, তা গান্ধীজীর ঐ কাজের অন্তরায় হওয়ায়, তা বাতিল হ'লো।"

এইভাবে গান্ধীজী আবার কংগ্রেসের সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন।

১১ই অক্টোবর ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। তিন দিন ধ'রে আলোচনা চললো। গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনার কথা বললেন। গান্ধীজী বললেন, লেখা ও বক্তৃতার স্বাধীনতাই স্বরাজের প্রধান কথা। কংগ্রেস অহিংসায় অঙ্গীকারবদ্ধ এবং যুদ্ধে অবিশ্বাসী। সুতরাং সকল যুদ্ধের বিরুদ্ধেই প্রচার করা তার কর্তব্য। এই প্রচারের মধ্য দিয়েই আইন অমান্য ঘটবে। তবে এই আইন অমান্য ব্যাপক হবে না, প্রথমে গান্ধীজীর কয়েকজন নির্বাচিত সত্যাগ্রহীই বক্তৃতাদির দ্বারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রে আইন অমান্য করবেন।

"আমার পরিকল্পনা আর কিছু নয়, এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবেন শ্রীবিনোবা ভাবে এবং বর্তমানে তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।....সরকার কি করতে চাইবে, তার উপরই অনেক কিছু নির্ভর করবে। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সত্যাগ্রহ সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও, এবং বর্তমানে তা মাত্র একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হ'লেও সরকার যদি বিনোবার বক্তৃতা শোনা বা বিনোবার

লেখা পড়াকে অপরাধ ব'লে ঘোষণা করে, তারা ক্রুত একটি সংকট সৃষ্টি করবে। তবে আমি মনে করি ও বিশ্বাস করি যে, তারা এইভাবে অসুবিধাজনক অবস্থাকে আমন্ত্রণ ক'রে আনবে না।"

১৯৪০ সালের ১৭ই অক্টোবর বিনোবা ভাবে ওয়ার্ধার কাছে পৌনার গ্রামে যুদ্ধবিরোধী একটি বক্তৃতা দিয়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের উদ্বোধন করলেন। তারপর পরপর তিনদিন তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ২১শে অক্টোবর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'লো। সরকার যুদ্ধবিরোধী এইসব বক্তৃতা সম্পর্কে কোনও বিবরণ ছাপা সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। 'হরিজন'-কেও এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী প্রতিবাদ জানিয়ে একটি বিবৃতি দিলেন এবং গান্ধীজী-পরিচালিত সাপ্তাহিকগুলির প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখলেন। বিনোবাজীর গ্রেপ্তারের পর জওহরলাল নেহ্রু ৭ই নভেম্বর সত্যাগ্রহ করবার জন্যে নির্বাচিত হলেন এবং সেই মর্মে সরকারকে নোটিশ দিলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহ করবার আগেই ৩১শে অক্টোবর তাঁকে ওয়ার্ধা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ছেওকি স্টেশনে গ্রেপ্তার করা হ'লো। পরে গোরখপুর জেলে তাঁর বিচার হ'লো এবং তিনি অক্টোবর মাসে প্রদত্ত তাঁর কতিপয় বক্তৃতার জন্যে চার বছরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

নভেম্বরের মাঝামাঝি সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হ'লো। এই সত্যাগ্রহ করলেন ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত দলগুলি। কংগ্রেসের নেতারা, বহু প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী পথে পথে ঘুরে, যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি দিলেন এবং গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। সর্দার প্যাটেলকে ১৭ই নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হ'লো। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা একে একে গ্রেপ্তার হলেন। রাজাগোপালাচারী বাইরে

ছিলেন। তিনিও ৩রা ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হলেন। গান্ধীজী বড়দিন উপলক্ষ্যে ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ৪ঠা জানুয়ারি পর্যন্ত অভিযান স্থগিত রাখলেন। ডিসেম্বরের শেষে দেখা গেল, ওয়ার্কিং কমিটির ১১ জন সদস্য, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৭৬ জন্য সদস্য, ২৯ জন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের চার শতাধিক সদস্য কারারুদ্ধ হয়েছেন। এইভাবে ১৯৪০-এর সাল-তামামি হ'লো।

১৯৪১ সালের ৫ই জানুয়ারি থেকে সত্যাগ্রহের তৃতীয় পর্যায় শুরু হ'লো। এবার স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিই সত্যাগ্রহীদের নির্বাচিত করলেন। সত্যাগ্রহীদের গান্ধীজী নির্দেশ দিলেন, "কোনও সত্যাগ্রহী, পুরুষই হ'ন বা স্ত্রীলোকই হ'ন, সত্যাগ্রহ শুরু করবার পর গ্রেপ্তার না হ'লে ঘরে ফিরবেন না। তাঁরা যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে বা প্রয়োজন হ'লে যুদ্ধবিরোধী সভাসমিতি এবং সংগঠনমূলক প্রচার করতে করতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবেন। অভিযানকালে সত্যাগ্রহী কোন যানবাহন ব্যবহার করবেন না। তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হ'লে তাঁরা একদিনের বেশিও এক জায়গায় থাকতে পারবেন।" জানুয়ারির শেষেই প্রায় আড়াই হাজার সত্যাগ্রহী কারারুদ্ধ হলেন। অনেক ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহীদের কারাদণ্ডের পরিবর্তে অর্থদণ্ড করা হ'লো। উত্তর প্রদেশেই গ্রেপ্তারের সংখ্যা সর্বাধিক ছিল।

যখন সারাদেশে সত্যাগ্রহ ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করছিল এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, তখন হঠাৎ ২৭শে জানুয়ারি তারিখে স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের পলায়নের চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হ'লো।

এপ্রিল মাসে সংগ্রামের চতুর্থ পর্যায় শুরু হ'লো। কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরাও সত্যাগ্রহীদের তালিকাভুক্ত হলেন। সমস্ত দেশে আবার অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা দিল। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দেশে

যে নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তা জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ক'রে তুলেছিল। ১লা বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারকে ধিক্কৃত ক'রে তাঁর বিখ্যাত "সভ্যতার সংকট" সম্পর্কে বাণীটি দিলেন। তাতে বললেন, "এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি ওকে সভ্যতা বলো, আমাদের কি অপহরণ করেছে, তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান্ এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ক'রে দিয়েছে।" উপসংহারে তিনি বললেন, "এই কথা আজ ব'লে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে,"—রবীন্দ্রনাথের এই শেষ বাণী। এর কয়েকমাস পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জুন মাসের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিতরূপে পরিবর্তিত হ'লো—জার্মানি সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করলো। জুলাই মাসে বড়লাট তাঁর শাসন-পরিষদ্ সম্প্রসারণ এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ্ গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। এতে কিন্তু গান্ধীজী আশার কণামাত্রও দেখতে পেলেন না। তিনি বললেন, "এই ঘোষণায় কংগ্রেস যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তার কোনও পরিবর্তন হবে না; এই ঘোষণায় কংগ্রেসের দাবী মেটানো হয় নি।"

এই সময়ে ইতিহাসখ্যাত এটলাণ্টিক সনদের পরিকল্পনা চলছিল। চার্চিল কিন্তু জিদ ধরলেন, এই সনদ ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে

না। গান্ধীজী এইসব ঘটনার উপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিলেন না। ২রা অক্টোবর সেবাগ্রামে গান্ধীজীর ৭২-তম জন্মদিবস পালিত হ'লো। গান্ধীজীকে এই উপলক্ষ্যে তিন কোটি গজ হাতে-কাটা সুতো ও বারো হাজার টাকা উপহার দেওয়া হ'লো। ১৭ই অক্টোবর (১৯৪১) ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এক বৎসর পূর্ণ হ'লো। এই সময় হঠাৎ সরকার কারাগার থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণের পলায়নের চেষ্টা সম্পর্কে একটি চাঞ্চল্যকর বিবরণ প্রকাশ করলো। গান্ধীজী জয়প্রকাশের সন্দেহাতীত দেশপ্রেম এবং সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের পূর্ণ যুদ্ধাবস্থার কথা ঘোষণা করলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি কংগ্রেস-কর্মীদের সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন যে, "কোনও গুপ্ত বা চক্রান্তমূলক আন্দোলন কখনই গণ-আন্দোলনে পরিণত হ'তে পারে না বা কোটি কোটি মানুষকে কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে না।"

১৯৪১ সালের শেষাশেষি মিত্রপক্ষের অবস্থা ক্রমেই সংকটজনক হয়ে উঠলো। জার্মানি সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ক্রমাগত অগ্রসর হ'তে লাগলো এবং নিকট প্রাচ্যে তার আক্রমণ সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। জাপান ইন্দোচীনে তার অধিকার বিস্তৃত করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুরোপুরি অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। সুতরাং ভারতের বিপুল জনবল ও সম্পদকে যুদ্ধের কাজে পুরোপুরি নিয়োগের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বৃটিশ সরকার তাই কিছুটা নমনীয় মনোভাব দেখালো। তারা জওহরলাল নেহরু ও মওলানা আজাদ সহ যেসব কংগ্রেস-কর্মীর অপরাধ তেমন গুরুতর নয় তাঁদের শুভেচ্ছার প্রতীকরূপে মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলো। গান্ধীজী বললেন, "আমি এই ঘটনার আগেও বলেছি, পরেও বলব, এতে আমার মনে কোন সাড়া জাগছে না।"

বিগত ২৪ মাসে প্রায় পঁচিশ হাজার সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার

হয়েছিলেন। তাঁদের সরকার পাইকারীভাবে মুক্তি দিতে লাগলো। ৭ই ডিসেম্বর গান্ধীজী একটি বিবৃতিতে বললেন যে, এইভাবে বন্দীদের মুক্তি দিয়ে সরকার কংগ্রেসকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের একটি সুযোগ দিতে চাইছে, যাতে কংগ্রেস যে বোম্বাই প্রস্তাব অনুসারে আমার নেতৃত্বে সত্যাগ্রহের অনুমতি দিয়েছিল সেই প্রস্তাবটি বাতিল করা হয়। গান্ধীজী তাই কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আজাদকে অবিলম্বে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকবার এবং তাড়াতাড়ি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের ব্যবস্থা করবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও ঘোষণা করলেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নূতন কোনও প্রস্তাব না নেওয়া পর্যন্ত সত্যাগ্রহ চলবে। পরদিন তিনি বারদৌলি যাত্রা করলেন এবং সেখানে সর্দার প্যাটেলের একটি কৃষিখামারে একমাস রইলেন।

২৩শে ডিসেম্বর বারদৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। জার্মানি সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করায় এবং জাপান বিশ্ব-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনীতিতে এবং যুদ্ধের চরিত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তা জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি নেতাদের বিশেষভাবে চিন্তিত ক'রে তুললো। জার্মানি ও জাপান তাদের আক্রমণের দ্বারা বহু দেশের স্বাধীনতা বিনষ্ট ও বিপন্ন করছিল। তাই কংগ্রেস কমিটি ভারতের সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের নীতির তীব্র নিন্দা ক'রে আক্রান্ত এবং নিজ নিজ স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করছে এমন দেশগুলির প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জানালো। তবে বললো, "কেবল একটি মুক্ত ও স্বাধীন ভারতই জাতীয় ভিত্তিতে দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এবং এই যুদ্ধের ঘটনা থেকে যেসব বৃহত্তর আদর্শ ও লক্ষ্যের উদ্ভব ঘটেছে সেগুলিকে সার্থক ক'রে তোলার কাজে সহায়তা করতে পারে। ভারতে সমগ্র পটভূমিকা হ'লো শত্রুতা

ও অবিশ্বাসের পটভূমিকা, কোনও সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিশ্রুতিই সে পটভূমিকার পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে না এবং যে উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদকে ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচার থেকে পৃথক করা যায় না, তাকে পরাধীন ভারত স্বেচ্ছায় বা ইচ্ছায় কখনও সাহায্য দিতে পারে না। সুতরাং কমিটির অভিমত এই যে, ১৯৪০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তা আজও অপরিবর্তিত রয়েছে এবং আজও তাই কংগ্রেসের নীতি নির্দেশ করছে।"

যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও যুদ্ধের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করায় গান্ধীজী পুনরায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে পাশে সরে দাঁড়ালেন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আজাদকে একটি পত্রে জানালেন যে, "আলোচনাকালে আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমি বোম্বাই প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় একটি মারাত্মক ভুল করেছি। আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম যে, কংগ্রেস প্রধানতঃ অহিংসার কারণেই বর্তমান ও সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অসম্মত হবে। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ সদস্যই আমার ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নন; তাঁদের মতে যুদ্ধবিরোধিতা কেবল অহিংসার কারণে না-ও হতে পারে। আমি বোম্বাই প্রস্তাবটি আবার পড়ে দেখলাম, অধিকাংশ সদস্যের এই ব্যাখ্যাই ঠিক এবং আমি যে ব্যাখ্যা করেছি, তা আক্ষরিক নয়। এই ভুল আবিষ্কারের ফলে যাতে অহিংসা অপরিহার্য নয় এমন কোনও কারণে যুদ্ধপ্রচেষ্টাবিরোধী কোনও সংগ্রামে আমার পক্ষে এখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব করা অসম্ভব।" তাই গান্ধীজীর অনুরোধে গান্ধীজীকে তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে এবং গান্ধীজীর নেতৃত্ব এবং তাতে সমগ্র জাতির সাড়া দেওয়ার প্রশংসা ক'রেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হলো।

বৃটিশ সরকারের মনোভাবে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। ভারতসচিব আমেরি বড়লাটের ঘোষণাকেই যথেষ্ট মনে করলেন।

জানুয়ারির মাঝামাঝি ওয়ার্ধায় আবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো। আজাদ এতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে গান্ধীজীর সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতের অমিল কোথায় তা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন—গান্ধীজী অহিংসার নীতি অনুসারেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরোধী, আর তাঁরা বিরোধী রাজনৈতিক কারণে। তিনি একথাও ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেসের সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, কেবল মৃত্যুই তাঁদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

গান্ধীজী এই অধিবেশনে হিন্দীতে যে ভাষণ দিলেন, তাতে বললেন, "আপনারা কেউ এই ধারণা নিয়ে যাবেন না যে, কংগ্রেসের বাঁশিতে চিড় ধরেছে। ওয়ার্কিং কমিটি একটি সুখী পরিবারের মতো কাজ করছে। কেউ এই ধরনের আভাস দিয়েছেন যে, আমার সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলালের বিচ্ছেদ ঘটেছে। আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে মতানৈক্যের চেয়ে অনেক বেশি কিছু দরকার। আমরা যখন থেকে সহকর্মীরূপে কাজ করতে শুরু করেছি, তখন থেকেই আমাদের মতানৈক্য আছে। তবু আমি কয়েক বছর যাবৎ বলছি এবং এখনও বলছি যে, রাজাজী নয়, জওহরলালই আমার উত্তরাধিকারী হবেন। জওহরলাল বলেন যে, তিনি আমার ভাষা বোঝেন না। তিনি যে ভাষায় কথা বলেন, আমি তা বুঝি না। তা সত্য হ'তেও পারে, না-ও পারে। কিন্তু ভাষা হৃদয়ের মিলনের পথে কোনও অন্তরায় নয়। এবং আমি এ-ও জানি যে, আমি যখন থাকব না, তখন তিনিই আমার ভাষায় কথা বলবেন।"

তিনি আরও বললেন, "আমি কংগ্রেসের নেতৃত্ব ত্যাগ করায় কোন কোন কংগ্রেসসেবী দুঃখ পেয়েছেন। আপনারা আমাকে হারান নি। কংগ্রেসের প্রতি যখন আমার আনুগত্য থাকবে না, যখন আমি ব্যবহারিক বুদ্ধি হারাবো, তখনই আপনারা আমাকে

হারাবেন। আমি বারদৌলিতে কংগ্রেস ত্যাগ করিনি। আমি সাত বছর আগে বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলাম এবং তা করেছিলাম দেশ ও কংগ্রেসকে আরো বেশি পরিমাণে সেবা করবার উদ্দেশ্যে। সর্দারজী ও রাজেন্দ্রবাবুর মতো সহকর্মীরা ঐ প্রস্তাবে সুখী নন; কিন্তু আমি তাঁদের ওয়ার্কিং কমিটি ত্যাগ না করতে অনুরোধ করছি। তবে তাঁরা যদি কংগ্রেস ত্যাগ করেন-ও, কংগ্রেসের কাজ বন্ধ থাকবে না। তাঁরা থাকুন বা না থাকুন, কংগ্রেসের কাজ চলতে থাকবে। কোনও মানুষ, তিনি যতো বড়োই হ'ন না কেন, কংগ্রেসের পক্ষে অপরিহার্য নয়। দাদাভাই, ফিরোজ শাহ্ ও তিলকের মতো যাঁরা কংগ্রেসকে গ'ড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা আজ কেউ নেই; তবু কংগ্রেস কাজ ক'রে চলেছে।"

এই অধিবেশনে কংগ্রেস গান্ধীজী-প্রদর্শিত গঠনমূলক কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করলো এবং সমাজবিরোধীরা যাতে দেশে হাঙ্গামা বা গোলযোগ সৃষ্টি করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে কঠোর অহিংস নীতির ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গ'ড়ে তুলতে বলা হ'লো।

গান্ধীজী জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করলেন। পথে তিনি "প্রকৃত যুদ্ধোদ্যম" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি বললেন, "অবশ্য বর্তমানের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হ'লো অন্নহীনকে অন্ন ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া। ইতিমধ্যেই দেশে খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব ঘটেছে। যুদ্ধ যতোই চলতে থাকবে, অভাব ততোই বাড়বে। খাদ্য বা বস্ত্র, কিছুই বাইরে থেকে আমদানি হচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত ধনীরা অভাবের তাড়না বোধ না করলেও দরিদ্ররা বুঝতে শুরু করেছে। ধনীরা দরিদ্রদের উপর নির্ভর ক'রেই বাঁচেন। অন্য কোন উপায় নেই। সুতরাং তাদের কর্তব্য কি? যাঁরা কিছু সঞ্চয় করেন, তাঁরা আসলে কিছুটা উৎপাদন করেন। তাই যাঁরা দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি বোধ করেন,

যাঁরা তাদের সঙ্গে একাত্ম হ'তে চান, তাঁদের উচিত তাঁদের নিজ নিজ প্রয়োজন হ্রাস করা।......পরে তিনি সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্পর্কেও একটি প্রবন্ধ লিখলেন। বারাণসীতে পৌঁছে তিনি যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেসসেবীদের একটি সভায় বক্তৃতা করলেন।

১লা ফেব্রুয়ারি তিনি ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গোসেবা-সঙ্ঘের সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি হিন্দুর কাছে গোজাতির পবিত্রতার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, আমরা হিন্দুরা গাভীর প্রতি যতোটা যত্ন করি, ষাঁড় বা বলদের প্রতি ততোটা করি না। মুসলমানদের গোহত্যায় বাধা দিয়ে আমরা কেবল মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধে নয়, গোহত্যাতেও উস্‌কানি দিই। হিন্দুদের হাতেই দুধ-ঘির ব্যবসা আছে। হিন্দুরা এই ব্যবসায়ে যে অসততার আশ্রয় নেয়, বেশি দুধ-সংগ্রহের আশায় ফুকা দিয়ে যেভাবে দুগ্ধবতী গাভীদের পীড়া দেয়, সেসব বিষয়েও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। তিনি দুধ, মাখন ও ঘিতে ভেজাল দেওয়ার ব্যাপারটির তীব্র নিন্দা করেন এবং দেশে কিভাবে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়, সে সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। কেবল গোজাতি নয়, মহিষগুলিকেও সংরক্ষণ করবার প্রশ্নটি তিনি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন।

ঘটনাপ্রবাহ ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। মিত্রপক্ষ এশিয়ায় ও ইউরোপে বারবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছিল। ব্রহ্মদেশে বৃটিশবাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। তার প্রতিক্রিয়া সারা এশিয়ায় অনুভূত হয়েছিল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রত চীন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। তাই ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুওমিন্‌তাং সরকারের প্রধান মার্শাল চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর পত্নী মাদাম চিয়াং কাই-শেক ভারতে এসেছিলেন। ভারতীয় নেতাদের মার্শাল চিয়াংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে বড়লাট আমন্ত্রণ করেছিলেন।

গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করা হয় নি। তবে মার্শাল চিয়াং গান্ধীজীর সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাৎ করলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজীর সঙ্গে মার্শাল চিয়াং দীর্ঘক্ষণ আলাপ করলেন। এই আলাপ প্রসঙ্গে গান্ধীজী সর্দার প্যাটেলকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে লিখেছিলেন যে, মার্শাল চিয়াং বা তিনি কেউ-ই পরস্পরের ওপর রেখাপাত করতে পারেন নি। এই সাক্ষাৎকারে চিয়াং কাই-শেকের মূল লক্ষ্য ছিল গান্ধীজীকে এই কথা বোঝানো যে, জাপানের চেয়ে বৃটিশ অনেক ভালো এবং এই যুদ্ধের পর বৃটিশ আরো ভালো হয়ে যাবে; সুতরাং জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের উচিত বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করা।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের দ্রুত ও দুর্বার অগ্রগতি কেবল মিত্রপক্ষের নয়, ভারতেরও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। কারণ, ভারত এখন জাপানী আক্রমণের মুখোমুখি এসে পৌঁছেছিল। যুদ্ধে ভারতের গুরুত্বও এখন অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ, এখন ভারতকেই ভিত্তি ক'রে জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া, ভারতের জনবল ও সম্পদ্ পুরোপুরি ব্যবহার এখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৪২ সালের ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হ'লে জাপ বাহিনী যে কোনও মুহূর্তে আসাম বাংলাদেশে বা মাদ্রাজে পৌঁছবার আশঙ্কা দেখা দিল। এই অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনস্টন চার্চিল ১১ই মার্চ ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের মন্ত্রিসভা ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপযোগী একটা পরিকল্পনা আবিষ্কার করেছেন এবং এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ভারতে রওনা হচ্ছেন।

২২শে মার্চ তারিখে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ দিল্লী পৌঁছলেন। তিনি প্রথমে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো, তাঁর শাসন পরিষদের সভ্যবৃন্দ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে

ভারতীয় সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। তিনি বৃটিশ সরকারের যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন, তাতে বলা হ'লো যে, ভারতে একটি নূতন যুক্তরাষ্ট্র গ'ড়ে তোলা হবে; এই যুক্তরাষ্ট্র ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা ঔপনিবেশিক মর্যাদা পাবে; তবে ইচ্ছা করলে তা বৃটিশ কমনওএল্‌থ্‌ থেকে বাইরে যেতে পারবে। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর ভারতের নূতন সংবিধান গঠনের জন্যে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সাংবিধানিক পরিষদ্‌ গঠিত হবে। ঐ সাংবিধানিক পরিষদ্‌ যে সংবিধান রচনা করবে, বৃটিশ সরকার তা গ্রহণ করবেন; তবে দুটি শর্ত—(১) যদি নূতন সংবিধান কোন প্রদেশ বা প্রদেশসমূহের মনঃপূত না হয়, তবে সে বা তারা নিজেদের জন্যে পৃথক সংবিধান রচনা করতে পারবে এবং তারাও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমমর্যাদা পাবে। দেশীয় রাজ্যগুলিরও নূতন সংবিধান মানবার বা না মানবার স্বাধীনতা থাকবে। (২) বৃটেনের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে শাসনকর্তৃত্ব সম্পূর্ণ স্থানান্তরের ব্যাপারে যেসব সমস্যা দেখা দেবে, তা সমাধানের সম্পর্কে বৃটিশ সরকার ও সাংবিধানিক পরিষদের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধিকার "তাদের বিশ্ব-যুদ্ধ প্রচেষ্টার অংশরূপে" বৃটেনের হাতে থাকবে; তবে ভারতের সামরিক, নৈতিক ও বৈষয়িক সহায়-সম্পদ্‌ সংগঠনের দায়িত্ব থাকবে ভারত সরকার ও দেশীয় জনসাধারণের সহযোগিতার ওপর। এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতীয় নেতাদের "তাঁদের দেশের, কমনওএল্‌থের ও রাষ্ট্রপুঞ্জের মন্ত্রণাসভাসমূহে" অংশ-গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় অবিলম্বে অংশগ্রহণের জন্যে অস্পষ্টভাবে আমন্ত্রণ জানানো হ'লেও এই প্রস্তাবে সবটুকুই ভবিষ্যতের জন্যে তোলা ছিল। এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ২৫শে মার্চ থেকে ১০ই

এপ্রিল পর্যন্ত চললো। এই সতের দিনে গান্ধীজীসহ দেশের বহু রাজনৈতিকদল ও দলীয় নেতাদের সঙ্গে স্যার স্ট্যাফোর্ড সাক্ষাৎ করলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা প্রধানত মওলানা আজাদ ও নেহ্‌রুজীর মাধ্যমে হ'লেও তিনি ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করলেন। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একা মিঃ জিন্না এবং হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে সাভারকর ও অন্যান্য চারজন প্রতিনিধি, তপসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ডাঃ আম্বেদকর ও এম. সি. রাজা এবং উদারপন্থীদের পক্ষ থেকে সপ্রু ও জয়াকর আলোচনা চালালেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলগুলিও তাঁদের বক্তব্য ও দাবী পেশ করলেন।

প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংস্থা সম্পর্কে মুসলিম লীগের মনোভাব ছিল বিরূপ। লীগ পাকিস্তান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দাবি করলো। হিন্দুমহাসভা এই পরিকল্পনার কোন কোন অংশ সম্পর্কে কমবেশি সন্তোষ প্রকাশ করলো। কিন্তু কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে নবগঠিত যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যেতে পারে, এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানালো এবং পরিকল্পনাটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণের অযোগ্য ব'লে ঘোষণা করলো। উদারনৈতিক নেতারা কিছুটা নমনীয় ভাব দেখালেন। তবে তাঁরাও ভারতবিভাগের সম্ভাবনায় আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। শিখসম্প্রদায় কোন প্রদেশের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাইরে যাওয়ার সুযোগের ঘোর বিরোধিতা করলেন; মুসলিমপ্রধান পাঞ্জাব যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যেতে চায়, তবে তারা তার বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে লড়বেন ব'লে ঘোষণা করলেন। তপসিলভুক্ত শ্রেণী এই পরিকল্পনায় তাঁদের কোনও রক্ষা করবার ব্যবস্থা নেই ব'লে তাঁরাও এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন।

গান্ধীজী স্যার স্ট্যাফোর্ডকে বললেন, "এই যদি আপনাদের প্রস্তাব হয়, তবে আপনি কেন এসেছেন? আপনি পরের বিমানেই

দেশে ফিরে যান।" তিনি পরিকল্পনাটিকে 'ভবিষ্যতের তারিখ-দেওয়া' একটি চেক ("a post-dated cheque") ব'লে বর্ণনা করলেন। তিনি ওয়ার্কিং কমিটিকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে ব'লে ৪ঠা এপ্রিল সেবাগ্রামে ফিরে গেলেন। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের প্রস্তাবে বললেন, "কেবল বর্তমানে স্বাধীনতালাভই সেই অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত করতে পারে যা কোটি কোটি হৃদয়কে উদ্ভাসিত ও সক্রিয় ক'রে তুলবে।" সেই সঙ্গে আরও বলা হ'লো যে, "যদিও এই প্রস্তাবে ভাবী স্বাধীনতার কথা প্রচ্ছন্ন আছে,—তবু সেই সঙ্গে যেসব প্রস্তাব ও বাধানিষেধ আরোপ করা যাচ্ছে, তাতে প্রকৃত স্বাধীনতা ছলনামাত্রে পরিণত হ'তে পারে।" কংগ্রেস ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবকে প্রধান দুটি কারণে অগ্রাহ্য করলেন; এক, এতে দেশীয় রাজ্যসমূহের নয় কোটি নর-নারীকে উপেক্ষা করা হয়েছে—সংবিধানে তাদের বক্তব্যের কোন স্থান নেই; এবং দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে। দুই, এতে কোনও প্রদেশ বা প্রদেশসমূহকে সংবিধান না মানবার ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হচ্ছে, তা ভারতের ঐক্যের বিরোধী।

ভারত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে ওঠায় আলোচনা-কালে প্রতিরক্ষাও যথেষ্ট প্রাধান্য পেলো। কংগ্রেস সে বিষয়ে বললেন, নূতন ক'রে বড়লাটের শাসন-পরিষদ্ গঠন করতে হবে এবং শাসন-পরিষদ্‌কে মন্ত্রিসভার মর্যাদা দিতে হবে; একজন ভারতীয় হবেন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী। স্যার স্ট্যাফোর্ড শাসন-পরিষদ্‌কে মন্ত্রিসভার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন এবং হঠাৎ ১২ই তারিখে দিল্লী থেকে লণ্ডন রওনা হয়ে গেলেন।

১৩ই এপ্রিল গান্ধীজী ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে বললেন; "এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বৃটিশ সরকার রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের জন্যে এমন একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, যা

দেখলেই কেউ গ্রহণ করবে না। আর এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, সেই প্রস্তাব যিনি নিয়ে এসেছেন তিনি একজন প্রগতিবাদী ও ভারত-হিতৈষী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্। তাঁর শুভেচ্ছা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। একথা তাঁর জানা উচিত ছিল যে, সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হ'লেও কংগ্রেস কখনও ডোমিনিয়ন স্টেটাস গ্রহণ করবে না। তিনি একথাও জানেন যে, এই প্রস্তাবে ভারতকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে পাকিস্তানের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মুসলিম লীগ যে পাকিস্তান চেয়েছে, এ তাও নয়। সর্বশেষে, এতে মন্ত্রীদের হাতে প্রতিরক্ষার বিষয়ে প্রকৃত কোনও নিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া হয় নি।”

২৬শে এপ্রিল তারিখে তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে ইংরেজদের ভারত ত্যাগ করতে বললেন। তিনি লিখলেন, “আমার পত্রপ্রেরকদের অসংখ্য প্রশ্নের মধ্যে একটি হ'লো ভারতে বিদেশী আগমন সম্পর্কে। আমাদের এখানে যথেষ্ট বিদেশী বন্দী রয়েছেন। এখন আমাদের বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্ভবত চীন থেকেও সৈন্যরা অবিরাম ধারায় আসতে থাকবে। আমি স্বীকার করছি, এই ঘটনাটিকে আমি শান্তচিত্তে দেখতে পারছি না। কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্য থেকে কি অসংখ্য সৈনিক শিক্ষা দিয়ে তৈরি করা যেত না? তারা কি যুদ্ধের সরঞ্জাম হিসাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের মতোই কাজ করতে পারে না? তবে বিদেশী সৈনিক কেন? আমরা জানি, মার্কিন সাহায্যের অর্থ কি। এর অর্থ শেষ পর্যন্ত বৃটিশ শাসনের সঙ্গে মার্কিন শাসনের সংযুক্তি না হ'লেও মার্কিন প্রভাব তো বটেই। তথাকথিত ভারত-রক্ষার জন্যে এই যে সব প্রস্তুতি, এর মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতাকে উঁকি দিতেও দেখছি না। যাই বলা হ'ক না কেন, এই প্রস্তুতি হ'লো সোজা কথায়, বৃটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার প্রস্তুতি। বৃটেন যেমন

সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে করেছে, সেইভাবে ভারতকে যদি তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চ'লে যায়, তাহ'লে অহিংস ভারতের কোন ক্ষতি হবে না। সম্ভবত জাপান ভারতের দিকে নজরই দেবে না।......"

ঐ সংখ্যাতেই তিনি পাঠকদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেন। একটি প্রশ্নে বলা হয়েছিল, জাপান যেমন বলছে, সত্যি যদি তেমনি সে ভারতকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করতে চায়, তবে আমরা তাদের সাহায্য নেব না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন, "কোনও আক্রমণকারী আমাদের উপকারী হবে, এটা মনে করা নির্বুদ্ধিতা। জাপান ভারতকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করতে পারে, তবে তারা তা করবে কেবল নিজেদের শাসন চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে। আমি বরাবরই ব'লে এসেছি, বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি-লাভের জন্যে আমরা অন্য কোনও শক্তির সাহায্য নেব না।"

আর একটি প্রশ্নে হয় বলা যে, গান্ধীজী জওহরলালকে তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী বলেছেন। কিন্তু জওহরলাল প্রয়োজন হ'লে জাপানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের কথাও বলছেন। জওহরলাল প্রকাশ্যে হিংসার প্রচার করছেন এবং রাজাজী সমগ্র ভারতীয় জাতির জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শিক্ষা দাবি করছেন। এতে গান্ধীজীর অহিংসা-নীতির অবস্থা কি দাঁড়াবে? গান্ধীজী এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, জওহরলাল তাঁর উত্তরাধিকারী এই অর্থে যে, তিনি যখন থাকবেন না, তখন জওহরলালই তাঁর স্থান অধিকার করবেন। জওহরলাল তাঁর (গান্ধীজীর) পদ্ধতিতে কখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নি, তিনি (জওহরলাল) অনেক সময় তার সমালোচনাও করেছেন; তবে তিনি কংগ্রেসের নীতিকে কঠোরভাবে অনুসরণ ক'রে এসেছেন। ......"আমি দুঃখিত যে, তিনি গেরিলা-যুদ্ধ সম্পর্কে কল্পনা করছেন, তাঁর এই কল্পনা স্থায়ী হবে না। তিনি বা রাজাজী এর ব্যর্থতা দেখলেই নূতন উৎসাহ নিয়ে আবার অহিংসার পথেই ফিরে আসবেন। তাই আমি এ বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগ বোধ করছি না।"

২৯শে এপ্রিল এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসবার কথা ছিল। ২৩শে এপ্রিল মাদ্রাজে রাজাজী মাদ্রাজ আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যদের এক সভায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উত্থাপনের জন্যে ছুটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাতে তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিরোধ মীমাংসার জন্যে পাকিস্তানকে মেনে নিতে এবং মাদ্রাজে পুনরায় দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন দাবি করতে বললেন। ২৯শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো। অধিবেশনে রাজাজীর এই দুই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেলো। রাজাজী এই প্রস্তাবগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে কোনক্রমে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ রাখতে সমর্থ হ'লেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হ'লো, তাতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করবার সামান্যতম প্রচেষ্টাকেও নিন্দা করা হ'লো।

সরকার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি প্রস্তাবের প্রকাশ নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিসে তল্লাস চালিয়ে কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করলো। জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে নেহ্‌রুজী যে সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা বলছিলেন, তা তিনি এখন পরিত্যাগ ক'রে গান্ধীজীর অহিংস প্রতিরোধের নীতিকেই গ্রহণ করলেন।

এপ্রিল মাসের শেষ থেকে গান্ধীজী নূতন ধ্বনি তুললেন—"ভারত ত্যাগ কর" ধ্বনি। তিনি বললেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতে বৃটিশের অবস্থিতিই জাপানকে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করবে। বৃটিশ যদি বুদ্ধিমানের মতো ভারত পরিত্যাগ ক'রে ভারতীয়দের হাতে তাদের সাধ্যমতো নিজেদের পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার ভার ছেড়ে দেয়, তবে জাপান তার পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হবে।" ১১ই মে তারিখে তিনি "প্রত্যেকটি

বৃটনের প্রতি" নামে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি বললেন : "এই মুহূর্তে বৃটেন যাতে এশিয়ায় ও আফ্রিকায় তাদের প্রত্যেকটি অধিকার থেকে, অন্ততঃপক্ষে ভারত থেকে, সরে যায়, এই উদ্দেশ্যে বৃটেনের কাছে আমার আবেদনকে সমর্থন করবার জন্যে আমি প্রত্যেকটি বৃটনকে অনুরোধ করছি। এই পদক্ষেপ বিশ্বের নিরাপত্তা এবং নাৎসীবাদ ও ফাসিবাদকে ধ্বংস করবার জন্যে অপরিহার্য। এতে আমি জাপানের মতবাদের কথাও বলছি। জাপানের মতবাদ নাৎসীবাদ ও ফাসিবাদের নকল মাত্র।··· যদি আমার আবেদন উপলব্ধি করা হয়, তবে বৃটেন ভারতে ও আফ্রিকায় তার যে স্বার্থ হারাবে তা যুদ্ধের জন্যে তার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের তুলনায় কিছুই নয়। নৈতিক দিক্ বিবেচনা করলে বৃটেন তথা বিশ্বের লাভই হবে।"

৬ই জুলাই তারিখে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে ওয়ার্ধায় ওয়াকিং কমিটির বৈঠক বসলো। তাতে জাপানী আক্রমণের উপযুক্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যেই যে বৃটেনের ভারত ত্যাগ করা প্রয়োজন, তা সুস্পষ্টভাবে বলা হ'লো। সেই সঙ্গে বলা হ'লো যে, কংগ্রেস যুদ্ধকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে বিব্রত করতে চায় না বলেই তারা ব্যাপক অহিংস সত্যাগ্রহের পথ ত্যাগ করে এসেছে এতদিন। কিন্তু বৃটেন যদি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে, তবে কংগ্রেস ১৯২০ সাল থেকে যে অহিংস যুদ্ধের শক্তিসঞ্চয় করেছে, তা গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এ বিষয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। ৭ই আগস্ট (১৯৪২) বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের দিনও স্থির হ'লো।

ভারতসচিব মিঃ আমেরি কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, "বিদ্রোহের সঙ্গে কোনপ্রকার আপোস করা হবে না।" স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ২৭শে জুলাই তারিখে একটি বেতার-ভাষণে

গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করলেন। বৃটেনে ও আমেরিকায় সম্ভাবিত ব্যাপক অহিংস আন্দোলন সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হ'তে লাগলো। গান্ধীজী গত তিনমাস যাবৎ অসংখ্য বিদেশী সাংবাদিকের কাছে তাঁর মতামত সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করছিলেন। তিনি "আমেরিকান বন্ধুদের" কাছেও তাঁর মত ব্যক্ত করে খোলা চিঠি লিখলেন।

বোম্বাইয়ে আগস্টের (১৯৪২) প্রথম সপ্তাহে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। গান্ধীজী আগাগোড়া উপস্থিত থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের "ভারত ছাড়" প্রস্তাবটিকে রূপদানের জন্যে সাহায্য করতে লাগলেন। ৭ই আগস্ট বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু হ'লো। কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ বললেন যে, ক্রিপ্‌স্ দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার পর এলাহাবাদে ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব করেছিল, তা না ক'রে গত্যন্তর ছিল না। আজাদ "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাবের নিহিতার্থ ব্যাখ্যা ক'রে বললেন যে, এতে ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে না, এতে বলা হচ্ছে বৃটেনকে ভারতীয়দের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে।

মওলানা আজাদের পর মহাত্মা গান্ধী হিন্দুস্থানীতে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "আমাদের সংগ্রাম ক্ষমতালাভের সংগ্রাম নয়, এ আমাদের ভারতের স্বাধীনতার জন্য অহিংস যুদ্ধ। হিংসাত্মক যুদ্ধে, প্রায়ই দেখা যায়, বিজয়ী সেনাপতি সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেস মূলত অহিংস। তাই এর পরিকল্পনার মধ্যে একনায়কত্বের কোনও স্থান নেই। স্বাধীনতার সংগ্রামে অহিংস যোদ্ধা নিজের জন্যে কিছু চায় না, সে শুধু তার দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করে। যখন স্বাধীনতা আসবে, তখন কে দেশ শাসন করবে, তা নিয়ে কংগ্রেস মাথা ঘামায় না। যখন ক্ষমতা আসবে, তখন সে ক্ষমতার অধিকারী হবে ভারতের জনগণ।

জনগণই স্থির করবেন, ক্ষমতা কার ওপর ন্যস্ত করা হবে। ধরুন, এমন হ'তে পারে, শাসনক্ষমতা পার্শীদের হস্তে ন্যস্ত হ'লো—তা যদি হয় আমি খুবই খুশী হব—কিংবা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের হাতে, যার নাম আজ কংগ্রেসের মধ্যে শোনাই যায় না। তখন আপনারা আপত্তি ক'রে বলতে পারবেন না যে, 'এই সম্প্রদায়টি নগণ্য ; ঐ দল স্বাধীনতা-সংগ্রামে কিছুই করে নি ; তবে ওরা সব ক্ষমতায় আসবে না কেন? প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কংগ্রেস নিজেকে সাম্প্রদায়িক কলঙ্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রেখেছে। কংগ্রেস সমস্ত জাতির দিক্ দিক থেকেই সর্বদা চিন্তা করেছে এবং সেইমত কাজও করেছে।...

"আমার বিশ্বাস, বিশ্বের ইতিহাসে আমাদের এই সংগ্রামের চেয়ে অধিকতর অকৃত্রিম কোনও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংঘটিত হয় নি। আমি যখন জেলে ছিলাম, তখন কারলাইলের "ফ্রেঞ্চ্ রিভল্যুশন্" পড়েছি, পণ্ডিত জওহরলাল আমাকে রুশ-বিপ্লব সম্পর্কে কিছু কিছু বলেছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যেহেতু এইসব সংগ্রাম হিংসার অস্ত্র দিয়ে সংঘটিত হয়েছে, সেগুলি গণ-তান্ত্রিক আদর্শকে রূপায়িত করতে পারে নি। আমি যে গণতন্ত্রের রূপ কল্পনা করেছি, অহিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি গণতন্ত্র, তাতে প্রত্যেকেরই সমান স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেকেই হবেন তাঁর নিজ নিজ প্রভু। এই ধরনের একটি গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করতে আমি আপনাদের সবাইকে আহ্বান করছি। আপনারা যদি একবার তা হৃদয়ঙ্গম করেন, তবে হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ ভুলে যাবেন, স্বাধীনতার জন্যে সকলের সম্মিলিত সংগ্রামে নিযুক্ত একজন ভারতীয়মাত্র ব'লে নিজেকে ভাববেন।"

উপসংহারে তিনি বললেন, "তাছাড়া, বৃটিশের প্রতি মনোভাব নিয়ে একটা সমস্যা আছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে, জনসাধারণের মধ্যে বৃটিশের প্রতি ঘৃণা রয়েছে। লোকে বলে, তাদের ব্যবহারে

তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। লোকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটিশ জাতির মধ্যে কোনও পার্থক্য করে না। তাদের কাছে, দু-ই এক। এই ঘৃণার ফলে তারা জাপানীদেরও স্বাগত জানাতে পারে। তা অতীব বিপজ্জনক। এর অর্থ হ'লো, তারা একটি দাসত্বের বিনিময়ে অন্য একটি দাসত্বকে নেবে। আমাদের এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। বৃটিশ জাতির সঙ্গে আমাদের বিবাদ নয়, আমাদের সংগ্রাম তাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। বৃটিশ শক্তিকে ভারত ত্যাগ করবার প্রস্তাব ক্রোধের বশবর্তী হয়ে করা হয় নি। এই সংকট-মুহূর্তে ভারত যাতে নিজের ভূমিকা ঠিকমতো করতে পারে, সেজন্যই করা হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধ চালাবে, আর ভারত ইচ্ছায় হ'ক অনিচ্ছায় হ'ক কেবল অর্থ ও সম্পদ্ দিয়ে সাহায্য করবে, এটা ভারতের মতো একটি সুবিশাল দেশের পক্ষে সুখকর নয়। আমরা স্বাধীন না হওয়ায় এই যুদ্ধ যে আমাদের যুদ্ধ এটা আমরা অনুভব করি না; আর যতোক্ষণ না তা আমরা অনুভব করছি, ততক্ষণ আমাদের মনে ত্যাগের ও বীর্যের মনোভাব জেগে ওঠা সম্ভব নয়। আমি জানি, আমরা যখন যথেষ্ট আত্মত্যাগ করবো, তখন বৃটেন আমাদের স্বাধীনতা না দিয়ে পারবে না। সুতরাং আমাদের ঘৃণার মনোভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। বস্তুতঃপক্ষে, আমি এখন নিজেকে বৃটেনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মনে করছি, যা ইতিপূর্বে কখনও করি নি। তার একটা কারণ, তারা এখন বিপদে পড়েছে। তাই আমার বন্ধুত্ব চায় তাদের ভুল থেকে তাদের মুক্ত করতে।..."

গান্ধীজীর পর জওহরলাল প্রস্তাবটি উত্থাপন ক'রে বললেন, "এই প্রস্তাব কারও প্রতি বিন্দুমাত্র হুমকি নয়। যদি বৃটিশ সরকার এই প্রস্তাব মেনে নেন, তবে তা সব দিক্ থেকেই, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, উভয় ক্ষেত্রেই উত্তম হবে। চীনের অবস্থার উন্নতি ঘটবে। ভারতের জন্যে যে কোনও পরিবর্তন আসুক, তাতে তার

মঙ্গলই হবে। তারা জানে, বৃটিশ বা অন্যান্য বিদেশী সৈন্যকে ভারতে থাকতে দিতে গান্ধীজীর আপত্তি নেই।”

প্রস্তাবটি সমর্থন ক’রে সর্দার প্যাটেল বললেন, “বৃটেনকে বিব্রত না করবার নীতি কংগ্রেস দীর্ঘ তিন বৎসর ধ’রে সন্তর্পণে অনুসরণ করেছে। কিন্তু বৃটেন কংগ্রেসের এই মনোভাবের মূল্য দেয় নি। কংগ্রেস আর অপেক্ষা করতে পারে না।

পরদিন, ৮ই আগস্ট, কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হ’লো, তখন কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব এলো। বেশির ভাগ সংশোধনী প্রস্তাবই তুললেন কমিউনিস্টরা। বিরোধীদের উত্তরে নেহ্‌রুজী সুস্পষ্টভাবে বললেন, “এই প্রস্তাব কোন হুমকি নয়। এটা একটা আমন্ত্রণ; এটা একটা ব্যাখ্যা; এটা সহযোগিতার একটা প্রস্তাব। এই মাত্র। তবু এর পেছনে একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, কিছু যদি না ঘটে, তবে তার ফলাফলরূপে কিছু ঘটবে। এটি স্বাধীন ভারতের সহযোগিতার একটি প্রস্তাব। অন্য কোনও শর্তে সহযোগিতা সম্ভব নয়। অন্য কোন শর্তে এই প্রস্তাব কেবল সংঘর্ষ ও সংগ্রামেরই অঙ্গীকার।”

সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিলে সেগুলি বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হলো। মূল প্রস্তাবটি ভোটে দিলে সেটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হ’লো—মাত্র তেরজন কমিউনিস্ট প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। তারপর গান্ধীজী অধিবেশনে দু ঘণ্টা ধরে হিন্দুস্থানীতে ও ইংরেজীতে ভাষণ দিলেন। ঐ দিনটি তাঁর অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটলো। তিনি সাংবাদিকদেরও অসংখ্য কূটপ্রশ্নের জবাব দিলেন।

পরদিন ৯ই আগস্ট সকালে পুনরায় অধিবেশন বসবার কথা। গান্ধীজী এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকারের সঙ্গে যে কথাবার্তা চালাবেন, সে সম্পর্কেই আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ঐ অধিবেশনে। ৮ই আগস্ট তারিখে গান্ধীজী বোম্বাইয়ের একজন

বিশিষ্ট মুসলমান ব্যবসায়ীকে লেখেন যে, মুসলিম লীগ যদি বিনা শর্তে স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তবে মুসলিম লীগের হস্তে বৃটেন ক্ষমতা অর্পণ করলেও গান্ধীজীর তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐ ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ৮ই আগস্ট তারিখেই সপারিষদ বড়লাট একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন যে, তাঁরা কংগ্রেসের "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণে প্রস্তুত। কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার আসন্ন, এইরূপ একটি জনরব রাত্রির দিকেই ছড়িয়ে পড়লো।

৯ই আগস্ট, শনিবার। গান্ধীজী ভোর চারটেয় উঠে উপাসনা শেষ করলেন। তারপর তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজ শুরু করবার আগেই শুনলেন যে, পুলিস কমিশনার এসেছেন, তিনি গান্ধীজীর সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি গান্ধীজী, মহাদেব দেশাই ও মীরাবেনকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের জন্যে পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন। কস্তুরবা বা পিয়ারেলালের জন্যে গ্রেপ্তারের কোন পরোয়ানা নেই, তবে তাঁরা ইচ্ছা করলে গান্ধীজীর সঙ্গে যেতে পারেন। তাঁরা যেতে অসম্মত হলেন। পুলিস গান্ধীজী ও অন্যান্যদের প্রস্তুত হওয়ার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় দিলো। গান্ধীজী নিয়মমতো ছাগলের দুধ ও ফলের রস খেয়ে তাঁর প্রাতরাশ শেষ করলেন। তাঁর দল গান্ধীজীর প্রিয় বৈষ্ণব ভজন গাইলেন এবং কোরান পাঠ করলেন। তারপর গান্ধীজী তাঁর ব্যবহার্য দুই একটি জিনিস, গীতা, আশ্রমের ভজনের বই, কোরান, একখানি উর্দু প্রথম ভাগ ও তকলি নিয়ে পুলিসের সঙ্গে রওনা হলেন।

রওনা হওয়ার সময়ে তিনি পিয়ারেলালকে তাঁর শেষ নির্দেশ দিয়ে গেলেন : "প্রত্যেকটি স্বাধীনতা-যুদ্ধের অহিংস সৈনিক একখণ্ড কাগজে বা কাপড়ে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' (Do or Die) লিখে নিজের পরিচ্ছদে এঁটে রাখবে। তাতে সত্যাগ্রহ করবার সময়ে

যদি তার মৃত্যু ঘটে, তবে তাকে যারা অহিংস নীতির জন্যে আত্মবলি দেয় নি, তাদের থেকে পৃথক করা সম্ভব হবে।”

ভিক্টোরিয়া টারমিনাস স্টেশনে একটি বিশেষ ট্রেন অপেক্ষা করছিল। ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য ও বহু কংগ্রেসকর্মী শেষ রাত্রেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁদের সকলকে নিয়ে ট্রেনটি যাত্রা করলো। গাড়িখানি চিন্‌চ্‌ওয়াড়ে পৌঁছলে প্রথমে গাড়ি থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নামানো হ'লো। কথাপ্রসঙ্গে আজাদ ও জওহরলাল অনশনের কথা তুললেন। জওহরলাল প্রশ্ন করলেন, “অহিংসায় গোপনতা রক্ষার স্থান থাকবে কেন?” গান্ধীজী বললেন, “তুমি অহিংসাকে তোমার ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করতে পারো।” গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু, মীরাবেন ও মহাদেব দেশাইকে চিন্‌চ্‌ওয়াড়ে একটি মোটরে তোলা হ'লো। অন্যান্যদের তোলা হ'লো একটি লরিতে। কংগ্রেস-কর্মীদের কারও কারও প্রতি পুলিস অপমানজনক ও অতিশয় রূঢ় আচরণ করায় গান্ধীজীর মুখখানি বেদনায় ম্লান হয়ে গেল। তারপর গান্ধীজী ও তাঁর দলকে পুনায় আগা খাঁর প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হ'লো এবং সেখানেই অন্তরীণ রাখা হ'লো। গান্ধীজী বিকালে বড়লাটকে একটি পত্র লেখা শুরু করলেন এবং রাত্রিতে পত্রটি মহাদেব দেশাইকে দিলেন।

নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদে সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের আহম্মদনগর দুর্গে অন্তরীণ করবার পর সরকার সারাদেশে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে লাগলো। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কোথায় অন্তরীণ রাখা হয়েছে, তা গোপন রাখা হয়েছিল। তবে গান্ধীজী ও তাঁর অনুচরদের যে পুনায় আগা খাঁর প্রাসাদে অন্তরীণ রাখা হয়েছে, সরকার তা গোপন করে নি। বোম্বাইয়ে একটি সভায় বক্তৃতা ক'রে কস্তুরবাঈও গ্রেপ্তার হ'লেন এবং স্বামীর সঙ্গে আগা খাঁর প্রাসাদে মিলিত হলেন। গান্ধীজী ১০ই আগস্ট একটি পত্রে

বোম্বাইয়ের গভর্নরকে জানালেন যে, তাঁর সঙ্গী অন্যান্য কংগ্রেস-কর্মীদের লরিতে তোলায় তিনি অত্যন্ত অপমানবোধ করেছেন। তিনি জানেন, সকলের জন্যে মোটরের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তবে আগেও তাঁকে জেলের গাড়িতে ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবারও তাঁকে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে জেলের গাড়িতে ক'রে নিয়ে গেলেই তিনি খুশী হতেন। তিনি বর্তমান অবস্থায় কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না। তিনি একথাও জানালেন যে, এবার কারাবরণ তাঁদের কর্মসূচীতে নেই; তাঁরা বৃহত্তর ত্যাগ ও আত্মবলির জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন; সুতরাং কংগ্রেসকর্মীরা সকলেই গ্রেপ্তার এড়াতে বা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করবেন। একজন তরুণ তাঁর দলে ছিল এবং সে গ্রেপ্তার এড়াতে চেষ্টা করলে পুলিস তাকে জোর ক'রে জেলের গাড়িতে তুলেছিল। "এটা বিশ্রী ব্যাপার। পরে একজন ইংরেজ সার্জেণ্ট তাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করে ও টেনে-হিঁচড়ে লরিতে তোলে, যেন সে মানুষ নয়, একটা কাঠের টুকরো। আমার মতে, ঐ সার্জেণ্টকে সংশোধন করা উচিত। এ ধরনের ঘটনা ছাড়াই আমাদের সংগ্রাম যথেষ্ট তিক্ত হয়ে উঠেছে।"

তিনি গভর্নরকে আরও জানালেন যে, তাঁকে খবরের কাগজ দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। ট্রেনে তিনি একখানি ইভনিং নিউজ পেয়েছিলেন। তাতে সরকার যে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, তা বহু ভুল তথ্যে পূর্ণ। ঐসকল তথ্যের সংশোধন প্রয়োজন। বাইরে কি ঘটছে, তিনি জেলে না জানতে পারলে, ঐ ধরনের সংশোধন করতে তিনি পারছেন না। সুতরাং তাঁর সংবাদপত্র চাই। উত্তরে বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারি জানালেন যে, বর্তমান ব্যবস্থার কোনও রদবদল হবে না।

১৪ই তারিখে গান্ধীজী বড়লাটকে একটি পত্রে জানালেন, এইভাবে দ্রুত সংকট গ'ড়ে তুলে ভারত সরকার ভুল করেছেন। সরকার তাঁদের কাজের সাফাই গেয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা ভুল ও

বিকৃত তথ্যে পরিপূর্ণ। গান্ধীজী জানালেন, তাঁর ব্যাপক আন্দোলন শুরু করা পর্যন্ত সরকারের অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

গান্ধীজীর এইসব প্রতিবাদে সরকার কর্ণপাত করলো না। সারা দেশে অর্ডিন্যান্সের রাজত্ব শুরু হ'লো। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলি অবৈধ ঘোষিত হ'লো। ৯ই আগস্ট বোম্বাই, আমেদাবাদ ও পুনায় হাঙ্গামা বাধলো। ১০ই আগস্ট দিল্লীতে এবং যুক্তপ্রদেশের কতিপয় শহরেও হাঙ্গামা ঘটলো। হাঙ্গামা ক্রমেই দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়লো এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ নিলো। হরতাল, বিক্ষোভ-প্রদর্শন, সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি চলতে লাগলো। সরকার ভারতরক্ষা আইন অনুসারে দোকানপাট বন্ধ রাখা বে-আইনী ক'রে দিলো। আন্দোলন সম্পর্কে সরকারীভাবে প্রদত্ত সংবাদ ভিন্ন কিছু ছাপাও নিষিদ্ধ করা হ'লো। সরকারের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে বহু পত্রিকা সাময়িকভাবে প্রকাশ বন্ধ করলো। সংগ্রাম চলাকালে 'হরিজন'ও বন্ধ রইলো।

আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী থাকবার সপ্তাহকাল মধ্যেই গান্ধীজী একটি মর্মান্তিক শোক পেলেন। তাঁর পুত্রাধিক প্রিয় এবং পঁয়ত্রিশ বৎসরের বিশ্বস্ত অনুচর ও সচিব মহাদেব দেশাই হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। সরকার লরিতে ক'রে কিছু পুলিস ও ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে দিল মহাদেব দেশাইয়ের শব-সৎকারের জন্যে। গান্ধীজী বাধা দিয়ে বললেন, "কোনও পিতা তার পুত্রের দেহকে অপরিচিতের হাতে তুলে দিতে পারে না। মহাদেব আমার কাছে পুত্রাধিক ছিল। তার শেষকৃত্য আমি নিজেই করব। সরকার যদি আমাকে বাইরে যেতে দিতে সম্মত হন, তবে এই দেহ আমি আমার বন্ধুদের হাতে দেব। কিন্তু জেল-কর্মচারীদের হাতে দিতে পারব না।" সরকার খুনী আসামীদের ফাঁসি দেওয়ায় পর তাদের মৃতদেহ তাদের আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেয়, কিন্তু মহাদেবের মতো একজন

অহিংস সত্যাগ্রহীর দেহ তারা তা করতে রাজী হ'লো না। সমস্ত পরিবেশ থমথমে হয়ে উঠলো। গান্ধীজী চিন্তা ক'রে শেষে বললেন, "সরকার যদি আমাকে বাইরে যেতে বা আমার বন্ধুদের হাতে মৃতদেহ দিতে না দেয়, তবে আমি এখানেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করব। কারা-কর্তৃপক্ষ টেলিফোনে দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে। শেষ পর্যন্ত সরকার তাতে সম্মতি দিলো।

ইনস্পেক্টর জেনারেল গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি মহাদেবের আত্মীয়স্বজনকে কোনও সংবাদ পাঠাতে চান কিনা। গান্ধীজী বললেন, "চাই, যদি সংবাদ কাটাকাটি করা না হয়।" গান্ধীজী তারবার্তাটি বলে যেতে লাগলেন। প্রথমে বললেন, "দুঃখিত," পরে থেমে বললেন,"না দুঃখিত কেন? এমন সুমহৎ মৃত্যুর কথা ঘোষণা করতে আমি দুঃখিত হব কেন? দুঃখিত কেটে দিন। লিখুন—মহাদেব হঠাৎ মারা গেছেন। কোন পূর্বলক্ষণ ছিল না। রাত্রে ভালোই ঘুমিয়েছিলেন। প্রাতরাশ করেছিলেন। আমার সঙ্গে বেড়িয়েছিলেন। সুশীলা ও জেলের ডাক্তার তাঁদের যথাসাধ্য করেছিলেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। সুশীলা ও আমি তাঁর দেহকে স্নান করিয়েছি। পুষ্পাবৃত অবস্থায় দেহ শায়িত রাখা হয়েছিল, ধূপ জ্বলছিল। সুশীলা ও আমি গীতা পাঠ করেছিলাম। মহাদেব যোগীর মতো, দেশপ্রেমীর মতো দেহত্যাগ করেছেন। দুর্গা, বাবলা ও সুশীলাকে ব'লো, দুঃখের কোনও স্থান নেই। এইরূপ মহৎ মৃত্যুতে চাই কেবল আনন্দ। আমার সামনেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। ভস্ম রেখে দেব। দুর্গাকে আশ্রমে থাকতে বা তার আত্মীয়দের কাছে যেতে ব'লো। আশা করি, বাবলা সাহসী হবে এবং মহাদেবের শূন্যস্থান যোগ্যতার সঙ্গে পূরণ করবে।" গান্ধীজী তারবার্তাটি জরুরী হিসাবে পাঠাতে বললেন। কিন্তু ওটি সাধারণ চিঠিরূপে তিন সপ্তাহ বাদে পাঠানো হয়েছিল।

মহাদেবের মৃত্যুসংবাদ দেশবাসীকে স্তম্ভিত ক'রে দিলো।

জনসাধারণের মনে এই ধারণা হ'লো যে, ধৃত নেতাদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হওয়ায় সরকারী সংবাদের উপর লোক বিশ্বাস হারালো এবং চারিদিকে নানারূপ জনরব ছড়িয়ে পড়লো। সরকারী সংবাদে যেসব ঘটনা চেপে যাওয়া হচ্ছিল সেগুলি বোম্বাইয়ে একটি অজ্ঞাত স্থান থেকে কংগ্রেসের অবৈধ বেতার মারফত ঘোষিত হ'তে লাগলো। আমেদাবাদের শ্রমিক ধর্মঘট, জামসেদপুরের ইস্পাত কারখানা বন্ধ, বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় সামরিক বিভাগ কর্তৃক দখল, বালিয়ায় বিমান থেকে বোমাবর্ষণ, মেদিনীপুরে অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন, অষ্টি ও চিমুরে সৈন্যদলের পাশবিক তাণ্ডব, সারা ভারতে লাঠিচার্জ, গুলীচালনা, গ্রেপ্তার প্রভৃতির কথা কংগ্রেস বেতারে এবং কংগ্রেসের অবৈধভাবে প্রচলিত বুলেটিনগুলিতে প্রচারিত হ'তে লাগলো।

সরকারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা গেল। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ, গুলী-চালনা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠলো। জনসাধারণের কণ্ঠ-রোধের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হলো। সরকারী ব্যবস্থাগুলি ক্রমেই জনসাধারণকে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত ক'রে তুললো। জনসাধারণ পুলিস ও সৈন্যদলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হ'লো। বৃটিশ শাসনের সকল চিহ্ন বলে যাকেই তারা মনে করলো, তার ওপর আক্রমণ চালালো। থানা, আদালত, ডাকঘর, রেলপথ, টেলিগ্রাফের ও টেলিফোনের তার, পথঘাট, সেতু সকল কিছুই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হ'লো। সরকারী হিসাব অনুসারে, নেতাদের গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় আড়াইশ রেলস্টেশন বিধ্বস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো, প্রায় ৫০০ ডাকঘরের উপর আক্রমণ ঘটলো। বহু সপ্তাহের জন্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশের পূর্বাংশে রেলচলাচল-ব্যবস্থা দারুণভাবে বিঘ্নিত হ'লো। তারবার্তাগুলি পৌছতে চিঠিরও বেশি সময় লাগলো।

সমস্ত ভারতে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ব্যাহত হ'লো। সরকারী হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ালো এক কোটি টাকারও বেশি।

অন্যান্য সরকারী ভবন ছাড়াও প্রায় দেড় শ থানা আক্রান্ত হ'লো। প্রায় ত্রিশজন পুলিস এবং কিছুসংখ্যক সৈন্য ও পদস্থ কর্মচারী নিহত হ'লো। আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সরকারী হিসাবে ৯০০-রও বেশি সাধারণ মানুষ নিহত হলো, আহত হ'লো আরও বহু। পুলিস ও সেনাবাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর ৫৩৮টি ক্ষেত্রে গুলী চালালো। কোথাও কোথাও বিমান থেকে মেশিনগানও চালানো হ'লো। বহু লোককে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'লো। গ্রামবাসীদের উপর প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার পাইকারী জরিমানা বসলো।

১৯৪২ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় ষাট হাজার লোক জেলে গেলেন। অসংখ্য লোক আত্মগোপন ক'রে রইলেন। প্রথম দু-এক মাস আন্দোলন ও হাঙ্গামা পুরোদমে চললো। পরে তা বিক্ষিপ্ত ঘটনায় পর্যবসিত হ'লো। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ঘোষণা করলেন যে, "সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে হাঙ্গামাকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছে। ভারতে অধিকতর সংখ্যায় সৈন্যদল পাঠানো হয়েছে এবং এখন ভারতে যে সংখ্যায় শ্বেতাঙ্গ সৈন্য রয়েছে, তা ভারতে বৃটিশ আধিপত্যের ইতিহাসে কোনদিন ছিল না।" পরে তিনি একথাও ঘোষণা করলেন যে, "কারও যদি এ সম্পর্কে কোনও ভুল ধারণা থাকে, তাই আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, যা আমাদের তা আমরা রাখতে বদ্ধপরিকর। আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে লাটে তোলার জন্যে রাজার প্রধান মন্ত্রী হই নি।"

আগস্ট মাসের শেষভাগে নিরাপত্তা-বন্দীদের সম্পর্কে কঠোরতা কিছু পরিমাণে হ্রাস করা হ'লো। গান্ধীজীকে তাঁর ইচ্ছামতো সংবাদপত্রসমূহ পড়তে, এমন কি পুরাতন সংখ্যাগুলি প্রয়োজন হ'লে দেখতে অনুমতি দেওয়া হ'লো।

২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজী ভারত সরকারের সেক্রেটারির উদ্দেশে একটি পত্র লেখেন, তাতে দেশে যেসব ঘটনা ঘটছে, সে সম্পর্কে বলেন, "কংগ্রেসের সম্পর্কে সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে, তার সমর্থনে পারিষদবর্গ ও অন্যান্যদের সমর্থনের ঐকতান ধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও, আমি বলব যে, আমি মহামান্য বড়লাটকে যে পত্র লেখার পরিকল্পনা করেছিলাম, তা লেখা ও তার ফলাফল পর্যন্ত সরকার যদি অপেক্ষা করতেন, তবে দেশ এই মহাবিপদের সম্মুখীন হ'তো না। যে শোচনীয় ধ্বংসকার্যের কথা বলা হয়েছে, তা নিশ্চয় এড়ানো সম্ভব হ'তো। বিরুদ্ধে যাই কিছু বলা হ'ক না কেন, কংগ্রেসের নীতি আজও দ্ব্যর্থহীনভাবে অহিংস রয়েছে বলেই আমি দাবি করি। মনে হয় কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার জনসাধারণকে ক্রোধে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছিল, যার ফলে তারা আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছে। আমি মনে করি, যেসব ধ্বংসাত্মক কার্য ঘটেছে, তার জন্যে কংগ্রেস নয়, সরকারই দায়ী। আমার মনে হয়, সরকারের একমাত্র নির্ভুল পন্থা হবে নেতাদের মুক্তি দেওয়া, দমনমূলক সমস্ত ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা এবং মীমাংসার পথ খুঁজে বার করা। এটা সুনিশ্চিত যে, প্রকাশ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ দমনের জন্যে বহু উপায় সরকারের আছে। কিন্তু দমন কেবল অসন্তোষ ও তিক্ততাই বৃদ্ধি করে। আমাকে সংবাদপত্র নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই দেশে যেসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে, আমার ওপর তার প্রতিক্রিয়া কি, তা আমি সরকারকে জানানো উচিত মনে করি। যদি সরকার মনে করেন যে, যেহেতু আমি বন্দী, এই ধরনের পত্রালাপের কোন অধিকার নেই, তাঁরা তা বললেই এই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি আমি আর করব না।"

সরকার গান্ধীজীর এই পত্রের জবাব দিল না। মিঃ উইনস্টন চার্চিল স্পষ্টই বলেছিলেন যে, গান্ধীবাদ বা গান্ধীবাদ বলতে যা কিছু বোঝায়, তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে, এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে

বিধ্বস্ত করতে হবে। এই নীতিই ভারত সরকার অনুসরণ করছিল। সরকার 'নবজীবন প্রেস' এবং 'হরিজন' পত্রিকার নূতন ও পুরাতন সকল সংখ্যা বাজেয়াপ্ত ক'রে নিলো। গান্ধীজী বোম্বাই সরকারের কাছে এই কাজের ব্যাখ্যা চাইলে তাঁকে জানানো হ'লো, "সরকার আমেদাবাদের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে 'হরিজন' কাগজের সকল পুরাতন কপি, পুস্তক, পুস্তিকা ও অন্যান্য বিবিধ কাগজপত্র যা 'নবজীবন প্রেস' থেকে বেরিয়েছে, তা সমস্তই নষ্ট করবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে।...(তাই) ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত 'হরিজন' পত্রিকার সমস্ত পুরাতন ফাইল নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে।"

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি 'ভারত ছাড়' দাবিতে যে অহিংস ও হিংসাত্মক আন্দোলন দেশে হচ্ছিল, তাকে মোটামুটি দমন ক'রে ফেললো। রাজাগোপালাচারী, সপ্রু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলেন। ভারতসচিব সুস্পষ্টভাষায় তাঁদের জানিয়ে দিলেন, "তাদের বর্তমান মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোসের কোনও সম্ভাবনাই নেই।"

এই সময়ে সেবাগ্রামে অধ্যাপক ভান্‌শালী চিমুরে সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং সে বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রতিবাদে অনশনের সিদ্ধান্ত করেন। গান্ধীজী এই খবর পেলে ভান্‌শালীর সঙ্গে সরাসরি তারে যোগাযোগ করবার অনুমতি চেয়ে সরকারকে অনুরোধ করেন। তিনি জানান যে, ভান্‌শালী উপযুক্ত কারণে অনশন না করলে তিনি তাঁকে এ বিষয়ে বিরত করবেন। কিন্তু সরকার তাঁকে তারে যোগাযোগ করতে অনুমতি না দিয়ে জানায় যে, গান্ধীজী যদি মানবতার খাতিরে অধ্যাপক ভান্‌শালীকে অনশন থেকে বিরত করতে চান, তবে সরকার তা ভান্‌শালীকে জানিয়ে দেবে। গান্ধীজী সরকারী সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানান যে, একজন প্রিয় সহকর্মীর জীবন বিপন্ন হওয়া

সত্ত্বেও সরকার তাঁকে তারে যোগাযোগ করতে অনুমতি না দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। কি কারণে অধ্যাপক ভান্‌শালী অনশন করছেন তা তিনি ঠিক না জানলে তাঁকে অনশন থেকে বিরত হ'তে বলতে পারেন না।

৩১শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধীজী নিজের হাতে বড়লাট লর্ড লিনলিথ্‌গোকে একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন :···"আমি মনে করি, আমরা বন্ধু ছিলাম; এখনও একথা ভাবতে আমরা ভালো লাগে। যাই হ'ক, ৯ই আগস্ট থেকে যা ঘটেছে, তাতে আমি অবাক্ হয়ে ভাবি, এখনও আপনি আমাকে বন্ধু ব'লে মনে করেন কিনা। যাঁরা আপনার গদিতে বসেছেন, তাঁদের কারও সঙ্গে আপনার মতো এতখানি ঘনিষ্ঠতা আমার ঘটে নি।

"আমাকে আপনার গ্রেপ্তার, তারপরে আপনার বিবৃতি, রাজাজীকে আপনার জবাব ও তাতে প্রদত্ত কারণসমূহ, আমার ওপর মিঃ আমেরির আক্রমণ, এই ধরনের আরও অন্যান্য বিষয় থেকে বোঝা যায়, কোন কোন পর্যায়ে আপনি আমার সততা সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছেন।···কংগ্রেস যে দুষ্কর্ম করেছে বলা হয়, তার উৎস আমি এইরূপ মনে হয়েছে। আপনি যদি আমাকে বন্ধু মনে করেন, তবে কোনও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন, কেন আপনার সন্দেহের কথা বললেন না এবং নিজেকে তথ্যাদি সম্পর্কে সুনিশ্চিত করলেন না?···আমি দেখলাম, এই প্রসঙ্গে সরকারী মহলে আমার সম্পর্কে যেসব উক্তি করা হয়েছে, সেগুলি সত্য থেকে সুস্পষ্ট বিচ্যুতি। আমি আপনাদের চোখে এতোই অধঃপতিত হয়েছি যে, একজন মুমূর্ষু বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার সুযোগ পেতে পারি নি।···কিছু লোকের তথাকথিত হিংসাত্মক কাজ, যা কংগ্রেস করেছে বলা হচ্ছে, আমি তার নিন্দা করব এরকম আশা করা হয়েছিল। যদিও আমার কাছে অতিমাত্রায় সেন্সার-করা সংবাদপত্রের বিবরণ ছাড়া

অন্য কোনও তথ্য ছিল না। আমি স্বীকার করছি, এইসব সংবাদ সম্পর্কে আমি পরিপূর্ণ সংশয় পোষণ করি।...আমার ভুল সম্পর্কে আমাকে নিশ্চিত করুন, আমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করব। আপনি আমাকে ডেকে পাঠাতে পারেন বা এমন কাউকে পাঠাতে পারেন যিনি আপনার মনের কথা জানেন ও আপনার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারবেন। অন্য অনেক উপায়ও আছে, আপনি ইচ্ছা করলে যা গ্রহণ করতে পারেন।”

১৯৪৩ সালের ১৩ই জানুয়ারি লর্ড লিন্‌লিথগো গান্ধীজীর পত্রের জবাবে লিখলেন “আপনার ৩১শে ডিসেম্বরের ব্যক্তিগত পত্র এই মাত্র পেলাম। পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।...আপনার পত্র পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। কারণ, আমাদের পূর্ব-বন্ধুত্ব অনুসারে অকপটে বলতে পারি যে, গত কয়েক মাসে আমি অত্যন্ত দুঃখবোধ করেছি। প্রথমত, আগস্ট মাসে কংগ্রেস যে নীতি গ্রহণ করেছে, তাতে এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ নীতির ফলে—কারণ এটা সুস্পষ্ট ছিল যে ঐ নীতির ফলে সারা দেশে হিংসা ও অপরাধের প্রাদুর্ভাব ঘটবেই : আমি বহিরাক্রমণ থেকে ভারতের ঝুঁকির কথা বলতে চাই না,—যা ঘটেছিল আপনি বা ওয়ার্কিং কমিটি তার নিন্দা না করায়। আপনি যখন পুনায় ছিলেন, তখন গোড়ার দিকে সংবাদপত্র পাচ্ছিলেন না ; সেটাই আমি আপনাব নীরবতার কারণ মনে করেছিলাম। কিন্তু যখন আপনাদের ইচ্ছামতো আপনাকে ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সংবাদপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তখন আমি মনে করেছিলাম, সংবাদপত্রে ঘটনাবলীর যেসব বিবরণ ছিল, তা আমাদের যেমন বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে, তেমনি আপনাদেরও বিস্মিত ও মর্মাহত করবে এবং আপনি এসব ঘটনার সুস্পষ্টভাবে নিন্দা করবেন ও তা সর্বসাধারণে প্রচার করবেন। কিন্তু তা হয় নি ; এইসব হত্যা, পুলিসকর্মচারীদের জীবন্ত দাহ, ট্রেনধ্বংস, সম্পত্তিনাশ, তরুণ ছাত্রদের বিপথে চালনা

প্রভৃতি যা কংগ্রেসের সুনামকে কলঙ্কিত করেছে তার কথা যতো ভেবেছি, ততোই আমি নিরাশ হয়েছি।…যা ঘটেছে তার আলোকে আপনার চিঠির অর্থ যদি এই হয় যে, আপনি এই পথ থেকে ফিরতে এবং গত গ্রীষ্মকালের নীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাইছেন, তবে আমাকে জানাবেন। আমি এ বিষয়ে আরও বিবেচনা ক'রে দেখব।…"

এরপরে গান্ধীজী ও লর্ড লিন্‌লিথগোর মধ্যে আরও কতিপয় পত্রবিনিময় চললো। গান্ধীজী বোঝাতে চাইলেন, এইসব তথাকথিত হিংসাত্মক ঘটনার জন্য সরকারের হঠকারিতাই দায়ী; লর্ড লিন্‌লিথগো বোঝাতে চাইলেন, কংগ্রেসের নীতিই দায়ী। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের বর্তমান নীতি ত্যাগ সম্পর্কে গান্ধীজী জানালেন, তাঁকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে একসঙ্গে রাখলে তিনি এর জবাব দিতে পারেন। গান্ধীজী এই সঙ্গে ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁর সংকল্পিত অনশনের কথাও জানালেন। ৫ই ফেব্রুয়ারির চিঠিতে বড়লাট লিখলেন, "কোনও সংস্থা এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তার ফলাফলস্বরূপ ঘটনাবলীর দায়িত্ব তারা এড়াতে পারে না। আপনি এবং আপনার বন্ধুরা আশা করেছিলেন এই নীতি হিংসায় পর্যবসিত হবে; আপনারা তা উপেক্ষা করবেন; যে হিংসাত্মক ঘটনাবলী ঘটবে, তা কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তারের বহু পূর্বেই সম্মিলিতভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল;—এইসব বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ধরনের, তা স্বরাষ্ট্রসচিব কেন্দ্রীয় আইনসভায় গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর ভাষণে বলেছেন। তার একটি কপিও আপনাকে পাঠালাম। সেই সঙ্গে আমি আরও বলতে চাই যে, যেসব পুঞ্জীভূত সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে, তা তৎকালে গৃহীত সিদ্ধান্তই সমর্থন করছে। আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য পেয়েছি যে, ধ্বংসাত্মক কার্যের অভিযান নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নামে প্রচারিত নির্দেশাবলীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে;

বহু খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মী হিংসাত্মক কার্য ও হত্যাকাণ্ড সংগঠন করেছেন এবং অবাধে অংশগ্রহণ করেছেন; এমনকি এখনও অন্যান্য গুপ্ত-সংগঠনগুলির সঙ্গে একটি গুপ্ত-সংগঠন আছে, যাতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্যের স্ত্রী বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করছেন; এই সংগঠন বোমানিক্ষেপ ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পরিকল্পনায় লিপ্ত আছে, যা সমগ্র দেশে বিরক্তি ও ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। আমরা এইসব তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করছি না, এগুলি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করছি না, কারণ এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি। কিন্তু এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, কংগ্রেসকে শীঘ্রই হ'ক বা দেরিতে হ'ক এই সকল অভিযোগের সম্মুখীন হ'তে হবে; তখন আপনাকে ও আপনার সহকর্মীদের জগৎসমক্ষে নিজেদের এইসব অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে হবে।" তিনি গান্ধীজীকে প্রস্তাবিত অনশন হ'তে বিরত হ'তে বলেন; যদি গান্ধীজী একান্তই অনশন করতে চান, তবে তা তিনি নিজ দায়িত্বেই করবেন; লর্ড লিন্‌লিথগো এই অনশনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের সহজ পন্থা ("to find an easy way out") ও রাজনৈতিক ব্যাক্‌মেইল ব'লেও বর্ণনা করলেন।

গান্ধীজী ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা তাঁর উত্তরে তাঁর সংকল্পিত অনশন সম্পর্কে বড়লাটের এইরূপ উক্তিতে মর্মাহত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি স্বরাষ্ট্রসচিবের ভাষণকে সরকার-পক্ষের উকিলের উদ্বোধনী-ভাষণ ব'লে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, এতে স্বরাষ্ট্রসচিব হিংসাত্মক ঘটনাবলীর সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরলেও কেন এবং কখন এগুলি ঘটেছিল, সে সম্পর্কে কোনও উল্লেখ করেন নি। "কেন তা ঘটেছিল, আমি বলেছি। আপনি অভিযুক্ত নরনারীকে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কি প্রমাণ-প্রয়োগের ভিত্তিতে আপনি তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন, তা জানাবার জন্যে

অনুরোধ ক'রে নিশ্চয় আমি ভুল করি নি। আপনি আপনার পত্রে যা বলেছেন, তা প্রত্যয় উৎপাদন করে না। প্রমাণগুলি বৃটিশ ন্যায়সংহিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত।"

অনশনের প্রাক্কালে গান্ধীজী ভারত সরকারের কাছ থেকে টেলিফোনে একটি সংবাদ পেলেন : "সরকার আপনার সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত দুঃখজনক মনে করছে। সরকারের মতামত অপরিবর্তিতই আছে ; অর্থাৎ সরকার আপনাকে অনশন করবার জন্যে অনশনকালে আপনাকে মুক্ত ক'রে দিতে প্রস্তুত। যদি আপনি সে সুযোগ নিতে না চান, এবং অন্তরীণ অবস্থাতেই অনশন করতে চান, তবে তা আপনি নিজ দায়িত্বে ও বিপদের ঝুঁকিতে করবেন। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার নিজের চিকিৎসক সঙ্গে নিতে পারবেন, এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে আপনার বন্ধুরা আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন।"

১০ই ফেব্রুয়ারি সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হ'লো যে গান্ধীজী ১০ই আগস্ট ত্রিশসপ্তাহব্যাপী অনশন শুরু করছেন। এই অনশন আমৃত্যু অনশন নয়, তাই গান্ধীজী লেবুর রস প্রয়োজনমতো মাঝে মাঝে গ্রহণ করবেন। সরকারী ঘোষণায় এ কথাও বলা হ'লো যে, সরকার অনশনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা পছন্দ করেন না···ভারত সরকার এই অনশনের ফলে তাঁদের নীতির কোনও পরিবর্তন করতে চান না। তাঁরা গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের ওপর এর ফলাফলের দায়িত্বও নেবেন না।

গান্ধীজীর অনশনের ফলে সারা দেশে উদ্বেগ ঘনিয়ে উঠলো। চুয়াত্তর বৎসর বয়সে গান্ধীজী এই অনশন সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পারবেন কিনা সেবিষয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করলেন। তাঁরা গান্ধীজীর জীবন সংশয় দেখলেন। ডাঃ গিল্ডার যারবেদা জেলে আটক ছিলেন। তাঁকে অনশনের দ্বিতীয় দিনে আগা খাঁ প্রাসাদে আনা হ'লো। চতুর্থ দিনে গান্ধীজীর বমি-বমি ভাব

ও অনিদ্রা দেখা দিল। ১৫ই তারিখে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পুনায় এসে পৌছলেন। তাঁকে সরকার সারা অনশনকালে গান্ধীজীর কাছে থাকবার অনুমতি দিলো। ১৭ই তারিখ থেকে গান্ধীজীর হৃদ্‌স্পন্দন ক্রমেই দুর্বলতর হ'তে লাগলো এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে গভীর সংশয় দেখা দিল। ঐদিন বড়লাটের শাসন-পরিষদ থেকে সরকারের কাজের প্রতিবাদে স্যার এচ. পি. মোদি, নলিনীরঞ্জন সরকার ও মিঃ আনে পদত্যাগ করলেন। ১৮ই তারিখে উদ্বেগ গভীরতর হ'লো। গান্ধীজী সকাল থেকে কথা বলা বন্ধ করলেন; যাঁরা তাঁকে দেখতে আসছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে তাঁর আর আগ্রহ দেখা গেল না।

গান্ধীজীকে অবিলম্বে মুক্তিদানের জন্য সারা দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হলো। ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রায় সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে দিল্লীতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'লো এবং বৃটেন ও ভারতের সম্পর্করক্ষার স্বার্থেই অবিলম্বে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হ'লো। মিঃ জিন্না এই সম্মেলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান নি। বড়লাট লিন্‌লিথগো ও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তাঁদের কঠোর মনোভাবে অবিচল রইলেন। সরকার মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্‌টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মিঃ উইলিয়ম ফিলিপ্‌সকে পর্যন্ত গান্ধীজীর সঙ্গে আগা খাঁ প্রাসাদে দেখা করতে দিলো না।

২০শে তারিখের বুলেটিনে জানা গেল, গান্ধীজীর অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। পরদিন ডাক্তাররা বললেন, গান্ধীজী যদি অবিলম্বে অনশন বন্ধ না করেন, তবে তাঁর জীবনরক্ষা দুরূহ হবে। ইতিমধ্যেই তাঁর ওজন ১৪ পাউণ্ড কমে গিয়েছিল। এখন তাঁকে ওজনও করা যাচ্ছিল না। এখন ডাক্তাররা গান্ধীজীকে শুধু লেবুর রসের পরিবর্তে জলের সঙ্গে কমলালেবুর রস খেতে অনুরোধ করলেন। কমলালেবুর রস খাওয়ায় বমি-বমি ভাবটা হ্রাস পেলো

এবং গান্ধীজী জলও বেশি পরিমাণে খেতে পারলেন। বিলিতী কাগজে কমলার রস খাওয়া নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হ'লো এবং নানা বিদ্বেষপূর্ণ খবর তারা ছাপতে লাগলো।

২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজীর অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে উঠলো। আবার বমির ভাবটা তীব্র হয়ে উঠলো; গান্ধীজী প্রায় অচেতন অবস্থাতেই কাটালেন। নাড়ীর স্পন্দন বোঝাও কঠিন হয়ে উঠলো। সতর্কতামূলকভাবে পুলিসী ও সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া হ'লো। সরকার শবদাহের জন্য প্রচুর চন্দনকাঠও সংগ্রহ করছে ব'লে জনরব ছড়িয়ে পড়লো। লোকচক্ষে কংগ্রেস ও ও গান্ধীজীকে হেয় করবার উদ্দেশ্যে সরকার ঐদিনই "হাঙ্গামা সম্পর্কে কংগ্রেসের দায়িত্ব" শীর্ষক বিবরণ প্রকাশ করলো।

২৩শে তারিখে কিন্তু গান্ধীজীর অবস্থা কিছুটা ভালো দেখা গেল। তিনি বহুদিন দেখেন নি এমন দর্শনপ্রার্থীদেরও চিনতে পারলেন। ২৪শে তারিখে তাঁর অবস্থার আরও উন্নতি হ'লো। ডাক্তাররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। গান্ধীজীর নিরাপদে অনশন উদ্‌যাপনের আশা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজীকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। বমির ভাব ছিল না, তিনি জলও বেশি পরিমাণে খেতে পেরেছিলেন। দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁকে মানসিক দিক থেকে বেশ সজাগ দেখা গেল। ৩রা মার্চ তারিখে আগা খাঁ প্রাসাদে "বৈষ্ণব জনতো" ভজন, গীতাঞ্জলির গান ও "Lead kindly Light" গীত হ'লো। গীতা ও কোরান পাঠ হ'লো। সকাল সাড়ে নটায় কস্তুরবার হাতে ছ আউন্স কমলা-রস সহ জল খেয়ে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বললেন, "গান্ধীজী চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন।"

অনশন শেষ হওয়ার পর ভারতের এই রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্যে দেশে ও বিদেশে তুমুল আন্দোলন

শুরু হ'লো। আমেরিকার "নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌", ইংলণ্ডের "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান্‌" প্রভৃতি পত্রিকা এবং জর্জ বার্নার্ড শ'র মতো জগদ্‌বিখ্যাত ব্যক্তিরা ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান, গান্ধীজীর মুক্তির দাবি প্রভৃতির সমর্থনে মতামত প্রকাশ করলেন। চীনা সংবাদগুলি কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের মুক্তি নিয়ে অচল অবস্থা অবসানের জন্য পরামর্শ দিলো। ভারতের অকংগ্রেসী বিশিষ্ট নেতারা যাঁরা বোম্বাইয়ে নির্দলীয় সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্যে গান্ধীজীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে বললেন। তাঁরা বড়লাটের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে চাইলে বড়লাট গান্ধীজীর অবিলম্বে মুক্তিলাভ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করতে রাজী হলেন না। তখন তাঁরা বড়লাটের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি পাঠালেন। বড়লাট তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাবে বললেন, "অন্তরীণ কংগ্রেস-নেতাদের কাছ থেকে কোন কোন বিষয়ে পূর্বপ্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পেলেই এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।" সপ্রুর নেতৃত্বে নির্দলীয় নেতারা পুনরায় তাঁদের দাবি তুলে ধরলেন। তাঁরা অন্তরীণ কংগ্রেস-নেতাদের সম্পর্কে অভিযোগসমূহ সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন বসাতে, বা কংগ্রেস-নেতারা যাতে অবস্থার পুনর্বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সেজন্যে তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে বললেন। কিন্তু সরকার তার সিদ্ধান্তে অবিচল রইলো। ইংলণ্ডে হাউস অব কমন্‌সে ভারতসচিব মিঃ আমেরি বললেন, গান্ধী ও অন্যান্য অন্তরীণ নেতাদের বিচারমঞ্চে তোলার ইচ্ছা তাঁদের নেই। হাউস অব লর্ডসে আলোচনাকালে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে ভারতের ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সদস্যের সুস্পষ্ট কোনও ধারণা নেই। লর্ড স্যামুয়েল গান্ধীজীর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। গান্ধীজী লর্ড স্যামুয়েল ও অন্যান্য কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিত তাঁর পত্রে এইসব অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করলেন।

অচল অবস্থা চলতে লাগলো। হাজার হাজার বন্দী জেলে পচতে লাগলেন। মানুষের মন তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠলো। ভারতরক্ষা বিধির যে ২৬ ধারা অনুসারে কংগ্রেস-নেতাদের অন্তরীণ রাখা হয়েছিল, ভারতের ফেডারেল কোর্ট তাকে এপ্রিল মাসে (১৯৪৩) অবৈধ ঘোষণা করলে সরকার নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করলো।

যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ বিপন্ন হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। পূর্ববৎসর যে সাইক্লোন ও বন্যা হয়েছিল, তার ফলরূপে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দিয়েছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, পঞ্চাশের মন্বন্তর। তার ওপর জাপানের বিমান আক্রমণও ছিল। উৎপীড়ন, অত্যাচার, অবিচার ও দুর্নীতি ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল হতাশা-বোধ। এ নৈরাশ্য দূর করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল গান্ধীজীর বাইরে থাকা।

জুন ও জুলাই মাসে জনরব ছড়িয়ে পড়লো যে, গান্ধীজী আগস্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে সরকারের কাছে পত্র দিয়েছেন। এই জনরবের প্রতিবাদ করবার জন্য গান্ধীজী সরকারকে অনুরোধ করলে সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হ'য়েই তাতে কর্ণপাত করলো না। সরকার কংগ্রেস ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে যে "হাঙ্গামায় কংগ্রেসের দায়িত্ব" নামে ৮৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল, গান্ধীজী বার বার তার এক কপি পাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলে শেষ পর্যন্ত সরকার তাঁকে এক কপি দিলো। গান্ধীজী দীর্ঘ ৪৮ দিন গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ ক'রে এই পুস্তিকার অভিযোগসমূহ একে একে খণ্ডন করলেন। তাঁর এই জবাব তিনি সাতাত্তরটি অনুচ্ছেদে শেষ ক'রে ভারত সরকারের কাছে পাঠালেন।

এই চিঠির জবাব এলো দীর্ঘ তিন মাস বাদে। তাতে বলা হ'লো যে, গান্ধীজীর অনুরোধেই তাঁকে এক কপি পুস্তিকা পাঠানো

হয়েছিল, সে সম্পর্কে তাঁর মতামত, মন্তব্য বা আত্মসমর্থন চাওয়া হয় নি। তবে তিনি যখন মন্তব্য করেছেন, তার উত্তরে সরকার বলতে চান যে, আগস্ট প্রস্তাবের ফলে যা ঘটেছে, তার দায়-দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করবার মতো কোনও কাজ তিনি করেন নি বা কোনও যুক্তি তিনি দেখাতে পারেন নি।

গান্ধীজীর এই থেকে স্থির ধারণা হ'লো যে, তাঁকে আরও দীর্ঘকাল অন্তরীণ থাকতে হবে। গান্ধীজী দীর্ঘ কারাবাসের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তুললেন। তিনি এই সময়ে ধর্মীয় সাহিত্য পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে শরীরতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অর্থনীতি প্রভৃতিও পড়তে থাকেন। তিনি শেক্স্পীয়র, ব্রাউনিং, বার্নার্ড শ, কার্ল মার্ক্স্, এঙ্গেল্স্, লেনিন, স্তালিন প্রভৃতির রচনাও পড়েন। কার্ল মার্ক্স্ রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "ডাস কাপিটালের" প্রথম খণ্ড তিনি আগা খাঁ প্রাসাদে ৭৪ বৎসর বয়সে সর্বপ্রথম পড়লেন। তিনি এই গ্রন্থ পড়ে মন্তব্য করেন, "মার্ক্স্‌বাদ ঠিক কি ভুল, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি যা বুঝি, তা হ'লো দরিদ্ররা নিষ্পেষিত হচ্ছে। তাদের জন্যে কিছু করা প্রয়োজন। আমার কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ।"

গান্ধীজী এই সময়ে কস্তুরবার সুবিধার জন্যে রামায়ণ ও ভাগবত সম্পাদনা করেন। এই সময়ে তিনি রোজ কস্তুরবাকে কিছু সময় গুজরাটী ব্যাকরণ, কবিতা, ইতিহাস ও ভূগোল শেখান। কিন্তু এই শিক্ষাদানে শীঘ্রই ছেদ পড়ে। কস্তুরবা অনেক দিন থেকে অসুস্থ ছিলেন। মহাদেবের মৃত্যুর পর তিনি প্রায়ই বিমর্ষ থাকতেন। তিনি গান্ধীজীকে দেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে জেলে পাঠাবার জন্য দায়ী করতেন। তখন গান্ধীজী কস্তুরবাকে আগস্ট প্রস্তাবের মর্ম ও উদ্দেশ্য কি, বোঝাতে চেষ্টা করতেন। গান্ধীজীর তিনসপ্তাহব্যাপী অনশনও কস্তুরবার মনের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। এই দারুণ উদ্বেগের দিনগুলি তাঁর দুর্বল দেহ

ও মনকে আরও দুর্বলতর ক'রে দিয়েছিল। সধবা অবস্থায় হিন্দু সতীসাধ্বী স্ত্রীদের মতোই মৃত্যু তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল। কস্তুরবার স্বাস্থ্যের এখন দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সরকার কস্তুরবার স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করলো। এতে বলা হ'লো যে, কস্তুরবাকে মুক্তি দিলে তাঁর এই অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। তাই তাঁরা তা করতে চান না। তবে সরকার বাইরের কোন চিকিৎসক বা নার্সেরও সাহায্য নিতে দিলেন না। তাই কস্তুরবার অনুরোধে গান্ধীজী সরকারকে এ বিষয়ে নিজে লিখলেন। তিনি জানালেন যে, ডাঃ মেহ্‌তাকে চিকিৎসার জন্যে আসতে অনুমতি দেওয়া হ'ক। তিনি আরও লিখলেন যে, তাঁর স্ত্রী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাও করাতে চান; তাই প্রয়োজন হ'লে যাতে কোনও কবিরাজের সাহায্য নেওয়া যায় সে ব্যবস্থাও করা হ'ক; নাতী কানু গান্ধীকে সরকার একদিন অন্তর কস্তুরবাকে দেখবার জন্যে আসতে দিচ্ছেন; কানুকে এই প্রাসাদেই রাখা হ'ক। গান্ধীজী বারবার তাগাদা দেওয়ার সপ্তাহখানেক বাদে সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা করলো। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার জন্য অনুমতি দেওয়া হ'লো। কিন্তু চিকিৎসককে আগা খাঁ প্রাসাদে থাকতে দেওয়া হ'লো না। তাঁকে প্রায়ই প্রাসাদের গেটে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাকতে হ'তো। গান্ধীজী শেষে বিরক্ত হয়ে ১৬ই ফেব্রুয়ারি (১৯৪৪) সরকারকে লিখে জানালেন যে, রাত্রিতেই রোগীর অবস্থা খারাপ হয়, তাই বৈদ্যরাজকে বন্দীশিবিরে দিবারাত্রি থাকার অনুমতি দেওয়া হ'ক। সরকার যদি তা না করতে পারেন, তবে তাঁরা গান্ধীজীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করুন। কারণ, রোগিণীর এই রোগযন্ত্রণা দিন দিন নিরুপায় হয়ে দেখতে পারেন না।

২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কস্তুরবার অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠলো। পুত্র দেবদাস নবাবিষ্কৃত পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌সন দিতে

চাইলে গান্ধীজী তাতে রাজী হলেন না। বললেন, "তোমার ঐ ঔষধের যতোই আশ্চর্য শক্তি থাক না কেন, এখন আর ওঁকে নিরাময় করতে পারবে না। উনি দুদিন কোনও ঔষধ ও জল খাচ্ছেন না। এখন উনি নিজেকে ভগবানের হাতে অর্পণ করেছেন। তুমি ইচ্ছা করলে ইন্‌জেক্‌সন দিতে পারো, কিন্তু আমি তোমাকে না দিতেই পরামর্শ দেবো। তাছাড়া কয়েক ঘণ্টা অন্তর ইন্‌জেক্‌সান দিয়ে তোমার মায়ের দৈহিক যন্ত্রণা বাড়িয়ে আর লাভ কি?"

গান্ধীজী অধিকাংশ সময় স্ত্রীর রোগশয্যায় বসে থাকতেন। যখন তাঁরা বালক-বালিকা ছিলেন, তখন তাঁদের বিবাহ হয়েছিল; সুদীর্ঘ বাষট্টি বছর তাঁরা জীবনসাথীরূপে কাটিয়েছেন। আজ এই বন্দীশালায় তাঁদের চিরবিচ্ছেদ হ'তে চলেছে!

২২শে ফেব্রুয়ারি কস্তুরবা স্বামীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে গান্ধীজী সরকারকে জানালেন, কস্তুরবার দেহ তাঁর পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের হাতে দেওয়া হ'ক; তাঁরা প্রকাশ্যে স্বাধীনভাবে যাতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন, তার অনুমতি দেওয়া হ'ক। যদি তা না হয়, তবে মহাদেবের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, তেমনিভাবে প্রাসাদেই সৎকারের ব্যবস্থা হ'ক। যদি আত্মীয় ছাড়া অন্যান্যদের উপস্থিত থাকতে সরকার অনুমতি না দেন, তবে গান্ধীজী আত্মীয়দেরও উপস্থিত থাকতে দেবেন না। কারণ, অন্যান্যরাও কস্তুরবার আত্মীয়ের চেয়ে কম প্রিয় ছিলেন না। আগা খাঁ প্রাসাদে যাঁরা অন্তরীণ আছেন তাঁরাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করবেন।

গান্ধীজী সারারাত্রি মৃতা স্ত্রীর পার্শ্বে বসে রইলেন। পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রাসাদে প্রায় দেড়শত আত্মীয় ও বন্ধুকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হ'লো। বন্দিশিবিরেই কস্তুরবার শেষকৃত্য

সম্পাদনের ব্যবস্থা হ'লো। গান্ধীজীর স্বহস্তে কাটা সুতোয় বোনা একটি সাদা শাড়িতে কস্তুরবার দেহ আবৃত করা হ'লো। কপালে পরিয়ে দেওয়া হ'লো কুমকুমের টিপ। চিরনিদ্রায় মগ্ন কস্তুরবার মুখখানিতে একটি অপূর্ব প্রশান্তি বিরাজ করতে লাগলো। পুত্র ও আত্মীয়রা কস্তুরবার মৃতদেহকে পুষ্পসজ্জিত শবাধারে ক'রে যেখানে মহাদেবের সৎকার করা হয়েছিল সেখানেই নিয়ে যাওয়া হ'লো এবং অতি অনাড়ম্বর পরিবেশে গীতা, কোরান, বাইবেল ও জেন্দাভেস্তা পাঠের মধ্যে শবদাহ সম্পন্ন করা হ'লো। যখন দেহ চিতায় তোলা হচ্ছিল, তখন গান্ধীজীকে অত্যন্ত বিচলিত ও অভিভূত দেখাচ্ছিল। তিনি ঘন ঘন চাদরের খুঁটে চোখ মুছছিলেন। তিনি বললেন, "শেষে 'বা' তার মুক্তি পেলো। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' তার অন্তরে অক্ষয় হয়ে আঁকা রইলো।"

গান্ধীজী দু ঘণ্টা চিতার পাশে ছিলেন। সকলে তাঁকে প্রাসাদে ফিরে যেতে ও বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি শুনলেন না। খর রৌদ্রে লাঠির ওপর ভর দিয়ে তিনি চিতার পাশে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন। চিতাগ্নি ধীরে ধীরে কস্তুরবার দেহ গ্রাস করতে লাগলো। গান্ধীজী সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "বা-কে ছাড়া আমি আমার জীবন কল্পনা করতে পারি না। বা আমার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তার মৃত্যুতে আমার জীবনে একটি চিরশূন্যতা গ'ড়ে উঠলো।"

পরে তিনি সুশীলাকে বললেন, "আমার মন এখন বা-র কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না।" কস্তুরবা যে টেবিলটিতে বসতেন ও খেতেন, সেটিকে গান্ধীজীর কাছে আনা হ'লো। গান্ধীজী এখন থেকে ঐটিতে বসেই খেতেন।

কস্তুরবার মৃত্যুতে সারা ভারতে হরতাল পালিত হ'লো। রাজ্যসভা এবং পাঞ্জাব বাংলা, উড়িষ্যা ও সীমান্ত প্রদেশের

আইনসভাগুলিতে শোকপ্রস্তাব গৃহীত হ'লো। লর্ড ওয়াভেল এখন বড়লাট হয়ে এসেছিলেন। তিনিও সমবেদনা প্রকাশ করলেন। কিন্তু সরকারী নীতির মধ্যে বিন্দুমাত্র নমনীয়তা দেখা গেল না।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গান্ধীজীর মুক্তির কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না। এই বন্দিদশাতেই গান্ধীজীর মৃত্যু হ'তে পারে এমন আশঙ্কাও অনেকে প্রকাশ করলেন। ১৯৪৪ সালের ১৬ই এপ্রিল সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেল, গান্ধীজী গত তিনদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন। তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তবে অন্যান্য দিক থেকে তাঁর অবস্থা 'সন্তোষজনক'। তিন দিন বাদে আর একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হ'লো, গান্ধীজীর রক্তাল্পতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রক্তের চাপ আরও হ্রাস পেয়েছে, তাঁর সাধারণ অবস্থা উদ্বেগজনক।

গান্ধীজী কিছুদিন যাবৎ তাঁকে আগা খাঁ প্রাসাদ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্যে সরকারকে অনুরোধ করছিলেন। স্বরাষ্ট্র সচিব আইনসভায় বলেছিলেন যে, আগা খাঁ প্রাসাদে গান্ধীজী ও তাঁর অনুচরবর্গকে পালনের জন্যে মাসে ৫৫০ টাকা খরচ হচ্ছে। এই প্রচারের দ্বারা জনমানসে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করবার চেষ্টা হয়েছিল। গান্ধীজী ৪ঠা মার্চ তারিখে ভারত সরকারকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন যে, যা তাঁর ও তাঁর অনুচরবর্গের জন্যে খরচ করা হচ্ছে বলা হয়েছে, আসলে তা আরও অনেক বেশি। তিনি বললেন যে, আগের বছর অক্টোবর মাসেই তিনি বলেছিলেন, এই সুরক্ষিত বিশাল প্রাসাদে তাঁকে বন্দী রেখে জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় হচ্ছে, তাঁকে অন্য কোনও সাধারণ জেলে স্থানান্তরিত করা হ'ক। সরকার তখন তাতে কর্ণপাত করেন নি। এখন সেই প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বললেন, "আমার ও আমার অনুচরবর্গের জন্যে ব্যয় মাসিক মাত্র ৫৫০ টাকা নয়। এই বিরাট জায়গার ভাড়া—

যার একটি সামান্য অংশমাত্র ব্যবহার করতে পাই,—বাইরে নিযুক্ত বিশাল প্রহরীদল, এবং ভিতরে নিযুক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জমাদার ও সিপাহীরা, এইসব বাবদ খরচ ঐ ৫৫০ টাকার সঙ্গে যোগ করতে হবে। কেবল তাই নয়, যারবেদা জেল থেকে একদল দণ্ডিত অপরাধীকে প্রাসাদের বাসিন্দাদের সেবা ও উদ্যানে কাজ করবার জন্যে আনা হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে, এই সমস্ত ব্যয়ই অনাবশ্যক যখন মানুষ অনাহারে মরছে, তখন এইরূপ ব্যয় ভারতীয় মনুষ্যত্বের কাছে প্রায় অপরাধস্বরূপ। আমি অনুরোধ করি যে, আমাকে ও আমার অনুচরবর্গকে সরকার তাঁর ইচ্ছামতো যে কোনও নিয়মিত কারাগারে স্থানান্তরিত করুন।......" এ ব্যাপারে ৯ই মার্চ তারিখে গান্ধীজী আবার একটি পত্র লেখেন।

কিছুদিন যাবৎ গান্ধীজীকে আগা খাঁ প্রাসাদ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে জনবর শোনা যাচ্ছিল। ৫ই মে ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল অব প্রিজন্‌স্‌ এসে খোঁজখবর নিয়ে জানতে চাইলেন যে, গান্ধীজীকে এখন ট্রেনে বা মোটরে একশ মাইল পথ নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা। তিনি আর কিছু বললেন না। তারপর ঐদিন সন্ধ্যার সময় তিনি আগা খাঁ প্রাসাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজীর কক্ষে এলেন এবং গান্ধীজীকে বললেন যে, পরদিন সকালে তাঁকে ও তাঁর অনুচরবর্গকে* বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই গান্ধীজী বললেন, "ঠাট্টা করছেন নাকি?" ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল অব প্রিজন্‌স্‌ বললেন, না, তিনি সত্যই বলছেন। তবে গান্ধীজী ইচ্ছা করলে নিজের সুবিধার জন্যে আরও কয়েকদিন এখানে থাকতে পারেন। তবে পরদিন বেলা আটটা থেকে প্রহরীদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও অবাধে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কিংবা তিনি ইচ্ছা করলে পুণা বা বোম্বাইয়ে কোনও বন্ধুর বাড়িতে গিয়েও

থাকতে পারেন। সেই সঙ্গে ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন যে, "ব্যক্তিগত ভাবে আমি আপনাকে এখানে না থাকারই পরামর্শ দেবো। কারণ, এটা সামরিক এলাকা। এখানে জনতা আপনার 'দর্শন' পাওয়ার জন্যে এলে সৈন্যদলের সঙ্গে সংঘর্ষ হ'তে পারে। তা আপনি পছন্দ করবেন না।" গান্ধীজী হেসে বললেন, "আমি যদি পুণায় কয়েকদিন থেকে যাই, তবে আমার রেলের ভাড়ার কি হবে?" ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল বললেন, "আপনি যখনই পুণা ত্যাগ করবেন, তখনই আপনার রেলের ভাড়ার ব্যবস্থা করা হবে।" গান্ধীজী দু-একদিন পুণায় থাকাই স্থির করলেন।

পরদিন ৬ই মে (১৯৪৪) সকাল ছটায় আগা খাঁ প্রাসাদে উপাসনা করলেন। তারপর তিনি কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাইয়ের সৎকার করা হয়েছিল যেস্থানে, সেই স্থানটুকু তাঁর জন্যে সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে ভারত সরকারকে একটি পত্র লিখলেন। তারপর তিনি কস্তুরবা ও মহাদেবের সমাধিতে গেলেন এবং ফুল দিয়ে ও উপাসনা ক'রে প্রাসাদে ফিরে এলেন। ঠিক বেলা আটটার সময় ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল গান্ধীজী ও তাঁর অনুচরবর্গকে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে এলেন এবং নিজের গাড়িতে ক'রে গান্ধীজীকে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিলেন। আর একটি গাড়িতে তাঁর অনুচরবর্গের আসবার ব্যবস্থা হ'লো। গান্ধীজী এইভাবে এক বৎসর নয় মাস বাদে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেলেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হ'লো, বিনাশর্তে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে।

পর্ণকুটির উদ্দেশে গান্ধীজীকে নিয়ে গাড়িখানি যখন রওনা হ'লো, তখন গান্ধীজীকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তাঁর মনে পড়ছিল, কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার কতো আগ্রহই না ছিল কস্তুরবার। গান্ধীজী নিজের মনেই বললেন, "এর চেয়ে আর

মহত্তর কোন মৃত্যুই তার হ'তে পারতো না। 'বা' ও মহাদেব দেশমাতৃকার বেদীতলেই আত্মবলি দিয়েছে।" গাড়ি এগিয়ে চললো। আগা খাঁ প্রাসাদ পিছনে প'ড়ে রইলো। আর পড়ে রইলো এক সুবিস্তৃত জীবন—যে জীবনে 'বা' ছিলেন চির-সঙ্গিনী ও মহাদেব ছিলেন নিত্য-সহচর।

ছাব্বিশ

আপোস-প্রচেষ্টা

গান্ধীজী মুক্তি পেলেও এতে মুক্তির আনন্দ ছিল না। তিনি দৈহিক ও মানসিক, দু দিক থেকেই খুবই দুর্বল বোধ করছিলেন। তিনি তিনদিন পুনায় বিশ্রাম নিলেন। তিনি দিনে একবার মাত্র সন্ধ্যায় উপাসনাকালে জনসাধারণের কাছে 'দর্শন' দিতেন। ৯ই মে তিনি একবার আগা খাঁ প্রাসাদে গেলেন, কস্তুরবা ও মহাদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে।

১১ই মে তারিখে গান্ধীজী বোম্বাই পৌঁছে জুহুতে বিশ্রাম নিতে গেলেন এবং ১৪ই মে থেকে পক্ষকালের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন মৌন অবলম্বন করলেন। সমুদ্রবায়ু তাঁর শরীরকে কিছুটা সতেজ করলো। তিনি সন্ধ্যায় উপাসনা ও সমুদ্রতীরে ভ্রমণকালে ব্যতীত সব সময়ই নিজের কুটিরে থাকতেন। গায়করা এসে গান শোনাতো। এই সময় তাঁকে "মিশন টু মস্কো" ইংরেজী সবাক চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়। এটিই তাঁর জীবনে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র-দর্শন।

২৯শে মে তারিখে তিনি তাঁর পরিপূর্ণ মৌন ভঙ্গ করলেন এবং এখন থেকে তিনি রোজ মাত্র চার ঘণ্টা—বিকাল চারটে থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত—কথা বলবেন স্থির করলেন। স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় ও কঠোর নিয়ম পালন করায় গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের অনেকখানি উন্নতি হ'লো। ১৫ই জুন তিনি বোম্বাই ত্যাগ ক'রে পুনা যাত্রা করলেন। ১৭ই জুন তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চেয়ে বড়লাটকে পত্র লিখলেন। সেই সঙ্গে তিনি অন্তরীণকালে সরকারের সঙ্গে তাঁর যেসব পত্র-বিনিময় হয়েছিল, তা জনসাধারণ্যে প্রকাশের অনুমতিও চাইলেন। ২০শে জুন ভারত সরকার পুস্তিকাকারে সরকার ও

গান্ধীজীর মধ্যে লিখিত পত্রাবলী প্রকাশের কথা ঘোষণা করলো। পরদিন "গান্ধীর সঙ্গে পত্রালাপ" (Correspondence with Mr. Gandhi) প্রকাশিত হ'লো। তবে বড়লাট গান্ধীজীকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি দিলেন না। কারণ হিসাবে দেখানো হ'লো যে, গান্ধীজী এখনও 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর পূর্বমত ত্যাগ করেন নি।

২০শে জুন তারিখে পুনায় গান্ধীজী প্রায় পঞ্চাশজন কংগ্রেস-কর্মীর সঙ্গে একটি সভায় মিলিত হলেন। ১লা জুলাই তিনি পুনাতেই কস্তুরবা গান্ধী জাতীয় স্মৃতিরক্ষা-তহবিলের ন্যাসরক্ষকদের একটি সভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "কস্তুরবা-স্মৃতি-তহবিলের ঠিক লক্ষ্য হ'লো ভারতের নারী ও শিশুদের কল্যাণসাধন।" গান্ধীজীর পরামর্শমতো ন্যাসরক্ষক কমিটি ঐ তহবিল ও তার আয়কে ভারতের দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী ও শিশুদের শিক্ষা ও কল্যাণকার্যে ব্যয় করবার সিদ্ধান্ত নিলো। গান্ধীজী ২রা জুলাই পার্বত্য স্বাস্থ্যাবাস পাঁচগনি যাত্রা করলেন।

১৫ই জুলাই তারিখে তিনি বড়লাট ওয়াভেলকে একটি পত্র লেখেন। তার উত্তরে লর্ড ওয়াভেল জানান, গান্ধীজী যদি কোনও গঠনমূলক নীতি অনুসরণের প্রস্তাব দেন, তবে তিনি তা বিবেচনা ক'রে দেখতে পারেন। ২৭শে জুলাই তারিখে গান্ধীজী বড়লাটকে আবার একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন যে, "আমি ওয়ার্কিং কমিটিকে এই মর্মে পরামর্শ দিতে পারি যে, পরিবর্তিত অবস্থায় ১৯৪২ সালের আগস্ট প্রস্তাবে যে ব্যাপক আইন অমান্যের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, তা কার্যকরী করা সম্ভব নয়, এবং যদি অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়, কেন্দ্রীয় আইন-সভার নিকট দায়িত্বশীল একটি সরকার গঠিত হয় এবং যুদ্ধকালে এখন যেমন সামরিক কার্যকলাপ চলছে তা চলবে তবে ভারতের উপর আর্থিক কোনও বোঝা চাপানো হবে না, এইরূপ ব্যবস্থা

থাকে, তবে যুদ্ধোদ্যমে কংগ্রেসের পরিপূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া উচিত। যদি বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আপোস-মীমাংসার ইচ্ছা থাকে, তবে পত্রবিনিময়ের পরিবর্তে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথাবার্তা চালানো উচিত। ...তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপোসের সামান্য আশা থাকবে, ততোক্ষণ আমি আপনার দ্বারে করাঘাত করতে থাকবো।"

উত্তরে বড়লাট জানালেন, বৃটিশ সরকার আপোস-মীমাংসায় ইচ্ছুক। কিন্তু গান্ধীজী যে শর্তগুলি দিয়েছেন, তাতে নয়। কারণ, তা ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে মওলানা আজাদ কর্তৃক স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে প্রদত্ত প্রস্তাবেরই অনুরূপ।

বৃটিশ সরকার গান্ধীজীর প্রস্তাব সম্পর্কে অনমনীয় থাকায় গান্ধীজী ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিকে আবার মনোযোগ দিলেন। তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে একটি আপোস-রফার চেষ্টা করতে লাগলেন। রাজাগোপালাচারী ইতিমধ্যে জিন্নার সঙ্গে আলাপ শুরু করেছিলেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজাগোপালাচারী একটি মীমাংসার প্রস্তাবিত সূত্র প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে গান্ধীজীর অনশনকালে রাজাজী গান্ধীজীর সঙ্গে ঐ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং গান্ধীজীও সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে রাজাজী ঐ সূত্রটির কথা মিঃ জিন্নাকে জানান। সূত্রটি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটি রফার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল : (১) মুসলিম লীগকে ক্ষমতার হস্তান্তরকালে স্বাধীনতাদানের দাবি জানাতে হবে, (২) যুদ্ধের পরে একটি কমিশন উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পরস্পর-সংলগ্ন মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করবে এবং ঐসব অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীর ভোটে ঐসব অঞ্চল হিন্দুস্থানে থাকবে কিনা তা নির্ধারিত হবে, (৩) পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লে দেশরক্ষা, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হবে, (৪) বৃটেন যদি পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব

হস্তান্তরিত করে, তবেই চুক্তির শর্তগুলি অবশ্য পালনীয় হবে। মিঃ জিন্না এই প্রস্তাব সম্পর্কে নিজে কোনও মতামত দিতে চাইলেন না, প্রস্তাবটিকে লীগের সম্মুখে উত্থাপিত করতে চাইলেন। ৩০শে জুলাই লাহোরে লীগের ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হলো, তাতে মিঃ জিন্নাকে গান্ধীজীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাবার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হ'লো। অবশ্য জিন্না নিজেও ওই প্রস্তাবকে সন্তোষজনক মনে করলেন না। তিনি বললেন, "সরল ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্থানের ভিত্তিতে মিঃ গান্ধী মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলান; তবেই আমরা ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতার নিকটবর্তী হ'তে পারব। কিন্তু মিঃ গান্ধী ও মিঃ রাজাগোপালাচারী ঘোড়ার সামনে গাড়ি রাখছেন; তাঁরা বলছেন এইসব শর্ত যদি বৃটেন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে তবেই মূল্যবান বা কার্যকর হবে। যদি হিন্দু ও মুসলমানরা মীমাংসায় না আসে ও ঐক্যবদ্ধ না হয়, এবং এইভাবে একটি মিলিত মোরচার মাধ্যমে বৃটেনের শাসকদের অনিচ্ছুক হাত থেকে আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে না নেয়, তবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।"

গান্ধীজী ১৭ই জুলাই তারিখে পাঁচগনি থেকে মিঃ জিন্নাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "আপনার যখন খুশি আসুন আমরা দেখা করি। আমাকে ইসলামের বা ভারতীয় মুসলিমদের শত্রু মনে করবেন না। আমি সর্বদা আপনাদের ও মানবজাতির সেবক ও বন্ধু রূপে কাজ করেছি। আমাকে হতাশ করবেন না।" মিঃ জিন্না ২৪শে জুলাই কাশ্মীর থেকে এর উত্তরে লিখেছিলেন, "প্রিয় মিঃ গান্ধী, আমি ফিরে এসে আমার বোম্বাইয়ের বাড়িতে আপনাকে আমি সানন্দে স্বাগত জানাব। সম্ভবত আমি আগস্টের মাঝামাঝি ফিরব। আমি আশা করি ততোদিনে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং

আপনি বোম্বাইয়ে ফিরে আসবেন। আমাদের দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছু বলতে চাই না।" মিঃ জিন্না সম্মেলনে এই উভয় চিঠি পড়ে শোনালেন।

জিন্নার সঙ্গে গান্ধীজীর ভারত-বিভাগ সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছাপ্রকাশে তাঁকে বিভিন্ন মহল থেকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হ'লো। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের হিন্দুরা সম্ভাবিত পাকিস্থানে সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় বিশেষভাবে বিচলিত হলেন। শিখরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এমন কি আমেদনগর দুর্গে অন্তরীণ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যেও অনেকে বিক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হলেন। বিশেষতঃ বাংলা, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, পাঞ্জাবেও মুসলিম লীগের মধ্যে যখন দ্বিধার ভাব দেখা দিয়েছিল, সেই মুহূর্তে গান্ধীজীর এই প্রস্তাব যে জিন্নার হাতকে শক্ত করবার কাজই করলো, এমনও অনেকে বলতে লাগলেন। পাঁচগনিতে গান্ধীজীর উপাসনায় হিন্দু মহাসভার অনুগামী তরুণরা কংগ্রেসবিরোধী ও পাকিস্থানবিরোধী ধ্বনি দিলো।

১লা আগস্ট তারিখে গান্ধীজী পুনায় পৌঁছলেন। ২রা আগস্ট পুনা থেকে ওয়ার্ধা যাওয়ার পূর্বে তিনি একবার আগা খাঁ প্রাসাদে মহাদেব ও কস্তুরবার সমাধিগুলিকে পুষ্পার্ঘ্য দিলেন ও সেখানে প্রার্থনা করলেন। ৩রা আগস্ট তারিখে ওয়ার্ধা স্টেশনে তাঁকে বিপুল জনতা অভ্যর্থনা জানালো। সেবাগ্রাম যাওয়ার পথে তিনি পায়ে হেঁটে একটি স্থানে এলেন। এখানে "করেঙ্গে ও মরেঙ্গে" অভিযানকালে একজন দরিদ্র গ্রামবাসী গুলিতে নিহত হয়েছিল।

আগস্ট প্রস্তাবের দুই বৎসর পূর্ণ হ'তে চলেছিল। তাই ৯ই আগস্ট কিভাবে পালিত হবে সে সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন করছিলেন। গান্ধীজী বললেন, "আমি পূর্বেই বলেছি, এখন ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন সম্ভব নয়। তবে ব্যাপক আইন অমান্য এক জিনিস

এবং আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্যে কিছু করা অন্য জিনিস। এটা সর্বজনের ও সর্বকালের করণীয়, ও করবার জন্যে নিজের বিবেকের ছাড়া অন্য কোনও অনুমতির প্রয়োজন হয় না। তবে আগামী ৯ই একটি বিশেষ দিন। কংগ্রেসের ও আমার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচুর ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তাই আমার ইচ্ছা সর্বত্র ঐদিনের জন্য পুলিসের বাধানিষেধ মেনে চলা উচিত।······দ্বিতীয়ত, যাঁরা আত্মগোপন করেছেন, তাঁদের উচিত ৯ই আত্মপ্রকাশ করা। তাঁরা কর্তৃপক্ষকে তাঁদের গতিবিধি ও অবস্থানাদির কথা জানিয়ে বা পুলিসকে না এড়িয়ে বা তাদের চোখে না ধুলো দিয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে তাঁদের কাজ ক'রে তা করতে পারেন।"

গান্ধীজীর এই বিবৃতির পর বহু আত্মগোপনকারী কংগ্রেস-কর্মী আত্মপ্রকাশ করলেন। পঁচিশজন সত্যাগ্রহী বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনারকে জানালেন যে, তাঁরা ৯ই আগস্ট ভোর সাড়ে পাঁচটায় "ভারত ছাড়" প্রস্তাবটি প্রকাশ্যে পাঠ করবেন। পুলিস তাঁদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করলো এবং বারো ঘণ্টা আটক রেখে ছেড়ে দিলো। গান্ধীজীর বিবৃতিতে হিন্দু ও মুসলমানদের ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব গ'ড়ে তোলার প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছিল। সেই অনুসারেও ঐদিন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কর্মীরা মিলিত ভাবে গান্ধী-জিন্না আলোচনার সাফল্য কামনা ক'রে একত্র উপাসনায় যোগ দিলেন। এলাহাবাদে আনন্দভবনে কংগ্রেস ও লীগের বিশিষ্ট কর্মীরা মিলিতভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দাবিতে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন। ঐদিন সেবাগ্রামে নিরবচ্ছিন্ন সূত্রযজ্ঞ চললো। গান্ধীজী বললেন, "আপনারা সকলে প্রার্থনা করুন, ভগবান যেন কায়েদ-এ-আজম ও আমাকে ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়ার মতো বিচারবুদ্ধি দেন।"

১৯শে আগস্ট গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের কথা ছিল। ৯ই

আগস্ট থেকে সারা ভারতে তার একটি সুন্দর পরিবেশ গ'ড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু ১৯শে আগস্ট গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার হ'লো না। জিন্না হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সাক্ষাতের তারিখ ৯ই সেপ্টেম্বরে পিছিয়ে দেওয়া হ'লো। ৮ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী বোম্বাই রওনা হয়ে গেলেন। পাকিস্থানবিরোধী সংগঠক মিঃ থাটী ও অন্যান্য আট ব্যক্তি বিক্ষোভ প্রকাশ করবার অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের একজনের কাছে একটি ছোরাও পাওয়া গেল। ৯ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী বোম্বাই পৌঁছলেন। সমগ্র মালাবার হিল অঞ্চল সকাল থেকেই পুলিসের রক্ষণাধীনে রাখা হ'লো।

গান্ধীজী বোম্বাইয়ে পৌঁছেই দু ঘণ্টার মধ্যে বিকাল প্রায় চারটেয় মিঃ জিন্নার বাড়িতে পৌঁছলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সেক্রেটারি পিয়ারেলাল। গান্ধীজীকে জিন্না সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। জিন্না গান্ধীজীর কাঁধ জড়িয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভঙ্গিতে দাঁড়ালে প্রতীক্ষমাণ ক্যামেরাম্যানরা তাঁদের মিলিত ফটো তুললেন।

জিন্নার সঙ্গে পুরো তিন ঘণ্টা ধ'রে গান্ধীজী নিরিবিলিতে আলাপ করলেন। সংবাদপত্রের লোকদের এমনও ধারণা হ'লো যে, একটা আপোস অসম্ভব নয়। আলাপশেষে দুজনের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হ'লো, "তাঁরা অকপট ও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে কথাবার্তা বলেছেন। সোমবার সাড়ে পাঁচটায় আবার আলোচনা শুরু হবে।" জিন্না-ভবন থেকে কিছু এনেছেন কিনা প্রশ্ন করা হ'লে গান্ধীজী বললেন, "শুধু কিছু ফুল।" তাঁর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে তখনও আপোস-আলোচনা সম্পর্কে কেউ বিন্দুমাত্র নৈরাশ্যবোধ করলেন না। গান্ধীজী রাজাজীকে জানালেন, আপনার সূত্র ও আপনার প্রতি তাঁর (মিঃ জিন্নার) ঘৃণা আমাকে স্তম্ভিত করেছে। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমি চলে আসি। কিন্তু প্রলোভনটা

শেষ পর্যন্ত জয় করলাম। তাঁকে বললাম, "আপনি যদি আমার মতামত পরিবর্তন করাতে পারেন, করুন; আমি আপনাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবো।......"

১১ই সেপ্টেম্বর তাঁরা আবার সন্ধ্যায় মিলিত হলেন। আলোচনা চললো। পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় আবার গান্ধীজী জিন্নার বাড়িতে পৌঁছলেন। বেলা একটা পর্যন্ত আলোচনা চললো। বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত আবার আলোচনা হ'লো। কোন বিবৃতি প্রকাশিত হ'লো না। সারা ভারত আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

১৩ই সেপ্টেম্বর চতুর্থ দিনেও সকালে ১১টা থেকে ১টা ও বিকালে সাড়ে পাঁচটা থেকে ৭টা পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা চললো। গান্ধীজী উৎসুক সাংবাদিকদের বললেন, "কাল আপনারা আমাদের মুখেচোখে কিছু পড়েছিলেন। আজও আমরা দুজনে আছি। তবে আমি আমাদের মুখেচোখে আশা, শুধু আশা ছাড়া আর কিছু পড়তে নিষেধ করব।" বোম্বাইয়ের কোনও সংবাদপত্র আলোচনার দীর্ঘতা দেখে এই আলোচনা ব্যর্থ হবে ব'লেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। তাই এই সতর্কবাণী।

১৪ই সেপ্টেম্বরও প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে আলাপ হ'লো। পরদিন সকালে আমেরিকান সাংবাদিকদের সঙ্গে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণী প্রকাশিত হ'লো। তাতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ বললেন যে, ভারতের জন্যে কোন নূতন সংবিধান রচনা বেশ কঠিন ও জটিল ব্যাপার; তা যুদ্ধের মধ্যে করা সম্ভব নয়। সরকারে ভারতীয় দলগুলির অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হ'লে তা বর্তমান সংবিধানের মধ্যেই করতে হবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আলোচনা চললো। পরদিন রমজানের ছুটি থাকায় ১৭ই রবিবার আবার আলোচনা হ'লো। গান্ধীজীকে ঐদিন জিন্না একটি পত্রে "সাময়িক অন্তর্বর্তী-

কালীন সরকার” বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা জানতে চেয়েছিলেন। পরদিন সোমবার আলোচনা হ'লো। ১৯শে সেপ্টেম্বর জিন্নার ঈদের বাণী প্রকাশিত হ'লো। তাতে তিনি বললেন যে, “আজ এই পবিত্র দিনে আসুন আমরা আবার সংকল্প করি যে, পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া এবং আমাদের লক্ষ্য পাকিস্থানে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আমরা যে কোনও ত্যাগ স্বীকার করবো।” ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঈদের জন্যে আলোচনা বন্ধ রইলো। ২১শে সেপ্টেম্বর আবার আলোচনা শুরু হ'লো। ২৭শে পর্যন্ত আলোচনা চললো। তারপর জিন্না গান্ধীজীর সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছতে অক্ষমতা ঘোষণা করলেন। সতেরো দিন ধ'রে আলোচনাকালে গান্ধীজীর সঙ্গে জিন্নার যেসব পত্রবিনিময় হয়েছিল, সেগুলি প্রকাশিত হ'লো। গান্ধীজী তাঁর একটি পত্রে বলেছিলেন, “এখন সাময়িকভাবে আমি রাজাজীর সূত্রটি সরিয়ে রাখছি এবং আপনার সহায়তায় মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবেই গভীরভাবে মনোনিবেশ করছি। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, প্রস্তাবে দ্বিজাতির তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। আমাদের আলোচনাকালে, আপনি আবেগভরে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভারতে দুটি জাতি আছে, হিন্দু ও মুসলমান এবং হিন্দুদের মতোই মুসলমানদের বাসভূমি ভারতবর্ষ।...ইতিহাসে আমি অনুরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখিনি যেখানে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা বা তাদের বংশধররা তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের পৃথক জাতি ব'লে দাবি করছে। ভারত যদি মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এক জাতি থাকে, তবে তার সন্তানদের একটি বৃহৎ অংশ ধর্মমত পরিবর্তন সত্ত্বেও তা একজাতিই থাকবে। আপনি রাজ্যজয়ের অধিকারে পৃথক জাতিত্বের দাবি করছেন না, করছেন ইসলাম গ্রহণের জন্যে। যদি সমস্ত ভারত ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কি এক জাতিতে পরিণত হবে? বাঙ্গালী, ওড়িয়া, অন্ধ্র, তামিলী,

মহারাষ্ট্রীয় বা গুজরাটীরা যদি সকলে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কি তারা সকলেই তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে?...... তারা আজ রাজনৈতিক দিক থেকে এক হয়েছে। কারণ তারা একটি বিদেশীয় শাসনে সকলেই রয়েছে। আপনি জাতীয়তার একটি নূতন মানদণ্ড ব্যবহার করছেন মনে হয়। আমি যদি তা মেনে নিই, তবে আমাকে আরও অনেক দাবির ও দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে।...” এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী লাহোর-প্রস্তাব সম্পর্কে যেসব অসুবিধা বোধ করছিলেন, সেগুলির উল্লেখ করলেন। সেগুলির কয়েকটি হ'লো, (১) প্রস্তাবে পাকিস্থান নেই। মূলতঃ পাকিস্থানের যে অর্থ ছিল, সেই অর্থই কি ঐ শব্দ এখন বহন করছে? পাঞ্জাব, আফগানিস্থান, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বালুচিস্থান থেকেই ঐ নামের সৃষ্টি হয়েছিল। যদি তা না হয়, তবে এর অর্থ কি? (২) পাকিস্থানের লক্ষ্য কি সর্ব-ইসলাম? (৩) ধর্মে ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে ভারতীয় মুসলমানদের পার্থক্য কোথায়? ভারতীয় মুসলমান কি তুর্কী ও আরব থেকে পৃথক? ইত্যাদি।

গান্ধীজী বললেন, আলোচনা ব্যর্থ হ'লেও তিনি নৈরাশ্যবোধ করছেন না। তিনি বললেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এই ব্যর্থতা থেকে মঙ্গলই হবে।

১৯৪৪ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধীজী পঁচাত্তর বৎসরে পদার্পণ করলেন। ভারতের সর্বত্র সমারোহের সঙ্গে গান্ধীজীর জন্মদিবস পালিত হ'লো। ঐদিন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অধিনায়ক ও সাময়িক আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রধান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রেঙ্গুনে পতাকা-অভিবাদন উপলক্ষে গান্ধীজীর উদ্দেশে বললেন: “আমাদের জাতির জনক! ভারতের স্বাধীনতার এই পবিত্র যুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্বাদ কামনা করি।”

১৯৪৪ সালের শেষের দিকে গান্ধীজী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন

বোধ করলেন। তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়বার আশঙ্কা দেখা দিল। তাই গান্ধীজী স্বল্পসময়ের জন্যে পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করলেন, "৪ঠা থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি সকল জনহিতকর কার্যকলাপ, সাধারণ বা ব্যক্তিগত সকল সাক্ষাৎকার, সকল প্রকার পত্রালাপ বন্ধ রাখতে সংকল্প করেছি। ঐ সময়ে আমি কোন সংবাদপত্র পড়ব না। অবশ্য কোনও অপ্রত্যাশিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে।"

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া থেকে তিনি পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ভারতসচিব মিঃ আমেরি কংগ্রেসের নেতাদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলে গান্ধীজী বললেন, "সত্যাগ্রহীরা কারাগারে যাবেন। সত্যাগ্রহীরা কারাবরণের দ্বারাই নিজ আদর্শের সেবা করেন। তবে কারাগারের বাইরে যারা আছে, তাদের কর্তব্য হ'লো—যাঁরা কারাগারে আছেন তাঁদের ভুলে না যাওয়া।"

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিক থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে আবার পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। কংগ্রেসের নেতাদের অধিকাংশ কারাগারে থাকলেও কংগ্রেস আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো। কংগ্রেস এখন আইনসভাগুলিতেও পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করলো। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইনসভায় অন্যান্য দলের সহযোগিতায় চার-পাঁচ বার সরকারকে পরাজিত করলো। মার্চ মাসে খান আবদুল গফর খানের ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাকে পরাজিত ক'রে সেখানে একটি কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। কয়েক সপ্তাহ বাদে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে আসামে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করলো। কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় অংশ গ্রহণ করলো না, তবে মুসলিম লীগকে সমর্থন করবার প্রতিশ্রুতি দিলো। মুসলিম লীগ প্রতিশ্রুতি

দিল যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ দমন করবে না। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটলো এবং গভর্নর সেখানে ৯৩ ধারা জারী করলেন। কেবল সিন্ধুপ্রদেশেই মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা রইলো।

ভুলাভাই দেশাই বড়লাটকে তাঁর শাসন-পরিষদ পুনর্গঠনের জন্যে একটি প্রস্তাব দিলেন। তাতে বলা হ'লো যে, কেবল ভারতীয় সদস্যদের নিয়েই শাসন-পরিষদ গঠন করতে হবে। চল্লিশ ভাগ সদস্য কংগ্রেসের, চল্লিশ ভাগ সদস্য মুসলিম লীগের এবং অবশিষ্ট বিশ ভাগ সদস্য অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এবং পুনর্গঠিত শাসন-পরিষদ ভারতের নূতন সংবিধান রচনার কাজে হাত দেবে। কংগ্রেসের ভুলাভাই দেশাই ও মুসলিম লীগের লিয়াকত আলি খান এতে সম্মতি দিলেন। গান্ধীজী ও জিন্না এই পরিকল্পনার কথা জানলেও তাঁরা এ সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করলেন না।

স্যার তেজ বাহাদুর সঁপ্রুর নেতৃত্বে কনসিলিঅ্যাশ্‌ন্ কমিটি অন্য একটি প্রস্তাব দিলো। এপ্রিল মাসে এই কমিটি বড়লাটকে একটি তারবার্তায় কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার গঠন ও প্রদেশসমূহে মন্ত্রিসভাসমূহের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলো। কমিটি ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কেও প্রস্তাব দিলো। এই সংবিধানে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হ'লো। বলা হ'লো নির্বাচন যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারাই হবে; প্রস্তাবে পাকিস্তান-দাবির তীব্র বিরোধিতা করা হ'লো।

ভারতে যেমন রাজনৈতিক সজীবতা দেখা দিয়েছিল, তেমনি ইংলণ্ডেও জনমত ভারতীয় রাজনীতিতে এই দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা সম্পর্কে অধীর হয়ে উঠেছিল। অবশ্য বৃটিশ সরকার এখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ের সুচারু সমাপ্তি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ইতিমধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্টের মৃত্যু ঘটেছিল এবং স্যানফ্রান্‌সিস্‌কো-সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। গান্ধীজী এই

সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিচ্ছেন, এইরকম জনরব প্রচারিত হলে জর্জ বার্নার্ড শ তার প্রতিবাদে বললেন, "কি থেকে অবসর নেবেন? তাঁর আসন সরকারী নয়, স্বাভাবিক। মহাত্মা তাঁর কিছুই অন্যের হাতে দিতে পারেন না। নেতৃত্ব এক ডেলা তামাক নয় যে, তা এক হাত থেকে অন্য হাতে দেওয়া যাবে।"

৭ই মে (১৯৪৫) জার্মানি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলো। মে মাসের শেষ সপ্তাহে মিঃ চার্চিল ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এইভাবে জাতীয় সরকারের কার্যকাল শেষ হ'লো। সাধারণ নির্বাচনে প্রচারকার্যে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলো। শ্রমিক দল নির্বাচনে জিতলে তাঁরা অবিলম্বে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করবেন, তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

৫ই জুন লর্ড ওয়াভেল ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে এলেন এবং ১৪ই জুন তিনি একটি বেতার-ভাষণ দিলেন। ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হ'লেও তখনও এশিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছিল। সেই যুদ্ধ চালনায় ভারতীয়রা যাতে পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং যুদ্ধোত্তর সমস্যাবলীর সমাধানে ভারতীয়গণ দায়িত্ব নেয়, সেই উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়াভেল বৃটিশ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের পুনর্গঠনের প্রস্তাব দিলেন। এই ব্যবস্থায় বড়লাট ও প্রধান সেনা-পতি ভিন্ন শাসন-পরিষদের অন্য সকল সদস্যই ভারতীয় হবেন এবং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সদস্যদের সংখ্যা সমান হবে। বৈদেশিক বিষয় বড়লাটের হাত থেকে ভারতীয় সদস্যের হাতে যাবে। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্যে বড়লাট রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের, প্রদেশ সরকারসমূহের মুখ্য মন্ত্রী ও ও প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন ডাকবেন—এবং তাঁদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে নূতন শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের নির্বাচন করবেন। নূতন ব্যবস্থায় যেসব প্রদেশে ৯৩ ধারা চালু আছে,

সেখানেও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। বৃটিশ সরকারের মতে, বর্তমান সংবিধানের মধ্যে এর চেয়ে প্রগতিশীল ব্যবস্থা আর কিছু হ'তে পারে না। ভারতসচিব মিঃ আমেরি ঘোষণা করলেন যে, যেসব কংগ্রেস-নেতা অন্তরীণ আছেন, তাঁদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। লর্ড ওয়াভেল সিমলায় প্রস্তাবিত সম্মেলন ডাকলেন। লর্ড ওয়াভেল গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি বললেন, তিনি সিমলা যাবেন, তবে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। তাঁর পরিবর্তে কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আজাদ আমন্ত্রিত হবেন। বড়লাট তাতেই সম্মত হলেন।

গান্ধীজী ১৮ই জুন বড়লাটকে একটি তারবার্তায় জানালেন: "মওলানা সাহেবকে সরাসরি আমন্ত্রণ করায় কৃতজ্ঞ। সদস্যদের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করবার সুযোগ থাকায় আমন্ত্রিতদের সম্মেলনে যোগদানের অন্তরায় অপসারিত হয়েছে। মুসলমান ও বর্ণহিন্দুদের সমতার অনিবার্যতা সম্পর্কে আমার আপত্তি এখনও রয়েছে। যদি বৃটিশ সরকারের পক্ষে ঐ নীতির পরিবর্তন অসাধ্য হয়, তবে কংগ্রেসের প্রতি আমার পরামর্শ হবে শাসন-পরিষদে অংশগ্রহণ না করা। কংগ্রেস কখনও নিজেকে হিন্দু বা অবর্ণ হিন্দুর সঙ্গে এক ক'রে দেখেনি, এমন কি স্বাধীনতালাভের জন্যেও দেখবে না; কারণ, তা হবে পক্ষপাতদুষ্ট, অসত্য ও আত্মঘাতী।"

গান্ধীজী লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সাংবাদিকদের বললেন যে, "ভুলাভাই যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাতে বর্ণের কোনও উল্লেখ ছিল না। তাতে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তাতে কংগ্রেস ইচ্ছা করলে যে কোন সম্প্রদায় থেকে তার অংশ নির্বাচিত করতে পারত।" বড়লাট সিমলা-সম্মেলনে হিন্দুমহাসভাকে কেন আমন্ত্রণ করেন নি, সে সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত চাওয়া হ'লে তিনি বললেন, "হয়তো বড়লাট সিমলা-সম্মেলনকে ধর্মীয় ভিত্তিতে না ক'রে বিশুদ্ধ রাজ-

নৈতিক ভিত্তিতে করতে চেয়েছেন কিংবা এমনও হ'তে পারে, তিনি কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা ব'লে দেখাবার চেষ্টা করছেন। তা যদি করা হয়, তবে কংগ্রেস এই তামাসা সন্তর্পণে এড়িয়ে চলবে।"

২১শে জুন তারিখে গান্ধীজী বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর পরে এই তাঁদের প্রথম মিলন। কমিটি বড়লাটের প্রস্তাবটি আলোচনার জন্যে মিলিত হয়েছিল। স্থির হ'লো, কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক সংস্থা রূপেই সিমলা-সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবে। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ২২শে জুন বড়লাটকে জানিয়ে দেওয়া হ'লো।

২৪শে জুন সিমলায় বড়লাট-ভবনে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা মিলিত হলেন। গান্ধীজী সম্মেলনে যোগ দিলেন না; তবে আলোচনা ও পরামর্শের জন্যে সিমলায় উপস্থিত রইলেন।

সম্মেলনে গোড়ার দিকে আশার ভাবই দেখা গেল। সম্মেলনে সমস্যাটা ক্রিপস্-দৌত্যকালে যেমন কি পরিমাণ ক্ষমতা ভারতীয়দের দেওয়া হবে, ছিল, এখন তা ছিল না; এখন সমস্যাটা ছিল ভারতীয়দের মধ্যে ক্ষমতা কিভাবে বণ্টন করা হবে। নব-গঠিত শাসন-পরিষদে কিছু আসন যে তপসিলভুক্ত হিন্দু, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেওয়া হবে, তা প্রায় স্থির ছিল। হিন্দু ও মুসলিম সদস্যরা যে সংখ্যায় সমান থাকবেন, সে বিষয়েও মতদ্বৈধ ছিল না। মতদ্বৈধ ছিল, কারা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন। মওলানা আজাদ ও মিঃ জিন্না এ বিষয়ে কংগ্রেস ও লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে যথাক্রমে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছিলেন। তাঁরা জানালেন যে, শাসন-পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ও সংগঠন নিয়ে তাঁরা একমত হ'তে পারছেন না। তাই সম্মেলন ১৪ই জুলাই পর্যন্ত মুলতুবি রইলো। লর্ড ওয়াভেল বিভিন্ন দলের নেতাদের সম্ভাবিত সদস্যদের তালিকা

পাঠাতে অনুরোধ করলেন, যাতে তাঁদের মধ্য থেকে তিনি শাসন-পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত ক'রে নিতে পারেন। ৭ই জুলাইয়ের মধ্যে কংগ্রেস ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দলগুলি তাঁদের তালিকা পাঠালেন। মুসলিম লীগ কোন তালিকা পাঠালো না। কিন্তু আলোচনাও সে বন্ধ করলো না। কংগ্রেস যে তালিকা দিয়েছিলেন, তাতে সমস্ত শাসন-পরিষদের সম্ভাবিত সদস্যদের নাম ছিল। ফলে, তাতে অন্যান্য প্রধান দলগুলির প্রতিনিধিদেরও নাম ছিল। ফলে ঐ তালিকায় মুসলিম লীগের মিঃ জিন্না ও অন্য দুজন নেতার নামও স্থান পেয়েছিল এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে মাত্র পাঁচ জন সদস্যের নাম দেওয়া হয়েছিল, তাতে মওলানা আজাদ ও আসফ আলির নামও ছিল। আজাদ সুস্পষ্টভাবে ব'লেছিলেন, কংগ্রেসের নীতি অনুসারেই ঐ তালিকার এই দুজন মুসলমানের নাম দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস তার তালিকায় মুসলিম নাম অন্তর্ভুক্ত করাতেই যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা আরও জটিল হ'লো। ইউনিয়নিস্ট পার্টির মালিক খিজির হায়াত খাঁ যখন দাবি করলেন যে পাঞ্জাব থেকে একজন মুসলিম সদস্য নিতে হবে, কংগ্রেস ও ইউনিয়নিস্ট পার্টির মুসলিম সদস্য নির্বাচনের দাবি লীগ অস্বীকার করলো এবং লীগকেই মুসলিম সদস্য নির্বাচনের একমাত্র অধিকারী বলে ঘোষণা করলো। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা চলতে লাগলো। কিন্তু জিন্না অটল রইলেন। শাসন-পরিষদের সকল মুসলিম সদস্যই লীগ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, এই প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত লীগ সদস্য-তালিকা দিলো না। কিন্তু তাঁর অসংগত দাবি কেউ মেনে নিলো না। ফলে সিমলা-সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লো।

সিমলা-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পক্ষকাল পরেই ইংলণ্ডে শ্রমিক দল ক্ষমতাসীন হ'লো এবং ছ সপ্তাহ বাদে জাপান আত্ম-সমর্পণ করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। শ্রমিক

দলের জয়লাভে ভারতবাসীরা খুবই আনন্দিত হ'লো। ভারত-সচিব মিঃ আমেরির পরাজয় প্রমাণ ক'রে দিলো যে, ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁর অনুসৃত নীতিকে সমর্থন করে নি। মওলানা আজাদ ভারতবাসীর পক্ষ থেকে নূতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লেমেণ্ট এটলীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন।

২১শে আগস্ট ঘোষণা করা হ'লো যে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ভারতেও কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বড়লাট বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে আবার ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ও ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল একসঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, বৃটিশ সরকার ভারতের সাধারণ নির্বাচন-শেষে আইনসভাসমূহের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতের নূতন সংবিধান রচনার জন্যে একটি সংস্থা গঠন করবেন। বড়লাটকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হ'লে তাঁর শাসন-পরিষদ গঠনের কাজ শুরু করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জানানো হ'লো।

১২ই থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুনায় এবং ২১শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। আজাদ সভাপতিত্ব করলেন। গান্ধীজী অধিকাংশ বৈঠকে উপস্থিত রইলেন। ভারতের অখণ্ডতা, তৎসহ জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরও অধিবেশন বসলো। এতে ২৮৩ জন প্রতিনিধি ও পঁচিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শেষ দিনে জওহরলাল নেহরু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দী সৈনিকদের সমর্থন ক'রে একটি প্রস্তাব আনলেন এবং যুদ্ধবন্দীর পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানালেন। তিনি জানালেন, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দীদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে কংগ্রেস একটি

কমিটি গঠন করেন। তিনি ঐ কমিটিতে অন্যান্য পার্টিকেও যোগদানের জন্য আহ্বান জানালেন। কংগ্রেসে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, কৃষক-সংগঠনসমূহ প্রভৃতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ার জন্যে দাবি জানানো হ'লো। কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন ও অবিলম্বে ক্ষমতা-হস্তান্তর সম্পর্কে জনসাধারণের ইচ্ছা প্রমাণের জন্যে কংগ্রেস আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে, এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হ'লো। গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকলেও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগ দিলেন না। তিনি অসুস্থ থাকায় কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতেই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা হ'লো। কংগ্রেসে আজাদ, প্যাটেল ও নেহ্‌রু প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন। গান্ধীজী নেচার কিওর ক্লিনিকে বিশ্রামলাভের জন্যে পুনা গেলেন।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানের জন্যে কোন্ পথ নেওয়া হবে, সে প্রশ্নও ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে উঠেছিল। এতোদিন গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচীই একমাত্র কার্যকর পন্থা ছিল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতালাভ আসন্ন হওয়ায় ঐ সম্পর্কে মতদ্বৈধ দেখা দিলো। গান্ধীজী প্রাচীন অর্থনীতিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছিলেন; তাঁর কাছে কুটির-শিল্পই ছিল প্রধান শিল্প। সুন্দর স্বচ্ছন্দ গ্রামীণ জীবনকেই গান্ধীজী আদর্শ জীবন এবং সত্য ও অহিংসা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বলে মনে করতেন। কিন্তু নেহ্‌রুজী ছিলেন আধুনিক যন্ত্রশিল্পে ও উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় বিশ্বাসী। আধুনিক বিজ্ঞানের দোষ-ত্রুটি থাকলেও তার কল্যাণকর দিক্‌কে তিনি সাগ্রহে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিষয়ে গান্ধীজী ও নেহ্‌রুজীর মধ্যে পত্রবিনিময় হয়। একটি পত্রে গান্ধীজী লেখেন :

"আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি।...তাই আমি তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী বলেছি। যাই হ'ক, আমার উত্তরাধিকারীকে আমার

এবং আমাকে আমার উত্তরাধিকারীর বোঝা অবশ্যই প্রয়োজন। কেবল তা হ'লে আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারত এবং ভারতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব যদি প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে, তবে শীঘ্রই হ'ক কি দেরিতে হ'ক, এই বিষয়টি স্বীকার করতে হবে যে, জনসাধারণকে শহরে নয় গ্রামে, প্রাসাদে নয় কুটিরে বাস করতে হবে। কোটি কোটি মানুষ কখনও শহরে ও প্রাসাদে পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারে না। তাতে তাদের হিংসা ও অসত্য দুইকে আশ্রয় না ক'রে উপায় থাকবে না। আমার দৃঢ় ধারণা, অসত্য ও হিংসা ছাড়া মানুষের ধ্বংস আর কিছু নেই। আমরা সত্য ও অহিংসাকে কেবল গ্রামীণ জীবনের সারল্যেই বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি এবং এই সারল্য কেবল চরকা ও চরকা বলতে যা বোঝায় তার মধ্যেই মিলতে পারে। বিশ্ব যদি আজ ভুল পথে যায়, তাতে আমি ভীত হব না। ভারতও ঐ পথে যেতে পারে, এবং পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখাকে ঘিরে উন্মত্তের মতো নৃত্য করতে থাকে ও শেষে নিজেকে দগ্ধ করে, ভারতও তাই করবে। কিন্তু আমি যতোদিন বেঁচে থাকব, ততোদিন ভারতকে তথা বিশ্বকে এই শোচনীয় পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করাই আমার একান্ত কর্তব্য। আমি যা বলেছি, তার মূলকথা হ'লো মানুষকে তার প্রকৃত প্রয়োজন মিটিয়ে ও স্বয়ম্প্রচুর হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমাদের যদি এই সংযম না থাকে, তবে আমরা নিজেদের বাঁচাতে পারব না।···আমি আধুনিক বিজ্ঞানের অনুরাগী, আমি পুরাতনকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে দেখতে চাই, যে আধুনিক বিজ্ঞানকে নূতন সজ্জায় ও নূতন ঢংয়ে ঠিকমতো সজ্জিত ও পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। তুমি ভেবো না যে, আমি যে গ্রামীণ জীবনের কল্পনা করছি, তা আজকের গ্রামীণ জীবনের অনুরূপ। আমার স্বপ্নের গ্রাম আমার অন্তরেই আছে। যাই হ'ক, প্রত্যেক মানুষই নিজের স্বপ্নের জগতে বাস করে। আমার আদর্শ গ্রামে

যুধ্যমান মানুষরা বাস করবে। তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো আবিলতা ও অন্ধকারের মধ্যে বাস করবে না। নরনারীরা হবে স্বাধীন, তারা বিশ্বের যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধেই নিজ অধিকার রক্ষা করবে। মহামারী থাকবে না, কলেরা থাকবে না, বসন্ত থাকবে না; কেউ আলস্যে কাটাবে না, কেউ বিলাসব্যসনে মত্ত হবে না। প্রত্যেককেই দৈহিক শ্রম করতে হবে।...রেলপথ, ডাক-তার ব্যবস্থা প্রভৃতির কথাও কল্পনা করা যেতে পারে।......"

এই পত্রের উত্তরে নেহ্রুজী লিখলেন, "আমাদের সম্মুখে যে প্রশ্ন রয়েছে, তা সত্য বনাম অসত্য, বা অহিংসা বনাম হিংসা নয়। প্রত্যেককে ধ'রে নিতে হবে যে, আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য হবে প্রকৃত সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি এবং যে সমাজব্যবস্থা এইসব বিষয়ে উৎসাহ দেবে তাই হবে আমাদের লক্ষ্য। তাই সমগ্র প্রশ্ন হ'লো কিভাবে এইরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং কি কি এই সমাজে থাকবে। কেবল গ্রামই যে কেন সত্য ও অহিংসার মূর্তি নেবে, তা আমি বুঝতে পারছি না। সাধারণভাবে বলতে গেলে গ্রাম বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির দিক্ থেকে অনগ্রসর এবং কোনও অনগ্রসর পরিবেশে অগ্রগতি সম্ভব নয়। সংকীর্ণমনা লোকদেরই অসত্যপূর্ণ ও হিংসাপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।...যথেষ্ট খাদ্যবস্তু, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যা দেশের ও প্রত্যেকের জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজন, এইরকম কতকগুলি লক্ষ্য আমাদের লিপিবদ্ধ করতে হবে। এইসব লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে রেখে বিশেষভাবে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে কিভাবে দ্রুত এইসব লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারি। আবার আমার কাছে এ-ও অপরিহার্য মনে হচ্ছে যে, আধুনিক যানবাহনের উপায়সমূহ ও অন্যান্য বহু আধুনিক ব্যবস্থা আমাদের চালিয়ে যেতে এবং সেগুলির উন্নতিসাধন করতে হবে। সেগুলি না নিয়ে উপায়ান্তর নেই। তাই যদি হয়, তাহ'লে অনিবার্যভাবেই ভারী যন্ত্রশিল্পের একাংশ থাকছেই। তা বিশুদ্ধ

গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে কতোখানি সংগতিপূর্ণ হবে? ব্যক্তিগতভাবে আমি আশা করি যে, ভারী ও হালকা যন্ত্রশিল্পগুলিকে যথাসম্ভব বিকেন্দ্রিত করতে হবে এবং এখন বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশের ফলে তা সম্ভবপরও। যদি দুই ধরনের অর্থনীতি থাকে, তবে তাদের মধ্যে হয় সংগতি ঘটবে না একটি অন্যটিকে কবলিত করবে। এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক্ থেকে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষাব্যবস্থার কথাও বিবেচনা করতে হবে। তাই আমি মনে করি না যে, ভারত যদি প্রযুক্তিবিজ্ঞানের দিক্ থেকে উন্নত না হয়, তবে সে যথার্থ স্বাধীন হবে। আমি বর্তমানে সৈন্যবাহিনীর কথা ভাবছি না, ভাবছি বৈজ্ঞানিক উন্নতির কথা। প্রত্যেক বিভাগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি শক্তিশালী পটভূমি ছাড়া আমরা বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক দিক থেকে অগ্রসর হ'তে পারি না। বর্তমান বিশ্বে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতিসমূহের মধ্যে আত্মঘাতের প্রবণতা এমনই প্রচণ্ড যে, তা সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি করছে। আমাদের সমগ্র সমাজ কমবেশি এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তিভূমিকে অপসারিত ক'রে স্বাতন্ত্র্যের নয়, সহযোগিতার একটি ভিত্তিভূমি গড়ে তোলা চাই। তা-ই যদি স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় এবং সম্ভবপর দেখা যায়, তবে যে অর্থনীতি বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন, তার ওপর ভিত্তি ক'রে নয়, যাতে সহযোগিতা আছে তার উপর ভিত্তি ক'রেই এটি কার্যে পরিণত করবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন ভারত একপ্রকার শূন্যতার সৃষ্টি করবে; সে শূন্যতা অন্যান্যদের মধ্যে আত্মঘাতের প্রবণতাকে বৃদ্ধি করবে এবং সৃষ্টি করবে সংঘর্ষের। কোটি কোটি মানুষের জন্যে প্রাসাদের কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু এর কোনও কারণ নেই যে, কোটি কোটি মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ আধুনিক গৃহে বাস ক'রে সেখানে তাদের সংস্কৃতিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারবে না। আধুনিক অতিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত শহরগুলিতে

অনেক অনিষ্টকর বিষয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শোচনীয়। সম্ভবত আমরা এই ধরনের অতিবৃদ্ধিকে নিরুৎসাহ করব এবং সেই সঙ্গে গ্রামগুলি যাতে শহরের সংস্কৃতির কাছাকাছি আসতে পারে, সে বিষয়ে উৎসাহ দেব।...আপনি ঠিকই বলেছেন যে, পৃথিবী বা পৃথিবীর একটি বৃহৎ অংশ আত্মঘাতী হ'তে চলেছে। সভ্যতার মধ্যে যে অমঙ্গলের বীজ ছিল, তা অনিবার্যভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে হয়তো এমন হয়েছে।...কিভাবে এই অশুভ শক্তির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং কিভাবে বর্তমান ও অতীতের মধ্যে যা কল্যাণকর, তাকে রক্ষা করা যায়, সেটাই আমাদের সমস্যা।...”

এ বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আরও পত্রবিনিময় হ'লো, আলাপ-আলোচনাও হ'লো। শেষে গান্ধীজী বললেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা একই কথা দু'জনে বিভিন্ন ভাষায় বলছেন।

অক্টোবর মাসে কংগ্রেস আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে তাঁর ১২ দফা লক্ষ্য ঘোষণা করলো : (১) কংগ্রেস ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধা চায়; (২) কংগ্রেস সকল সম্প্রদায় ও ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের ঐক্য এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও শুভেচ্ছা কামনা করে; (৩) কংগ্রেস চায় সমগ্র জাতি তাদের নিজ নিজ ইচ্ছা ও প্রতিভা অনুসারে বিকাশ লাভ করবার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পাবে। (৪) কংগ্রেস চায় বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে থেকেই প্রত্যেকটি গোষ্ঠী ও অঞ্চল তাদের নিজ নিজ জীবনধারা ও সংস্কৃতিকে বিকশিত ক'রে তুলবে। (৫) কংগ্রেস চায় প্রদেশগুলিকে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে। (৬) কংগ্রেস চায়, যারা সমাজে সামাজিক উৎপীড়ন ও অবিচার ভোগ করছে, তাদের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভের পথে যেসব বাধা আছে, তা অপসারিত করা হবে। (৭) কংগ্রেস একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা চায়, যে রাষ্ট্রে সংবিধানের রক্ষাকবচের দ্বারা সংরক্ষিত মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ

প্রত্যেক নাগরিকই ভোগ করবে; (৮) কংগ্রেস একটি যুক্তরাষ্ট্র চায়, যে যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গগুলির প্রচুর পরিমাণে স্বয়ংশাসনের অধিকার থাকবে। (৯) কংগ্রেস ভারতের সর্বাধিক আশু ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, অর্থাৎ দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি ও জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়নের সমস্যা, সমাধানের জন্য চেষ্টা করবে। (১০) কংগ্রেস শিল্প ও কৃষির আধুনিকীকরণ এবং সম্পদের সকল উৎস, উৎপাদন ও বণ্টনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চায়, যাতে ভারত একটি সমবায়ী কমনওয়েল্‌থে পরিণত হ'তে পারে। (১১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস চায় স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি যুক্তরাষ্ট্র। (১২) কংগ্রেস সকল পরাধীন জাতির মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করবে, সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদের বিলোপের জন্যে সচেষ্ট থাকবে।

নভেম্বর মাসে দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের বিচার শুরু হ'লো। জওহরলাল বন্দী সৈনিকদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে ত্রিশ বৎসর পরে ব্যারিস্টারের পোশাক প'রে বিচারালয়ে উপস্থিত রইলেন। ভুলাভাই দেশাই বন্দী সৈনিকদের প্রধান কৌঁসুলি রূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনীর সৈনিকদের দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা বর্ণনা করলেন। বিচারকালে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের লক্ষ্য ও আদর্শ দেশপ্রেমের দ্বারাই উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে জাপানী ফ্যাসিবাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। ভুলাভাই বিচারালয়ে বললেন যে, বৃটিশ আনুগত্য পরিহার ক'রে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণের অধিকার সকল ভারতীয়েরই আছে। গান্ধীজী বড়লাটকে লিখলেন, "আমি বিচারটি আগাগোড়া—লক্ষ্য করছি। যদিও আমি বল-প্রয়োগের দ্বারা আত্মরক্ষার নীতিকে সমর্থন করি না, তবু সশস্ত্র ব্যক্তিরা যুদ্ধকালে যে শৌর্য ও দেশপ্রেম প্রকাশ করে, তার প্রতি কখনও অন্ধ থাকতে পারি না। যাদের বিচার হচ্ছে, ভারতবর্ষ

তাদের শ্রদ্ধা করে। এটা নিঃসন্দেহ যে, সরকারের হাতে অসীম শক্তি রয়েছে। তবে সেই শক্তিকে যদি ভারতের সার্বজনিক প্রতিবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়, তবে তা শক্তির অপব্যবহারই হবে।”

সারা ভারত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দী-সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হ'য়ে উঠলো। এই দাবিতে কংগ্রেসই নিলো প্রধান ভূমিকা। এই দাবি ভারতবর্ষ আদায় করলো। নেহ্রু সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, “এটা ছিল ভারতীয় জনগণের ইচ্ছা এবং ভারতে যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাদের ইচ্ছার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা। আর এই শক্তিপরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত জনগণের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়েছিল।”

গান্ধীজী তিনমাস পুনায় নেচার ক্লিনিকে থেকে তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করলেন। তিনি ২১শে নভেম্বর (১৯৪৫) পুনা থেকে সেবাগ্রামে ফিরে এলেন। এই সময়ে তিনি খাদি-ভাণ্ডার ও খাদি-নীতির নানা সংস্কার সাধন করেন। তিনি ১লা ডিসেম্বর কলকাতা এসে বাংলার গভর্নর মিঃ কেসির সঙ্গে দেখা করলেন। মিঃ কেসি গান্ধীজীকে বললেন যে, ভারতীয় রাজনীতিতে যে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে, তা গান্ধীজীই দূর করতে পারেন। গান্ধীজী বললেন, সরকার যদি ভারতীয়গণের প্রতি পরিপূর্ণ ন্যায়-নীতি অনুসরণ না করেন, তবে তাঁর পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব নয়। মিঃ কেসি তখন তাঁকে জানালেন যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে বৃটিশ সরকার সংকল্পবদ্ধ এবং ভারত শীঘ্রই স্বাধীনতা পাবে। গান্ধীজী বললেন, ভারতে যদি স্বাধীনতা আসে, তবে তার ছায়া আগেই পড়বে। কিন্তু সেরকম তিনি কিছুই দেখছেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজনৈতিকদের মুক্তিদানের প্রশ্ন। মিঃ কেসি বললেন, এ বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য করছেন।

গান্ধীজী সোদপুর আশ্রমে প্রার্থনা-সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন,

তিনি বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে বা আসন্ন নির্বাচনের প্রচার চালাতে আসেন নি। তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে এসেছেন তাদের সহানুভূতি জানাতে। তিনি বললেন, কারামুক্ত হয়েই তিনি বাংলাদেশে আসতে চেয়েছেন, কিন্তু অসুস্থতার জন্যে পারেন নি। তাছাড়া, সরকার তাঁর আসার ওপর কোনও বিধিনিষেধ প্রয়োগ করবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে আসতে পারেন নি। কারণ, তিনি বিধিনিষেধের কাছে মাথা নত করতেও যেমন চান না, তেমনি চান না বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐরকম কোনও নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে। গান্ধীজী ভাষণের উপসংহারে বললেন যে, ১৯১৪ সালে যখন তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন থেকেই বাংলা শিখতে চেষ্টা করছেন। তিনি কিছুটা শিখেছেন, কিন্তু শেখাটা নিয়মিত চালিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গালীদের অন্তরের কথা জানবার জন্যে ও তাঁর অন্তরের কথা বাঙ্গালীকে জানাবার জন্যে বাংলাভাষায় কথা বলতে পারা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও তিনি তা পারেন নি।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি বাংলার গভর্নর মিঃ কেসির সঙ্গে কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ করেন। এইভাবে বড়লাটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের পথ প্রস্তুত হয়ে ওঠে। বড়লাট কলকাতা এলে ১০ই ডিসেম্বর বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হ'লো। গান্ধীজী বড়লাটকে বললেন, ভারতীয় সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হ'লো ইংরেজদের উপলব্ধি করা যে ভারতের উপর তার অধিকার আঁকড়ে রাখার কোনও নৈতিক অধিকার তার নেই। ৭ই ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। গান্ধীজী কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে যে সামগ্রিক প্রস্তাবের খসড়াটি রচনা ক'রে দিলেন, তা-ই গৃহীত হ'লো। তাতে আবার

অহিংসাকেই একমাত্র আদর্শ ও সংগ্রামের হাতিয়ার ব'লে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হ'লো। ওয়ার্কিং কমিটি এই বৈঠকেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কমিউনিস্ট সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা-ভঙ্গের অভিযোগ এনে তাদের কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করলো এবং অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে কংগ্রেস সংগঠনগুলিকেও নির্দেশ দিলো।

১৮ই ডিসেম্বর গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকশেষে শান্তি-নিকেতনে গেলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে গুরুদেবের মৃত্যু হয়েছিল। গুরুদেবের আদর্শ পদে পদে অনুসরণ করবার জন্যে তিনি আশ্রম-বাসীদের উপদেশ দিলেন। ১৯শে ডিসেম্বর তিনি চার্লস্ এণ্ড্রুজের স্মৃতিরক্ষার্থে দীনবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। ২০শে ডিসেম্বর তিনি কলকাতা ফিরে এসে পুনরায় মিঃ কেসির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। সোদপুরে কংগ্রেস-কর্মীদের এক সভায় তাঁকে কেউ বন্দিমুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, বন্দীরা আগেই হ'ক পরেই হ'ক মুক্তি পাবেন। কিন্তু বন্দিমুক্তি নিয়ে এতো উদ্বেগের কারণ নেই। বন্দিশালাই আমাদের মুক্তিতোরণ নয় কি? সমস্ত পরাধীন ভারত কি একটি বন্দিশালা নয়?

২৪শে ডিসেম্বর গান্ধীজী সোদপুর থেকে মেদিনীপুরের মহিষাদল যাত্রা করলেন। আগস্ট-আন্দোলনে মহিষাদল স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছিল। এখানে শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত, শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া প্রভৃতির নেতৃত্বে একটি সমান্তরাল জাতীয় সরকার প্রায় দুবছর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাছাড়া, ওখানে ও মেদিনীপুরের অন্যান্য স্থানে পুলিস ও সৈন্যবাহিনী, ঘূর্ণিবাত্যা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ যে তাণ্ডব চালিয়েছিল, তা গান্ধীজীকে বিশেষভাবে মেদিনীপুরের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। পরদিন তিনি মহিষাদল পৌঁছলেন। পথে অগণিত মানুষ তাঁকে

প্রণাম জানালো। তিনি মহিষাদলে চারদিন রইলেন এবং প্রার্থনা-সভাগুলিতে পঞ্চাশ-ষাট হাজার নরনারীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

কংগ্রেস-কর্মীরা গান্ধীজীর কাছে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরলেন। আন্দোলনকালে যা ঘটেছিল, তার অনেকগুলিকে তিনি সমর্থন না করলেও জাতীয় সংকটকালে জনসাধারণ যে জড় ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে নি, তাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন। গান্ধীজী ৩০শে ডিসেম্বর কাঁথি রওনা হলেন। ২রা জানুয়ারি (১৯৪৬) কাঁথিতে মেদিনীপুরের প্রায় পাঁচ শত কংগ্রেস-কর্মীর এক সভায় মিলিত হলেন এবং কর্মীদের নানা প্রশ্নের জবাব দিলেন। এই সময়ে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন না যে, সুভাষচন্দ্র মৃত; তাঁর ধারণা যথাসময়ে সুভাষচন্দ্র আত্ম-প্রকাশ করবেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও দুঃসাহসের প্রশংসা করেন, কিন্তু তাঁর রীতিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিট্যাল' পড়েছেন। মার্কসের বিরাট শ্রম ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত-গুলিকে মানতে পারেন না। তিনি নিজে অহিংস-রীতির প্রবর্তক হওয়ায় হিংসাত্মক পদ্ধতিতেও বিশ্বাস করেন না। গান্ধীজী এখানে সংসদীয় কর্মসূচীকে গঠনমূলক কর্মসূচীকে কার্যকর করবার উপায় ব'লে বর্ণনা করেন। তিনি গঠনমূলক কার্য ছাড়া আইন-অমান্য বা অসহযোগ আন্দোলনও সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পারে না বলে জানান।

৩রা জানুয়ারি তিনি মেদিনীপুর থেকে সোদপুরে ফিরে এলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রায় পাঁচশত কর্মীর একটি সম্মেলনে তিনি এই গঠনমূলক কর্মসূচী সম্পর্কে ভাষণ দিলেন। এখানে তিনি কর্মীদের নানা প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং সমস্ত বিষয়গুলি দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন।

৯ই জানুয়ারি গান্ধীজী গৌহাটি পৌছলেন। তিনি সপ্তাহকাল আসামে ছিলেন। ঐ সময় তিনি জনসাধারণের কাছে গঠনমূলক

কর্মসূচীর অর্থ ও উপযোগিতার কথা ব্যাখ্যা ক'রে বলেন। তিনি খাদি সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেখান যে, প্রায় পঁচিশ লাখ টাকার মূলধনের দ্বারা সাড়ে পাঁচ কোটি টাকারও বেশি দেশের সাধারণ মানুষের পকেটে যাওয়ার ব্যবস্থা করা গেছে। ভারতবর্ষে তখনকার মূল্য অনুসারে প্রায় একশ কোটি টাকার কাপড় ব্যবহৃত হ'তো। গান্ধীজী বললেন, গঠনমূলক কর্মসূচী কার্যকর করলে ঐ সমগ্র টাকাটাই ভারতীয় জনসাধারণের পকেটে আসতে পারে।

গান্ধীজী আসাম থেকে মাদ্রাজ রওনা হলেন। পথে তিনি উড়িষ্যা হয়ে গেলেন। গান্ধীজী ২১শে জানুয়ারি মাদ্রাজে পৌঁছলেন এবং ২৪শে গঠনমূলক কর্মী-সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। সম্মেলনের কর্মসূচী ইংরেজীতে মুদ্রিত হওয়ায় গান্ধীজী বিরক্ত হলেন। বললেন, এটা তামিল বা হিন্দুস্থানীতে রচিত হওয়া উচিত ছিল। তিনি ভারতবাসীর উদ্দেশে বলেন যে, তাঁরা যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময়ে ইংরেজী ব্যবহার না করেন, তাঁরা যেন হয় মাতৃভাষায় বা রাষ্ট্রভাষায় অর্থাৎ হিন্দুস্থানীতে কথা বলেন। তিনি বলেন, কেবল গঠনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমেই স্বরাজ লাভ করা যেতে পারে। গঠনমূলক ও সংসদীয় উভয় কার্যসূচীই দেশের সম্মুখে রয়েছে; ও দুটির কোনটি অপরটির চেয়ে খাটো নয়। কিন্তু ভারত যদি অহিংসার মাধ্যমে স্বরাজ লাভ করতে চায়, তবে গঠনমূলক কার্যসূচী অপরিহার্য। ২৭শে জানুয়ারি তিনি হিন্দী-প্রচার-সভার রজত-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, আমার একমাত্র অনুরোধ আপনারা ইংরেজী একেবারে ভুলে যান। ইংরেজী আমাদের কোনও কাজে লাগে না। ইংরেজী শিখবার জন্যে আপনারা যে সময় ও শক্তির অপচয় করেন, তার সামান্য একাংশ যদি হিন্দুস্থানী শেখার জন্যে দেন, তবে হিন্দুস্থানী শেখার কোনও অসুবিধা থাকে না। তিনি হিন্দী প্রচার সভার নাম পরিবর্তন ক'রে হিন্দুস্থানী-প্রচার-সভা রাখতে বলেন। তিনি

বলেন, "যখন আমরা হিন্দী ও উর্দু শিখব, তখনই আমরা হিন্দুস্থানী শিখেছি বলতে পারব। হিন্দুস্থানের জন্যে, ভারতের স্বরাজের জন্যে এবং ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যে হিন্দুস্থানী শিখুন।" মাদ্রাজে থাকাকালে গান্ধীজী রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বারবার বলেন।

'২৯শে জানুয়ারি তারিখে গঠনমূলক কর্মী-সম্মেলনে গান্ধীজীকে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি অর্থনৈতিক সাম্য ও বিধিবদ্ধ ন্যাস (statutory trusteeship) সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন, তা ঠিক কি না? তার উত্তরে তিনি বলেন, তিনি যে অর্থনৈতিক সাম্যের ধারণা পোষণ করেন, তার অর্থ এই নয় যে, সকলে সমান পাবে। তার অর্থ হ'লো সকলে নিজের প্রয়োজনমতো পাবে। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ বললেন, তাঁর শীতকালে দুখানি শাল লাগে, আর তাঁর নাতী কানুর শাল না হ'লেও চলে। তাঁর ছাগলের দুধ ও কমলারস লাগে, কানু সাধারণ খাবারই খায়। এজন্যে কানুকে তাঁর ঈর্ষা হয়। কিন্তু ঈর্ষা ক'রে লাভ নেই। কারণ, কানু যুবক ও তিনি ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ। তাঁর খাদ্যের জন্যে কানুর খাদ্যের চেয়ে অনেক বেশি খরচ পড়ে। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা নেই।...সুতরাং অর্থনৈতিক সাম্যের প্রকৃত অর্থ হ'লো "প্রত্যেককে তার প্রয়োজনমতো দেওয়া" (To each according to his need)। একথা মার্কস্‌ও বলেছিলেন। একজন অবিবাহিত লোক যদি একজন বিবাহিত ও চারিটি সন্তানের পিতার সমান চায়, তবে তাতে অর্থনৈতিক সমতা থাকতে পারে না। সেই সঙ্গে তিনি বললেন, "উচ্চশ্রেণীর লোকদের ও সাধারণ মানুষের, রাজারাজড়ার ও নিঃস্ব ব্যক্তির মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তা ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করবার জন্যে কেউ যেন না বলেন যে উচ্চশ্রেণীর লোকদের বা রাজারাজড়াদের প্রয়োজন বেশী। তাতে কূটতর্কের অবতারণা ক'রে আমার বক্তব্যের হাস্যকর ভুল ব্যাখ্যা করা হবে।

বর্তমানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। গ্রামবাসীদের কেবল বিদেশী সরকার নয়, তার স্বদেশবাসীরাও, শহরবাসীরাও, শোষণ করছে। তারা খাদ্য উৎপাদন করে, অথচ তারা অনাহারে থাকে। এটা লজ্জাকর। প্রত্যেকেরই সুষম খাদ্যের, বাসোপযোগী গৃহের, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার এবং প্রত্যেকের চিকিৎসার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।" গান্ধীজী নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুর, যথা বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার যে নিষিদ্ধ করলেন, তা নয়। তিনি বললেন, দরিদ্রদের নিত্য-প্রয়োজন মেটাবার পরেই সেগুলি নেওয়া যেতে পারে। আগের কাজ আগে করতে হবে। এখন যাঁরা ধনসম্পদের মালিক আছেন, তাঁদের শ্রেণী-সংগ্রাম ও নিজেদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ধনসম্পদের ন্যাসরক্ষকে পরিণত হওয়ার মধ্যে বেছে নিতে হবে। তাঁদের ধনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ও বৃদ্ধি করবার পরিপূর্ণ সুযোগ থাকবে। তবে তা নিজের জন্যে নয়, সমগ্র জাতির জন্যে; সুতরাং তাতে শোষণের স্থান নেই।...যদি এ বিষয়ে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেন, তবেই তাঁদের সন্তানেরা উত্তরাধিকারসূত্রে ধনসম্পদ্ রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির অধিকার পাবে।"

তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বললেন, "ধরো, কাল ভারত স্বাধীনতা পেলো। তখন দেশের সব পুঁজিপতিই এই বিধিবদ্ধ ন্যাসরক্ষকে পরিণত হওয়ার সুযোগ পাবেন। কিন্তু এই বিধি বা বিধান (statute) উপর থেকে তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এটা আসবে নিচ থেকে। জনসাধারণ যখন এই ন্যাসরক্ষার অর্থ কি বুঝবেন এবং এজন্যে পরিবেশ প্রস্তুত হবে, তখন জনসাধারণ গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু ক'রে এই বিধান প্রবর্তিত করবেন। এ রকম জিনিস নিচ থেকে এলে গেলা যায়, কিন্তু উপর থেকে এলে জগদ্দল পাথরের মতো ভার মনে হয়।"

প্রশ্ন এলো: "আপনার এই অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার

কৌশলের সঙ্গে কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টদের কৌশলের পার্থক্য কি ?”

গান্ধীজী বললেন : “কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা বলে যে, এখনই তারা এই অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার জন্যে কিছু করতে পারে না। তারা এর সমর্থনে কেবল প্রচার চালিয়ে যাবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা ঘৃণার জন্ম দেবে ও তাকে তীব্র থেকে তীব্রতর ক’রে তুলবে। তারা বলে, যখন তারা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-অধিকার পাবে, তখন তারা জোর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে। আমার পরিকল্পনায় রাষ্ট্র থাকবে জনগণের ইচ্ছা কার্যকর করবার জন্যে ; রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে জনসাধারণের উপর জোর ক’রে চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে নয়। আমি অহিংসার মাধ্যমে জনসাধারণকে আমার সঙ্গে একমত ক’রে, ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রেমের শক্তিকে নিয়োজিত ক’রে, অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা করব। একথা বলাই বাহুল্য যে, আমি যদি পঞ্চাশখানা মোটর-গাড়ির, এমন কি বিশ বিঘা জমির মালিক হই, তবে আমি এই অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনাও করতে পারব না। সেজন্যে আমাকে নিজেকে দরিদ্রতম মানুষটির স্তরে নামিয়ে আনতে হবে। আমি গত পঞ্চাশ বছর বা তারও বেশি সময় ধ’রে তা-ই করতে চেয়েছি। সেইজন্যই আমি নিজেকে একজন সেরা কমিউনিস্ট (a Foremost Communist) বলি। ধনীরা আমাকে মোটর-গাড়ি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিলে আমি তা ব্যবহার করি, কিন্তু তাতে আমার উপর তাদের কোন অধিকার বর্তায় না ; জনসাধারণের স্বার্থে মুহূর্তের নোটিশে আমি তা ত্যাগ করতে পারি।”

বাংলাদেশ, আসাম ও মাদ্রাজে দুমাসব্যাপী সফর শেষ ক’রে গান্ধীজী সেবাগ্রামে ফিরে এলেন। তিনি বাংলা, আসাম ও মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের যে করাল ছায়া দেখে এসেছিলেন, তা তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত ও চিন্তিত করলো। ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে গান্ধীজী পুনরায়

'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে সাড়ে তিন বছর বাদে 'হরিজন' পত্রিকা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলো।

১৯শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি (ভারতীয় নৌবাহিনী) তাদের দাবিদাওয়া উত্থাপন করলো এবং কয়েকদিন বাদেই বিদ্রোহ করলো। বিদ্রোহদমনের জন্যে তাদের উপর গোলাগুলী বর্ষণ করা হ'লো। নৌবাহিনীতে এই বিদ্রোহ দ্রুত বিস্তার লাভ করলো এবং বোম্বাই, করাচী ও কলকাতায় হাঙ্গামা দেখা দিল। বহু স্থানে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ইউরোপীয়দের অপমান-লাঞ্ছনা করা হ'লো। গান্ধীজী এই ব্যাপারকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হঠকারিতার কাজ ব'লে নিন্দাসূচক বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন, কাউকে জোর ক'রে "জয় হিন্দ্" উচ্চারণ করানো স্বরাজের কবর খোঁড়ার সমান। ভারতীয়রা যদি তাদের চাকরির শর্তাবলীকে অপমানজনক মনে করে, তবে তারা চাকরি ছেড়ে দিতে পারে। অগ্নিকাণ্ড, লুঠতরাজ, ইউরোপীয়দের লাঞ্ছনা প্রভৃতির জন্যে অনেকে গুণ্ডাদের দায়ী করলে গান্ধীজী তার প্রতিবাদ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কারা এই গুণ্ডা। ইংরেজরা চলে গেলে কি এরা থাকবে না? গুণ্ডাদের ওপর দোষ চাপানোর অভ্যাস ছাড়তে হবে। হিংসাত্মক কাজের উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্যদের মিলনকে তিনি 'অপবিত্র' ব'লে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটা পারস্পরিক হিংসায় পরিণত হবে, হয়তো বা এটা তারই প্রস্তুতি; তা ভারত ও বিশ্বের পক্ষে ক্ষতিকর। অরুণা আসফ আলির মতো সোস্যালিস্ট নেতারা যখন বললেন যে, জনসাধারণ হিংসা ও অহিংসার নীতিবাক্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, তার উত্তরে গান্ধীজী বললেন, হিংসাত্মক পন্থার দিক্ থেকে এটা অবিবেচনার কাজ। অরুণা ঠিক বলেছে যে, যোদ্ধারা এবার লড়াইয়ের শক্তি দেখিয়েছে। কিন্তু এই লড়াইয়ের শক্তি নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত, অসময়োচিত ও আত্মঘাতী।

অরুণার একথা বলবার অধিকার আছে যে, জনসাধারণ হিংসা বা অহিংসা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু জনসাধারণের মাথা ঘামানো দরকার, হিংসা বা অহিংসার পথে তাদের স্বাধীনতা আসবে তা জানবার জন্যে।

সর্দার প্যাটেলের চেষ্টায় বিদ্রোহী নৌসেনারা আত্মসমর্পণ করলে গান্ধীজী সন্তোষ প্রকাশ করলেন। যাঁরা যে কোনও উপায়ে স্বাধীনতা লাভের কথা বল্লেন, তাঁদের উত্তরে গান্ধীজী বললেন, "ইতালির দিকে তাকাও। গ্যারিবল্‌ডি ছিলেন একজন মহাপুরুষ। তিনি ইতালির মুক্তি এনেছিলেন। মুসোলিনি আপাতঃদৃষ্টিতে ইতালিকে শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু ইতালি আজ কোথায়? জাপানের দিকে তাকাও, জার্মানির দিকে তাকাও। যে হিংসা তাদের শক্তির শীর্ষদেশে পৌঁছে দিয়েছিল, সেই হিংসাই তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। আণবিক বোমা কি সকলপ্রকার হিংসার ব্যর্থতা প্রমাণ ক'রে দেয় নি?...আমার দৃঢ় ধারণা হিংসার এই তাণ্ডবলীলার মধ্য থেকেই মানুষ অহিংসার শিক্ষা লাভ করবে।"

মার্চ মাসে বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলে গান্ধীজী বোম্বাই এলেন। ১৪ই মার্চ তারিখে শিবাজী পার্কে তিনি এক সুবিশাল জনতার সামনে সত্যাগ্রহের অর্থ ও কলাকৌশল সম্পর্কে ভাষণ দিলেন। ১৫ই মার্চ ওয়ার্কিং কমিটি দেশের সংকটজনক খাদ্য-পরিস্থিতি, বোম্বাই দিল্লী কলকাতা প্রভৃতি স্থানে হাঙ্গামা, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবগুলি 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত গান্ধীজীর মতামতের আলোকেই রচিত হয়। প্রস্তাবগুলি হিন্দুস্থানীতেই রচিত হয় ও সঙ্গে ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হয়। বোম্বাইয়ে গান্ধীজী পাঁচদিন ছিলেন। ঐ সময় বেশির ভাগ তিনি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ব্যস্ত থাকলেও তিনি দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্যে "স্বভাব চিকিৎসা-"র

প্রসারই সর্বোত্তম পন্থা, তা চিবেচনা ক'রে তাঁর স্বভাব চিকিৎসার কর্মকেন্দ্রকে পুনা থেকে একটি গ্রামে স্থানান্তরিত করবার সংকল্প করেন।

উরুলি নামে একটি গ্রামের অধিবাসীদের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁদের গ্রামেই স্বভাব-চিকিৎসার (Nature Cure) কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্যে অনুরোধ করেন। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকা সহ যথেষ্ট ভূমি দিতে চান। গান্ধীজী ২২শে মার্চ উরুলিতে আসেন এবং স্বভাব-চিকিৎসা কেন্দ্রটি স্থাপন করেন। পরদিন থেকেই রোগীরা আসতে শুরু করে। গান্ধীজী তাদের পরীক্ষা ক'রে দেখেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা দেন। রোগীর সংখ্যা তৃতীয় দিনে ৪৩ জনে দাঁড়ায়।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্ত সেনারা প্রায়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতো এবং তারা কিভাবে অহিংসা-যুদ্ধের সেনা হ'তে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ চাইতো। ঐ সময়ে নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র জীবিত আছেন কিনা সে সম্পর্কে সকলের মনে চিন্তা-ভাবনা দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজী ৩০শে মার্চ তারিখে হরিজন পত্রিকায় তাঁর মতামত প্রকাশ করেন:

"কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে, সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে। আমি সংবাদটি বিশ্বাস করেছিলাম। পরে সংবাদটি ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। সেই থেকে আমার কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর স্বরাজের স্বপ্ন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের ত্যাগ করতে পারেন না। আমি জানি নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি শত্রুর, এমন কি সারা বিশ্বের, চোখে ধুলো দেওয়ার শক্তি রাখেন। তা থেকেই আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছিল। তিনি যে জীবিত আছেন, তা বিশ্বাসের পেছনে এই কারণগুলিই ছিল।...কিন্তু অন্যপক্ষে এই ধারণার বিরুদ্ধে কতকগুলি শক্তিশালী সাক্ষ্য আছে। বৃটিশ সরকার একটি সাক্ষী। ক্যাপ্টেন

হবিবুর রহ্‌মান বলেছেন যে, নেতাজীর মৃত্যুকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি নেতাজীর পোড়া রিস্ট ওয়াচটিও এনেছেন। তাঁর আর একজন সঙ্গীর স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা ক'রে বলেছেন যে, আমার ধারণা ভুল এবং সুভাষচন্দ্র যে জীবিত আছেন এই ধারণা আমার ত্যাগ করা উচিত। এইসব সাক্ষ্য সামনে রেখে আমি প্রত্যেকের কাছে আবেদন করছি যে, আমি যা বলেছি, তা যেন তাঁরা ভুলে যান, এবং সাক্ষ্যগুলির কথা বিবেচনা ক'রে এই কঠিন সত্যকে স্বীকার ক'রে নেন যে, নেতাজী আমাদের ছেড়ে গেছেন।...”

৩১শে মার্চ গান্ধীজী পুণা থেকে বোম্বাই আসেন এবং ওয়ার্লিতে মেথরদের পল্লীতে গিয়ে থাকেন। এর বিরুদ্ধে একশ্রেণীর মেথর বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গান্ধীজী 'হরিজন'-পল্লীতে ছ ঘণ্টা ছিলেন। হরিজন-পল্লীতে তাঁর থাকবার সংকল্পের কারণ তিনি ৩১শে মার্চ 'হরিজন' পত্রিকায় বিশদভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: কিছুদিন যাবৎ আমি বলছি যে, আমাদের সকলকেই ভাঙ্গী বা হরিজন হ'তে হবে। কিন্তু এটা আমার দুর্ভাবনার কারণ হয়েছিল যে, আমি যা বলেছি তা করিনি। হয়তো ইচ্ছা অনুসারে পুরোপুরি কাজ করা সম্ভব নয়। তবে যথাসম্ভব করা উচিত। যখন এইভাবে আমার মনের মধ্যে একটা আলোড়ন চলছিল, তখন সংবাদ পেলাম গুজরাটে একটিমাত্র মন্দির ও একটিমাত্র কূপ হরিজনদের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; কারাদিতেও তাই। সংবাদ সত্যই হ'ক বা মিথ্যাই হ'ক, কিছু যায় আসে না। আসল ব্যাপারটি হ'লো এই সংবাদে আমার মনে একটি প্রতিক্রিয়া ঘটলো। রাগ করা পাগলামি। এই সংবাদে 'হরিজন'-পল্লীতে বাস করবার ইচ্ছাটা দ্রুত বৃদ্ধি পেলো।...”

গান্ধীজী ১লা এপ্রিল দিল্লীতে পৌঁছলেন। এখানেও তিনি ভাঙ্গী (মেথর)-পল্লীতে এসে রইলেন। তাঁকে কালো পতাকা

দেখানো হ'লো; বিক্ষোভকারীরা কংগ্রেসবিরোধী ধ্বনি দিলো এবং গান্ধীজীর কুটিরের উপর ইটপাটকেল ছুঁড়লো।

এই সময়ে বৃটেনের শ্রমিক সরকার ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করবার জন্যে বৃটিশ মন্ত্রিসভার একটি মিশন ভারতে পাঠিয়েছিলেন। এই ব্যাপারেই গান্ধীজী দিল্লীতে এসেছিলেন। এতে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকলেও তিনি আজাদ্ হিন্দ্ সৈনিকদের যাঁরা এখনো বিভিন্ন শিবিরে বন্দী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন। একটি প্রার্থনাসভায় তিনি তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন।

"কাল থেকে আমার মনে যেসব চিন্তা ক্রমাগত ভীড় করছে, তা তোমাদের বলি। ভারত মুক্তিপ্রাপ্ত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেনাদের রাজকীয় অভিনন্দন জানাচ্ছে। তাদের জাতীয় বীর ব'লে ঘোষণা করা হচ্ছে। জনসাধারণের এই ভাবপ্রবণতার জোয়ারের সামনে কেউ পা ঠিক রেখে দাঁড়াতে পারছেন না। তবে আমি অকপটে তোমাদের কাছে স্বীকার করব, আমি এই নির্বিচার বীরপূজার অংশীদার নই। আমি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এই সামর্থ্য, ত্যাগ ও দেশপ্রেমের প্রশংসা করি। কিন্তু যে পদ্ধতি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, যে পদ্ধতি দেশের স্বাধীনতালাভের জন্যে বিগত পঁচিশ বৎসর ধ'রে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, তাকে আমি সমর্থন করতে পারি না।...নেতাজী ছিলেন আমার পুত্রতুল্য। তাঁকে আমি পরলোকগত দেশবন্ধুর উদীয়মান সহকারীরূপে প্রথম জেনেছিলাম। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কাছে তাঁর শেষ বাণী ছিল এই যে, যতদিন বিদেশের ভূমিতে আছ ততদিন সশস্ত্রভাবে যুদ্ধ করবে এবং যখন ভারতে ফিরে যাবে, তখন কংগ্রেসের পরিচালনায় ও নেতৃত্বাধীনে অহিংস সৈনিকরূপে দেশসেবা করবে। যে বাণী আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বয়ে নিয়ে এসেছে, তা বিরোধ মীমাংসার জন্যে অস্ত্রগ্রহণের আবেদন

নয়—কারণ, দেখা গেছে, তা ক্রটিপূর্ণ—তা অহিংসা, ঐক্য, সংহতি ও সংগঠন অনুশীলনের বাণী। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তার আশু লক্ষ্যে ব্যর্থ হলেও, তারা এমন অনেক কাজ করেছে, যেজন্য তারা সহজেই গর্ববোধ করতে পারে। এগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'লো আজাদ হিন্দ্ ফৌজ একই পতাকাতলে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোককে ঐক্যবদ্ধ করেছে, তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক সংকীর্ণ মনোভাব দূর ক'রে এক দৃঢ়তা ও একতার মনোভাবকে সঞ্চারিত করেছে। আমাদের প্রত্যেকের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।...”

গান্ধীজী এই সময়ে ডাঃ জাকির হোসেনের জামিয়া মিলিয়া পরিদর্শন করেন। এখানে একজন ছাত্র তাঁকে প্রশ্ন করে যে, কিভাবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য আনা যায়? উত্তরে গান্ধীজী বলেন, “খুব সহজে। যদি সমস্ত হিন্দুই গুণ্ডা হয়ে যায় ও তোমাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, তবু তুমি তাদের ভাই না ভেবে পারো না। হিন্দুর ক্ষেত্রেও তাই। এটা কি অসম্ভব, আদৌ না; বরং বিপরীত। যা একজনের পক্ষে সম্ভব, তা সকলের পক্ষে সম্ভব। বর্তমানে সমগ্র আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজগুলি সকলপ্রকার উদ্ভট গুজব ছড়াচ্ছে এবং জনসাধারণ তা বিনা বিচারে গিলছে, ফলে আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে; হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই তাদের মানবিকতা ভুলেছে ও পশুর মতো পরস্পরের প্রতি আচরণ করছে।...”

সংবাদপত্রগুলির দায়িত্বহীন আচরণ সম্পর্কে তিনি একটি প্রার্থনা-সভাতেও বলেন।

“সাংবাদিকরা চলমান মহামারী হয়ে উঠেছেন। কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের কাছে একসঙ্গে বাইবেল, কোরান, জেন্দাভেস্তা ও গীতা হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজে যা বেরোয় তা ভগবদ্দত্ত সত্য ব'লে গৃহীত হয়। যেমন ধর, খবরের

কাগজে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলো, দাঙ্গা বাধবে, দিল্লীতে যতো লাঠিসোটা ছোরাছুরি ছিল সব বিক্রি হয়ে গেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলো। এটা খারাপ, আরেকটা কাগজে লিখলো, এখানে কি ওখানে দাঙ্গা হয়েছে, পুলিস কোথাও হিন্দুর, কোথাও বা মুসলমানের পক্ষ নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মাথার ঠিক রইলো না। আমি তোমাদের সবাইকে এই ধরনের লজ্জাহীন ভীরুতা ত্যাগ করতে বলি। যেসব নরনারী ভগবানে বিশ্বাস করেন এবং উপাসনায় যোগ দেন, তাঁদের এসব সাজে না। যদি দাঙ্গা সত্যিই বাধে এবং কিছু লোক মারা যায়, তাতে কি? সবাই তো একদিন মরবে। আমি আশা করি, তোমরা সেই লড়াইয়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে এবং হাঙ্গামাকারীদের বোঝাবে। সেদিন কথাপ্রসঙ্গে এক বন্ধু বলেছিলেন যে, গরীব হাঙ্গামাকারীরাই মারে ও মরে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দাঙ্গার জন্যে তারা দায়ী নয়, কিছুসংখ্যক শিক্ষিত লোক, তাদের অনেকে বেশ সম্মানযোগ্য পদেও আসীন, তারাই এজন্যে দায়ী। তারাই নেপথ্যে থেকে হিংসাত্মক কাজে উসকানি দেয়। তাই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদেরই প্রয়োজন হ'লে জীবন দিয়েও হাঙ্গামা রোধ করা উচিত। এমন কি একটি ছোট্ট মেয়েও গুণ্ডাদের কাছে গিয়ে তাদের বিরত হ'তে বলতে পারে। সম্ভবত তাতে তারা বিরত হবে। ধরে নেওয়া গেল, তারা বিরত হ'লো না, তারা মেয়েটিকে হত্যা করলো, তাতেও মেয়েটির মঙ্গলই হবে। সে তার এই পবিত্র আত্মবলির মধ্যেই বেঁচে থাকবে। যারা ভগবানে বিশ্বাস করে এবং নিজেদের পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করে, সর্বদা তাদের মঙ্গলই হয়। স্বাধীনতা আসছে। কিন্তু স্বাধীনতার বায়ুতে নিঃশ্বাস নেওয়ার শক্তি আমাদের ফুসফুসগুলি হারিয়েছে।"

ইংলণ্ড থেকে কেবিনেট মিশন এসে গিয়েছিল। এই মিশনে

বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন মন্ত্রী লর্ড পেথিক-লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ ও মিঃ অ্যালবার্ট আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে হাজির হয়েছিলেন অসংখ্য সাংবাদিক, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকেই। সাংবাদিকরা পৃথিবীর সর্বত্র নিজ নিজ দেশে খবর পাঠাচ্ছিলেন। কেবিনেট মিশন যেদিন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন, সেদিন সংবাদ পাঠানোর ব্যাপারে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। নানা সিদ্ধান্ত, নানা গুজব, নানা গালগল্পে দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রগুলির প্রথম পৃষ্ঠা ভরে উঠলো। কেবিনেট মিশন কোনও স্থির প্রস্তাব নিয়ে আসেন নি। তাই তাঁদের আলাপ-আলোচনাটা আপোসের সূত্র অন্বেষণেই চলছিল।

দিল্লী যেমন একদিকে রাজনৈতিক তৎপরতায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তেমনি কয়েকদিন যাবৎ দিল্লীর আকাশে একটি ত্রাসের কালোমেঘ দেখা দিয়েছিল—গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, শীঘ্রই দিল্লীতে ভয়ংকর একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধবে। গান্ধীজী তাই বারবার সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও ঐক্যের কথা বলছিলেন, হাঙ্গামা কিভাবে রোধ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে উৎসাহ ও পরামর্শ দিচ্ছিলেন এবং সংবাদপত্রগুলির দায়িত্বহীন কাজের নিন্দা করছিলেন।

কেবিনেট মিশনের সঙ্গে কি মর্মে আলাপ-আলোচনা চালানো হবে, তা স্থির করবার জন্যে দিল্লীতে ১২ই এপ্রিল থেকে ১৮ই এপ্রিল এবং পরে ২৫শে এপ্রিল থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসেছিল। আলাপ-আলোচনা শেষ না হওয়ায় আলাপ-আলোচনার পরবর্তী স্থান সিমলাতেই নির্ধারিত হ'লো।

২৯শে এপ্রিল গান্ধীজী "স্বাধীনতা" সম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখলেন : "স্বাধীনতা কি তা নির্দিষ্ট ক'রে বলবার জন্যে বন্ধুরা

আমাকে আহ্বান করেছেন। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েই আমি বলব, আমার স্বপ্নের স্বাধীনতা হ'লো রামরাজ্য, পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য। আমি জানি না স্বর্গে এটা কেমন হবে। আমি সেই সুদূর দৃশ্যের কথা জানতেও চাই না। যদি বর্তমানটা যথেষ্ট মনোরম হয়, তবে ভবিষ্যৎটা খুব বেশি অন্যরকম হ'তে পারে না। মোদ্দা কথায়, স্বাধীনতা হবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক। 'রাজনৈতিক' মানে বৃটিশ বাহিনীর যে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ অপসারিত হবে। 'অর্থনৈতিক' মানে বৃটিশ পুঁজিপতি ও পুঁজির, এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতি ও পুঁজির হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ। অন্য কথায়, সবচেয়ে যে ছোট, সে সবচেয়ে যে বড়, তার সঙ্গে নিজেকে সমান বোধ করবে। এটা হ'তে পারে যদি পুঁজিপতি বা পুঁজি দীনতম ও হীনতমের সঙ্গে তাঁদের নৈপুণ্য ও পুঁজিকে ভাগ করে নেন। 'নৈতিক' মানে সমস্ত প্রতিরক্ষা-বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি। আমার রামরাজ্যের ধারণায় বৃটিশ বাহিনীর স্থলে জাতীয় বাহিনীকে স্থাপন করবার স্থান নেই। যে দেশ এমন কি নিজের জাতীয় বাহিনীর দ্বারা শাসিত হয়, তা নৈতিক দিক থেকে কখনও স্বাধীন হ'তে পারে না। সুতরাং এর তথাকথিত দুর্বলতম সদস্যরা কখনই নৈতিক উচ্চতার পূর্ণতায় উপনীত হ'তে পারে না। যদি কেবিনেট মিশন আমাদের প্রাপ্য দেয় (delivers the goods) তবে ভারতকে স্থির করতে হবে যে, সে সামরিক শক্তি হওয়ার চেষ্টা ক'রে অন্ততঃ কয়েক বছর অতি নিম্নস্তরের একটি শক্তি হয়ে থাকবে এবং বিশ্বের কাছে তার বলবার কিছু থাকবে না কিংবা সে তার অহিংসার নীতিকে উন্নততর ক'রে এবং অনুসরণ ক'রে তার আয়াসলব্ধ স্বাধীনতাকে তথাকথিত জয় সত্ত্বেও বিশ্ব যে চাপে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে তা থেকে বিশ্বকে মুক্ত করবার জন্যে ব্যবহার ক'রে বিশ্বে প্রথম স্থানীয় একটি জাতি হওয়ার নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবে।"

সাতাশ

অগ্নিকাণ্ড ও অগ্নিপরীক্ষা

১৯৪৬ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আজাদ কেবিনেট মিশনের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য লর্ড পেথিক লরেন্সের কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন। তাতে বলা হ'লো যে, কেবিনেট মিশন ও বড়লাট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমানসংখ্যক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁদের কাছে একটি আলোচনার সূত্র রাখতে চান। সূত্রটি মোটামুটি এই: ভবিষ্যৎ ভারতের যে সংবিধান হবে তাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে; দুই শ্রেণীর প্রদেশ থাকবে—কতকগুলি হিন্দুপ্রধান ও কতকগুলি মুসলিমপ্রধান। প্রাদেশিক সরকারের হাতে যেসব ক্ষমতা থাকবে, সেগুলির ক্ষেত্রে প্রদেশের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে; দেশীয় রাজ্যগুলি আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 'যথাযোগ্য' স্থান পাবে।

এই পত্রের উত্তরে আজাদ লিখলেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী রাখতে হলে তার হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ছাড়াও অন্যান্য এমন অনেক বিষয় থাকা চাই যা ভারতের অগ্রগতির পথে অপরিহার্য। এ বিষয়ে তিনি কারেন্সি, শুল্ক, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ঐ ধরনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করলেন। হিন্দুপ্রধান ও মুসলিমপ্রধান, এই দুই শ্রেণীতে প্রদেশগুলিকে ভাগ করার অযৌক্তিকতার কথাও তুলে ধরলেন। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উপ-যুক্তরাষ্ট্র দেখা দিক তা তাঁরা চান না ব'লে সুস্পষ্টভাবেই জানালেন। দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে তিনি বললেন, তাদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে হবে এবং সরকারের হাতে যেসব ক্ষমতা থাকবে, সেগুলিকে তাদেরও মেনে

নিতে হবে। তিনি এইসব আপত্তি জানালেও যে কোন দল বা ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে রাজী হলেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও বললেন যে, বাইরের একটি শাসক শক্তি যতোদিন এখানে বিদ্যমান থাকবে, ততোদিন এই ধরনের আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগদানের জন্যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে আজাদ, নেহ্রু, খান আবদুল গফর খান ও সর্দার প্যাটেল ১লা মে তারিখে সিমলা রওনা হলেন। কেবিনেট মিশন ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অনুরোধে গান্ধীজীও সিমলা গেলেন। ৪ঠা মে গান্ধীজী তাঁর অনুচরবৃন্দকে সিমলা থেকে দিল্লী ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, আবার সিমলা-সম্মেলন ব্যর্থ হ'তে চলেছে। গান্ধীজী এইসব জনরব প্রচার সম্পর্কে সকলকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, "এই ধরনের জনরব প্রচার নিজেদের কাপুরুষতারই পরিচয়। ভারতবাসী তাদের নিজেদের যোগ্যতায় যা অর্জন করবে, তার চেয়ে এতোটুকুও বেশি কেবিনেট মিশন দিতে পারবে না। তাছাড়া গতবারের সিমলা-সম্মেলনের সঙ্গে এবারের সিমলা-সম্মেলনের পার্থক্য আছে। বৃটিশ ভারত ত্যাগ করবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েই কেবিনেট মিশন ভারতে এসেছে; সে কবে ভারত ত্যাগ করবে এবং ভারত ত্যাগ করার সময়ে সে কিভাবে কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই সিমলা-সম্মেলন হচ্ছে। ভারতবাসীকেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।"

শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান সিমলা-সম্মেলনে সত্যই হ'লো না। ১২ই মে সম্মেলন ভেঙে গেল এবং কেবিনেট মিশন, বড়লাট, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা দিল্লীতে ফিরে এলেন। গান্ধীজী আবার দিল্লীতে ভাঙ্গি পল্লীতে সানন্দে আশ্রয় নিলেন। এদিকে কেবিনেট মিশন এখন কি ঘোষণা করবে, তা নিয়ে সারা

দেশে জল্পনাকল্পনা শুরু হ'লো। ১৮ই তারিখে কেবিনেট মিশনের ঘোষণা প্রকাশিত হ'লো। এতে কতকগুলি সুপারিশ করা হ'লো। পাকিস্থানের দাবিকে অস্বীকার ক'রে সমস্ত বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হ'লো। ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান কি হবে তা বৃটিশ ভারতের ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সাংবিধানিক পরিষদই স্থির করবে। কেবিনেট মিশন সুপারিশ করলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ থাকবে এবং কেন্দ্র এইসব ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়নির্বাহের জন্যে অর্থসংগ্রহ করতে পারবে। কেন্দ্রে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি আইনসভা ও একটি শাসন-পরিষদ্ থাকবে। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতা পাবে। প্রদেশসমূহের দল (group) গঠনের অধিকার থাকবে। তবে এইসব সুপারিশ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কেবিনেট মিশন একথাও বললেন যে, তাঁরা এইসব সুপারিশের দ্বারা ভারতীয়রাই যাতে ভারতীয়দের জন্যে একটি সংবিধান রচনা করতে পারে, তারই পথ প্রশস্ত ক'রে দিতে চান। সেজন্যে তাঁরা দিল্লীতে যাতে অচিরে একটি সাংবিধানিক পরিষদ্ গঠিত হয়, সে বিষয়েও প্রস্তাব করলেন। সাংবিধানিক পরিষদ্ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসন-পরিষদ্ গঠনের প্রস্তাবও করা হ'লো। এ বিষয়ে বড়লাট আলাপ-আলোচনাও শুরু করলেন। সমর দপ্তরসহ সমস্ত দপ্তরের ভারই জনপ্রিয় ভারতীয় নেতাদের হাতে থাকবে, এ কথাও তিনি বললেন।

২০শে মে তারিখে গান্ধীজী এ সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি কেবিনেট মিশনের সততা ও সদিচ্ছার কথা উল্লেখ ক'রে সুপারিশগুলির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির উল্লেখ

করলেন। তিনি বললেন, "এতে আমাদেরই দুর্বলতা প্রতিফলিত হয়েছে। কংগ্রেস ও লীগের মতের মিল হয় নি, হ'তে পারে নি। এখনও যদি আমরা এই মতানৈক্য বৃটিশের সৃষ্টি ব'লে নির্বোধের মতো আত্মসন্তুষ্ট থাকি, তবে আমরা শোচনীয় ভুল করব। এই মতানৈক্যের সুযোগ নেওয়ার জন্যে মিশন সুদূর ইংলণ্ড থেকে ছুটে আসেন নি। তাঁরা এখানে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার সর্বাধিক সহজ ও সত্বর উপায় উদ্ভাবনের জন্যেই এসেছেন। যতক্ষণ না বিপরীত কিছু প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের তাঁদের ঘোষণা বিশ্বাস করবার মতো সাহস রাখতে হবে। প্রতারকের প্রতারণাই সাহসকে শক্তি যোগায়।..." গান্ধীজী সুপারিশগুলির মধ্যে গ্রুপ-ব্যবস্থার অযৌক্তিকতা বিশ্লেষণ ক'রে দেখালেন। তিনি 'হরিজনে' "গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিসমূহ" আলোচনা ক'রে দেখালেন যে, দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে বৃটিশ যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা (Paramountcy) ভোগ করে, তা অবসান ঘটাবার ব্যবস্থা করা হয় নি এবং তাতে নূতন সমস্যার উদ্ভব হবে। সুপারিশগুলি ঘোষণার আগেই অন্তর্বর্তী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত ছিল ব'লেও তিনি মন্তব্য করলেন। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বৃটিশ বাহিনী ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা ও ভারতকে বহিরাক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ভারতে থাকবে, তিনি এই ব্যবস্থারও সমালোচনা করলেন।

কেবিনেট মিশন ও বড়লাট কর্তৃক সুপারিশগুলি ঘোষণার পর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সেগুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা ক'রে দেখতে লাগলেন এবং গান্ধীজীকে এ বিষয়ে প্রায় সবসময় ব্যস্ত থাকতে হ'লো। গান্ধীজী পুনরায় শারীরিক দিক থেকে দুর্বল ও অবসন্ন বোধ করছিলেন। তাই তিনি কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় একটু ভাটা পড়ায় কিছুদিনের জন্যে মুসৌরিতে বিশ্রামের জন্যে গেলেন। কয়েকদিন মুসৌরিতে

বিশ্রামলাভের পর তিনি ৮ই জুন মধ্যরাত্রিতে মোটরে ক'রে দিল্লীতে ফিরে এলেন। ৯ই জুন আবার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। শেষ বৈঠকে তাঁরা জানিয়ে দিলেন যে, বৃটিশ সরকার কেন্দ্রে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা বলেছেন, তার পরিপূর্ণ চিত্রটি না পেলে তাঁরা কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবেন না।

১৬ই জুন ঘোষণা করা হ'লো যে, বড়লাট তাঁর মন্ত্রিপরিষদ্ গঠনের কাজে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য ১৪ জন বিশিষ্ট ভারতীয়কে আমন্ত্রণ করেছেন। গান্ধীজী মন্তব্য করলেন যে, "কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে মতৈক্য ঘটেনি, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু যা তাঁকে বিস্মিত করেছে, সেটি হ'লো এই যে, কোন না কোন রাজনৈতিক দলকে জাতীয় সরকার গঠনের জন্যে আমন্ত্রণের যে গণতান্ত্রিক রীতি রয়েছে, তা অনুসরণ না ক'রে কেবিনেট মিশন ও বড়লাট তাঁদের পছন্দসই একটি সরকারকে দেশের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন।..." তা সত্ত্বেও তিনি এই ঘোষণার উজ্জ্বল দিকটিতে সকলকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন। সেই সঙ্গে তিনি বললেন, "হয়তো এতে প্রকৃত উজ্জ্বল কোনও দিক নেই; সেক্ষেত্রে কেবিনেট মিশনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে।"

এই সময় ভারতে বাসকারী ইউরোপীয়রা সংবিধান-প্রণয়নে ও শাসন-ব্যবস্থায় নিজেদের অধিকার দাবি করলে ১৭ই জুন গান্ধীজী "ইউরোপীয়দের ভোটাধিকার" সম্পর্কে লিখলেন:

"ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতির মতো একজন ব্যক্তি সিংহের থাবা দেখিয়েছেন। সেটা মনে হচ্ছে নগ্ন সত্য। সত্যিকার কোন সাংবিধানিক সভা গঠিত হলে ইউরোপীয়রা যে ভোট দেবে না বা নির্বাচন-প্রার্থী হবেন না, এটা সুনিশ্চিত।...শাসকশ্রেণী যখন বলেন যে, বেসরকারী ইউরোপীয়দের উপর তাঁদের কোনও নিয়ন্ত্রণাধিকার নেই, তখন তা অর্থহীন। সরকারীর অস্তিত্ব

বেসরকারীর স্বার্থেই। বেসরকারী না থাকলে সরকারীর কোনও কাজ থাকবে না। বৃটিশ বাণিজ্যের পিছু পিছু-ই বৃটিশ যুদ্ধজাহাজগুলি এসেছিল। সমস্ত ভারত একটি শত্রু-অধিকৃত দেশ। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমাদের ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতির কার্যাবলীর বিচার করতে হবে। প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সভায় তাঁদের সম্প্রদায়কে ভোট দেওয়ার বা ভোট পাওয়ার কোনও বৈধ অধিকার সরকারী কাগজপত্রে দেওয়া হয়েছে কিনা, তা তিনি শক্তির মদমত্ততায় যাচাই ক'রে দেখবার মতো কষ্টটুকুও স্বীকার করেন নি মনে হয়। তাঁর এবং তাঁর নির্বাচকগণের জ্ঞাতার্থে আমি দিল্লীর বারের নেতার কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত নিয়েছি। সভাপতি মহাশয় কি অনুগ্রহ ক'রে মিশনকে জিজ্ঞাসা করেন নি যে তাঁর নৈতিক ও বৈধ অবস্থা কি? কিংবা তিনি মিশনকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, কারণ তিনিই প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি এবং কেবিনেট মিশন ও বড়লাট হলেন বৃটিশ লেবার পার্টির প্রতিনিধি, যে বৃটিশ লেবার পার্টি সাম্রাজ্যবাদকে পরিহার করতে চাইছে? কোন্ দিকে হাওয়া বইছে এই কুটোটি দেখলেই বোঝা যায়। ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের এই কাজটি মিশনের কাজের বাস্তবতা সম্পর্কে আমার বিশ্বাসকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে। কেবিনেট মিশন কি যথাসময়ের পূর্বেই এসেছেন? কামানরক্ষিত ভারতে বাসকারী ইউরোপীয়রা কি তাঁদের কামানগর্জন নীরব ক'রে তাঁদের সৌভাগ্য-সম্পদকে কেবল ভারতীয় জনসাধারণের শুভেচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি নেবেন? না, তাঁদের এই পুরুষেও ভারতীয়দের ওপর বৈদেশিক শাসন চাপিয়ে রাখার প্রত্যাশা করেন? তাঁরা কেমন ক'রে বলেন যে, তাঁরা আপোসহীন মনোভাব পোষণ করেন না? তাঁদের বিবৃতিগুলি আপোসহীনতায় পূর্ণ। তাঁরা বাংলায় ও আসামে সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার ঠুসে দিয়েছেন। আইন-সভাগুলিতে তাঁদের থাকবার কি অধিকার আছে? তাঁরা ঐ দুটি

আইনসভায় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে বাংলা ও আসামের জনসাধারণকে অসুবিধায় ফেলা ছাড়া আর কি করেছেন ?..."

কাশ্মীরে গণ-আন্দোলন চালাবার অভিযোগে শেখ আবদুল্লা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তাঁর বিচারকালে তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে নেহ্‌রু কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। নেহ্‌রুজী কাশ্মীর সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হলেন। গান্ধীজী নেহ্‌রুজীর গ্রেপ্তার সম্পর্কে বললেন যে, নেহ্‌রুজী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং নির্বাচিত ভাবী প্রেসিডেণ্ট। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদস্যগণের তালিকাতেই নেহ্‌রুর নাম রয়েছে। সুতরাং দিল্লীতে তাঁর উপস্থিতি যে কোনও মুহূর্তে প্রয়োজন হ'তে পারে। তাঁর অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তাই কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আজাদ নেহ্‌রুজীকে অবিলম্বে ফিরে আসবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন এবং এবিষয়ে বড়লাটকে দ্রুত ব্যবস্থা করতেও অনুরোধ জানিয়েছেন।

এদিকে সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও গান্ধীজী সম্পর্কে নানাপ্রকার জনরব প্রচার করতে লাগলো। এমনকি গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিরোধের কথাও তারা বলতে লাগলো। গান্ধীজী সংবাদপত্রগুলিকে সংযত হ'তে এবং মিথ্যা প্রচার থেকে নিবৃত্ত হ'তে অনুরোধ করলেন এবং জানালেন যে, একথা সত্য যে তিনি কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে পূর্বে যে বিশ্বাস ও প্রত্যাশা পোষণ করতেন, এখন তা করতে পারছেন না। ক্রমেই তাঁর মনে সংশয় ও আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠছে। কি সংশয়, কি আতঙ্ক, তা এখনও তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন না; তাই তিনি ওয়ার্কিং কমিটিকে নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। ওয়ার্কিং কমিটিও কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে সন্তুষ্ট বা সংশয়হীন ছিল না। কারণ কংগ্রেস সুদীর্ঘকাল যে গণ-

তান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে এসেছে, কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবে তা বহুলপরিমাণে ব্যর্থ হ'তে চলেছে। কেবিনেট মিশন যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে প্রদেশগুলিকে 'ক' 'খ' ও 'গ' শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে; ৩৮৯ জন সদস্য নিয়ে যে সাংবিধানিক সভা গঠিত হবে, তাতে ৯৩ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকবেন। সাংবিধানিক সভার প্রাথমিক সম্মেলন হওয়ার পর প্রদেশসমূহের বিভিন্ন দল বা গ্রুপ পৃথক পৃথক ভাবে অধিবেশনে মিলিত হবে এবং তাদের প্রাদেশিক ও গ্রুপ সংবিধানগুলি রচনা করবে। তারপর আবার সকল প্রতিনিধি মিলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচনা করবেন। এইসব প্রতিনিধি প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। গ্রুপগুলিকে দশবৎসর পরে প্রয়োজন মনে করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তাতে বস্তুতঃ ভবিষ্যতে পাকিস্থানকেই মেনে নেওয়া হয়েছিল।• সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তে এই প্রস্তাবকে গান্ধীজী বা কংগ্রেস কারও পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তার ওপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সমস্ত মুসলিম সদস্যকে মনোনয়নের অধিকার মুসলিম লীগ দাবি করায় সমস্যাকে আরও জটিল ক'রে তুলেছিল।

যে দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল সত্যাগ্রহের জন্মভূমি ও গান্ধীজীর প্রথম জীবনের সাধনপীঠ, সেখান থেকে বর্ণবিদ্বেষের সংবাদ ক্রমাগত আসছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন সরকার অশ্বেতাঙ্গদের পৃথকীকরণ আইন পাস করেছিল। অশ্বেতাঙ্গরা এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেছিল। সরকার সত্যাগ্রহীদের বাধা দেয় নি; কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা দলবদ্ধভাবে সত্যাগ্রহীদের আক্রমণ করছিল এবং আইন-শৃঙ্খলাকে নিজেদের হাতে নিয়েছিল। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের এই হৃদয়হীন নিষ্ক্রিয়তা ও শ্বেতাঙ্গদের এই দলবদ্ধ বর্বরতার তীব্র নিন্দা ক'রে ২৬শে জুন "শ্বেতাঙ্গদের দায়িত্ব"

(White Man's Burden) লিখলেন। ঐদিন তিনি ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়ায় গণ-আন্দোলনের সমর্থনেও মতামত প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন:

"সংবাদপত্রের খবরগুলি থেকে জানা যায়, ডাঃ লোহিয়া গোয়াবাসীদের আমন্ত্রণ পেয়ে গোয়ায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ ক'রে তাঁর ওপর একটি আদেশ জারী করা হয়েছিল। ডাঃ লোহিয়ার বিবৃতি অনুসারে, ১৮৮ বছর ধরে গোয়ার জনসাধারণকে সভা-সমিতি করবার ও সংগঠন গ'ড়ে তুলবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। স্বভাবতঃ তিনি ঐ আদেশ অমান্য করেছেন। এর দ্বারা তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শ ও বিশেষতঃ গোয়াবাসীদের সেবা করেছেন। বৃটিশ সরকারের দয়ায় যে ক্ষুদ্র পর্তুগীজ উপনিবেশটি টিকে আছে, তার পক্ষে বৃটিশের অসৌজন্যমূলক আচরণের অনুকরণ সাজে না। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন রাষ্ট্রের আইনসমূহের বিরুদ্ধে গোয়ার পৃথক অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একটি গুলী না ছুঁড়েও গোয়াবাসীরা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দাবি করতে ও পেতে সমর্থ হবে। বর্তমান পর্তুগীজ সরকার গোয়াবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের পৃথক ও পদানত রাখবার জন্যে আর বৃটিশ অস্ত্রের উপরা নির্ভর করতে পারবেন না। আমি গোয়ার পর্তুগীজ সরকারকে পরামর্শ দেব যে, তাঁরা যেন তাঁদের ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে সম্পন্ন কোনও চুক্তির উপর নির্ভর না ক'রে কালের নির্দেশ পাঠ করেন এবং গোয়ার জনসাধারণের সঙ্গে সম্মানজনক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। আমি গোয়াবাসীদের বলব, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা যেমন শক্তিশালী বৃটিশ সরকারের ভয় ত্যাগ করেছেন, তেমনি গোয়াবাসীরাও যেন পর্তুগীজ সরকারের ভয় ত্যাগ করেন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তার সমস্ত অধিকারই তাঁরা দাবি করেন। গোয়ার অধিবাসীদের মধ্যে যে ধর্মীয় বিভেদ আছে, তা তাদের সকলের ব্যক্তি-স্বাধীনতা লাভের পক্ষে কোনও

অন্তরায় হবে না। প্রত্যেক নরনারীর বাঁচবার জন্যেই ধর্ম। তা কখনও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের বিষয় হ'তে পারে না।"

২৮শে জুন তারিখে গান্ধীজী দিল্লী ত্যাগ ক'রে পুনা রওনা হলেন। ২৯শে জুন শেষ রাত্রিতে গান্ধীজী যে ট্রেনে পুনা যাচ্ছিলেন, সেটি হঠাৎ লাইনচ্যুত হ'লো। লাইনের উপর কেউ বা কারা ঐ দুরভিসন্ধি নিয়েই পাথর রাশি ক'রে রেখে দিয়েছিল। পাথরে আঘাত পেয়েই ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়; ট্রেনের ইঞ্জিন ও তার পেছনের কামরা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ইঞ্জিনচালক ট্রেনটিকে .দ্রুত না থামালে সমস্ত গাড়িখানিই ভেঙে চুরমার হ'তো ও সব যাত্রীই মারা পড়তো। দুর্ঘটনার পরে ট্রেনখানির দুমড়ানো মোচড়ানো কামরাগুলিকে পৃথক করবার জন্যে প্রায় দুঘণ্টা ধরে হাতুড়ি পেটা চলতে থাকে। কিন্তু তাতেও গান্ধীজীর ঘুম ভাঙে না। তিনি নিরাপদেই তাঁর কামরায় ঘুমাতে থাকেন। পরদিন তাঁকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বিস্মিত হন এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলেন। পরদিন পুনার প্রার্থনা-সভায় তিনি এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলেন, এই নিয়ে তিনি জীবনে সাতবার প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। তিনি বললেন, "মানুষের সমগ্র অস্তিত্বই হ'লো জীবন ও মৃত্যুর শক্তির মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব। তা সত্ত্বেও, সাম্প্রতিকতম এই দুর্ঘটনা আমার ১২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশাকে দৃঢ়তর করেছে।"

গান্ধীজী ৫ই জুলাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্যে বোম্বাই গেলেন। ৬ই ও ৭ই জুলাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'লো। অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি মওলানা আজাদ তাঁর সভাপতিত্বের ছয় বৎসর কালের ঘটনাবলীর বিবরণ ও সেগুলির আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। জহওরলাল নেহ্‌রু কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করলেন। ১৬ই মে ও ১৬ই জুন বৃটিশ সরকারের

পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, এবং কংগ্রেসের সভাপতি ও কেবিনেট মিশন ও বড়লাটের মধ্যে যে পত্রালাপ চলেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তা অনুমোদনের জন্যে উত্থাপিত হ'লো। সোস্যালিস্টরা গান্ধীজীর প্রার্থনাসভার মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত ক'রে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে গান্ধীজী প্রস্তাবটির সমর্থনে একটি বিবৃতি দিলেন। ৭ই জুলাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ২০৪-৫১ ভোটে প্রস্তাবটি অনুমোদন লাভ করলো।

গান্ধীজী বোম্বাইয়েও ভাঙ্গি-পল্লীতে ছিলেন এবং তাঁর গৃহে দিনরাত্রি পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তা দেখে তিনি লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করলেন এবং প্রতিবাদ জানালেন। তিনমাস অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি পুনরায় বিশ্রামের জন্যে ১৩ই জুলাই পাঁচগনি পৌঁছলেন। প্রতিদিন তাঁর কাছে ডাকে যে রাশি রাশি পত্র আসতো, কয়েকদিন ডাকঘরে ধর্মঘট হওয়ায় তিনি সাময়িকভাবে তার হাত থেকে নিস্কৃতি পেলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁর সঙ্গে বহু গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট অতিথি দেখা করতে এলেন ও নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। এই সময়ে বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক লুই ফিশার তাঁর সঙ্গে পর পর দুদিনে তিনবার সাক্ষাৎ করেন।

গান্ধীজী পাঁচগনিতে দু সপ্তাহ ছিলেন। সেখান থেকে তিনি পুনা গেলেন। পুনায় তিনদিন রইলেন। ঐ তিনদিনে তিনি দাক্ষিণাত্যের দেশীয় রাজাদের সম্মেলন এবং কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলির শিল্প ও শিক্ষা-মন্ত্রীদের সম্মেলনে ব্যস্ত থাকেন। গান্ধীজী পুনা থেকে উরুলি-কাঞ্চনে যান। গান্ধীজী উরুলিতে চারদিন থাকার পর ৬ই আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্যে সেবাগ্রামে আসেন। ঐ সময়ে মুসলিম লীগ ১৬ই আগস্ট তারিখে পাকিস্থানের দাবিতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবস' পালনের

সংকল্প ঘোষণা করে। ৮ই আগস্ট তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে বলা হয় যে, মুসলীম লীগ তাদের সাংবিধানিক সভায় অংশগ্রহণের পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখিত। বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কংগ্রেস তা গ্রহণ করেছিল। নেহরুজী কংগ্রেসের সভাপতিরূপে জিন্নাকে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দিলেন। জিন্না তাতে সম্মত হলেন না।

১৬ই আগস্ট তারিখে মুসলিম লীগ তাদের ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করলো। দাঙ্গা বাধলো। ঐদিন কলকাতায় প্রায় একশত লোক নিহত ও একহাজার লোক আহত হলো। বহু দোকানপাট লুণ্ঠিত হ'লো, বহু গৃহ ভস্মীভূত হ'লো। কলকাতায় ১৬ই থেকে ১৯শে আগস্ট পর্যন্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা চললো। উভয় সম্প্রদায়ের শত শত মানুষ প্রাণ হারালো বা ভয়ংকরভাবে আহত হ'লো; শত শত গৃহ ভস্মীভূত হ'লো, অসংখ্য দোকানপাট লুণ্ঠিত হ'লো; যানবাহন চলাচল বন্ধ হ'লো; সারা শহরে এক অভূতপূর্ব আতঙ্ক নেমে এলো। দাঙ্গাহাঙ্গামা দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়লো। গান্ধীজী একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখলেন:

"যদি সংবাদপত্রসমূহের সংবাদ বিশ্বাস করতে হয়, তবে সিন্ধুর দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা ও অন্যান্য স্থানে সমান দায়িত্বশীল লীগ মন্ত্রীরা সর্বত্রই নগ্ন ভাষায় হিংসার প্রচার করছেন। কাপট্যের তুলনায় নগ্নতা ভালো। কিন্তু সেই নগ্নতা যখন অশ্লীলতা হয়, তখন তা অপরাধরূপে পরিত্যাজ্য, তা লীগপন্থীর ক্ষেত্রেই হ'ক, বা অন্য কারো ক্ষেত্রে হ'ক। একজন বলছে, যে মুসলীম লীগের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে বিশ্বাসঘাতক; অন্য একজন বলছে, হিন্দুরা কাফের, তাদের ভাগ্যে এইরকম হওয়াই উচিত। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কি এবং তা কিভাবে করতে হয়, কলকাতা তার চাক্ষুষ পরিচয় দিয়েছে।

এতে কার লাভ হ'লো? নিশ্চয় মুসমমান জনসাধারণের নয়; নিশ্চয় কোনও প্রকৃতিস্থ ইসলামে বিশ্বাসীর নয়, কারণ ইসলাম শান্তি ও প্রকৃতিস্থতার শিক্ষাই দেয়। নমস্কার জানাতে যে 'সালাম আলাইকুম' বলা হয় তার অর্থই হ'লো 'আপনার শান্তি হ'ক'। জীবনে হিংসার হয়তো স্থান আছে; কিন্তু সংবাদপত্রের সংবাদকে সত্য ব'লে ধরে নিলে আমরা কলকাতায় যা দেখেছি সে হিংসার স্থান নেই। যে ধরনের পাকিস্থানই হ'ক না কেন, তার সম্ভাবনায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কলকাতায় যা দেখানো হয়েছে তা বুদ্ধিপ্রসূত হিংসার দৃষ্টান্ত নয়। এই বুদ্ধিহীন হিংসা বৃটিশ বা বৈদেশিক শাসনের মেয়াদই বৃদ্ধি করতে পারে। আমার বিশ্বাস, সরকারী নথির রচয়িতারা শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয়দের প্রতিনিধিদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু আপনাদের যদি বৃটিশের বন্দুক ও সঙ্গীনের প্রয়োজন হয়, তবে বৃটিশ যদিও বা চলে যায়, অন্য কোনও বিদেশী শক্তি তাদের স্থান নেবে।...সম্প্রতি কলকাতা কুখ্যাতি অর্জন করেছে। বিগত কয়েক মাসে এখানে বহু উন্মত্ত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। এই কুখ্যাতি যদি আরও কিছুদিন চলতে থাকে, তবে কলকাতা আর প্রাসাদময়ী মহানগরী থাকবে না, হয়ে উঠবে মৃত্যুপুরী। আশা করি, কলকাতার এই হিংসার জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং তা অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়বে না। অবশ্য, তা মুসলিম লীগের নেতাদের উপর নির্ভর করে; কিন্তু তাই ব'লে অন্যান্যরাও দায়িত্বমুক্ত থাকবে না। তাঁরা প্রতিশোধ নিতেও পারেন, না-ও নিতে পারেন। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে না নেওয়াই সহজ ও সরল। প্রতিশোধ গ্রহণ জটিল....।"

২৪শে আগস্ট গান্ধীজী সেবাগ্রাম ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন। যাত্রাকালে তিনি বললেন: "যেদিন কোচরাবে প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন আমাদের সম্মুখে কিছু কিছু আদর্শ ছিল। আজও সেই আদর্শগুলি আমাদের সামনে আছে। আজ দেশে যে

অগ্নিকাণ্ড চলছে, তার মুখোমুখি এইসব আদর্শ অনুসারে আমাদের কর্তব্য কি? আজ আমাদের দীনভাবে স্বীকার করতে হবে যে, জনসাধারণ আমাদের কাছে যা প্রত্যাশা করেন, তার সবকিছু মেটাবার শক্তি আমাদের নেই, কিন্তু আমরা সর্বান্তঃকরণে সেজন্যে চেষ্টা করছি। আমরা যদি যেসব নীতি সমর্থন করি, সেগুলির তাৎপর্যাদি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি, তবে আমরা ঐ অগ্নিশিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব ও আত্মবলি দেব এবং তার দ্বারা ঐ অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করতে পারব।"

২৪শে আগস্ট তারিখে পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বে জাতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হ'লো। বড়লাট তাঁর বেতার ভাষণে মুসলিম লীগকে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা ক'রে জাতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানালেন এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে বললেন। পরদিন নবনিযুক্ত অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য স্যার শাকাত আহ্মেদ খাঁ মুসলিম যুবকদের হস্তে ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন। ২৭শে থেকে ৩০শে আগস্ট পর্যন্ত দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। তাতে মুসলিম লীগ-ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও তার পরিণতিরূপে সংঘটিত দাঙ্গাহাঙ্গামার নিন্দা করা হ'লো এবং সকল সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি গ'ড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানানো হ'লো। অন্যপক্ষে লীগ-নেতা গজনফর আলি খাঁ দিল্লীতে একটি জনসভায় ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য হ'লো নেহ্রু সরকারকে ইতিহাস-খ্যাত আধ-দিনের বাদশাহিতে পরিণত করা। এই সভায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারগঠনের নিন্দা ক'রে প্রস্তাব গৃহীত হ'লো এবং মুসলমানরা তাদের রক্ত দিয়েও এইরকম সরকারের প্রতিরোধ করবে বলে বৃটনকে সতর্ক ক'রে দিল।

২রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৬) নেহ্রু ও তাঁর সহকর্মীরা অন্তর্বর্তী-কালীন সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। গান্ধীজী শেষ-

রাত্রিতে উঠে নেহ্রুজীর জন্যে এই নূতন সরকারের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে একটি ছোট নোট লিখে রাখলেন। নেহ্রুজী ও তাঁর সহকর্মীরা গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিতে এলে তিনি ঐ নোটটি তাঁদের দিলেন। ঐদিন ছিল সোমবার—গান্ধীজীর মৌনের দিন। ঐ নোটে লেখা ছিল—"...লবণ-কর বাতিল কর। ডাণ্ডি অভিযানের কথা স্মরণ কর। হিন্দু ও মুসলমানের মিলন ঘটাও। অস্পৃশ্যতা দূর কর। খাদি গ্রহণ কর।"

২৬ সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন। পরদিন গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে তাঁর কি কি আলাপ হয়েছিল তা সংক্ষেপে লিখে বড়লাটকে একটি পত্রে জানালেন। তাতে তিনি লিখলেন :

"কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্যে আপনি যে চেষ্টা করেছেন, তার ফলাফল আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে জানিয়েছেন। আমাদের আলোচনাপ্রসঙ্গে আপনি আমাকে বলেছেন যে, লীগের প্রতি আপনার কিছুটা ঝোঁক আছে। আপনার মতে, দুই পক্ষের মধ্যে মাত্র একটি বিষয়ে মতানৈক্য আছে, সেটা হ'লো, কংগ্রেসের নির্দিষ্ট অংশ থেকে মুসলিম লীগ বহির্ভূত মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। আপনি কংগ্রেসের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন, কিন্তু আপনি মনে করেন যে, কংগ্রেস যদি শান্তির খাতিরে তার এই অধিকার ত্যাগ করে, তবে তা তার পক্ষে রাজনীতিজ্ঞসুলভ কাজ হবে। আমি আপনাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, এটি যদি অধিকারত্যাগের প্রশ্ন হ'তো, তবে ব্যাপারটি সরল ছিল। কিন্তু এটা হ'লো লীগ-বহির্ভূত মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের যে কর্তব্য আছে, তা পালন না করবার প্রশ্ন। আপনার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে একমত যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি কোনদিন খোলা মনে পরস্পর মিলিত হয়,

তবে সেদিন একটি স্মরণীয় দিন হবে ; আর যদি তারা পরস্পরের সঙ্গে কেবল কলহের জন্যে মিলিত হয়, তবে তা অনাবশ্যকের চেয়েও মন্দ হবে। তাছাড়া এ বিষয়ে আমি জোর দিয়েছিলাম যে, কায়েদ-ই-আজমের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা ক'রে একটা বোঝাপাড়ায় আসার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য, যদি সর্বাধিক মন্দটাই ঘটে এবং মুসলিম লীগের সাংবিধানিক সভা বর্জন চলতে থাকে এবং বৃটিশ সরকার সাংবিধানিক সভা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গতই বলব। যদিও প্রধান প্রধান দলগুলির সার্থক বর্জন সত্ত্বেও কেবিনেট মিশন সাংবিধানিক সভা চালিয়ে যাবেন এই রকম একটা ধারণা সৃষ্টি করলেও তাঁরা তা করবেন বা করতে পারবেন ব'লে আমি মনে করি না। তারপর আপনি একথাও বলেছিলেন যে, পক্ষ এখন দুটি নয়, তিনটি। দেশীয় রাজ্যগুলিও একটি পক্ষ। আপনি বলছিলেন যে, যদি বর্জন চলতে থাকে, তবে দেশীয় রাজ্যগুলি যোগ দেবে কিনা সে বিষয়ে আপনার গভীর সংশয় আছে। এই মতামত আমার একলার হ'তেও পারে, তবু আমি বলেছিলাম যে, দুইটি পক্ষের একটি পক্ষ যদি সহযোগিতা প্রত্যাহার ক'রে নেয়, তবে কার্যকর কোন সংবিধান রচিত হ'তে পারে, এ আমি কল্পনা করি না। তখন আপনি আমাকে সাংবিধানিক সভা বন্ধের যুক্তিসঙ্গত উপসংহারের কথা চিন্তা করতে বলেছিলেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কি হবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম যে, যাই ঘটুক না কেন, জাতীয় সরকার একবার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তাঁরা যতক্ষণ না চালিয়ে যেতে নিজেদের অযোগ্য বা অক্ষম মনে করছেন, ততক্ষণ চলতেই থাকবে। আমি আরও বললাম যে, কংগ্রেস যে তার সেরা লোকদের পাঠিয়েছে, এর মধ্যে দলের জন্য ক্ষমতা দখল করার মনোভাব নেই, আছে নিঃস্বার্থভাবে সমস্ত জাতির সেবা করা। তাঁরা আপনার ও মুসলিম লীগের প্রতি এতই

সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন যে, যাতে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী-কালীন সরকারে যোগ দেয়, সেজন্যে তাঁরা দুটি মুসলিম আসন শূন্য রেখেছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চালু রাখা সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে আপনি সংশয় পোষণ করেন এবং যাই হ'ক আপনি বৃটিশরাজের ভৃত্য মাত্র এবং আপনি বৃটিশ সরকারের আদেশ পালন করতে বাধ্য। আমি আপনার যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করলেও আমি বলেছিলাম যে, কেন্দ্রে একটি প্রকৃত জাতীয় সরকার একান্ত প্রয়োজন; এবং তা থেকে কোনপ্রকার বিচ্যুতি ভারতীয় জন-সাধারণের চক্ষে বৃটিশ জনসাধারণকে সন্দেহভাজন ক'রে তুলবে এবং তা অত্যন্ত শোচনীয় হবে।"

গান্ধীজী তাঁর এই পত্রে যেসব কথা লিখেছিলেন, বড়লাট তার অনেকগুলির সঙ্গে একমত হ'তে পারলেন না। বিশেষভাবে, মুসলিম লীগের প্রতি তাঁর ঝোঁক আছে এই ধরনের কোন উক্তি তিনি করেননি বললেন। গান্ধীজী পরের চিঠিতে লিখলেন যে, বড়লাট ঠিক কি কি বলেছিলেন তা ব'লে তিনি যদি গান্ধীজীর পত্রের ভুলগুলি সংশোধন ক'রে দেন, তবে ভালো হয়। কিন্তু বড়লাট তাতেও সম্মত হলেন না।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ক্রমাগত আসতে লাগলো। কলকাতা, ঢাকা, এলাহাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান থেকে ছুরিকাঘাতের সংবাদ আসতে লাগলো। দেশের আবহাওয়া ক্রমেই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু তার মধ্য থেকে ক্ষীণ আশার আলোও দেখা দিলো। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে নেহরু ও জিন্নার মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হ'লো এবং লীগের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের সম্ভাবনা দেখা দিল। গান্ধীজী জনসাধারণকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যাতে এবার খিলাফত দিনগুলির চেয়েও ঐক্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়, সেজন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বললেন।

ভূপালের নবাব ১লা অক্টোবর গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা ক'রে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসার একটি সূত্র আলোচনা করলেন। তাতে বলা হ'লো যে, মুসলিম আসনসমূহে মুসলিম লীগ যেহেতু বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করেছে, সেই হেতু লীগের সাধারণভাবে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার কংগ্রেস স্বীকার করে নেবে, এবং অন্যপক্ষে লীগ যেসব মুসলমান কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের ভাগ্যকে জড়িত করেছে, তারা সহ অন্যান্য সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবার কংগ্রেসের অধিকার লীগ স্বীকার ক'রে নেবে। এই সূত্রের মধ্যে গান্ধীজী আপত্তির কিছুই দেখলেন না। কারণ, এই সূত্র অনুসারে কংগ্রেস কংগ্রেসী মুসলমানসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব করবে, অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মন্ত্রিসভায় নিয়োগ ও লীগের নির্দিষ্ট আসনসংখ্যার বাইরে কোন আসন শূন্য থাকলে তা পূর্ণ করবার ব্যাপারে লীগ আপত্তি করবে না। মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে সহযোগিতা করে, তবে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে। গান্ধীজী তাই এই রকম একটি সূত্রে স্বাক্ষর দিতে সম্মত হলেন। ফলে সূত্রটির একটি খসড়া তৈরী হ'লো। খসড়াটি এই রকম ছিল: "(১) মুসলিম লীগ যে এখন ভারতের সুবিপুল সংখ্যাধিক মুসলমানের কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রতিনিধি, তা কংগ্রেস অস্বীকার করছে না ও গ্রহণ করছে। এই কারণে এবং গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ অনুসারে আজ মুসলিম লীগই একাকী ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবার অবিসম্বাদী অধিকারী। কিন্তু কংগ্রেস তার সদস্যদের মধ্য থেকে যাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে ইচ্ছা করবে, তার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতা আরোপ কংগ্রেস মেনে নিতে পারে না। (২) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রীরা ভারতের মঙ্গলের জন্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে এবং

কোনক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করবে না, তাও উভয়েই স্বীকার করছে।"

জিন্না এই খসড়া দেখে (১) নং অংশ সম্পর্কে একমত হলেও দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বললেন যে, এ বিষয়ে আরও আলোচনা ও স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। কিন্তু এই সূত্রের দ্বিতীয় অংশটির উপরই গান্ধীজী বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। কারণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কংগ্রেস ও লীগ মিলিতভাবে কাজ করলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রকৃত জাতীয় সরকারে পরিণত হবে। গান্ধীজী ভূপালের নবাবকে তাই বললেন যে, জিন্না যদি সূত্রটি সমগ্রভাবে মেনে নেন, তবেই তিনি সূত্রটির প্রথম অংশ মেনে নেবেন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি কিন্তু সূত্রটির ভাষা পছন্দ করলেন না। তাঁরা বললেন, কোনও কোনও বিষয় আরও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। তাঁরা বললেন, প্রথম অংশের ভাষা হওয়া উচিত ছিল এইরূপ : "ঐ একই কারণে লীগ কংগ্রেসকে সমস্ত অমুসলমান এবং কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করেছেন এমন সব মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবার কর্তৃত্বসম্পন্ন সংস্থা ব'লে স্বীকার করছে।" গান্ধীজীকে একথা বলা হ'লে তিনি বললেন, কেন, খসড়াতে তো তা-ই আছে। ঐদিন গান্ধীজী সারাদিন ব্যস্ত থাকায় রাত্রিতে সুযোগমতো খসড়ার কপিটি পড়ে দেখলেন এবং তাড়াহুড়ায় তিনি খসড়াটি না পড়ে স্বাক্ষর দিয়ে যে ভুল করেছেন বুঝতে পারলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পিয়ারেলালকে ভূপালের নবাবের কাছে পাঠালেন এবং জানালেন যে, তিনি খসড়াটি না পড়ে স্বাক্ষর ক'রে ভুল করেছেন; সমগ্র দোষ তাঁর; এজন্যে যদি তাঁকে চিরদিনের জন্যে রাজনীতি ত্যাগ করতে হয়, তা-ও করবেন; তবু তিনি ঐ খসড়া-মতো মীমাংসার সূত্রটিকে গ্রহণের জন্যে কংগ্রেসকে বলতে পারবেন না। ওয়ার্কিং কমিটি কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসায় আসায় গান্ধীজীর স্বাক্ষরিত সূত্রটিকেই মেনে নিলেন। ৫ই ও ৭ই

অক্টোবর ভূপালের নবাবের গৃহে নেহ্রু ও জিন্নার মধ্যে আলাপ-আলোচনা হ'লো। কিন্তু জিন্না ৭ই অক্টোবর হঠাৎ একটি পত্র লিখে তাঁর ন-দফা দাবির কথা তুললেন। ঐ দাবিগুলি জিন্না ৪ঠা অক্টোবর বড়লাটকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন এবং বড়লাটও আংশিকভাবে সেগুলি মেনে নিয়েছিলেন। কংগ্রেস বড়লাটের মধ্যস্থতা বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই লীগের সঙ্গে মীমাংসায় উৎসুক ছিলেন। অন্যপক্ষে লীগ বড়লাটের মাধ্যমেই দাবিগুলি আদায়ের চেষ্টা করছিল। ১৫ই অক্টোবর তারিখে লীগ ঘোষণা করলো যে, তারা বড়লাটের আমন্ত্রণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিচ্ছে। লীগ-মনোনীত ব্যক্তিরা এইভাবে কার্যতঃ বৃটিশ-সমর্থনেই অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিল।

বাংলাদেশ থেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়াবহ সংবাদ আসতে লাগলো। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে লীগ যোগ দেওয়ায় গান্ধীজী আশা করেছিলেন যে, অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু লীগ তাদের তালিকায় তপসিলভুক্ত সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধির নাম অন্তর্ভুক্ত করায় লীগের দুরভিসন্ধি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ২৩শে অক্টোবর গান্ধীজী নেহ্রুজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর বাংলাদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঐদিন ওয়ার্কিং কমিটি দিল্লীতে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলো।

২৪শে অক্টোবর তারিখে গান্ধীজীর সান্ধ্য-উপাসনার প্রাক্কালে একদল উত্তেজিত যুবক পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের পৈশাচিক তাণ্ডবের প্রতিবিধানের দাবিতে ধ্বনি দিতে দিতে সমবেত হ'লো। গান্ধীজীর কক্ষে ঐ সময় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলছিল। যুবকরা তাদের কণ্ঠস্বর তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে চিৎকার করতে লাগলো। গান্ধীজী বললেন, তাদের কণ্ঠস্বর আগেই পৌঁছেছে। তিনি বললেন, তাঁর ও প্রত্যেকটি মানুষের মন আজ

পূর্ববঙ্গে পড়ে আছে। তিনি তাদের শান্তভাবে উপাসনায় যোগ দিতে বললেন। একজন বলে উঠলো, তাদের ঘর যখন দাউ দাউ ক'রে পুড়ছে, তখন তারা উপাসনায় যোগ দিতে পারে না। গান্ধীজী বললেন, ঘরে যখন আগুন লাগে তখন ঘরের মালিকের কর্তব্য হ'লো আগুন নেবাবার জন্যে সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করা, মাথা খারাপ নয়।

গান্ধীজী ২৮শে অক্টোবর বাংলাদেশে যাত্রা করবেন স্থির করলেন। তিনি পূর্বদিন উপাসনা-সভায় ঘোষণা করলেন যে, তিনি পরদিন কলকাতা যাত্রা করছেন। কলকাতা থেকে তিনি নোয়াখালি যাবেন। তাঁর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ, পথঘাটও ভালো নয়। তবু তাঁর কর্তব্য তাঁকে করতেই হবে; তার উপায়ও ভগবান ক'রে দেবেন। তিনি বললেন, তিনি কার অপরাধ তা নির্ণয়ের জন্যে বাংলাদেশে যাচ্ছেন না। তিনি জনসাধারণের সেবকরূপে সেখানে যাচ্ছেন; তিনি সেখানে হিন্দু-মুসলমান সকলের সঙ্গে মিলিত হবেন। এখন একদল মুসলমান তাঁকে শত্রু ব'লে মনে করেন। তাঁরা চিরকাল তা করতেন না। তাঁদের এই ক্রোধে তিনি কিছু মনে করেন না। তাঁর স্বধর্মীরাও কি মাঝে মাঝে তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হন না? তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়কে বললেন, তাঁরা কখনও কেউ কারো শত্রু হ'তে পারেন না। তাঁরা সকলে ভারতে জন্মেছেন, ভারতে বড় হয়েছেন, ভারতেই তাঁরা মরবেন। ধর্মের পরিবর্তন কখনও মূল সত্যকে পরিবর্তন ক'রে দেয় না। কেউ যদি মনে করেন যে, ধর্মের পরিবর্তনের ফলে জাতীয়তারও পরিবর্তন হয়, সেজন্যেও তাঁদের সঙ্গে শত্রুতার কোনও কারণ নেই। নারীর চোখের জল তাঁর হৃদয়কে চিরদিন বিগলিত করেছে। তিনি বাংলাদেশে যাচ্ছেন, তাঁদের চোখের জল মোছাতে, তাদের বুকে সাহস যোগাতে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি কলকাতায় গভর্নর ও মুখ্যমন্ত্রী

মিঃ সুরাবর্দীর সঙ্গে দেখা করবেন, তারপর নোয়াখালি রওনা হবেন।

গান্ধীজী বহু বৎসর পরে এই পথে যাচ্ছিলেন। তাঁর পক্ষে ট্রেনযাত্রা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। স্টেশনে স্টেশনে অগণিত মানুষের জনতা—তারা গাড়ি থামলেই বন্যার মতো গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, গাড়ির ছাদে উঠলো, জানালাগুলিতে ভীড় ক'রে বেয়ে উঠলো, জানালার কাচ ভেঙে দিলো, চিৎকার করতে লাগলো, বারবার গাড়ির এলার্ম চেন টেনে পথে গাড়িকে আটক করলো। স্টেশন-কর্তৃপক্ষ অনেক জায়গায় তাদের হোজ-পাইপের জল দিয়ে সরাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হ'লো না। গাড়ির কামরাগুলিই জলে ভেসে গেল।

গান্ধীজী কোলাহল ও চেঁচামেচির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কানে আঙুল দিয়ে ব'সে রইলেন। অনেকে গান্ধীজীকে তাঁর কামরার আলো নিবিয়ে দিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর দর্শনপ্রার্থীদের এভাবে হতাশ করতে চাইলেন না। তিনি বললেন, তাঁর দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও দেশবাসীর সেবা করাই তাঁর ব্রত, নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধান করা নয়।

নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ ঘণ্টা পরে গাড়ি পৌঁছলে তাঁকে সোজা সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হ'লো। গান্ধীজী কলকাতায় এসে গভর্নর ও মিঃ সুরাবর্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কলকাতার বুকে দাঙ্গার রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন দেখে তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

এই সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের প্রেসিডেণ্ট বড়লাট হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি শান্তি ও সম্প্রীতির জন্যে আবেদন জানালেন। গান্ধীজী নোয়াখালি যাওয়ার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু চতুর্থ দিনেও যাওয়া সম্ভব হ'লো না। মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী জানালেন যে,

এতো তাড়াতাড়ি ট্রেনের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। নোয়াখালি থেকে ক্রমাগত মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর বিবরণ আসতে লাগলো। কলকাতাতে উত্তেজনাও ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। তারপর মুসলমানদের বক্‌র্‌-ঈদ্‌ এসে পড়লো। ঐ উৎসবের সময়ে কলকাতায় ফের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধবার আশঙ্কা অনেকেই করতে লাগলেন। তাই সুরাবর্দী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মীরা গান্ধীজীকে বক্‌র্‌-ঈদ্‌ পর্যন্ত কয়েকদিন কলকাতায় থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা গান্ধীজীকে বোঝাতে চাইলেন, যতো নষ্টের গোড়া এই কলকাতা। গান্ধীজীকে কয়েক দিন কলকাতায় রয়ে যেতে হ'লো। ২রা নভেম্বর তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চারজন মন্ত্রীও কলকাতায় এলেন। বড়লাটও কলকাতায় এলেন। ফলে বাংলাদেশের অনেকেই মনে করতে লাগলেন যে, সরকার দৃঢ় কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, হয়তো সৈন্যবাহিনীর হাতেই বাংলাদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দেওয়া হবে। গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় জনসাধারণের এই রকম মনোভাব ত্যাগ করতে বললেন। তিনি বললেন, বড়লাট তাঁর ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে দিয়েছেন; গভর্নরও তাঁর ক্ষমতা প্রদেশের মন্ত্রিসভার হাতে দিয়েছেন। এখন এইসব সরকারকে যদি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে তা করতে হবে জনসাধারণের সাহায্যেই। গান্ধীজী বললেন, প্রতিহিংসা একটি বিষাক্ত চক্র। ধর, আমাকে কেউ হত্যা করলো; প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে অন্য কাউকে হত্যা ক'রে কোন লাভ হবে না। কেউ যদি তোমাকে চড় মারে, তুমি যদি তাকে ক্ষমা করবার মতো উদারহৃদয় না হও, তুমি তাকে চড় মারতে পারো। তার অর্থ বুঝতে পারি। কিন্তু অপরাধী যদি পালিয়ে যায়, তবে আহত পক্ষ যদি অপরাধীর কোন আত্মীয়কে, কি স্বধর্মীকে, প্রতিশোধগ্রহণের জন্যে মারে, তা মনুষ্যত্বের অবমাননা মাত্র। কেউ যদি তোমার মেয়েকে অপহরণ করে, তবে

তুমি কি সেই অপহরণকারীর বা অপহরণকারীর বন্ধুর মেয়েকে অপহরণ করবে? তা লজ্জাকর।

গান্ধীজী প্রতিশোধ সম্পর্কে সতর্ক করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাটনায় প্রতিহিংসানল জ্বলে উঠলো। এই সংবাদ পেয়েই দ্রুত জওহরলাল নেহ্‌রু ও আরও তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পাটনা চ'লে গিয়েছিলেন। গান্ধীজী উদ্বিগ্নভাবে তাঁদের তার পাঠালেন। উত্তরে জওহরলাল জানালেন, বিহারের বহু স্থানে অবস্থা গুরুতর, তবে সরকার অবস্থা আয়ত্তে আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। তিনি ও তাঁর সহকর্মী আবদুর রব নিশ্‌তার বিহার থেকে যাবেন স্থির করেছেন। ৪ঠা নভেম্বর গান্ধীজী তাঁর লিখিত বাণীতে বললেন, "কংগ্রেস জনসাধারণের। মুসলিম লীগ মুসলমান ভাই-বোনের। কংগ্রেস যে প্রদেশে ক্ষমতাসীন সেখানে যদি কংগ্রেস মুসলমানদের রক্ষা করতে না পারে, তবে একজন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী থেকে লাভ কি? ঠিক তেমনি, কোন মুসলিম লীগ-শাসিত প্রদেশে যদি লীগপন্থী মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারেন, তবে লীগপন্থী মুখ্যমন্ত্রীরই বা প্রয়োজন কি? যদি তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশে সংখ্যালঘুকে রক্ষা করবার জন্যে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিতে হয়, তবে তার অর্থ হ'লো এই যে, তবে সংকটকালে জনসাধারণের উপর তাঁদের কোনরকম নিয়ন্ত্রণাধিকার নেই। তাই যদি হয়, এর একমাত্র অর্থ হ'লো এই যে, তাঁরা উভয়েই বৃটিশকে ভারতে তাদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।"

যারা গুণ্ডাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকতে চায়, তাদের তিনি বললেন, "আমরা সর্বদাই গুণ্ডাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিই। কিন্তু এই গুণ্ডা-সৃষ্টির জন্যে ও তাদের উৎসাহ

দেওয়ার জন্যে আমরাই দায়ী। সুতরাং এটা বলা উচিত নয় যে, যতো কিছু অন্যায় হচ্ছে, তা গুণ্ডারাই করছে।"

বিহারের ভয়ংকর ঘটনাবলীর সংবাদ আসতে লাগলো। জওহরলাল নেহ্‌রু অপরাধীদের সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, এই বর্বরতা কেন্দ্রীয় সরকার কোনমতে সহ্য করবে না, প্রয়োজন হ'লে বিমান থেকে বোমা ফেলে অপরাধীদের স্তব্ধ করা হবে। গান্ধীজী বললেন, "এ তো বৃটিশ পন্থা। কংগ্রেস দেশের জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস যে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে, তারই বিরুদ্ধে কি সে ধ্বংসাত্মক বিদেশী পন্থা গ্রহণ করতে পারে? সৈন্য-বাহিনীর সাহায্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা দমন করলে তারা ভারতের স্বাধীনতাই দমন করবে। কিন্তু জওহরলালই বা কি করবেন, যদি কংগ্রেস জনসাধারণের উপর তার নিয়ন্ত্রণাধিকার হারিয়ে ফেলে? এর চেয়ে জনসাধারণ যদি নিয়মকানুন ও যুক্তি মানতে না চায়, তবে সরকারী কর্তৃত্ব ত্যাগ করাই শ্রেয়।

৫ই নভেম্বর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষণা করলেন যে, গান্ধীজী বিহারে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দাঙ্গা বন্ধ না হলে আমরণ অনশনের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। প্রয়োজন হলে তিনি বিহারে এসেই অনশন করবেন।

৬ই নভেম্বর গান্ধীজী নোয়াখালি রওনা হলেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি "বিহারের উদ্দেশে" একটি আবেদন প্রচার করলেন:

"আমার স্বপ্নের বিহার যেন মিথ্যায় প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষপাতিত্বপুষ্ট বা অতিরঞ্জিত হ'তে পারে এমন বিবরণের উপর আমি নির্ভর করছি না। কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীর নিরবচ্ছিন্ন অবস্থিতিই বিহারের শোকাবহ অবস্থার কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে। মুসলিম লীগ সরকারের অধীনে বাংলার অবস্থা এর চেয়ে খারাপ যদি না হয়, ভালো নয় এবং বিহারে যা ঘটছে তা বাংলারই ফল, এ ধরনের জবাব দেওয়া সহজ। কোনও পক্ষের

একটি মন্দ কাজ অন্য পক্ষের একটি মন্দ কাজকে ন্যায়সঙ্গত করে না ; বিশেষতঃ যখন ঐ পক্ষ বৃহত্তম রাজনৈতিক কৃতিত্বসমূহ সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই গর্ববোধ করে। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমি কলকাতায় সপ্তাহকালের বেশি থাকলেও আমি এখনও এই মর্মান্তিক ঘটনাবলীর প্রচণ্ডতার পরিমাণ ঠিক জানি না। বিহার আমাকে ডাকলেও নোয়াখালি সম্পর্কে আমার কর্মসূচী আমি ব্যাহত করতে পারি না। কংগ্রেসকর্মীরা মুসলিম লীগকে যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করছেন তার জবাব কি প্রতি-সাম্প্রদায়িকতা ? বিহারের অধিবাসীদের শতকরা চৌদ্দজন যে মুসলমান, তাদের নিষ্পেষিত করাই জাতীয়তাবাদ ? কয়েক হাজার বিহারীর পাপের জন্যে আমার সমগ্র বিহারের নিন্দা করা যে উচিত নয়, তা আমাকে বলতে হবে না। বিহার কি একজন ব্রজকিশোর প্রসাদ বা একজন রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্যে গর্বিত নয় ? তবে আমার ধারণা, বিহারে যে দুষ্কার্য চলছে, তা যদি চলতে থাকে, তবে দুনিয়া সারা ভারতের হিন্দুদেরই দোষী করবে। কায়েদ-ই-আজম জিন্না যে বলেন, কংগ্রেসে কিছু সংখ্যক শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী ও অন্যান্যরা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান, তা বিহারী হিন্দুদের দুষ্কার্য সঙ্গত প্রতিপন্ন করতে পারে। সংখ্যালঘু মুসলিম ভাইদের, যাঁদের নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে, তাঁদের বিহারী হিন্দুরা বিপুল সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সমান ব'লে গণ্য করতে বিবেকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। যে বিহার কংগ্রেসের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য এতো কিছু করেছে, আজ যেন সেই বিহার কংগ্রেসের কবর না খোঁড়ে। আমি আমার অহিংসার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। আমার অহিংসা এই সংকটকালে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তা দেখবার জন্তেই আমি বাংলাদেশে এসেছি। কিন্তু এই পত্রে আমি তোমাদের অহিংসার কথা বলতে চাই না। তবে আমি বলতে

চাই যে, তোমরা যা করেছ ব'লে সংবাদ পেয়েছি, তা কখনই বীরত্বের কাজ ব'লে গণ্য হবে না। কয়েক শত লোককে হাজার হাজার লোক মিলে হত্যা করা কোন বীরত্বের কাজ নয়। এটা জাতীয়তাবাদ বা যে কোনও ধর্মের পক্ষে অযোগ্য। যদি তোমরা আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত দিতে, তবে কেউ তোমাদের প্রতি অঙ্গুলিহেলনও করতে পারত না। কিন্তু তোমরা যা করেছ, তা তোমাদের তথা ভারতকে অনেক নিচে টেনে নামিয়েছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু, সর্দার নিশ্‌তার সাহেব ও ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে, তাঁদের নিজেদের চ'লে যেতে এবং সর্বভারতীয় কার্যকলাপে মনোনিবেশ করতে তোমাদের বলা উচিত। তোমরা যদি তোমাদের অমানুষিকতা সম্পর্কে অনুতপ্ত হও এবং মুসলমানদের তোমরা তোমাদের নিজেদের ভাইবোনের মতো রক্ষণাবেক্ষণ করবে, এ বিষয়ে তোমরা যদি তাঁদের নিশ্চিত করতে পারো, তবে তাঁরা তা করতে পারেন। যতদিন না প্রতিটি মুসলমান শরণার্থী তাদের গৃহে ফিরে আসে, তাদের গৃহগুলি তোমরা যতদিন না পুনর্নির্মাণ ক'রে দাও বা তোমাদের মন্ত্রীদের ও বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করতে বলো, ততদিন তোমাদের স্থির থাকা উচিত হবে না। সমালোচকরা তোমাদের মন্ত্রীদের সম্পর্কে আমাকে কি বলেছেন, তা তোমরা জানো না। আমি নিজেকে তোমাদের অংশ ব'লেই মনে করি। তোমাদের স্নেহই আমার মধ্যে সেই আনুগত্য এনেছে। বিহারী হিন্দুদের কি করা কর্তব্য, তা তোমাদের চেয়ে আমি ভালো বুঝি ব'লেই আমি কিছু পরিমাণে প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্যে আমি কলকাতায় পৌঁছার পর সর্বনিম্ন পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করছিলাম। বিহারের শোচনীয় সংবাদ পাওয়ার পর প্রায়শ্চিত্তরূপে আমি সেই খাদ্যই গ্রহণ করছি। যে বিহারীরা ভুল করেছে, তারা যদি নূতন অধ্যায়

শুরু না করে, তবে আমার এই স্বল্প খাদ্য আমরণ অনশনে পরিণত হবে।..."

গান্ধীজী সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীতেই নোয়াখালি যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা সরকার তাঁর জন্যে একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করলেন এবং বাণিজ্য-মন্ত্রী জনাব সামসুদ্দিন ও মুখ্যমন্ত্রীর পরিষদীয় সচিব জনাব নসরুল্লা ও জনাব আবদুর রসিদকে গান্ধীজীর সঙ্গে পাঠালেন। মুখ্যমন্ত্রী জনাব সুরাবর্দীও সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কলকাতায় তাঁকে রয়ে যেতে হ'লো। কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি ও গোয়ালন্দে বিরাট জনতা গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা জানালো। গান্ধীজী এইসব স্থানে জনসাধারণের উদ্দেশে সংক্ষেপে ভাষণ দিলেন। গোয়ালন্দ থেকে গান্ধীজী একটি বিশেষ স্টীমারযোগে চাঁদপুরে গিয়ে পৌঁছলেন। এখানে মুসলিম লীগ ও হিন্দুদের পক্ষ থেকে দুটি প্রতিনিধিদল গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। এখানে ৭ই নভেম্বর গান্ধীজী বললেন, "যেটা আমাকে সবচেয়ে পীড়া দিয়েছে, সেটা হ'লো এই যে, একটিমাত্র লোককেও জোর ক'রে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে বা একটিমাত্র স্ত্রীলোককেও অপহরণ বা ধর্ষণ করা হয়েছে। এই ধরনের অসম্মানের কাছে আমরা মাথা নত করতে পারি, এইরকম বোধ আমাদের যতদিন থাকবে, ততদিন এই ধরনের অসম্মান আমাদের ঘটবে। যদি আমরা বলি যে, পুলিস বা সৈন্যদলের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া আমরা টিকতে পারি না, তবে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই আমরা পরাজয়কে বরণ করি। যারা কাপুরুষ, তাদের দুনিয়ার কোন পুলিস, কোন সৈন্যদলই রক্ষা করতে পারে না। তোমরা বলছ, এখন হাজার হাজার লোক মুষ্টিমেয় মানুষকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছে, সুতরাং মুষ্টিমেয় মানুষ কি করবে? কিন্তু বিশাল জনতাও যদি নিরুপায় বোধ করে, তবে মাত্র কয়েকজনেই তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত ক'রে তুলতে পারে। তোমাদের প্রকৃত অসুবিধা হ'লো সংখ্যাল্পতা

নয়,—নিরুপায় মনোভাব যা তোমাদের পেয়ে বসেছে এবং পরনির্ভরশীলতা। প্রতিকার তোমাদের কাছেই আছে। তাই দলে দলে তোমরা পূর্ব বাংলা ত্যাগ করো, তা আমি চাই না। এটা অক্ষমতা ও অসহায়তার কোনও প্রতিকার নয়। তোমরা মুসলমানদের স্থলে হিন্দু কর্মচারী, হিন্দু পুলিস ও হিন্দু সৈন্য দাবি করেছ। কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছ যে, অতীতে হিন্দু কর্মচারী, হিন্দু পুলিস ও হিন্দু সৈন্য সবাই এইসব কাজ করেছে: লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, নারীহরণ, ধর্ষণ। আমি কাথিয়াবাড় থেকে এসেছি। সেখানে বহু ছোট ছোট রাজার বাস। মনুষ্যত্বের সেই অধঃপতন আমি বর্ণনা করতে পারব না। এইসব দেশীয় রাজ্যে কোনও নারীর সম্মান নিরাপদ নয়; অথচ রাজারা গুণ্ডা নয়, নিয়মিত শাসক।"

৭ই নভেম্বর বিকালে গান্ধীজী চৌমোহানী গিয়ে পৌঁছলেন। এখানে তাঁর উপাসনাসভায় প্রায় পনেরো হাজার লোক উপস্থিত হ'লো। এদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই ছিল মুসলমান। চৌমোহানি শহরে দাঙ্গাহাঙ্গামা বিশেষ না হ'লেও এর চারদিকের গ্রামাঞ্চলে ভয়াবহ তাণ্ডব চলেছিল। গান্ধীজী উপাসনাসভায় প্রায় বিশ মিনিট বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, খিলাফত যুগে তিনি আলি ভাইদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ সফর করেছিলেন। তখন মুসলমানরা তাঁর কথা বিশ্বাস করতো। মুসলিম মহিলাদের সভায় আলি-ভাইরা গেলে চোখ বেঁধে যেতেন। কিন্তু তিনি চোখ না বেঁধেই যেতেন—মা-বোনেদের কাছে চোখ বেঁধে যাবেন কেন? পর্দানসিন মহিলারাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন, তাঁকে নিজের পরিবারের একজন ব'লে গ্রহণ করতেন। কিন্তু আজ তিনি অনেক দুঃখ নিয়েই এসেছেন। ভারতমাতা এমন কি অপরাধ করেছেন যে, আজ তাঁর হিন্দু-মুসলমান সন্তানেরা এমন ভয়াবহ বিবাদে লিপ্ত হয়েছে? তিনি শুনেছেন যে, পূর্ববঙ্গে আজ কোনও হিন্দু স্ত্রীলোক নিরাপদ নন। বাংলাদেশে আসার পর তিনি ভয়াবহ সব ঘটনার কথা

শুনছেন। মুখ্যমন্ত্রী জনাব সুরাবর্দী ও বাণিজ্য-মন্ত্রী জনাব সামসুদ্দিন স্বীকার করেছেন যে, তিনি যা শুনেছেন, তার মধ্যে অনেকখানি সত্য রয়েছে। এখানেও তিনি হিন্দুদের অসহায়বোধ ত্যাগ ক'রে বীরের মতো বিপদের সম্মুখীন হ'তে বললেন।

৮ই নভেম্বর গান্ধীজী জনাব নসরুল্লা, জনাব আবদুর রসিদ, জেলাশাসক মিঃ ম্যাকইনার্নি ও পুলিস সুপারের সঙ্গে মোটরযোগে চৌমোহানি গ্রাম থেকে গোপাইরবাগ গ্রামে গেলেন। এখানে তিনি দেখলেন, সুপারি ও নারিকেল গাছের ছায়ায় হিন্দুদের পাঁচটি কুটির। তার চারিদিকে প্রায় ২৫০ মুসলিম পরিবারের বাস। এখানে গৃহদাহ, হত্যা ও নারীহরণ ঘটেছে নির্বিচারে নির্বিবাদে। নিহত ব্যক্তিদের শবগুলিকে একটি উঠানের এককোণে জড় ক'রে তাতে আগুন ধরানো হয়েছিল। অর্ধদগ্ধ দেহগুলি একটি পৈশাচিক ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। গৃহগুলির দ্বারে রক্তের ছাপ। অনেক বাড়িতে মেঝেগুলি খোঁড়া হয়েছে লুকানো অর্থ ও অলঙ্কারের সন্ধানে। সারা স্থানটিতে একটি শ্মশানের স্তব্ধতা, এখনও বীভৎস মৃত্যু যেন তার করাল ছায়া বিস্তার ক'রে রয়েছে। এখান থেকে তিনটি মেয়ে অপহৃত হয়েছে, তাদের দুজনের এখনও হদিস মিলছে না।

বিকালে গান্ধীজী ফিরবার পথে দত্তপাড়া গ্রামে দেওয়ান-বাড়িতে গেলেন। এখানে দেওয়ান পরিবারের লোকেরা সময়োচিত বুদ্ধির সাহায্যে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। এখানে প্রায় ছ হাজার শরণার্থীর শিবির পড়েছে। গান্ধীজী শরণার্থীদের নিজ নিজ গৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে জেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করলেন। স্থানীয় মুসলিম লীগ সদস্যরাও অনেকে আমন্ত্রিত হয়ে আলোচনায় যোগ দিলেন। এখানে একটি সভায় গান্ধীজী বললেন, হিন্দুরা যে এভাবে দলে দলে গৃহত্যাগ ক'রে পালিয়ে এসেছেন, তা হিন্দু ও মুসলিম উভয়

সম্প্রদায়েরই লজ্জার বিষয়। এটা মুসলমানদের লজ্জার বিষয়, কারণ, তাদের ভয়েই হিন্দুরা গৃহত্যাগ করেছেন। মানুষ মানুষের মনে এরকম আতঙ্কের সঞ্চার করবে কেন? হিন্দুদের পক্ষেও এটা কম লজ্জার বিষয় নয়, কারণ তারা এই আতঙ্কের কাছে কাপুরুষের মতো আত্মসমর্থন করেছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ শরণার্থীদের ঘরে পাঠাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিল। কারণ, শরণার্থী-শিবিরগুলির ব্যয়ভার বহন তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। একজন মুসলমান বললেন, তাঁরা হিন্দুদের অভয় ও আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা ঘরে ফিরে যেতে চাইছে না। একজন হিন্দু শরণার্থী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, যখন হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল, তখন তো স্থানীয় মুসলমানরা তাদের ভরসা দিয়েছিল। কিন্তু বিপদের সময় তারা কেউ রক্ষা করতে আসে নি। তাছাড়া, তারা ফিরে যাবেই বা কোথায়? জঙ্গলে? গান্ধীজী বললেন, সরকার তাদের ঘরবাড়ি নির্মাণ ক'রে দেবেন। তাদের সঙ্গে প্রতি গ্রামে একজন ক'রে সৎ মুসলমান ও একজন ক'রে হিন্দু যাবেন। প্রতিবাদ এলো, যেখানে পঞ্চাশজন মুসলমান তাদের রক্ষা করতে পারে নি, তখন একজন সৎ মুসলমানই বা কি করবেন? তবু সাহসে ভর ক'রে মানুষের উপর আস্থা রেখে গান্ধীজী তাদের গৃহে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। কারণ, সাহস ছাড়া বিপদে রক্ষার কোনও পথ নেই। কাপুরুষের প্রতি ভগবানও বিমুখ হন।

গান্ধীজী আরও ভেতরের গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার জন্যে দত্তপাড়ায় তাঁর ছাউনি ফেললেন। ১০ই নভেম্বর তাঁর উপাসনা-সভায় প্রচুর লোক-সমাগম হ'লো। তার শতকরা ৮০ ভাগ ছিল মুসলমান। গান্ধীজী বললেন, "তোমরা বিশ্বাস কর, আর নাই কর, আমি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সেবক। আমি এখানে পাকিস্থানের বিরোধিতা করতে আসিনি। বিভক্ত হওয়াই যদি ভারতের ভাগ্যে থাকে, তবে তা কেউ রোধ করতে পারবে না। তবে একথাও বলতে

চাই যে পাকিস্থান গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।…আমি আমার মুসলমান ভাইদের এই কথাটুকু বলতে চাই যে, তারা একজাতি বা দ্বিজাতি, যেরূপেই বাস করুন না কেন, তাঁদের হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুর মতো বাস করা উচিত। যদি তাঁরা তা না চান, তবে তা তাঁদের স্পষ্টই বলা উচিত। সেক্ষেত্রে আমি নিজেকে পরাজিত ব'লে মেনে নেব। শরণার্থীরা চিরকাল শরণার্থীরূপে বাস করতে পারে না। সরকার চিরকাল তাদের খাইয়ে যেতে পারে না। আর শরণার্থীরা কি খাবারই বা খেতে পাচ্ছে? রোজ একজন সুস্থলোকের বাঁচবার জন্যে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য লাগে তার অর্ধেক, মাছ নেই, শাকসবজি নেই, অন্য কিছুই নেই অভাব পরিপূরণের জন্যে। কিছুকালও এইভাবে শরণার্থীরা বেঁচে থাকতে পারে না। তাই মুসলমানরা যদি তাদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যেতে দিতে না চান, তবে তাদের অন্যত্র কোথাও যেতে হবে।…এক হাজার হিন্দু যদি একশত মুসলমানকে ঘিরে ফেলে বা একহাজার মুসলমান যদি একশত হিন্দুকে ঘিরে ফেলে, তার মধ্যে কাপুরুষতা ছাড়া কোনও বীরত্ব নেই। ন্যায়যুদ্ধে যোদ্ধার সংখ্যা দুই পাশের সমান হওয়া উচিত, আগে থেকে বিজ্ঞপ্তিও চাই। এর অর্থ এই নয় যে, আমি তাদের লড়াই সমর্থন করছি। এমন কথা বলা হয়েছে যে, হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুর মতো একসঙ্গে বাস করতে বা পরস্পর সহযোগিতা করতে পারে না। একথা আমাকে কেউ বিশ্বাস করাতে পারবে না। তবু আপনারা যদি বিশ্বাস করেন, তা আপনাদের বলা উচিত। সেক্ষেত্রে আমি শরণার্থীদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতে বলব না। তারা পূর্ব-পাকিস্থান ত্যাগ করবে এবং তা মুসলমান ও হিন্দুদের উভয়ের পক্ষে লজ্জাজনক হবে। অন্যপক্ষে আপনারা যাদ চান যে, হিন্দুরা আপনাদের মধ্যে থাকুক, তবে আপনারা তাদের বলবেন যে তাদের রক্ষার জন্যে সৈন্যদলের প্রয়োজন নেই, তাদের মুসলমান ভাইরাই তাদের রক্ষা করবেন

তাদের মেয়ে বোন মা আপনাদের নিজেদের মেয়ে বোন মা, তাদের জীবন দিয়েও আপনারা রক্ষা করবেন। একজন শরণার্থী গত সন্ধ্যায় আমার উপাসনাসভার পর তার গ্রামে ফিরেছিল। কিন্তু সে গিয়ে দেখল, মুসলমানরা তার বাড়ি ঘিরে রয়েছে; তারা তাকে তার সম্পত্তি নিতে দেবে না। এ ঘটনা যদি সত্য হয়, এই অবস্থায় আমি কিভাবে কাউকে ফিরে যেতে বলি?...আমাকে একথা বলা হয়েছে এবং আমি বিশ্বাসও করি যে, অনেক সৎ মুসলমান আছেন যাঁরা চান যে হিন্দুরা তাদের ঘরে ফিরে আসুক, কিন্তু গুণ্ডারা বাধা দিচ্ছে। আমি আপনাদের বলতে চাই, যদি সৎ মুসলমানরা একবাক্যে তাদের মত প্রকাশ করেন এবং মত অনুযায়ী কাজ করেন, তবে তথাকথিত গুণ্ডারা ব্যর্থ হবে এবং তাদের নিজ নিজ পথ পরিবর্তন করবে।"

১১ই নভেম্বর ছিল গান্ধীজীর মৌনদিবস। তা সত্ত্বেও তিনি নোয়াখালা, সোনাচাকা ও খিলপাড়া গ্রামগুলি পরিদর্শন করলেন। তিনি কোথাও মোটরে, কোথাও বা কচুরিপানায় ভর্তি খালে ডিঙিতে ক'রে গেলেন। নোয়াখালায় ১৫ বছরের একটি স্কুলের ছেলেসহ আটজন লোক নিহত হয়েছিল। চারটি মাথার খুলি ও কয়েকটি অর্ধদগ্ধ দেহ ইতস্ততঃ পড়েও ছিল। সমস্ত গৃহগুলিই প্রায় দগ্ধ বা অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ছিল। যে বাড়িতে স্কুলের ছেলেটিকে মারা হয়েছিল, সেখানে তার বই ও খাতাগুলি ছেঁড়া অবস্থায় মেঝেতে পড়েছিল। ঘরগুলির চারিদিকে সুপারিগাছ ও নারিকেলগাছগুলিও আগুনের তাপে ঝলসে গিয়েছিল। যাদের ওখানে হত্যা করা হয় নি, তাদের মুসলমান করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বোবাও ছিল। সে ইঙ্গিতে দেখালো যে, তার মাথার টিকি কেটে দেওয়া হয়েছে, এবং সেটিকে সে সযত্নে সন্তর্পণে একটুকরো কাপড়ে বেঁধে লুকিয়ে রেখেছে। যে কজন স্ত্রীলোক বেঁচে ছিল, তারা অবিরাম বিলাপ করছিল ও কাঁদছিল। গান্ধীজী যখন একটি বিধ্বস্ত গৃহ

থেকে বাইরে আসছিলেন, তখন একটি কুকুর ক্রমাগত তাঁকে অনুসরণ করছিল এবং কেঁউ কেঁউ শব্দে কি যেন বলতে চাইছিল। গান্ধীজীর সহযাত্রী কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে গান্ধীজী তাঁদের নিষেধ ক'রে বললেন, "দেখছ না, কুকুরটা কি বলতে চায়।" কুকুরটা যেদিকে যেতে চাইছিল, গান্ধীজী সেই দিকেই সকলকে অনুসরণ করতে বললেন। কুকুরটির পিছুপিছু গিয়ে তাঁরা দেখলেন, তিনটি মানুষের কঙ্কাল এবং কিছু মাথার খুলি ও হাড় পড়ে আছে। গান্ধীজী শুনলেন, এই বাড়ির মালিক ও তাঁর পরিবারের সাতজন লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। গান্ধীজী তারপর গোমাটোলি ও নন্দিগ্রাম গ্রামে গেলেন। এইভাবে তিনি সারা লখিমপুর থানার বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন শেষ করলেন। নন্দিগ্রামেই প্রায় ছ'শ গৃহ ভস্মীভূত হয়েছিল। একটি বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস ও হাসপাতালও অগ্নিকাণ্ডের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। চারিদিকের সুপারি ও নারিকেল গাছগুলি আগুনের শিখায় ঝলসে গিয়েছিল। গ্রামের হিন্দু মন্দিরটিকে অপবিত্র করা হয়েছিল।

১৩ই নভেম্বর গান্ধীজী তার অনুচরদের প্রত্যেককে তাঁকে অনুসরণ না ক'রে এক-একটি বিধ্বস্ত গ্রামে গিয়ে থাকতে এবং হিন্দুদের মনে সাহস সঞ্চয় করতে নির্দেশ দিলেন। এজন্যে তাঁদের জীবন বিপন্ন হ'লেও তাতে ভীত হ'তে নিষেধ করলেন। অবশ্য, যাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে একাজে আত্মনিয়োগ করতে চাইবেন না, তাঁদের তিনি অন্যত্র গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্যে বললেন। তিনি নিজেও একাকী এই কাজেই আত্মনিয়োগ করবার সংকল্প করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যতোদিন পূর্ববঙ্গে শান্তি স্থাপিত না হয়, ততোদিন তিনি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করবেন না। এজন্যে তাঁর জীবন যদি যায়, তাতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হবেন না।

১৪ই নভেম্বর গান্ধীজী দত্তপাড়া থেকে কাজিরখিলে গেলেন। এখানে একটি অর্ধবিধ্বস্ত গৃহে তাঁর শিবির রচিত হ'লো। তিনি

এখন থেকে কোনও মুসলমানের গৃহে থাকতে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর দলের কেউ থাকবেন না, তিনি মুসলমান পরিবারেই থাকবেন, নিজের ব্যবস্থাটুকু নিজেই ক'রে নেবেন। কিন্তু কোন মুসলমান পরিবার এ দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হলেন না। ১৭ই নভেম্বর গান্ধীজী কাজিরখিল থেকে দু মাইল দূরে দশঘরিয়া গ্রামে এলেন। এখানে বহুসংখ্যক হিন্দু স্ত্রীলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের জোর ক'রে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা করলেন যে, এই ধরনের ধর্মান্তরণ আইনতঃ স্বীকৃত হবে না। গান্ধীজী বললেন, এঁদের সকলকে পুনরায় হিন্দু-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। তা না হ'লে কখনও মন থেকে সাম্প্রদায়িক বিষ দূর হবে না।

১৯শে তারিখে জনাব সুরাবর্দী তাঁর কয়েকজন সহকর্মী সহ গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা বললেন, শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্যে পুলিস ও সৈন্য অপসারণ করা ও শরণার্থীদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। গান্ধীজী তাতে একমত হলেন। সেই সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, প্রতি গ্রামে একজন ক'রে সৎ মুসলমান পাওয়া যাবে কিনা যিনি শরণার্থীদের রক্ষার দায়িত্ব নেবেন। তখন একজন মন্ত্রী বলেন, একজন সৎ মুসলমানের প্রয়োজন কি, গ্রামের সমস্ত মুসলমানই সেই দায়িত্ব নেবে। গান্ধীজী বললেন, তা আরও আনন্দের কথা; কিন্তু সকলের কাজ আসলে কারও কাজ নয়; তাই তিনি একজন ক'রে সৎ মুসলমান চাচ্ছেন যিনি ও কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। তিনি একজন ক'রে হিন্দুর ব্যবস্থা করবেন, সরকার একজন ক'রে মুসলমানের ব্যবস্থা করতে পারেন কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীরা নীরব রইলেন।

কাজিরখিল থেকে গান্ধীজী শ্রীরামপুর গ্রামে গেলেন। ১৯শে নভেম্বর গান্ধীজী বিহার থেকে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের তারবার্তা

পেলেন। তাতে বলা হ'লো যে, গত সপ্তাহকাল বিহারে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। অবস্থা সন্তোষজনক। গান্ধীজী যেন তাঁর পুরো খাদ্য খান। শ্রীরামপুর যাওয়ার পূর্বে গান্ধীজী বললেন, "আমি দেখছি চারিদিকে অত্যুক্তি ও মিথ্যা, আমি সত্য আবিষ্কার করতে পারছি না। পরস্পরের মধ্যে ভয়াবহ অবিশ্বাস। পুরাতনতম বন্ধুত্বও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যে সত্য ও অহিংসা আমার ব্রত, যা আমাকে দীর্ঘ ষাট বৎসর বাঁচিয়ে রেখেছে, যা সেই সত্য ও অহিংসার গুণ বলা হয়, তা প্রকাশে তা ব্যর্থ হচ্ছে। আমি তাকে আরও ভালোভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই। সেজন্য যাঁরা এই দীর্ঘ বছরগুলি আমার সঙ্গে আছেন, আমার জীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তুলেছেন, আমি তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রীরামপুর গ্রামে যাচ্ছি। আমার বাংলা শিক্ষক ও অর্থকার রূপে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু এবং আমার স্টেনোগ্রাফার হিসাবে আমার অনুরাগী নিঃস্বার্থ ও নীরব কর্মী শ্রীপরশুরাম কেবল আমার সঙ্গে যাবেন। আমার ইচ্ছা কোনও স্থানীয় মুসলমান পরিবারে থাকা; কিন্তু সেই সুখের দিন আসবার জন্যে আমার অপেক্ষা ক'রে থাকলে চলবে না। ইতিমধ্যে আমাকে তাদের গ্রামে গিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। আমি মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের বলেছি, তাঁরা যেন আমাকে প্রত্যেক উপক্রুত গ্রামের জন্যে একজন ক'রে সৎ ও সাহসী মুসলমান দেন, যিনি প্রাণ দিয়েও প্রত্যাগত হিন্দু শরণার্থীদের জীবন রক্ষা করবেন। আমাকে দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে, নইলে শরণার্থীদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যেতে আমি রাজী করাতে পারছি না। আমি যে বিবরণ পাচ্ছি, তাতে গ্রামগুলিতে এখনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ নয়। তাই তারা নিজেদের গ্রাম, শস্যক্ষেত্র, উদ্যান ও পরিপার্শ্ব থেকে দূরে পালিয়ে সামান্য সরকারী দানের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে চায়।"

এইভাবেই গান্ধীজী ২০শে নভেম্বর বেলা সাড়ে এগারোটায় কাজিরখিল থেকে ছাউনি তুলে তাঁর নিঃসঙ্গ যাত্রা শুরু করলেন। দুঘণ্টায় নৌকায় শ্রীরামপুরে পৌঁছলেন এবং সুপারি ও নারিকেল বনে ঘেরা একটি গৃহে তাঁর নির্জনবাসের ব্যবস্থা করলেন। তিনি নিজেই তাঁর বই, কাগজপত্র ও জিনিসপত্রগুলিকে সাজিয়ে রাখলেন, নিজের বিছানা ক'রে নিলেন। তারপর নিজে তেল মেখে একটি বালতি থেকে মগে ক'রে জল নিয়ে স্নান করলেন। ছাগলদুধ ও কিছু শাকসবজি দিয়ে মধ্যাহ্ন আহার করলেন। বিকেলে কিছু আঙ্গুরের সঙ্গে ঐ খাবারেরই ব্যবস্থা রইলো। ২০শে নভেম্বর তিনি হাজার মানুষের একটি সভায় বললেন, তিনি যে এতো শীঘ্র নোয়াখালির একটি উপদ্রুত গ্রামে এসে বাস করতে পারবেন, তা তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। তাঁর সঙ্গীরাও তাঁর মতোই নোয়াখালির বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে কাজ করবেন। সভায় উপস্থিত মুসলমানরা, যে তাঁকে তাঁদের বাড়ি দেখবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সেজন্যে তিনি আনন্দিত। তাঁরা বলেছেন যে, হিন্দুরা তাঁদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এলে তাঁরা সুখী হবেন। কিন্তু তা করবার মতো মনের অবস্থা এখনও হিন্দুদের হয় নি।

ভয়কে তিনি ঘৃণা করেন। কেন মানুষ মানুষকে ভয় করবে? মানুষ শুধু ভগবানকে ভয় করবে, তবেই সে সকল ভয় ছাড়তে পারবে। পিয়ারেলাল এসেছেন। তিনি পথে প্রায় দেড়শত শরণার্থীকে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে দেখেছেন। তাদের জিজ্ঞাসা করায় তারা বলেছে, তাদের ভয় পুলিস ও সৈন্য সরিয়ে নিলে আবার হাঙ্গামা হবে। তাই পথঘাট নিরাপদ থাকতে থাকতেই তারা কোন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে চাইছে। কিন্তু ভয় যাদের পেয়ে বসেছে তারা কোথাও নিরাপত্তা পাবে না। পুলিস ও সৈন্য এদের কি নিরাপত্তা দিতে পারে? পুলিস ও

সৈন্যের উপর নির্ভর করার অর্থ হ'লো নিজেদের অসহায়তাকে সাহায্য করা। পুলিস ও সৈন্য এরকম লোকদের কি সাহায্য দিতে পারে? তিনি এখানে মুসলমান গ্রামবাসীদের মধ্যে থাকবেন, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবেন, তাদের তিনি তাঁর মনের কথা জানাবেন। যখন তাঁরা পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারবেন, তখনই আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

শ্রীরামপুরে আসবার পর গান্ধীজী শামসুদ্দিন সাহেব ও অন্যান্যদের কতিপয় বৈঠকে মিলিত হলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় ত্রিশজন প্রতিনিধির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলেন। এর ফলে তাঁরা শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে একটি পরিবেশ গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন। মুসলিম লীগের মন্ত্রীরাও এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্যে আন্তরিক সদিচ্ছা জানালেন।

গান্ধীজী চণ্ডীপুরে ২৩শে নভেম্বর একটি সভায় বললেন, "এঁরা নির্বাচিত মুসলমান যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন। তাঁরা যখন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তখন তাঁরা আবার হাঙ্গামা বাধলে নীরবে তা দেখবেন না। হিন্দুদের প্রতি আমার পরামর্শ হ'লো এই যে, তাঁদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রেখে তা একবার যাচাই ক'রে দেখা। এর অর্থ এই নয় যে, পূর্ববঙ্গে আর একটিও বদ মুসলমান থাকবে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালো লোক আছে, মন্দ লোক আছে। অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ যে কোনও মন্ত্রিসভা বা যে কোনও সংস্থাকে ভেঙে দিতে পারে। যদি আপনারা প্রকৃত শান্তি চান, তবে পরস্পর বিশ্বাস ও আস্থা ছাড়া গত্যন্তর নেই। লোকে বলছে, বিহার নোয়াখালির শোধ নিয়েছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পূর্ববঙ্গের বা সারা ভারতের মুসলমানরা যদি বিহারের শোধ নিতে চায় তবে ভারতের অবস্থা কি হবে? যাই হ'ক, মন্দের

মন্দ ঘটে যদি তবে আপনারা কেবল আপনাদের জীবন হারাতে পারেন। আপনারা তা বীরের মতোই করবেন। শামসুদ্দিন সাহেব ও তাঁর সঙ্গীরা যা বলছেন, তা যদি তাঁদের মনের কথা না হয়, তাও আপনারা জানতে পারবেন। আমিও সেই শোচনীয় ঘটনা চোখে দেখবার জন্য বেঁচে থাকতে চাই না।”

২৩শে নভেম্বর মীরাটে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হ'লো। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও গান্ধীজী তাতে যোগ দিতে গেলেন না। সাতাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ গান্ধীজী এখন রোজ আঠারো ঘণ্টা ক'রে কাজ করতে লাগলেন। তিনি রোজ গ্রামের পথ ও সাঁকোর উপর দ্রুত হাঁটা অভ্যাস করতে ও বাংলা শিখতে লাগলেন। তাঁর হাঁটার গতির দ্রুততা বেশ বৃদ্ধি পেলো। শ্রীরামপুর থেকে বিশ বর্গ মাইল নিয়ে তাঁর শান্তি-অভিযান চললো। পনেরজন কর্মী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে রামগঞ্জ থানার বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি-অভিযান চালিয়ে হিন্দুদের মনে সাহস সঞ্চার করতে লাগলেন। গান্ধীজী নিজে হয় পায়ে হেঁটে, নয় নৌকায় উপদ্রুত অঞ্চলগুলি ঘুরে বেড়ালেন। তিনি প্রতিটি শরণার্থী-শিবির ঘুরে দেখলেন, সকলকে সান্ত্বনা দিলেন, ভরসা দিলেন, সাহস দিলেন। তাঁর উপাসনা-সভাগুলিতেও নিত্য লোকসমাগম বাড়তে লাগলো; হিন্দুদের মধ্যে আবার প্রাণের সঞ্চার দেখা দিতে লাগলো। তারা এসে উপাসনা-সভায় রামধুন গাইতে লাগলো। পক্ষকালের মধ্যে দূর দূর গ্রাম থেকেও হিন্দুরা নাম-সংকীর্তন করতে করতে আসতে লাগলো। অনেকে উপাসনা-সঙ্গীতগুলির সঙ্গে খোল বাজিয়ে সংগত করলো। তবু সারা আবহাওয়া থেকে ভীতি ও সংশয় গেল না। গান্ধীজী বললেন, “আমার সারা জীবনে এমন আঁধার আমি কোনদিন অনুভব করিনি। রাত্রিকালও যেন বেশ দীর্ঘ মনে হয়। একমাত্র সান্ত্বনা হ'লো যে, আমি বিভ্রান্ত বা হতাশ বোধ করিনি। আমি যে কোনও অবস্থায়

জন্যে প্রস্তুত আছি। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"-র এখানেই পরীক্ষা হবে। এখানে "করেঙ্গে" মানে হিন্দুরা ও মুসলমানরা একত্রে শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে বাস করতে শিখবে। অন্যথায় ঐ চেষ্টায় আমি মরব।. সত্য, এটি একটি কঠিন কাজ। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

২রা ডিসেম্বর গান্ধীজী সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদের বল্‌লেন, "অধিবাসী-বিনিময়ের প্রশ্নটি চিন্তা ও কার্যের অতীত। এ প্রশ্নটি আমার মনে কখনও দেখা দেয় নি। প্রত্যেকটি প্রদেশে, প্রত্যেকেই ভারতীয়, সে হিন্দু, মুসলিম বা যে কোনও ধর্মাবলম্বীই হ'ক। পুরোপুরি পাকিস্থান এলেও এর অন্যথা হবে না। আমার কাছে, এরকম কোন জিনিসের অর্থ হবে ভারতীয় বিচক্ষণতা ও কূটনীতির দেউলিয়াপনা। এইরকম কোন ব্যবস্থায় যুক্তিসঙ্গত ফলাফল যা হবে, তা ভাবতেও ভয় হয়। এতে ভারতকে কৃত্রিমভাবে অনেকগুলি ধর্মীয় অঞ্চলে ভাগ করা হবে না কি ?"

২১শে ডিসেম্বর গান্ধীজীর শ্রীরামপুরে একমাস বাস পূর্ণ হ'লো। ঐ দিন তিনি উপাসনা-সভায় বললেন, তিনি দান সম্পর্কে খুবই কঠোর মতামত পোষণ করেন। কাউকে যে কিছু দান করে বা যে সে দান গ্রহণ করে, উভয়েই অন্যায় করে। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের সমস্ত অঞ্চল থেকেই লোকে নোয়াখালির উপদ্রুত অধিবাসীদের অর্থ ও অন্যান্য সকল প্রকার বস্তু দিয়ে সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু এতে নোয়াখালিবাসীদের অপরের দানের উপর নির্ভর করবার একটি মনোবৃত্তি গ'ড়ে উঠতে পারে। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, আজ যারা শরণার্থী-শিবিরে এসে ভীড় করছে, তারা তা নিজেদের দোষে করছে না। তাদের গৃহগুলি ভস্মীভূত হয়েছে, তারা আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে ; অনেকের কুটিরগুলি হয়তো আজও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের ধনসম্পত্তি সব লুণ্ঠিত হয়েছে ; আর এক দল রয়েছে যারা নিরাপত্তার

অভাববোধের জন্যেই গৃহত্যাগ করেছে। সরকারের উচিত হবে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং জনসাধারণকে নিরাপত্তাবোধের সঙ্গে গৃহে ফিরে আসতে সাহায্য করা।...যতোদিন না সে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, ততোদিন সাহায্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, যেসব দাতব্য-সংস্থা এখানে কাজ করছেন, তাদের খোলাখুলি লোকদের ব'লে দেওয়া উচিত, তাঁরা যেন প্রত্যেকে বিনা সাধু পরিশ্রমে একবার খাদ্যগ্রহণকেও অসম্মানজনক মনে করেন। ধনী ও দরিদ্র, উভয়েই আজ সর্বহারা। তাঁদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকটি সুস্থ নরনারী বা বালক-বালিকা যদি তাঁদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে কাজ না করেন, তবে সমাজকে তাঁরা বঞ্চিত করবেন। সুতরাং তাঁদের উচিত হবে, সরকারের কাছ থেকে সমাজের পক্ষে হিতকর কাজ চাওয়া যা তাঁরা করতে পারবেন।"

এই সময়ে একশ্রেণীর লোকে প্রচার করতে থাকে যে, গান্ধীজী বাংলাদেশে মুসলিম সরকারকে অপদস্থ করবার জন্যেই নোয়াখালিতে রয়েছেন। গান্ধীজী ২৩শে ডিসেম্বর এর প্রতিবাদে বললেন যে, তিনি পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্যেই নোয়াখালিতে এসেছেন, মুসলিম সরকারকে অপদস্থ করবার কোন মতলব তাঁর নেই। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা বা সরকারী কর্মচারীদের সকলের সঙ্গেই তাঁর সৌহার্দ্য রয়েছে এবং তাঁরা সকলেই তাঁর এই শান্তি-অভিযানকে ভালো চোখেই দেখেন। তিনি বিহারে কেন যান নি, তার উত্তরে বললেন, তিনি বহু দূরে থেকেও বিহারে তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। বিহারে অবস্থা যদি আজও আয়ত্তাধীন না হ'তো, তবে তিনি নিশ্চয় বিহারে যেতেন।

২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন, যিশুর জন্মদিন। ঐ উপলক্ষে একটি মিশনারী-সংস্থা তাঁকে কতকগুলি উপহার পাঠান। উপহার-

গুলির মধ্যে সিগারেট, তাস, সাবান প্রভৃতিও ছিল। গান্ধীজী ঐদিন বেশ খোসমেজাজে ছিলেন। তিনি ঐ জিনিসগুলিকে একটি মাতুরে ঢেলে একে একে জিনিসগুলি উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। পণ্ডিত জওহরলালের আসবার কথা ছিল। তাই তিনি সিগারেটগুলি তাঁর জন্মে রেখে দেন।

১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারি শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর থাকবার দেড়মাস পূর্ণ হ'লো। তিনি কয়েকদিন পূর্বে শ্রীরামপুর ছেড়ে নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে যে পরিক্রমার কথা ঘোষণা করেছিলেন, ২রা ডিসেম্বর থেকে তা শুরু হ'লো। ২রা ডিসেম্বর সকালে তিনি তাঁর এই বিখ্যাত "তীর্থযাত্রায়" বেরুলেন। হাতে একখানি দীর্ঘ বাঁশের লাঠি নিয়ে ও অন্য হাত তাঁর সঙ্গীদের কাঁধে রেখে এই সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চললেন। সঙ্গে তিনি মাত্র দু-একজন সঙ্গীকেই নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সর্বত্র শত শত গ্রামবাসী তাঁর সঙ্গে চললো। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আবদুল্লা আটজন সশস্ত্র পুলিস নিয়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। গান্ধীজী তাঁর এই ধরনের রক্ষাব্যবস্থায় বারবার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সরকার তাঁর মহামূল্য জীবনের নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নি। ফলে গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ করা বন্ধ করেছিলেন। এক জায়গায় গ্রামবাসীরা তাঁকে জানালো যে, একদল মুসলমান তাঁর কাছে আসতে চায়, কিন্তু পুলিস দেখে তারা সাহস পাচ্ছে না। গান্ধীজী এই কথা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানালে তিনি পুলিসদের গান্ধীজীর আগে আগে দূরে দূরে যেতে নির্দেশ দিলেন। বেলা ৯টায় গান্ধীজী চণ্ডীপুরে পৌঁছলেন। তিনি বিকালে উপাসনা-সভায় ঘোষণা করলেন যে, এখনো তাঁর পরিক্রমা ঠিকমতো আরম্ভ হয় নি। তিনি এখানে তিন-চারদিন থাকবেন। তারপর শ্রীসতীশ দাশগুপ্তের ব্যবস্থামতো পরিক্রমা শুরু করবেন।

৭ই জানুয়ারি সকাল থেকে গান্ধীজীর "একটি দিন একটি গ্রাম" সফর শুরু হ'লো। সওয়া সাতটায় তিনি তাঁর কুটির থেকে বেরিয়ে এলে চণ্ডীপুরে যে পরিবারের বাড়িতে তিনি ছিলেন, তাঁদের মেয়েরা তাঁকে মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে ললাটে সিঁদুর-চন্দনের ফোঁটা দিয়ে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বিদায় দিলেন। সতীশ দাশগুপ্ত আগে আগে চললেন। তাঁর পেছনে পেছনে চললেন গান্ধীজী। গান্ধীজীর পেছনে অগণিত গ্রামবাসী। পথে মেয়েরা তাঁকে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। গান্ধীজীর পা ফাটা থাকা সত্ত্বেও তিনি নগ্নপদে মেঠো পথে পরবর্তী গ্রাম মসিমপুরের উদ্দেশে এগিয়ে চললেন। পথে তিনি তিন জায়গায় থামলেও এই আড়াই মাইল পথ দেড় ঘণ্টায় অতিক্রম করলেন। গান্ধীজী বেলা নটায় মসিমপুরে পৌঁছে তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসূচীগুলি সম্পন্ন করলেন। বিকাল চারটায় তিনি প্রায় দু হাজার লোকের উপস্থিতিতে তাঁর উপাসনা-সভায় ভাষণ দিলেন। উপাসনার পর তিনি ঘণ্টাখানেক স্থানীয় মুসলিম পল্লীতে কুটিরে কুটিরে ঘুরে বেড়ালেন। সাড়ে ছটায় তিনি তাঁর সেদিনের বাসায় ফিরলেন; দু ঘণ্টা কাজ করলেন, তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। চারঘণ্টা ঘুমিয়েই তিনি ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠলেন। চিঠিপত্রের জবাব দিলেন। সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গীতা পাঠ করলেন। পাঁচটার সময় গরম জলের সঙ্গে মধু খেলেন। কিছুক্ষণ বাদে কিছুটা ফলের রস খেলেন। তারপর সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বিশ্রাম করলেন।

৭টা ৪০ মিনিটে আবার তিনি নগ্নপদে হেঁটে মসিমপুর ত্যাগ ক'রে পরবর্তী গ্রাম ফতেপুরে পৌঁছলেন। এইভাবে নিয়মিত গ্রাম থেকে গ্রামে সফর চলতে লাগলো। এই সময় গান্ধীজী রোজ বিশ ঘণ্টা ক'রে কাজ করতেন। মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমাতেন। পরদিন তিনি ফতেপুর গ্রাম থেকে দাসপাড়া গ্রামে পৌঁছলেন।

পরদিন তিনি জগৎপুর গ্রামে গেলেন। জগৎপুর থেকে গেলেন লামচর। লামচর থেকে ১২ই জানুয়ারি করপাড়া পৌঁছলেন। ঐদিন নির্মলকুমার বসু সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে, গান্ধীজী এ পর্যন্ত রোজ ভোর দুটো থেকে কাজ শুরু করতেন; তাঁর দুর্বল শরীরের পক্ষে তা সম্ভব হবে না। এখন থেকে তিনি ভোর তিনটেয় কাজ শুরু করবেন। সর্বভারতীয় ব্যাপারে চিঠিপত্রের তিনি আর জবাব দিতে পারবেন। তিনি তাঁর কর্মশক্তিকে নোয়াখালি ও অনুরূপ উপদ্রুত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। ১৩ই জানুয়ারি গান্ধীজী সাহাপুর গ্রামে এবং পরদিন ভাটিয়ালপুর গ্রামে পৌঁছলেন। এখানে তিনি যে বাড়িতে ছিলেন, সেখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহটিকে স্বহস্তে মন্দিরে পুনঃস্থাপিত করেন। কয়েকজন মুসলমান যুবক তাকে প্রশ্ন করলো যে, তিনি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন কেন। গান্ধীজী বললেন, তিনি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের বিরোধী নন; কিন্তু কোন পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র পৃথকভাবে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি ক'রে অখণ্ড ভারতের ক্ষতি করবে, তিনি তার বিরোধী। কেউ তার বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করবার স্বাধীনতা অপরকে দিতে চায় না। গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়, ভারতের স্বাধীনতার পথে যখন পাকিস্থানের প্রশ্ন বিঘ্নস্বরূপ হয়েছে, তখন পাকিস্থান মেনে নিতে আপত্তি কেন? গান্ধীজী তার উত্তরে বললেন, "ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পরই কেবল পাকিস্থান মেনে নেওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। তার আগে ওঠার অর্থ বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য। আজাদ ও পাকিস্থান, দুয়ের জন্যেই চাই আগে বিদেশী শক্তির বিতাড়ন। ভারতবর্ষ যতোদিন না স্বাধীন হচ্ছে, ততোদিন অন্য কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।"

পরদিন ১৫ই জানুয়ারি তিনি নারায়ণপুর গ্রামে যান এবং সেখানে একজন মুসলমানের বাড়িতে আশ্রয় লন। মুসলমানটির

আন্তরিকতায় তিনি অত্যন্ত আনন্দবোধ করেন। মুসলমানটি গান্ধীজীকে তাঁর পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। কিন্তু পর্দানসিন মেয়েরা আলাপ করতে লজ্জা বোধ করলেন। গান্ধীজী তখন পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। যতোদিন ভারতের অর্ধাংশ নারীজাতি পুরুষের দাসত্ব করবে, ততোদিন ভারত কখনই প্রকৃত স্বাধীনতা পাবে না। পরদিন তিনি দশঘরিয়া গ্রামে যান। পরদিন পারকোটে পৌঁছেন। এইভাবে "একটি দিন একটি গ্রাম" সফর চলতে থাকে। ২০শে জানুয়ারি গান্ধীজী শিরণ্ডি পৌঁছেন। এখানে তাঁর আশ্রমবাসিনী জনৈকা মুসলিম মহিলা মিস্ আমতুস্ সালাম মন্দিরের অপহৃত পবিত্র খড়গটি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবীতে অনশন করছিলেন। তাঁর অনশনের ২৪-তম দিবস চলছিল। গান্ধীজী শিরণ্ডি পৌঁছেই মিস্ আমতুস সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিস্ সালাম অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, কথা বলবার মতো শক্তিও তাঁর ছিল না। গান্ধীজী এখানে সমবেত মুসলিমদের এক সভায় পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেন। যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা না করেন, তবে তিনি নিজেই অনশন করবেন। স্থানীয় বিশিষ্ট মুসলমানরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে এ বিষয়ে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি মিস্ আমতুস সালামকে অনশন ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন। রাত্রি সাড়ে নটায় একজন মৌলবীর কোরানপাঠের মধ্যে গান্ধীজী মিস্ সালামকে নিজ হাতে কমলার রস দেন। মিস্ আমতুস সালাম অনশন ভঙ্গ করলে গান্ধীজী উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। শিরণ্ডি থেকে গান্ধীজী কেতুরি ও কেতুরি থেকে পানিয়ালা যান। এখানে কয়েকদিন আগে মুসলিম, হিন্দু ও অস্পৃশ্যরা একটি ভোজে মিলিত হয়েছিলেন। এই মিলনোৎসবে গান্ধীজীর অংশগ্রহণের

ইচ্ছা থাকলেও তাঁর সফরসূচী অনুসারে তা সম্ভব হয় নি। গান্ধীজী পানিয়ালা এসে তাই বিশেষ আনন্দ লাভ করলেন। এখানেই সর্বাধিক সংখ্যক লোক তাঁর উপাসনা-সভায় যোগ দিয়েছিল। গান্ধীজী বললেন, তাঁদের এই মিলনোৎসবের জন্যে তিনি খুবই আনন্দিত, কিন্তু তাঁরা যদি স্থায়িভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন গড়ে তুলতে পারেন, সেটিই হবে সবচেয়ে আনন্দের। এই উদ্দেশ্যেই মিস্ আমতুস সালাম ও তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন।

২৩শে জুলাই তিনি ডালটা গ্রামে পৌছেন। এখানে একজন তপসিলভুক্ত হিন্দুর গৃহে তিনি আতিথ্যগ্রহণ করেন। এই গ্রামের চৌধুরীরা তাঁকে তিনি যেখানে উপাসনা-সভা করেছিলেন সেই স্থানটি ধর্ম ও দল নির্বিশেষে জনহিতকর কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে দান করেন। ঐদিন ছিল সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। এই শুভদিনে একজন তপসিলভুক্ত ব্যক্তির অতিথিসংকার এবং চৌধুরীদের এই দান তাঁকে বিশেষভাবে আনন্দ দিয়েছে বলে তিনি বলেন। গান্ধীজী বলেন, নেতাজী বসু কেবল হিন্দু ছিলেন না, কেবল বাঙ্গালী ছিলেন না, তিনি নিজেকে কখনও উচ্চবর্ণের হিন্দু ব'লেও মনে করেন নি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে একজন ভারতবাসী। গান্ধীজী নেতাজীর দেশপ্রেমের জন্য উৎসর্গীকৃত মহান্ জীবনের তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেন।

২৪শে জানুয়ারি তিনি মুরাইম গ্রামে হবিবুল্লা পাটোয়ারির বাড়িতে ওঠেন এবং আবার একজন মুসলমানের আতিথ্যলাভ ক'রে বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন। এখানে তিনি উপাসনা-সভায় বলেন, আজকাল খবরের কাগজগুলি কোরান বাইবেল ও গীতার স্থান নিয়েছে। কিন্তু অনেক সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসার বিষ ছড়াচ্ছে। পরদিন তিনি হীরাপুর গ্রামে যান। হীরাপুর থেকে যান বানসায়। ঐদিন ছিল ২৬শে জানুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস।

গান্ধীজী ঐদিন তাঁর উপাসনা-সভায় বললেন, স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ লোক অংশ নিয়েছে। ভারতের দুর্ভাগ্য না হ'লে, যাঁরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা সগৌরবে এখানে তেরঙ্গা পতাকা উড়তে দেখতে পেতেন। গান্ধীজী তাঁদের ঐ পতাকা এখন উড়াতে বারণ করেন। কারণ, ঐ পতাকা সারা ভারতের। ভারত আজ বিভক্ত। দুঃখের কথা, মুসলমান ভাইয়েরা ঐ পতাকার জন্যে এখন গর্ব বোধ করেন না। অনেকে ঐ পতাকাকে বিদ্বেষের চোখে দেখেন। সুতরাং ঐ পতাকা তিনি তাঁদের মুখের উপর ওড়াতে চান না।

পরদিন তিনি পাল্লাগ্রামে এক তাঁতীর বাড়িতে ওঠেন। এজন্যে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি এখানে বলেন, তিনি আসবার পথে অসংখ্য বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত বাসগৃহ, বিদ্যালয়, বাজার দেখে এসেছেন। অনেক জায়গায় দেখেছেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সন্দেহের বিদ্বেষ ও অসহযোগিতার ভাব। কিন্তু এতে হিন্দুর বা মুসলমানের, কার লাভ হয়েছে? চাষারা ঠিকমতো চাষ-আবাদ করছে না, দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়ছে সারা দেশে; গ্রামগুলি নোংরা অপরিচ্ছন্ন; পানীয় জল নেই; ভগবান্ যেন হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিতভাবে এইসব সমস্যায় মোকাবিলা করবার মতো বুদ্ধি ও শক্তি দেন। ২৮শে জানুয়ারি তিনি চর্টাখিলে পৌঁছেন। চর্টাখিল থেকে জোয়াগ, জোয়াগ থেকে আমকি, আমকি থেকে নবগ্রাম, নবগ্রাম থেকে আমিষপাড়া, আমিষপাড়া থেকে সাতঘরিয়া, সাতঘরিয়া থেকে মাধুরখিল। ৩রা ফেব্রুয়ারি মাধুরখিলে পৌঁছবার পর গান্ধীজীর সফরের প্রথম পর্যায় শেষ হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে আবার তাঁর "একটি দিন একটি গ্রাম" সফর শুরু হয়। তবে তিনি মাধুরখিলে ও পরের দু-একটি গ্রামে দু দিন ক'রে কাটাতে চান।

মাধুরখিলে দু-দিন দু-রাত্রি কাটাবার পর গান্ধীজী পুনরায়

পদব্রজে তাঁর সফর শুরু করলেন। তিনি ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে মেঠো পথ দিয়ে চল্লিশ মিনিটে দু মাইল অতিক্রম ক'রে শ্রীনগরে গিয়ে পৌছলেন। ঐদিন তিনি একটি বিরাট উপাসনা-সভায় ভাষণ দিলেন। পরদিন তিনি ধরমপুরে পৌছলেন। বিজয়নগরে তিনি দু দিন রইলেন। এখান থেকে তাঁর গোপীনাথপুর যাওয়ার কথা ছিল এবং তাঁকে বলা হয়েছিল, গোপীনাথপুর এখান থেকে দেড় মাইলের কম পথ হবে। কিন্তু গান্ধীজী যখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট হেঁটেও গোপীনাথপুরের নাগাল পেলেন না, তখন তিনি আর এগুতে চাইলেন না। তিনি আবার বিজয়নগরে ফিরে এলেন। এইভাবে তাঁকে একটানা প্রায় দেড় ঘণ্টা হাঁটতে হ'লো। তাঁর বয়স ও শরীরের পক্ষে এটা ছিল অত্যধিক। গান্ধীজী তাঁকে ভবিষ্যৎ দূরত্ব সম্পর্কে সঠিক খবর দিতে অনুরোধ করলেন। গান্ধীজী বিজয়নগর থেকে হামবাদি ও কাফিয়াটলি হয়ে পূর্ব কেরোয়া গেলেন। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি ভাগ-চাষীদের তেভাগার দাবী সমর্থন করলেন। কৃষিতে সমবায়-প্রথার উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি তাতেও সমর্থন জানালেন। গান্ধীজী কেরোয়া থেকে গেলেন রায়পুর, রায়পুর থেকে দেবীপুর। ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি নোয়াখালি থেকে সন্নিহিত ত্রিপুরায় প্রবেশ করলেন। এখানে আলুনিয়ায় তাঁর কাছে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের তিনি উত্তর দিলেন। প্রশ্নটিতে বলা হয়েছিল, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বা মুসলিম লীগ সরকার ক্ষতি-পূরণ দিতে রাজী হ'লে সে ক্ষেত্রে গান্ধীজী হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ সমর্থন করেন কি না। গান্ধীজী বলেন, কেবল মুসলমানপ্রধান প্রদেশে নয়, হিন্দুপ্রধান প্রদেশেও তিনি ঐ ব্যবস্থা সমর্থন করেন। কারণ, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি এমন বৈরী-মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকে, তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্যে কি ব্যবস্থাই বা সরকার করতে পারে?

পরদিন ১৮ই ফেব্রুয়ারি, চরহুখিয়ায় তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে বৈরী-ভাবাপন্ন হয়ে উঠলে গান্ধীজী তাদের বাস্তুত্যাগ সমর্থন করছেন। কিন্তু একথাও বলেছেন যে, সত্যিকার অহিংস কোনও ব্যক্তি কখনই প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয় পরিবর্ত্তনের আশা ত্যাগ করবে না। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে কি-ভাবে অহিংসায় বিশ্বাসী কেউ পরাজয় স্বীকার ক'রে নিয়ে বাস্তু ত্যাগ করতে পারে? গান্ধীজী জবাবে বলেন, অহিংসায় বিশ্বাসী কেউ কখনই এক পাও নড়বে না। তার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও ওঠে না। সে তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে প্রাণ দেবে এবং প্রমাণ ক'রে দেবে সে কোনও সরকার বা সম্প্রদায়ের শত্রু নয়। কিন্তু নোয়াখালির হিন্দুরা সাধারণ সরল মানুষ, তাঁরা সুখে শান্তিতে এ পৃথিবীতে দুদিন বাঁচতে চান। অহিংসায় বিশ্বাসী কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, তা তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গান্ধীজী সেই সঙ্গে বললেন, ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, হিন্দু ও মুসলমান শান্তিতে পাশাপাশি বাস করতে জানে।

গান্ধীজী চর লড়ুয়া ও কমলপুর, চর সোলাদি হয়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারি হাইমচরে এসে পৌঁছলেন। এখানে সমবেত নমঃশূদ্রদের তিনি পতিত বা অস্পৃশ্য ভাবতে নিষেধ করলেন। তাঁরা আজ যা হয়েছেন, তা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অন্যায়ের ফল। তাঁরা নিজেরা যদি তা উপলব্ধি করেন, তবে উচ্চবর্ণের অন্যায় কার্যের অনুকরণ তাঁরা করবেন না।

গান্ধীজীর নোয়াখালিতে থাকার ব্যাপারে একদল লোক বিরোধিতা করছিল। তাঁর উপাসনা-সভাগুলি বর্জন করবার জন্যে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এমন কি ফজলুল হকের মতো লোকও নাকি বলেছিলেন যে, গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মিলনের পথ প্রশস্ত করছেন না, তাদের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষই গ'ড়ে তুলছেন। বিশেষতঃ মুসলমান মৌলবীরা ইসলাম সম্পর্কে

গান্ধীজীর ব্যাখ্যা ও কোরান থেকে প্রায়ই উদ্‌ধৃতিদানকে ভালো চক্ষে দেখে নি। এই বিরোধিতা ক্রমেই প্রকাশ্য হয়ে উঠলো। অনেক সময় গান্ধীজী যে পথে সফরে যাবেন, সে পথকে ইচ্ছাকৃত-ভাবেই নোংরা ও অশুচি ক'রে রাখা হ'তো; মুসলিমরা এখন তাঁর উপাসনা-সভা বর্জন করতে লাগলো। গান্ধীজী এইসব জিনিস ধৈর্যের সঙ্গেই উপেক্ষা ক'রে যাচ্ছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের এই ভ্রান্তিমূলক ব্যবহার তাঁকে মুসলমানদের সম্পর্কে আরও সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু এই সময় ডঃ সৈয়দ মামুদের কাছ থেকে একটি পত্র এসে পৌঁছলো। তাতে ডঃ মামুদ লিখেছিলেন যে, গান্ধীজী যদি বিহারে যান, তবে সেখানকার নিপীড়িত সংখ্যালঘু মুসলমানদের খুবই উপকার হয়। কয়েকদিন আগে তাঁকে সর্দার নিরঞ্জন সিং গিলও জানিয়েছিলেন যে, বিহারের অবস্থা আশানুরূপ নয়। গান্ধীজী অবিলম্বে নোয়াখালি ত্যাগ ক'রে বিহার যাবেন স্থির করলেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন। গান্ধীজী ঐদিন একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, একদিন বাংলাকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল; কিন্তু এখন যদি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে মুসলিমপ্রধান ও হিন্দুপ্রধান দুই অংশে বিভক্ত করা হয়, তাতে তাঁর মত কি। গান্ধীজী বললেন, তিনি নীতিগত ভাবে সর্বদাই বিভাগের বিরোধী। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করে পৃথক্ হয়ে যায়, এটা নূতন কিছু নয়। তিনি জোর ক'রে কোনও ঐক্য চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধী। ভারতবর্ষকে হিন্দুরা যদি সংখ্যাগুরুত্বের জোরে অখণ্ড রাখতে বাধ্য করে, তিনি তারও বিরোধিতা করবেন। তিনি বলপ্রয়োগে দেশবিভাগের যেমন বিরোধী, তেমনি বিরোধী বলপ্রয়োগে দেশে অখণ্ডতা ও ঐক্য রক্ষার।

গান্ধীজী বিহার রওনা হওয়ার জন্যে জীপে ক'রে চাঁদপুরে

এলেন। তিনি নোয়াখালিতে যে সাত সপ্তাহ সফর ক'রেছিলেন, তাতে তিনি খালিপায়ে ১১৬ মাইল হেঁটেছিলেন এবং ৪৬টি গ্রাম ঘুরেছিলেন। ২রা মার্চ তিনি জাহাজযোগে চাঁদপুর ত্যাগ করলেন এবং বিহার রওনা হলেন। এইভাবে নোয়াখালিতে গান্ধীজীর বিখ্যাত পদযাত্রা শেষ হ'লো।

বিহার যাওয়ার পথে গান্ধীজী কলকাতা হয়ে ৪ঠা মার্চ সোদপুর এলেন। সোদপুরে উপাসনা-সভায় তিনি জানালেন যে, কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী ৬ই মার্চ দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্যে তারবার্তা পাঠিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁকে নিজের অসামর্থ্যের কথা জানিয়েছেন। কারণ, এখন তাঁর স্থান বিহারে। তিনি আরও বললেন, এতো তাড়াতাড়ি তাঁকে নোয়াখালি থেকে চ'লে আসতে হবে, তিনি ভাবতেও পারেন নি। কারণ, নোয়াখালিতে তাঁর কাজ এখনও অসমাপ্ত। কিন্তু ডঃ সৈয়দ মামুদের পত্র থেকে তিনি বুঝেছেন, বিহারের অবস্থা নোয়াখালির চেয়েও খারাপ। তাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান সবাই সমান। তাই তিনি নোয়াখালি ছেড়ে দ্রুত বিহারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গান্ধীজী ১৯৪৭ সালের ৫ই মার্চ পাটনায় পৌছলেন। তিনি দীর্ঘ সাত বছর বাদে বিহারে আসায় তাঁর উপাসনা-সভায় বিপুল জনসমাগম হ'লো। বিহার মন্ত্রিসভা গান্ধীজীর প্রার্থনান্তিক ভাষণ হাজার হাজার কপি ছেপে বিমানযোগে বিহারের সর্বত্র বিলির ব্যবস্থা করলো। গান্ধীজী বললেন, কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা সমগ্র ভারতের সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই যে কোনও শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক কোনও দুষ্কার্য করলে কংগ্রেস তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। অনেক কংগ্রেস-সেবী নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে মুসলমানদের রক্ষা করেছেন। গুণ্ডাশ্রেণীর লোক এইসব দুষ্কার্য করেছে, এই ধরনের আত্ম-

সন্তুষ্টির কোনও কারণ নেই। বিহারের হিন্দুরা যা করেছে তা-ই নোয়াখালিতে মুসলমানদের অনুষ্ঠিত বর্বরতার স্রোত ব্যাহত করেছে, এ ধারণাও ভুল। বর্বরতার অনুকরণ ক'রে বর্বরতার স্রোত কখনও বন্ধ করা যায় না। ভারতবর্ষকে যদি প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে হয়, তবে তাকে এই বর্বরতা ত্যাগ করতে হবে। এই বর্বরতার আশ্রয় ভারতের স্বাধীনতাকে কেবল ব্যাহত ও বিঘ্নিত করবে।

৬ই মার্চ গান্ধীজীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হ'লো যে, পরদিন দোলযাত্রার দিন। ঐদিন আবার মুসলমানদের উপর আক্রমণ হ'তে পারে ব'লে মুসলমানরা ভয় করছে। গান্ধীজী বললেন, এমন একদিন ছিল যখন হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি শান্তিতে বাস করতো। আজ যদি তাঁরা পরস্পরকে বন্ধু ব'লে মনে না করে, তবে অন্ততঃপক্ষে তারা পরস্পরের প্রতি বৈরী আচরণ থেকে বিরত থাকুক। তিনি বললেন, তিনি নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় যেসব ভয়াবহ ঘটনার কথা হিন্দুদের কাছে শুনেছিলেন, ঠিক সেই ধরনের ঘটনার কথা তিনি পাটনায় মুসলমানদের মুখে শুনছেন। তিনি নোয়াখালিতে হিন্দুদের যা বলেছিলেন, সে কথাই তিনি বিহারের মুসলিম ভাইদের বলবেন—মানুষের ভয় ছেড়ে ভগবানে বিশ্বাস রাখো। আজ "বন্দে মাতরম্", "জয় ভারত", "জয় হিন্দ" প্রভৃতি ধ্বনি মুসলমানদের আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তোলে। তবে কি "ভারতকী জয়ের" অর্থ হ'লো "মুসলমানকী ক্ষয়"? এটা খুবই লজ্জার কথা যে, অবস্থা আজ এইরূপ দাঁড়িয়েছে। তাঁর কাছে বহু মুসলমান এই প্রশ্ন তুলছেন যে, হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে তবে মুসলমানরা কি থাকতে পাবে না। ডঃ সৈয়দ মামুদের মতো কংগ্রেসসেবীরাও অস্বস্তি বোধ করছেন। ভাইয়ে ভাইয়ে এই হানাহানি তাঁদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। উন্মত্ততার জবাবে যদি উন্মত্ততাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে সারা ভারতবর্ষ রক্তের সমুদ্রে ভেসে যাবে।

গান্ধীজী উপাসনা-সভায় একথাও বললেন যে, তাঁর কাছে অভিযোগ এসেছে যে, বহু মুসলমান মেয়েকে হিন্দুর বাড়িতে এখনও আটক রাখা হয়েছে। যদি তা সত্য হয়, তবে অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ গৃহে পাঠিয়ে দিতে হবে। যারা এইসব দুষ্কার্য করেছে, তাদের প্রকৃত অনুতাপ করা দরকার। হিন্দুদের এইসব দুষ্কৃতকারীদের অনুতপ্ত হ'তে এবং শাস্তির সম্মুখীন হ'তে উৎসাহিত করা উচিত। দুষ্কৃতকারীরা অতদূর অগ্রসর হ'তে না চাইলে তারা যেন অপহৃত মেয়েদের আমার কাছে বা রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। হিন্দুদের কেবল মৌখিক অনুতাপ প্রকাশ বা অর্থে ক্ষয়পূরণ দান যথেষ্ট নয়। তাদের হৃদয়কে বিদ্বেষমুক্ত ক'রে ভালোবাসায় ও বন্ধুত্বে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে, যাতে মুসলমান নরনারী ও শিশু ওই মনের আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। হোলির উৎসবকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতিতে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে।

১০ই মার্চ গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় বললেন যে, অনেকে তাঁকে চিঠি লিখে এই অভিযোগ করছেন যে, তিনি তাঁর উপাসনা-সভাগুলিকে তাঁর প্রিয় রাজনৈতিক মতামত প্রচারের জন্যে ব্যবহার করছেন। মানুষের জীবনটা এমন যে তাকে পরস্পর বিভিন্ন অংশে পৃথক রাখা যায় না, তাই নীতির সঙ্গে রাজনীতিও জড়িত থাকে। তিনি তাঁকে লেখা একটি চিঠি প'ড়ে শোনালেন। তাতে লেখা হয়েছে যে, গান্ধীজী যে পরধর্মসহিষ্ণুতার কথা বারবার বলছেন, তা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। কারণ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ, তা ধর্মীয় মতভেদের কারণে নয়; তার কারণ রাজনৈতিক। ধর্মকে কেবল রাজনীতির বাইরের লেবেল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। চিঠিতে পত্রলেখক লিখেছেন, যাঁরা অখণ্ড ভারত চান, আর যাঁরা ভারতকে খণ্ডিত করতে চান, এ হ'লো তাঁদের মধ্যে লড়াই। গান্ধীজী বললেন, এটা যদি তথাকথিত রাজনৈতিক সংগ্রামই হয়ে থাকে, তবে কি সুনীতি, সৌজন্য, সুরুচি

সকল কিছুকে বিদায় দিতে হবে? যদি ভারতবাসীর নিজেদের মধ্যে প্রকৃত মতভেদ থাকে, তবে কি ভারতের চল্লিশকোটি মানুষকে পশুর পর্যায়ে নেমে আসতে হবে? তারা কি বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌজন্যপূর্ণ পরিবেশে তাদের মতানৈক্যের মীমাংসা করতে পারে না; এই সময় শ্রোতাদের মধ্যে গোলমাল হ'তে থাকলে তিনি ভাষণদান বন্ধ করেন। ঐদিন তিনি দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে শুরু করেন এবং সকলকে এই তহবিলে মুক্তহস্তে দান করবার জন্যে আহ্বান জানান। পরদিন তিনি জানান যে, এটি পাটনায় তাঁর শেষ প্রার্থনা-সভা। কারণ এখন থেকে তিনি প্রতিদিন পাটনা থেকে গ্রামাঞ্চলে সফরে যাবেন এবং শহরে রাত্রিতে ফিরবেন। তাই উপাসনা-সভাগুলি তাঁকে স্বভাবতঃ বাইরেই করতে হবে। তাঁর সাহায্য-তহবিলে প্রায় দু হাজার টাকা ওঠে এবং কিছু পরিমাণ গহনাও পাওয়া যায়।

পরদিন থেকে গান্ধীজী শহরের আশপাশের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। তিনি বহু লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত গৃহ ও মসজিদ দেখেন। পরদিন থেকে খান আবদুল গফুর খানও তাঁর সঙ্গে যান। গান্ধীজী আবদুল্লাকে তাঁর উপাসনা-সভায় বলেন, কেউ যদি মনে করে যে, বিহার নোয়াখালির প্রতিশোধ নিয়েছে, তবে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলবেন, এটা প্রতিশোধের পথ নয়। ভারতের এক অংশ অন্য অংশকে যদি শত্রু মনে করে, তবে তা আত্মহত্যার সামিল। এর দ্বারা দাসত্বকেই চিরস্থায়ী করা হবে।

এই সময়ে গান্ধীজীকে বিহার ত্যাগ ক'রে পাঞ্জাবে শান্তি-স্থাপনের জন্যে দ্রুত যাওয়ার জন্যে অসংখ্য আহ্বান আসতে থাকে। গান্ধীজী কিন্তু বিহারে থাকাই স্থির করেন এবং পাঞ্জাবে মুসলমান এবং হিন্দু ও শিখদের মধ্যে যাতে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়, সেজন্যে আবেদন জানান। ১৪ই মার্চ গান্ধীজী খসরুপুর নামে একটি ছোট শহরে যান। এখানে কয়েকটি সম্পন্ন মুসলমান

পরিবারের উপর আক্রমণ হয়েছিল। গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় বলেন যে, দেশের সামনে আজ দুটি পথ খোলা রয়েছে—একটি পাঞ্জাবের পথ যেখানে আঘাতের বিনিময়ে আঘাত দেওয়া হয়েছে; আর একটি সম্পূর্ণ অহিংসার পথ। তিনি বলেন, বল-প্রয়োগের দ্বারা হয়তো কোনও প্রদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা যেতে পারে; কিন্তু তা সাময়িক; তলে তলে সে আগুন অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়বে, এবং বিদ্বেষ ও ঘৃণা আরও গভীরে প্রবেশ করবে। বিহারের লোকেরা যদি মনে করে যে, হিংসার পথই বর্তমান সময়ে হিংসার একমাত্র জবাব, তবে সে কথা তারা অকপটে বলুক, তাতে তিনি দুঃখ পাবেন না। তিনি অহিংসার এই পরাজয় দেখবার জন্যে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করবেন। তাঁর চির-আদরের আদর্শের জন্যে কোথায় তিনি তাঁর জীবন বিসর্জন দেবেন, তাতে কিছু আসে যায় না। ভারতের যে কোনও অঞ্চলেও হ'ক তা তাঁর কাছে ভারতই থাকবে। কিন্তু তিনি আজও বিশ্বাস করেন যে, অহিংসাই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে। এ ক্ষেত্রে বিহার আজ যদি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে তবে তাতেই আমাদের এই হতভাগ্য দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ আশা নিহিত থাকবে।

১৭ই মার্চ গান্ধীজী মাসাউড়িতে যে প্রার্থনা-সভা করেন, তাতে প্রায় ত্রিশ হাজারের বেশি লোক যোগ দেয়। গান্ধীজী বলেন এখানে মুসলমানেরাই প্রথমে আক্রমণ করেছিল বলা হয়েছে। কিন্তু আক্রমণ প্রথমে যেই করুক, তিনি একথা ভেবে বিস্মিত ও বিচলিত হচ্ছেন যে হিন্দুরা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করবার মতো নীচে কিভাবে নামলো। নভেম্বর মাসে বিহারে নরনারী ও শিশুকে যে সংখ্যায় হত্যা করা হয়েছিল, তা নোয়াখালিকেও ম্লান করে দিয়েছে, যদিও নোয়াখালিতে যা ঘটেছে তা-ও কম নয়। তিনি চান বিহারের মানুষ শুধু "গান্ধীজীকী জয়" উচ্চারণ না ক'রে তারা অন্তরে সত্যই অনুতাপ বোধ করুক। তিনি

কেবল বিহারের হিন্দুদের অকৃপণ হস্তে সাহায্য-তহবিলে দান করতে বললেন না, সেই সঙ্গে তিনি দুষ্কৃতকারীদের এসে অনুতাপ প্রকাশ করতেও আহ্বান জানালেন।

পরদিন তিনি তাঁর প্রার্থনা-সভায় মাসাউড়িতে যে ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দেখে এসেছেন, তার উল্লেখ করেন এবং বিহারে "নোয়াখালি দিবস" পালনের উত্তেজনাই যে এর কারণ, তাও তিনি বলেন। আগামী ২৩শে মার্চ "পাঞ্জাব দিবস" পালনের কথা শুনে মুসলমানরা আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। তবে তাঁর বিশ্বাস এটা গুজব মাত্র। কারণ ঐরকম কোনও দিবস পালনের অর্থই হ'লো ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানিকে ডেকে আনা। তিনি মুসলমান ভাইদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, যদি ঐরকম কোনও ঘটনা সত্যিই ঘটে, তবে তিনি নিজে আগুনে আত্মাহুতি দেবেন।

পরের দু'দিন গান্ধীজী গ্রামাঞ্চলে সফরে অত্যন্ত দুর্বল থাকায় প্রার্থনা-সভা বন্ধ রাখেন। ২১শে মার্চ তিনি প্রার্থনা-সভায় গড়াইয়া-খড়িতে নরনারী ও শিশুকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার উল্লেখ করেন এবং উপস্থিত সকলকে নীরবতা পালন ক'রে শোক প্রকাশ করতে বলেন। তিনি বলেন, যে গৃহগুলি কয়েক মাস আগে মানুষের কলহাস্যে পূর্ণ ছিল, সেগুলি আজ পরিত্যক্ত, নির্জন। লোকে দলে দলে গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছে, আর ভাবছে তারা যে পাপ করেছে, তা ধুয়ে যাচ্ছে। *কিন্তু ঐসব বিধ্বস্ত ভগ্ন গৃহগুলি তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে, তারা অসহায় শিশু ও নারীদের হত্যা করেছে, তারা কিভাবে এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে?* গান্ধীজী বলেন, তাদের উচিত ঐসব ভগ্ন গৃহকে পুনরায় পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য ক'রে তোলা এবং মুসলমানদের কাছে তাদের অন্তরের প্রকৃত অনুশোচনা প্রকাশ ক'রে মুসলমানদের ঐসব গৃহে আবার ফিরিয়ে আনা। হয়তো মুসলমানরা বলবে যেখানে তাদের স্ত্রী-পুত্রকন্যা 'আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে

তারা কেমন ক'রে সেখানে ফিরে যাবে। তাদের একথা বলা অন্যায় নয়। কিন্তু দুষ্কৃতকারী বা তাদের আত্মীয়-স্বজন যদি প্রকৃত অনুতাপ বোধ করে তবে তাদের ফিরিয়ে আনাও অসম্ভব নয়। তিনি বলেন, তিনি যেদিন মাসাউড়ি যান, তার পরদিন প্রায় পঞ্চাশজন দাঙ্গার অভিযোগে অভিযুক্ত ফেরার ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি এদের প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন যে, নোয়াখালিতে অবস্থা আবার দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং ২৩শে মার্চ "পাকিস্থান দিবস" পালনের সংবাদে নোয়াখালির হিন্দুরা আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। নোয়াখালিতে তাঁর উপস্থিতি কামনা ক'রে অনুরোধ আসছে। তবে এই মুহূর্তে বিহার ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, বিহারে তিনি যদি সফল হন, তবে তার প্রভাব বাংলাদেশে, সম্ভবতঃ সারা ভারতেও, পড়বে। বিহারের মুসলমান ও বাংলাদেশের হিন্দুরা তাঁকে তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জামিনরূপে গ্রহণ করতে পারে। তিনি এখানে এসেছেন "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" এই শপথ নিয়ে।

গান্ধীজী মাসাউড়িতে উপদ্রুত অঞ্চলে দু'দিনব্যাপী সফর শেষ ক'রে ২২শে মার্চ পাটনায় ফিরে এলেন। তিনি প্রার্থনা-সভায় এ কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন এবং বিহার সরকার "পাঞ্জাব দিবস" "পাকিস্থান দিবস" প্রভৃতি পালন এবং কোনপ্রকার মিছিল বের করা নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

২৭শে মার্চ তিনি ওরকি গ্রামে তাঁর উপাসনা-সভায় বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রথম ঘোষণার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার জন্যে শেষ বড়লাট হিসাবে ভারতে এসেছেন। সকল প্রকার বৃটিশ ঘোষণা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তিনি বিপরীত কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত

সকল ঘোষণাকেই বিশ্বাস করেন। গান্ধীজী বলেন, তবে দেশে উন্মত্ততা আত্মপ্রকাশ করেছে, তার ফলে স্বাধীনতার এই সুবর্ণ ফলটি তাঁদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলেও যেতে পারে।

২৯শে মার্চ গান্ধীজী পরদিন তাঁর দিল্লী রওনা হওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং চার-পাঁচদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন বলে জানান। গান্ধীজী ৩০শে মার্চ দিল্লী রওনা হন।

১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল গান্ধীজী দিল্লীতে এশিয়ান রিলেশনস্ কন্‌ফারেন্স্-এ যোগ দিলেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে গান্ধীজী প্রশ্নোত্তরের আসরে কিছু বললেও ২রা এপ্রিল তিনি সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণে বললেন, "বন্ধুগণ, আপনারা প্রকৃত ভারতবর্ষ দেখেন নি এবং আপনাদের সম্মেলনও প্রকৃত ভারতবর্ষে হচ্ছে না। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, লাহোর—এ সমস্তই মহানগরী, সুতরাং সেগুলি পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত।···আপনারা যদি প্রকৃত ভারতবর্ষ দেখতে চান, আপনাকে তবে ভারতের গ্রামের দরিদ্র ভাঙ্গী পল্লীগুলি দেখতে হবে। ভারতে এরকম সাত লক্ষ গ্রাম আছে এবং আটত্রিশ কোটি লোক এইসব গ্রামে বাস করে। আপনাদের কেউ কেউ যদি ভারতীয় গ্রামগুলি দেখেন, তবে তা দেখে আকৃষ্ট হবেন না। আপনাদের গোবরগাদায় আঁচড় দিয়ে তার নিচে দেখতে হবে। আমি বলতে চাই না যে, এগুলি কখনও স্বর্গতুল্য ছিল। তবে, এখন ঐগুলি প্রকৃত গোবরগাদায় পরিণত হয়েছে। পূর্বে ঐগুলি এরকম ছিল না। আমি যা বলছি, তা ইতিহাস থেকে বলছি না, আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, তাই বলছি। আমি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি এবং নিষ্প্রভচক্ষু এই দুঃখী মানুষগুলিকে দেখেছি। এরাই ভারত।···প্রাচ্য প্রতীচ্যকে যে জ্ঞান দিয়েছে সে সম্পর্কেও গান্ধীজী বললেন, "এইসব জ্ঞানী লোকদের মধ্যে প্রথম হলেন জরথুস্ত্র। তিনি প্রাচ্যের

মানুষ। তাঁর পরে এলেন বুদ্ধ, তিনিও প্রাচ্যের, ভারতের। বুদ্ধের পরে কে এলেন? যিশু, তিনিও প্রাচ্য থেকে এলেন। যিশুর আগে এসেছিলেন মুশা। তিনি মিশরে জন্মালেও তিনি ছিলেন প্যালেস্টাইনের লোক। যিশুর পরে এলেন মহম্মদ। আমি কৃষ্ণ, রাম বা অন্যান্যদের কথা বলতে চাই না। তাঁরা যে কেউ কম তা নয়, তবে শিক্ষিত দুনিয়ায় তাঁরা কম পরিচিত। যাই হ'ক, আমি জানি না, এশিয়ার এইসব মানুষের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কেউ আছেন কি না। তারপর কি ঘটেছে? খ্রীষ্টধর্ম যখন পাশ্চাত্যে গেছে, তখন তা বিকৃত হয়েছে।...এশিয়ার বাণী কি, তা আমি আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করতে অনুরোধ করি। পাশ্চাত্যের মধ্য দিয়ে বা পারমাণবিক বোমা অনুকরণ ক'রে তা করতে পারবেন না। আপনারা যদি পাশ্চাত্যকে কোনও বাণী দিতে চান, তবে সে বাণী হবে প্রেমের বাণী, সত্যের বাণী। আমি আপনাদের কেবল মস্তিষ্কের কাছে আবেদন করতে চাই না, আমি আপনাদের হৃদয়ও জয় করতে চাই।..."

গান্ধীজী সম্মেলন থেকে যথাসময়ে উপাসনা-সভায় যোগদানের জন্যে ফিরে এলেন। কিন্তু পর পর দুদিন তাঁকে উপাসনা-সভা পরিত্যাগ করতে হ'লো। তিনি উপাসনা-সভা আরম্ভ করবার পূর্বে জানতে চাইলেন যে, এখানে এখন কেউ উপস্থিত আছেন কিনা যিনি কোরানপাঠে আপত্তি করেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে দু-তিনজন আপত্তি জানালো; তারা প্রশ্ন করলো যে, গান্ধীজী কোন্ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে হিন্দুমন্দিরে কোরান পাঠ করছেন? একজন যুবক উপাসনা-মঞ্চের দিকে এগিয়ে চললো। অন্যান্যরা তাকে বাধা দিলো। গান্ধীজী মঞ্চ থেকে যুবকটির দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, আমার ও ঐ যুবকটির মাঝখানে আপনারা কেউ আসবেন না। কিন্তু সভার লোকেরা যুবকটিকে ধাক্কা দিয়ে সভা থেকে বের ক'রে দিলো। গান্ধীজী দুঃখিত

হয়ে বললেন, "যুবকটি ক্রুদ্ধ হয়েছে। ক্রোধ স্বল্পস্থায়ী উন্মত্ততা-বিশেষ। আমার ও আপনাদের উচিত উন্মত্ততাকে উন্মত্ততা দিয়ে নয়, প্রকৃতিস্থতা দিয়েই প্রতিরোধ করতে হবে।" গান্ধীজী বললেন, "এই মন্দিরটি ভাঙ্গী-পল্লীর; ভাঙ্গীরা এতে আপত্তি করেন নি। তিনি নিজেও ভাঙ্গী; তাঁর এই মন্দিরে তাঁর ইচ্ছামত উপাসনা করবার অধিকার আছে। যারা কোরান-পাঠে আপত্তি করছে, তারা নিজেরা ভাঙ্গী নয়, ভাঙ্গী হতেও চায় না।"

গান্ধীজীকে উপাসনা-সভা চালাবার জন্যে সমবেত সকলে অনুরোধ করলেও তিনি তা করতে চাইলেন না, বললেন, যারা আপত্তি করেছে, তিনি তাদের কাছে আজও হার স্বীকার করলেন। কালও তিনি আবার এই প্রশ্ন করবেন এবং উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকবেন। পরদিন উপাসনা-সভা শুরু করবার আগে তিনি বললেন যে, তিনি এই মর্মে একটি চিঠি পেয়েছেন যে, হয় তিনি কোরানপাঠ বন্ধ করবেন, নয় বাল্মীকি-মন্দির ত্যাগ করবেন। তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রশ্ন করলেন কোরানপাঠে তাঁদের কারও আপত্তি আছে কি না। উত্তরে অনেকে হাত তুললো এবং বললো যে, গান্ধীজী কোরানপাঠ বন্ধ না করলে তাঁকে উপাসনা করতে দেবে না। গান্ধীজী উপাসনা বন্ধ রাখাই স্থির করলেন। সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন যে, তিনি যা কর্তব্য মনে করেন, তা সম্পাদনে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন না। কিন্তু তাঁর অহিংসা বলছে যে, যদি একটি বালকও তাঁর উপাসনা-সভায় আপত্তি করে, তবে তিনি উপাসনা-সভা বন্ধ রাখবেন। কিন্তু কেউ যেন একে তাঁর কাপুরুষতা ব'লে মনে না করেন। তিনি উপাসনা বন্ধ রাখলেন তর্কবিতর্ক ও হিংসা এড়াবার জন্যে। হিংসা শয়তানের কাজ এবং সমস্ত জীবন তিনি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি সেই সঙ্গে আরও বললেন

যে, যাঁরা তাঁর উপাসনা-সভা করার বিরোধী, তাঁরা যেন না আসেন। আর যদি আসেন কেবল তাঁরাই আসবেন এবং তাঁকে হত্যা করবেন। তাঁকে হত্যা করা হ'লেও তিনি রাম ও রহিমের নাম উচ্চারণ বন্ধ করবেন না। কারণ রাম ও রহিম একই ঈশ্বরের নাম। মুখে রাম ও রহিমের নাম নিয়ে তিনি হাসিমুখে মরবেন। তিনি যদি রাম ও রহিমের নাম নেওয়া থেকে বিরত থাকেন, তবে তিনি কি ভাবে নোয়াখালির হিন্দু ও বিহারের মুসলমানদের সামনে আসবেন? যাঁরা উপাসনা-সভা করতে বলেছিলেন, তাঁদের যারা বাধাসৃষ্টি করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ পোষণ করতেও নিষেধ করলেন এবং তাদের করুণা করতে বললেন। বললেন, ক্রোধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা দ্বারা হিন্দুধর্মের সেবা করা যায় না। ঐ সময় সমবেত লোকদের মধ্যে পরস্পর বিতর্ক ও বিবাদ বাধলে গান্ধীজী উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় পনের মিনিট বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, ক্রোধে কোনও ফল হয় না। মানুষের ভাবা দরকার, তারা কিভাবে পাঞ্জাবের ক্ষতকে সারিয়ে তুলতে পারবে; কাউকে গালাগালি ক'রে লাভ হবে না; তা ধর্মের বিরোধী—।

তিন দিন বন্ধ থাকবার পর ৪ঠা এপ্রিল গান্ধীজী আবার উপাসনা-সভা করলেন। সভা আরম্ভ করবার আগে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কারও আপত্তি আছে কি না। হিন্দু মহাসভার একজন সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে পূর্ব কয়েকদিনের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইলেন। তিনি বললেন, উপাসনা-সভা বিতর্কের স্থান নয়; কেউ যদি বিতর্ক করতে চান, তবে তিনি বাইরে গিয়ে করবেন। তিনি সমবেত সবাইকে শান্তভাবে উপাসনায় যোগ দিতে বললেন। ৫ই তারিখেও উপাসনা-সভা আরম্ভ করবার পূর্বে তিনি কোরান-পাঠে কারও আপত্তি আছে কি না জানতে চাইলেন। কেউ আপত্তি না জানালে তিনি উপাসনা-সভা শুরু করলেন। তিনি

বললেন, এক ধর্মের তুলনায় অন্য ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করা ভুল। আজ সারা দেশে ঘৃণার যে পরিবেশ গ'ড়ে উঠেছে, তাই রয়েছে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূলে।

৭ই এপ্রিল উপাসনা-সভায় তিনি বললেন যে, তাঁকে গালাগালি ক'রে নানারকম চিঠি আসছে। একটি চিঠিতে তাঁর আখ্যা দেওয়া হয়েছে "মহম্মদ গান্ধী"; একটিতে বলা হয়েছে, তিনি "জিন্নার গোলাম"। গান্ধীজী বললেন, তাঁর মৃত্যুই স্থির করবে তিনি মহম্মদ গান্ধী, জিন্নার গোলাম, হিন্দুধর্মের ধ্বংসকারী, না হিন্দুধর্মের প্রকৃত সেবক ও সংরক্ষক। গান্ধীজী বললেন, যে পাকিস্থানে অমুসলমান শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করতে পারে না, সে কেমন পাকিস্থান তিনি বোঝেন না। যে হিন্দুস্থানে মুসলিমরা নিরাপদ নয়, সেও কেমন হিন্দুস্থান তিনি বোঝেন না। তিনি বিহারে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি হিন্দুদের ক্রোধমুক্ত করতে এবং মুসলমানদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। বিহারে হিন্দুরা মুসলমানদের ভয়ংকর ক্ষতি করেছে, তা পূরণের জন্যে বিহারের মন্ত্রারা উদ্বিগ্ন। কংগ্রেস শাসন যা হিন্দু ও মুসলমানের উপর সমভাবে প্রভাববিস্তার করতে পারে, তা যদি মুসলমানদের নিরাপত্তা দিতে না পারে, তবে তাকে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী বলা চলে না। তিনি সত্যই সুখী যে বিহারে বহু হিন্দু প্রকাশ্যে হিন্দুরা মুসলমানের প্রতি যে অন্যায় করেছে, সেজন্যে অনুতাপ প্রকাশ করেছে এবং এই ধরনের লজ্জাকর ব্যাপার যাতে আর না ঘটে, সেজন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমি মুসলিম নেতাদের কাছেও আবেদন করছি যে, তাঁরাও যেন মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে অমুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা থেকে মুসলমানদের বিরত করতে চেষ্টা করেন। পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখরা যতোই প্ররোচনামূলক ভাষা ব্যবহার করুক না কেন, তাতে যেসব স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে মুসলমানদের ঐ ধরনের নৃশংস

তাণ্ডবলীলা চালাবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। বিগত দুদিন তিনি নোয়াখালি থেকে বহু দুঃসংবাদ পাচ্ছেন, সেখানে আবার লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়েছে। তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে পত্র দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি এই লুঠতরাজ্ ও অগ্নিকাণ্ড নিবারণে সমর্থ হবেন।

১০ই এপ্রিল গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় বলেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছেন যে, শীঘ্রই বৃটিশ সরকার ক্ষমতা-হস্তান্তরের কথা ভাবছেন। এজন্যেই লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে তাঁরা বড়লাট ক'রে পাঠিয়েছেন। ১১ই তিনি উপাসনা-সভায় জানালেন যে, পরদিন তিনি আবার বিহারে যাচ্ছেন। তিনি পাঞ্জাবের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বললেন, তাঁরা যেন মরেন, তবু না মারেন। পাকিস্থান তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হ'লে, তাঁরা অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারাই তা রোধ করতে পারবেন।

১২ই তারিখে একটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'লো যে, গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতভেদ হয়েছে, তাই তিনি দিল্লী ত্যাগ করছেন। গান্ধীজী এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করলেন। গান্ধীজী ১৪ই এপ্রিল পাটনা পৌঁছলেন। ঐদিন পাটনায় উপাসনা-সভায় তিনি বললেন, নোয়াখালি থেকে তিনি আবার উদ্বেগজনক সংবাদ পাচ্ছেন। নোয়াখালিতে তাঁর কাজ অসমাপ্ত রেখেই তিনি চলে এসেছিলেন। সুতরাং নোয়াখালিতে দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে অনশন করবার অধিকার তাঁর আছে। অবশ্য, এই অনশন সম্পর্কে তিনি এখনও কোন সিদ্ধান্ত করেন নি। গান্ধীজী আরও জানালেন যে, বড়লাট তাঁর সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনিই ভারতের শেষ বড়লাট, এবং ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের বেশি তিনি থাকছেন না।

গান্ধীজী যখন দিল্লীতে ছিলেন, তখন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শ অনুসারে গান্ধীজী ও মিঃ জিন্না একটি

মিলিত বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। ১৫ই এপ্রিল একটি ইস্তাহারে তা প্রকাশিত হ'লো। তাতে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগের" নিন্দা করা হয়েছিল এবং সকল সম্প্রদায়কে হিংসা ও শান্তিভঙ্গ থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানানো হয়েছিল। গান্ধীজী ১৬ই এপ্রিল এই বিবৃতিতে তাঁর স্বাক্ষর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, তাঁর কাছে এটা নূতন কিছু নয়, কারণ তিনি সর্বদাই অহিংসায় বিশ্বাসী। এই বিবৃতির গুরুত্ব এখানেই যে, এতে কায়েদ-ই আজম স্বাক্ষর দিয়েছেন।

২৮শে এপ্রিল গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় ঘোষণা করলেন যে, তিনি ৩০শে এপ্রিল দিল্লীতে ফিরে যাচ্ছেন। মে মাসের গোড়াতেই দিল্লীতে ফেরবার জন্যে পণ্ডিত নেহ্‌রু ও আচার্য কৃপালনী তাঁকে অনুরোধ করেছেন, কারণ ঐ সময় দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসছে। তিনি শীঘ্রই বিহারে ফিরে আসবেন ব'লেও বললেন।

দিল্লীতে ১লা মে তারিখে গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও অন্যান্য স্থানে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছিল তার উল্লেখ ক'রে বললেন যে, জিন্না সাহেব বলতে পারেন না যে, তাঁর অনুগামীরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিচ্ছে। যে মুসলিম লীগ ভারতের সকল মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব দাবী করে, মিঃ জিন্না তাঁর সভাপতি। সুতরাং তিনি ঐ কথা বললে, তাঁর পায়ের তলার মাটিই সরে যায়। মুসলমানরা যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, এককথায় পাকিস্থানের দাবীতে, বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়, তবে মুসলিম লীগের কর্তৃত্ব থাকে কোথায়? বৃটিশ সরকার কি যুক্তির শক্তিতে বিশ্বাস না ক'রে বলপ্রয়োগের কাছে মাথা নত করবেন?

২রা মে তারিখে গান্ধীজী বাল্মীকি-মন্দিরে উপাসনা-সভায় যোগদানের জন্যে আসবার ঠিক আগে পাকিস্থানবিরোধী ফ্রণ্টের মিঃ থাট্রেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মিঃ থাট্রে কোরানপাঠের

বিরোধিতা করবেন ব'লে আগেই পত্রে জানিয়েছিলেন। উপাসনা-সভা শুরু হ'লে এক ব্যক্তি কোরানপাঠের বিরোধিতা করলে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করলো। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা বন্ধ ক'রে ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, কেবল ধ্বনি দিলেই হিন্দুধর্মের কোনও লাভ হবে না। কোরানের যে অংশ পাঠ করা হচ্ছিল, তাতে ভগবানের স্তবই করা হয়েছে। সুতরাং ঐ অংশ পাঠে হিন্দুধর্মের কি ক্ষতি হ'তে পারে? ঐটি আরবী ভাষায় লেখা ব'লেই কি অনিষ্টকর? গান্ধীজী বললেন, তাঁর এক বন্ধু বলেছেন যে, ঐ একই ভাবই যজুর্বেদের একটি সূক্তেও আছে। যাঁরা হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন একশ আটটি উপনিষদের মধ্যে একটির নাম "আল্লোপনিষদ্"। গুরু নানক যখন প্রকৃত ধর্মের সন্ধানে দেশেবিদেশে পর্যটন করছিলেন, তখন তিনিও আরবদেশে গিয়েছিলেন।

৬ই মে গান্ধীজী মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ৭ই তারিখে তাঁর এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে উপাসনা-সভায় বললেন, তাঁদের আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে; কিন্তু তিনি ভারতবিভাগের প্রশ্নে একমত হ'তে পারেন নি; তিনি এই চিন্তাও সহ্য করতে পারেন না। এটা ভুল, যতোক্ষণ তাঁর এই বিশ্বাস থাকবে, ততোক্ষণ তিনি এই পরিকল্পনায় সম্মতি দিতে পারেন না। এটা কেবল হিন্দুদের পক্ষেই খারাপ নয়, মুসলমানদের পক্ষেও খারাপ। তিনি বললেন, অনেকে তাঁর জিন্না সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেন নি। কিন্তু এতে তিনি ক্ষতির কিছু দেখেন নি; তাঁরা দুজনেই ভারতবাসী, একই দেশে তাঁদের বাস করতে হবে। একজন হিন্দুসভাপন্থী নেতার পত্নী তাঁর উপাসনা-সভায় কোরান-পাঠ সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে তাঁকে পত্র লিখেছিলেন। গান্ধীজী বললেন, একজন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে এ ধরনের পত্র পেয়ে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছেন। কারণ মায়েদের হৃদয়ও যদি ঘৃণায় পূর্ণ

হয়, তবে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের কি শিক্ষা দেবেন। কয়েকজন মুসলমান বাংলায় ও পাঞ্জাবে দুষ্কার্য করেছে ব'লে কোরান মন্দ হয়ে যেতে পারে না। হিন্দুরা বিহারে উন্মত্ততা প্রকাশ করেছে ব'লে গীতার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। গান্ধীজী কোনও মসজিদে গীতাপাঠ করতে পারতেন না, বা কোনও মুসলমানকে অন্য ধর্মের শাস্ত্র পাঠ করতে দেওয়া হয় না, এই যুক্তি গান্ধীজী ভ্রান্তিমূলক বলেন। কারণ, তিনি নোয়াখালিতে মুসলমানের বাড়িতে এবং মসজিদ-প্রাঙ্গণে উপাসনা-সভা করেছেন।

ভারতবিভাগ ও পাকিস্থান সম্পর্কে গান্ধীজী আরও বললেন যে, "যাঁরা পাকিস্থান চান, আমি হাতজোড় ক'রে তাঁদের বলছি, তাঁরা আমাকে বুঝিয়ে দেন যে এতে ভারতের ভালো হবে। তাঁরা তাঁদের বিষয়টি জনসাধারণের সামনে রাখুন এবং জনসাধারণকে জানান এতে জনসাধারণের কি উপকার হবে। তাঁরা যদি যুক্তি দিয়ে তাঁদের বোঝাতে পারেন, ভালোই। তবে তাঁদের জেনে রাখা ভালো যে বলপ্রয়োগের ফলে এক ইঞ্চি ভূমিও ছাড়া হবে না।"

গান্ধীজী আরও বললেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তো কার্যতঃ পাকিস্থান প্রায় মেনে নিতে চলেছেন ; তবে তাঁরা দাবী করছেন যে, ভারত বিভক্ত হ'লে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিকে পাকিস্থানের বাইরে রাখতে হবে। গান্ধীজী বললেন, তিনি তারও বিরোধী। ভারতের ব্যবচ্ছেদের চিন্তাতেও তিনি শিউরে ওঠেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি এখন নিঃসঙ্গ। তিনি জিন্না সাহেবকে বলেছেন যে, তিনি ভারত-ব্যবচ্ছেদের কোনও পরিকল্পনাতেই স্বাক্ষর দেবেন না।

৭ই তারিখে গান্ধীজী কলকাতায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সংবাদ পেয়ে দিল্লী থেকে কলকাতা রওনা হলেন। তিনি কলকাতা আসবার পথে বড়লাটকে একটি পত্রে জানালেন যে, ভারতবিভাগে বৃটিশ যদি অংশীদার হয়, তবে তা বৃটিশের পক্ষে প্রচণ্ড রকমের একটি ভুল হবে। যদি ভারতবিভাগ করতেই হয়, তবে তা বৃটিশের

চ'লে যাওয়ার পরই হওয়া উচিত, তা বিভিন্ন দলের মধ্যে আপোস-মীমাংসার পথেই হ'ক বা সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই হ'ক। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে হয় কেবল কংগ্রেস বা কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে, নয় কেবল মুসলিম লীগ বা লীগের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়েই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হ'ক। এখন কেন্দ্রে যে দ্বৈত ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে মিলিতভাবে কাজ করবার মনোভাবের অভাব থাকায় দেশের ক্ষতি হচ্ছে। এই অবস্থায় সীমান্ত প্রদেশে বা অন্য কোনও প্রদেশে গণভোটও বিপজ্জনক। তিনি লেখেন, তাঁর মনে হয়, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশকে বিভক্ত করাও উচিত নয়। বড়লাট যদি ভারতকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিয়ে যেতে না চান, তবে তাঁর উচিত হবে, কোনও একটি দলের হাতে দেশীয় রাজ্যসমূহসহ সমগ্র ভারতের শাসনভার দিয়ে যাওয়া।

গান্ধীজী সোদপুর আশ্রমে পৌঁছলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব সুরাবর্দী তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। সুরাবর্দী গান্ধীজীকে অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার কথা বললে গান্ধীজী হেসে বললেন, বাংলাদেশ বাঙ্গালীর জন্যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জন্যে, থাকবে এই বিষয়ে জনাব সুরাবর্দী তাঁকে নিঃসংশয় করলে তিনি কেবল তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না, তিনি তাঁর সেক্রেটারিরূপে কাজ করতেও প্রস্তুত। গান্ধীজী সুরাবর্দীর সঙ্গে কলকাতার সাম্প্রতিক গোলযোগে বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। গত আগস্টের তুলনায় এবারের গোলযোগের প্রচণ্ডতা কম ছিল। গান্ধীজী আশা প্রকাশ করলেন যে, এই গোলযোগই কলকাতার শেষ সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হবে।

১৪ই মে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে, তিনি পাটনা যাচ্ছেন এবং পাটনা থেকে দিল্লী যাবেন। দিল্লীতে কাজ শেষ হ'লে আবার কলকাতা ফিরে আসবেন।

গান্ধীজী দশদিন বিহারে থেকে ২৫শে মে দিল্লীতে পৌঁছলেন।

অন্যান্য বারের মতোই এবারও দিল্লীতে উপাসনা-সভায় তাঁর

কোরানপাঠ সম্পর্কে আপত্তি এলো। একজন মহিলা এবার উপাসনা আরম্ভ হওয়ার আগে চিঠি লিখে তাঁর আপত্তি জানালেন। গান্ধীজী বললেন, এক-আধজন আপত্তি করায় এখন আর তিনি উপাসনা বন্ধ করবেন না; কারণ, প্রথমতঃ মন্দিরের মালিকরা কেউ আপত্তি করেন নি; দ্বিতীয়তঃ দিল্লীর জনসাধারণ এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, তাঁরা আপত্তিকারীর প্রতি কোনও কঠোর ব্যবহার করবেন না, এই তাঁর ধারণা। তিনি বললেন, আপত্তি হ'ক বা না হ'ক, এখন আর উপাসনা বন্ধ করা হবে না। ঐদিন উপাসনা শান্তিতে অনুষ্ঠিত হ'লো। পরদিন কিন্তু মহিলাটি আবার লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানালেন। তিনি লিখলেন, মুসলমানদের হাতে হিন্দু ও শিখরা অকথ্য নির্যাতন সহ্য করছে। কোরানে অমুসলমানদের হত্যা করতে বলা হয়েছে। সুতরাং গান্ধীজী কিভাবে উপাসনা-সভায় কোরান পাঠ করতে পারেন। গান্ধীজী তাঁর আপত্তি না শুনলে তিনি উপাসনা-সভায় চেঁচামেচি করতে লাগলেন। তখন স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁকে ধ'রে সভা থেকে বের ক'রে দিলেন। স্ত্রীলোকটি গান্ধীজীকে লিখে জানালেন যে, স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করা অন্যায়।

গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় পর পর কয়েকদিন এ বিষয়ে জবাব দিলেন। তিনি বললেন, পুরুষ যদি মেয়েকে নিষ্কামভাবে স্পর্শ করে, তবে তাতে কোনও দোষ হয় না। তিনি তো প্রায়ই মেয়েদের কাঁধে ভর ক'রে হাঁটেন। তিনি মেয়েটির আপত্তির জবাবে বললেন, মেয়েটি বিপথে পরিচালিত হয়েছেন। কোরানের কোথাও অমুসলমানদের হত্যা করতে বলা হয় নি। কোরান সকল মানুষের প্রতি সুবিচারের কথাই বলেছে। সব মুসলমান এই নীতি মেনে চলতে পারছেন না সত্য, কিন্তু হিন্দুরাও কি গীতা ও বেদের বাণী মেনে চলতে পারছেন? তাতে গীতা ও বেদের মহত্ত্ব হ্রাস পায় না। মুসলমানদের দুষ্কার্যও কোরানের মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ করে না।

পূর্বে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। কিন্তু ভারতের বর্তমান ভয়ংকর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার শীঘ্রই ক্ষমতা-হস্তান্তরের কথা চিন্তা করছিলেন। তাই বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপের জন্য ইংলণ্ড গিয়েছিলেন। শাসন-ক্ষমতা কিভাবে হস্তান্তরিত করা হবে, সে সম্পর্কে বড়লাট ২রা জুন একটি ঘোষণা দেবেন ব'লে জনরব ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র আবার উন্মত্ততার একটি প্রচণ্ড প্রবাহ বয়ে যাবে, এই রকম আশঙ্কা সর্বত্রই দেখা দিয়েছিল। ভারতের জনসাধারণ যে এইভাবে লণ্ডনের দিকে নিজেদের স্বাধীনতার প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছে, গান্ধীজী তার নিন্দা করলেন। গান্ধীজীর কাছে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে, বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, সিন্ধু থেকে এই মর্মে পত্র আসতে লাগলো যে, বড়লাটের আসন্ন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে ভেবে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। ১লা জুন বড়লাট দিল্লীতে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া আরও থমথমে হয়ে উঠলো। ভারত-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সঙ্গে করা হ'লেও তা প্রকাশ করা হ'লো না। মানুষের কৌতূহল ও আশঙ্কা তীব্রতর হয়ে উঠলো। গান্ধীজী এ বিষয়ে জনসাধারণকে ৩রা জুন তারিখে বড়লাটের ঘোষণা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বললেন।

৩রা জুন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং তার পরে নেহ্রু, জিন্না ও বলদেব সিংহ বেতারে ভাষণ দিলেন। ভাষণে বলা হ'লো, বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব এই যে, মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির মুসলিম প্রতিনিধিরা দাবী করলে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে পাকিস্থান গঠিত হবে, এবং বাংলা ও পাঞ্জাবের আইন-সভার যে কোনও দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দাবী করলে বাংলা ও পাঞ্জাবকে মুসলিম ও অমুসলিম অংশে বিভক্ত করা হবে।

ভোট গ্রহণ করে স্থির করা হ'বে, শ্রীহট্ট আসামে থাকবে বা পূর্ব-বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবে। ক্ষমতা-হস্তান্তর পূর্বনির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই করা হবে এবং নূতন সংবিধান চালু না হওয়া পর্যন্ত ভারত ডোমিনিয়নের মর্যাদা পাবে। এই পরিকল্পনায় ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে আপোস-আলোচনার মাধ্যমে যদি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ ভারত চায়, তবে তারও বাধা থাকবে না।

৪ঠা জুন গান্ধীজী বৃটিশ সরকারের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বললেন যে, তিনি বারবার বলেছেন, বলপ্রয়োগের কাছে নতি স্বীকার ক'রে এক ইঞ্চি স্থানও ছাড়া অন্যায় হবে। তবে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি বলেছেন যে, তাঁরা অস্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করেন নি, তাঁরা পরিপার্শ্বের কাছে নতি স্বীকার করেছেন। অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীই অনিচ্ছুক অংশীদার নিতে চান না। তাঁদের আদর্শ অহিংসা, সুতরাং কোনও বলপ্রয়োগ নয়। তাই সকল দিক্ সতর্কভাবে বিচার ক'রেই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে হ'লেও এই প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করেছেন। গান্ধীজী মুসলিম লীগের নীতিতে দুঃখ প্রকাশ করলেন, বললেন তাঁরা হিন্দু-প্রাধান্যকে ভয় করছেন এবং যাকে ভুল ক'রে তাঁদের জন্মভূমি বলছেন তাতে নিজেরা শাসন করতে চাইছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে যাঁরাই জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন, ভারতবর্ষ তো তাঁদেরই জন্মভূমি।

৫ই জুন তিনি উপাসনা-সভায় বললেন, তিনি ভারত-ব্যবচ্ছেদ সমর্থন করেন না। তাই অনেকে আশা করছেন যে, তিনি কংগ্রেসের এই নীতির বিরুদ্ধে অনশন করবেন। কিন্তু তিনি দেশের সেবক, তথা কংগ্রেসের সেবক। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়েছে ব'লে কি তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনশন করতে পারেন? তাঁকে ধৈর্য ধ'রে থাকতে হবে। তিনি যন্ত্রশিল্পের বিরোধী, তিনি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখার বিরোধী, কংগ্রেস কিন্তু এগুলির সমর্থন করছে। সেজন্যে যদি তাঁকে অনশন করতে হয়,

তবে তাঁর আমরণ অনশনের কারণের অভাব নেই। গান্ধীজী বললেন, এই ভারতবিভাগের ফলে একদল হিন্দু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন; তাঁরা ভাবছেন, তাঁরা মুসলমানদের দ্বারা আর বিব্রত হবেন না এবং নিজেদের ইচ্ছামতো দেশের উন্নতিসাধন করতে পারবেন। কিন্তু অন্যান্য অনেকে আবার জানেন, এই দেশ-বিভাগের মধ্যে সমস্যার প্রকৃত কোনও সমাধান নেই। ভারত-বিভাগ সত্ত্বেও প্রায় চার কোটি মুসলমান ভারতে রয়ে যাবেন এবং দু কোটি অমুসলমান রয়ে যাবেন পাকিস্থানে। একজন মহিলা ক্রুদ্ধ হয়ে দেশবিভাগের জন্যে কংগ্রেস তথা গান্ধীজীকে দায়ী ক'রে পত্র লিখেছিলেন। মহিলাটি বলেছিলেন, গান্ধীজীই জিন্নাকে আশকারা দিয়ে জিন্নার মাথা বিগড়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং আজ দেশ যে দুর্দিনের সম্মুখীন হয়েছে, সেজন্য গান্ধীজীই দায়ী। গান্ধীজী তার জবাবে বললেন, প্রেম ও অহিংসার দ্বারা কখনও কারও অনিষ্ট হয় না।

এই সময়ে বাংলাদেশে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছিল। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতি এক, সুতরাং বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবে বাঙ্গালীজাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করবার যে পরিকল্পনা ছিল, তা রদ ক'রে একটি ঐক্যবদ্ধ সার্বভৌম বাংলাদেশের দাবী উঠেছিল প্রগতিবাদীদের মহল থেকে। শরৎচন্দ্র বসু এঁদের নেতৃত্ব করছিলেন। গান্ধীজীও নীতিগতভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বললেন, যেহেতু তিনি ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের সমর্থক, সেই হেতু তিনি অখণ্ড বাংলারও দাবী সমর্থন করেন। তবে অনেকে তাঁকে বলছেন যে, বাংলাদেশে হিন্দুরা মুসলিম লীগ শাসনে থেকে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে, তাই তারা পৃথক হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ চায়। গান্ধীজী বলেন, এমনও কথা বলা হচ্ছে যে, অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার দাবীতে যে

আন্দোলন হচ্ছে, তার পেছনে তাঁর হাত আছে। কিন্তু তিনি যা করেন, তা প্রকাশ্যেই করেন। তাঁকে একথাও বলা হয়েছে যে, অখণ্ড বাংলার আন্দোলনের জন্যে জলের মতো টাকা ঢালা হচ্ছে। এই ধরনের কোনও ব্যাপার সত্যি ঘটে থাকলে তিনি তা সমর্থন করবেন না।

৯ই জুন গান্ধীজী বলেন, ভারতবিভাগ এখন প্রায় নিশ্চিত; এ নিয়ে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। তিনি কায়েদ-ই আজম জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। ধর্মের পরিবর্তন কখনও জাতীয়তার পরিবর্তন করে না। তিনি নিজে যতোখানি পাকিস্থানের, ততোখানি হিন্দুস্থানের। লোকে এইভাবে চিন্তা করলে জিন্না সাহেব তাঁর দ্বিজাতির তত্ত্ব কখনই প্রমাণ করতে পারবেন না। মুসলমানরা যা চেয়েছিল, এখন তা পেয়েছে, সুতরাং তারা এখন তাদের অমুসলমান স্বদেশবাসীর সঙ্গে শান্তিতে বাস করবে ব'লে আশা করা যায়। পাকিস্থানে মুসলমানদের উচিত সকলকে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমানাধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত করা। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, এখন সিন্ধুর হিন্দুরা শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করতে পারবে না কেন?

এই সময়ে রাওলপিণ্ডি থেকে কয়েকজন অমুসলমান তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে গান্ধীজী তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, এখন মুসলমানদের পাকিস্থান পাওয়া যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন মুসলমানদের ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন এসেছে কিনা। উত্তরে তারা বললো, পরিবর্তন হয়েছে, তবে আরও মন্দের দিকে। গান্ধীজী শুনে বিস্মিত হলেন। ক্যাম্প্‌বেলপুর থেকে কয়েকজন এসে গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করলো, তারা এখন ক্যাম্প্‌বেলপুরে থাকতে পারবে কিনা। গান্ধীজী তাদের বললেন, মানুষকে মানুষ ভয় করবে কেন, মানুষ শুধু ভয় করবে ভগবানকে। গান্ধীজীর এই উত্তরে তারা সন্তুষ্ট হ'লো না। কেবল আতঙ্কই তাদের মুখে-

চোখে ফুটে উঠলো। ভারতবিভাগের দ্বারা যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে না, গান্ধীজী সে বিষয়ে ক্রমেই নিঃসংশয় হয়ে উঠলেন।

কেবল ভারত ও পাকিস্থানে নয়, ভারতবর্ষ আরও বহু খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর এ বিষয়ে প্রথম সংকেত দিল। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার গান্ধীজীকে একটি তারবার্তায় জানালেন যে, অবিভক্ত ভারতের গণ-পরিষদে ত্রিবাঙ্কুর যোগ দিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ যদি খণ্ডিত হয়, তবে ত্রিবাঙ্কুর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেবে না, স্বাধীন থাকবে। ১৪ই ও ১৫ই জুন দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'লো। গান্ধীজী তাতে বললেন, "এক সময় ছিল যখন আমি সবাইকে ভারতীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করতাম। সেই সময় আমরা তৃতীয় একটি শক্তির সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। সময় বদলেছে। ভারত এখন স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। হায়দারাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর এখন স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার কথা বলছে। এ ধরনের কথা বলা নিরর্থক। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য যারা সাংবিধানিক পরিষদে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। তারা যদি সর্বান্তঃকরণে যোগ দেয়, তবে তারা সেবক ও ন্যাসরক্ষক হিসাবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। সময়ের সঙ্গে তাদের এগুতে হবে। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, দেশীয় রাজন্যবর্গ যারা প্রকৃতপক্ষে বৃটিশের গোলাম মাত্র ছিল, তারা ভারতীয় ইউনিয়নের সম্মানের আসনে পদাঘাত ক'রে স্বাধীন হ'তে চাইছে। ভারতীয় ইউনিয়ন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি বৈরীভাবাপন্ন নয়। কিন্তু আজ যখন শাসনের বল্গা জনগণের হাতে এসেছে, তখন তারা সমগ্র ভারতের মঙ্গলকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে

আছেন। দেশীয় রাজ্যগুলি যদি স্বাধীন হয়, তবে তা দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের স্বাধীনতার বিনিময়েই হ'তে পারে। আমি যতোদূর ভারতকে জানি, তাতে এই অবস্থা কখনই সহ্য করা হবে না। দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রাচীরের লেখন পড়া উচিত।"

দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করলো, তাতে ঘোষণা করা হ'লো: "কোনও দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করবার এবং ভারতের অবশিষ্টাংশ থেকে পৃথকভাবে থাকবার অধিকার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি স্বীকার করে না। তাতে ভারতের ইতিহাসের গতিকে এবং ভারতের বর্তমান জনসাধারণের লক্ষ্যসমূহকে অস্বীকার হবে।"

বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা-সংক্রান্ত ৩রা জুনের বিবৃতি সম্পর্কে প্রস্তাবটি পণ্ডিত পন্থ উত্থাপন করলেন এবং মৌলানা আজাদ সমর্থন করলেন। সভাপতি কৃপালনী তেরোটি সংশোধনী-প্রস্তাব পেলেন; সেগুলির মধ্যে আটটিকে তিনি বাতিল ক'রে দিলেন। অন্যান্য সংশোধনী-প্রস্তাবগুলিকে আলোচনার জন্য তুলতে দেওয়া হ'লো। ত্রিশজন সদস্যেরও বেশী প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলেন। প্রস্তাবটি সম্পর্কে দুদিন ধ'রে বিতর্ক হ'লো। প্রস্তাবটির পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্কবিতর্ক হ'লো। পণ্ডিত পন্থ বললেন, বৃটিশ সরকারের এই পরিকল্পনা কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনার চেয়ে ভালো, তাই এটি গ্রহণের তিনি সুপারিশ করছেন। মওলানা আজাদ বললেন, কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা এর চেয়ে ভালো ছিল; কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করছেন এই কারণে যে, বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করবার জন্যে সকল ক্ষতি স্বীকার ক'রেও মীমাংসায় পৌছার প্রয়োজন আছে। পুরুষোত্তম-দাস ট্যাণ্ডন বললেন, স্বাধীনতার জন্যে এই মূল্য দেওয়ার চেয়ে আরও কিছুদিন বৃটিশ শাসন সহ্য করা উচিত। ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানি বললেন, এই প্রস্তাব মুসলিম লীগের কাছে নতি-

স্বীকার মাত্র। গান্ধীজী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে চল্লিশ মিনিট ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক ৩রা জুনের প্রস্তাবটি গ্রহণ সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, এই প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন করবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির। তবে বর্জন বা সংশোধনের অর্থ হবে কংগ্রেসের সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা। সে ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই কংগ্রেস সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটিকে পদত্যাগ করতে হয়। ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিরূপে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উচিত এই প্রস্তাবকে গ্রহণ ক'রে নেওয়া।

গান্ধীজী বললেন, তিনি ওয়ার্কিং কমিটির ওকালতি করছেন না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে সকল দিক বিচার ক'রে দেখতে হবে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত সুবিদিত। কিন্তু এই প্রস্তাবগ্রহণের সঙ্গে কেবল ওয়ার্কিং কমিটি জড়িত নয়, এর সঙ্গে বৃটিশ সরকার ও মুসলিম লীগও জড়িত। বর্তমান অবস্থায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ না করলে দুনিয়ার লোকে কি বলবে? সমস্ত দলই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে; এখন কংগ্রেস তার কথা না রাখলে তা উচিত হবে না। যদি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, এই পরিকল্পনার দ্বারা দেশের ক্ষতি হবে, তবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে একদল নূতন নেতার সন্ধান করতে হবে যাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির ও সরকারের ভার নিতে পারবেন। তাঁদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান অবস্থায় দেশে শান্তির একান্তই প্রয়োজন। কংগ্রেস পাকিস্থানের বিরোধী এবং তিনি নিজেও ভারত বিভাগের বিরোধিতা ক'রে এসেছেন। তবু তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে ভারতবিভাগ সংক্রান্ত এই প্রস্তাবটি

গ্রহণের জন্য বলতে এসেছেন। অনেক সময় নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেও অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়।

বিতর্কশেষে ১৫ই জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ১৫৭—১৫ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হ'লো।

১৬ই জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে উপস্থিত ত্রিবাঙ্কুরের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলে গান্ধীজী তাঁদের জানালেন, "আমি যদি ভুল না বুঝি, তবে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কে স্বাধীন হবে, দেশীয় রাজারা, না জনসাধারণ? তিনি স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার ও অন্যান্য দেওয়ানদের এই মর্মে পরামর্শ দিয়েছেন যে, তাঁদের উচিত দেশীয় রাজাদের সাংবিধানিক পরিষদে যোগ দিতে পরামর্শ দেওয়া।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলিমপ্রধান হ'লেও সেখানকার পাঠান অধিবাসীরা ছিলেন কংগ্রেসী এবং তাঁরা মুসলিম লীগের ঘোর বিরোধী। তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সাংবিধানিক পরিষদেও যোগ দিয়েছিলেন। মুসলিম লীগ-শাসিত পাকিস্থানে যোগ দিতে তাঁদের আপত্তি ছিল। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই মীমাংসায় এসেছিল যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভারতে বা পাকিস্থানে যোগ দেবে, তা ভোটে স্থির হবে। কিন্তু গান্ধীজী ও "সীমান্ত গান্ধী" খান আবদুল গফুর খান ভোটগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। কারণ এই ভোটগ্রহণ কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের সমর্থনের প্রশ্নে হবে না, হবে মুসলিমপ্রধান পাকিস্থানে যোগদানের প্রশ্নে। সংগ্রামপন্থী মুসলমানরা যে এ বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবেন, তাতে সন্দেহ ছিল না। এইভাবে এই ভোটগ্রহণ পাঠানে পাঠানে কলহ বাধাবে, বিদ্বেষ ও অশান্তির সৃষ্টি করবে। তাই আবদুল গফুর খান চাচ্ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাঠানিস্থান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে আপাততঃ পরিণত

হ'ক এবং পরে ভারত ও পাকিস্থানের চেহারা কি রকম দাঁড়ায় তা দেখে তা ভারতে বা পাকিস্থানে যোগ দেবে। গান্ধীজী খান আবদুল গফুর খানের তথা পাঠানদের এই প্রস্তাব সমর্থন করছিলেন। ১৮ই জুন তারিখে গান্ধীজী ও আবদুল গফুর খান বড়লাট-প্রাসাদে মিঃ জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন। এখানে স্থির হ'লো যে, খান আবদুল গফুর খান জিন্নার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে রক্তপাত এড়াবার জন্যে খান আবদুল গফুর খান প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় তাঁর সাফল্য প্রার্থনা করবার জন্যে সকলকে বললেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগের সদস্যরা থাকায় কংগ্রেস-মন্ত্রীরা তাঁদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারছিলেন না। মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা সরকারের কাজে পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিলেন। এখন ভারত-বিভাগ স্বীকার ক'রে নেওয়ার পর কংগ্রেস মন্ত্রিসভা মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের বাদ দেওয়ার জন্য বলতে লাগলেন। মিঃ জিন্না বললেন, তা করা হ'লে মুসলিম লীগ ৩রা জুনের প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে নেবে। এই নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিবাদ বেধে গেলে অবস্থা জটিল হয়ে উঠবে ভেবে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেসের এই দাবী স্বীকার করলেন না। তিনি মীমাংসার জন্যে বললেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোনও বিতর্কমূলক বিষয় যথাসম্ভব এখন স্থগিত রাখা হবে এবং দৈনন্দিন প্রশাসনিক ব্যাপারে যেসব মতবিরোধ দেখা দেবে, সেগুলির সিদ্ধান্তের জন্যে তাঁকে জানানো হবে। সাময়িক-ভাবে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন স্বস্তিবোধ করলেও অবস্থা থমথমে রইলো।

পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটছিল। পাঞ্জাবে শিখরা চঞ্চল হয়ে উঠলো; উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ক্রমাগত শরণার্থীরা আসতে লাগলো।

সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাকিস্থানে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। রাজধানীর কাছেই গুরুগাঁয়ে মুসলিম মেয়েরা হিন্দু আহির ও জাঠদের সঙ্গে লড়াই করছিল। সর্দার প্যাটেল বললেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা বাধা সৃষ্টি করায় পরিস্থিতির ক্রমাবনতি-রোধে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন।

৪ঠা জুলাই তারিখে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল উত্থাপিত হ'লো। এই বিলে বলা হলো যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বৃটেন ভারত ত্যাগ করবে; ভারতবর্ষে ভারত ও পাকিস্থান নামে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন সৃষ্টি হবে; বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত সকল অঞ্চল ঐ দুটি ডোমিনিয়নের একটির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সংসদীয় পদ্ধতিতে ঐ দুটি ডোমিনিয়নের শাসনভার ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত হবে। দেশীয় রাজ্যসমূহ ও উপজাতীয় অঞ্চলসমূহের উপর বৃটেনের যে সর্বোচ্চ সার্বভৌম অধিকার (Paramountcy) আছে, তা-ও ঐ সঙ্গে লোপ পাবে। ৫ই জুলাই গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় এই বিল সম্পর্কে বললেন। তিনি বললেন, অনেকে এই বিলের মধ্যে অশুভ দুরভিসন্ধি লক্ষ্য করছেন। তিনি তেমন কিছু করছেন না। এক ভারতবর্ষের পরিবর্তে যে দুটি ভারতবর্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা-ই যথেষ্ট খারাপ। দুয়েরই মর্যাদা সমান যা দুদিন আগেও অসম্ভব মনে করা হ'তো। তা ঘটাবার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ প্রাপ্য কায়েদ-ই-আজম জিন্না ও মুসলিম-লীগের। তাঁরা কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন। তাঁরা এ বিষয়ে কংগ্রেসের ও শিখ সম্প্রদায়ের সম্মতিও আদায় করেছেন। যে বিষয়টা খারাপ, তা সকলে গ্রহণ করেছে ব'লে তা ভালো হয়ে যায় না। গান্ধীজী বললেন, দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ডোমিনিয়নগুলির সম্পর্ক কি হবে, তা এই বিলে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি।

জিন্নার সঙ্গে খান আবদুল গফুর খানের আলাপ-আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নি। সেখানে ভোটগ্রহণই শেষ পর্যন্ত হ'তে চলেছে। তবে আবদুল গফুর খান ও তাঁর দল খুদা-ই-খিদমদগার এই ভোটে অংশ গ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ মুসলিম লীগ খোলা মাঠেই জয়লাভ করবে। গান্ধীজী উপাসনা-সভায় বললেন, তিনি আশা করেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভোটগ্রহণ শান্তিতেই হবে। বাদশা খান্ ও তাঁর খুদা-ই-খিদমদ্গার দল অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁরা জীবন দিয়েও নিশ্চয় তাঁদের আদর্শ পালন করবেন। মুসলিম লীগের কাছ থেকেও বা তিনি তাই আশা করবেন না কেন? কারণ এটা যখন মুসলিম বনাম মুসলিমের প্রশ্ন।

৮ই জুলাই গান্ধীজী একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁর উপাসনা-সভায় বললেন, মানুষের নিজেকে প্রতারণা করবার সর্বাধিক ক্ষমতা রয়েছে; মানুষের মধ্যে আবার এই ক্ষমতা ইংরেজদের রয়েছে সবচেয়ে বেশি। ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাচ্ছে, কারণ সে বুঝতে পেরেছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতকে আর ধ'রে রাখা লাভজনক নয়। এই ব্যাপারে ইংরেজরা অকপট। সে আত্মপ্রতারণা করছে এই ব্যাপারে যে, সে বলছে, ভারতবর্ষকে সম্ভাবিত অরাজকতার মধ্যে ছেড়ে যেতে পারে না। সে ভারত-বর্ষকে দুই সংঘবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্ররূপে ছেড়ে গিয়েই সন্তুষ্ট। যাওয়ার আগে সে এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের লড়াইকে প্রায় সঙ্গত ব'লে একটা ছাপ মেরে দিয়ে যাচ্ছে। দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কেও তার যা করণীয়, তা সে করছে না।

পাকিস্থান ডোমিনিয়নের গভর্নর-জেনারেল হবেন জিন্না। কিন্তু কংগ্রেস লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকেই ভারতীয় ইউনিয়নের গভর্নর-জেনারেল করবে স্থির করেছিল। এই বিষয় নিয়ে অনেকে

সমালোচনা করতে থাকলে গান্ধীজী ৯ই জুলাই তার উত্তরে উপাসনা-সভায় বললেন, অনেকে এরকম ইঙ্গিত করেছেন যে, কংগ্রেসনেতারা দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং তাঁরা লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে থেকে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে তাঁরা যে এখনও ইংল্যাণ্ডের উপর নির্ভরশীল তাই প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজী সমালোচকদের এই ধরনের সন্দেহ থেকে নিজেদের মনকে মুক্ত করতে বললেন। তাঁরা একথা কিভাবে ভাবেন যে, জওহরলাল ও প্যাটেলের মতো জাত সংগ্রামীরা কখনও কারও কাছে নতজানু হ'তে বা কারও পদলেহন করতে পারেন? সকলের এটা জেনে রাখা দরকার যে, ১৫ই আগস্টের পর আমাদের হাতে যাকে ইচ্ছা আমাদের গভর্নর-জেনারেল নিয়োগের অধিকার আসবে। সংবাদপত্রের মারফত সকলেই জানেন যে, প্রথমে স্থির হয়েছিল ভারত ও পাকিস্থান দুই অংশই লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে তাদের একমাত্র গভর্নর-জেনারেল নিয়োগ করতে চেয়েছিল। এতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হবে না ভেবে কংগ্রেস এতে সায় দিয়েছিল। তারপর পাকিস্থান হঠাৎ তাদের মত বদলে কায়েদ-ই-আজম জিন্নাকে পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল করা স্থির করলো। কংগ্রেস-নেতারাও ঐরকম করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের কথা রাখাই সমীচীন মনে করলেন। এতে গান্ধীজী অন্যায় কিছু দেখছেন না। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে তাঁর এই নূতন পদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে—যদিও তিনি সাংবিধানিক দিক থেকে সরকারের নামমাত্র কর্তা।

গান্ধীজীর মন দিল্লীতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। নোয়াখালিতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন সম্পর্কে তাঁর সংকল্প "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"-র কথা তিনি ভোলেন নি। ১৫ই আগস্ট ভারতবিভাগের দিন স্থির হওয়ায় ঐদিন নোয়াখালিতে আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা আশঙ্কা ক'রে নোয়াখালি থেকে বারবার তাঁর ডাক আসছিল। বিহারের

অবস্থাও কম শোচনীয় নয়। নোয়াখালির চেয়ে বিহারের অবস্থা ছিল আরও ভয়ংকর। নোয়াখালিতে যেখানে প্রায় পাঁচ শত হিন্দু মারা গিয়েছিল সেখানে বিহারে মারা গিয়েছিল প্রায় দশ হাজার মুসলমান। পাঞ্জাবের অবস্থাও ছিল ভয়ংকর। এই মুহূর্তে গান্ধীজী ঠিক কোথা যাবেন স্থির ক'রে উঠতে পারছিলেন না। অনেকে তাঁকে বোঝাচ্ছিলেন যে, তিনি যেখানে সমগ্র ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন, সেখানে তিনি একটি বিশেষ স্থানে আবদ্ধ থাকছেন কেন? গান্ধীজী তার উত্তরে বলেছিলেন, শৈশবে তিনি এই শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, অণুর মধ্যে বিশ্ব রয়েছে; পরিপার্শ্বের সেবাতেই জগতের সেবা করা যায়। যাই হ'ক, গান্ধীজী নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব, কোথা যাবেন, স্থির করতে পারছিলেন না। এই সময়ে তিনি কিছুদিন হিমালয়ের বুকে উত্তর কাশী যাবেন মনে করলেন। গান্ধীজীর উত্তর কাশী যাওয়ার সম্ভাবনার কথাতে অনেকে বলতে লাগলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে গান্ধীজীর মতের মিল না হওয়ায় তিনি রাজনীতি থেকে বিদায় নিচ্ছেন এবং হিমালয়ের বুকে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাবেন স্থির করেছেন। কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের মিল ছিল না সত্য। কারণ, গান্ধীজী দেখেছিলেন, কংগ্রেস যে পথে অগ্রসর হ'তে চায়, তাতে তাঁর স্বপ্নের রামরাজ্য স্বপ্নই থেকে যাবে। তিনি সম্প্রতি সকল বিষয়কে নির্লিপ্তভাবে গ্রহণের একটি অভ্যাস গ'ড়ে তুলেছিলেন। তাই তিনি কি করা কর্তব্য তা ঘোষণা ক'রে এবং যথাসম্ভব তা নিজে পালন ক'রেই ক্ষান্ত ছিলেন। কেউ তাঁর ডাক শুনে যদি না আসে, তবে তিনি একলা চলার নীতিকেই জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

১৩ই জুলাই একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ জিন্না ঘোষণ করলেন যে, পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের ধর্ম, রীতিনীতি সম্পত্তি ও জীবন সম্পর্কে পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করবে। তাদের

পাকিস্থানের নাগরিকরূপে শিক্ষিত ক'রে তোলা হবে এবং তাদেরও পাকিস্থানের নাগরিকরূপে যথাযোগ্য কর্তব্য পালন করতে হবে। এই নীতিই ভারতীয় ডোমিনিয়নেও পালিত হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কেউ রাষ্ট্রের প্রতি অবিশ্বাসী বা অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত হ'তে দিতে পারে না। ছুটি রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘুদের সুনাগরিক ও নিজ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হ'তে হবে। ঐদিন উপাসনা-সভায় জিন্নার সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ সম্পর্কে গান্ধীজী আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে বললেন, জিন্না সাহেব পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু কোন নেতা যে কোনও ঘোষণা করুন না কেন, তা তিনি যতোই আন্তরিকভাবে করুন না কেন, তা থেকে এটা ধ'রে নেওয়া যায় না যে, ঐ ঘোষণা অনুসারে সকলে কাজ করবে। এটা খুবই ছুঃখের বিষয় যে, ভারতবিভাগ সুনিশ্চিত হওয়ার পরও ছুরিকাঘাত, হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের খবর আসছে। সিন্ধু-প্রদেশে বহু হিন্দু নিরাপত্তা বোধ না করায় বাস্তু ত্যাগ ক'রে পালাচ্ছে। তিনি জিন্না সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে চান, জিন্না সাহেব কি ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্থগিত রাখবেন? তিনি শুনেছেন, যুক্ত প্রদেশের মুসলমানরাও নিরাপত্তা বোধ করছেন না। যুক্ত প্রদেশের সরকারের কর্তব্য মুসলমানদের মনে নিরাপত্তাবোধ ও আস্থা গড়ে তোলা।

১৫ই জুলাই গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় বললেন যে, তিনি শুনেছেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ভয় করছেন যে, এখন বাংলাদেশ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে বিভক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভুলে যাবেন, ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন। এই ধরনের আশঙ্কা কেন, তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা ও বিহারের হিন্দুরা কি চিরদিন উন্মাদের

মতো কাজ করতে থাকবে? ভারতবিভাগ তিনি কখনও সমর্থন করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা যখন ঘটেছে, মানুষকে সেই বাস্তব অবস্থা মেনে নিতে হবে। বাংলা দেশ বিভক্ত হ'লেও পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মানুষরা বাঙ্গালীই থাকবেন, তাঁরা একই বাংলাভাষায় কথা বলবেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবেন। তা যদি করেন, তবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও নিশ্চয় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবেন। কারও অন্যকে শত্রু ব'লে মনে করা উচিত নয়। এই রকম মনোভাবই ভয় দূর করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আরও ভালোভাবে সাহায্য করতে পারবেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার থাকবে। বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হবে কিনা, এ প্রশ্নও তাঁকে করা হয়েছে। তাঁর উত্তর হ'লো, 'না'। কংগ্রেস কমিটি কখনই বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত মনে করবে না। দুইটি অংশে প্রাদেশিক কংগ্রেসের দুটি সাব-কমিটি থাকবে, তারা প্রাদেশিক কমিটির পরিচালনাধীনে চলবে। কংগ্রেস একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান; ভারতবর্ষের যে কোনও লোকের তাতে প্রবেশের অধিকার আছে। তাঁকে একথাও বলা হয়েছে যে, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও সুরেশ ব্যানার্জী পূর্ববঙ্গের লোক; তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় যোগ দিচ্ছেন; এতে তাঁরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ত্যাগ করছেন। গান্ধীজী বললেন, এঁরা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় কেন যোগ দেবেন না, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁরা তাঁদের জন্মস্থান ত্যাগ করছেন, এর দ্বারা তা-ও বোঝায় না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা দুই বঙ্গের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করবেন এবং দুই বঙ্গের বন্ধনকে দৃঢ়তর করবেন।

১৮ই জুলাই তারিখে হাউস অব লর্ডসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-বিলে রাজসম্মতি দানের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হ'লো।

এইভাবে ঐদিন ভারত ও পাকিস্থান দুটি ডোমিনিয়নের জন্ম হ'লো। গান্ধীজী ঐদিন উপাসনা-সভায় কংগ্রেস-কর্মীদের সরকারী পদ আঁকড়ে থাকার স্পৃহা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, একজন পত্রলেখক তাঁকে ক্রুদ্ধভাবে লিখেছেন যে, ১৫ই আগস্ট ভারতীয় ডোমিনিয়নের যে পতাকা উড্ডীন করা হবে, তার এক কোণে ক্ষুদ্রাকারে বৃটিশ পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাকও' থাকবে। তা যদি হয়, তবে পত্রলেখক ঐ পতাকা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবেন এবং সেজন্যে তাঁকে মরতে হ'লেও তিনি ভয় পাবেন না। গান্ধীজী এই মনোভাবের নিন্দা করলেন। ভারত যতোদিন ডোমিনিয়ন থাকবে, তার পতাকায় ইউনিয়ন জ্যাক থাকলে তাতে কোনও ক্ষতি নেই। এতে পূর্বে যারা শত্রু ছিল, তাদের প্রতি সৌজন্যই দেখানো হবে। ভারতীয়রা যে ঐতিহ্য ধৈর্যসহকারে গ'ড়ে তুলেছেন, তার সঙ্গে বরং এর সংগতি থাকবে। তবে, তিনি শুনেছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি জাতীয় পতাকায় ইউনিয়ন জ্যাককে স্থান দিতে সম্মত হননি।

২২শে জুলাই জওহরলাল নেহ্‌রু সাংবিধানিক পরিষদে ভারতের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তাতে প্রস্তাব করা হ'লো যে, ভারতের জাতীয় পতাকা গৈরিক, শ্বেত ও গাঢ় সবুজের তেরঙ্গা পতাকা হবে। গৈরিক, শ্বেত ও সবুজ রংগুলি সমান্তরালভাবে উপর থেকে নীচে পর পর থাকবে। মধ্যস্থলের সাদা অংশে গাঢ় সবুজ রঙে একটি চক্র-চিহ্ন থাকবে। এই চক্র-চিহ্ন হবে চরকার প্রতীক। অশোকের সারনাথ স্তম্ভের চক্রের অনুসরণে চক্রটি রচিত হবে। চক্রটির ব্যাস হবে সাদা অংশের প্রস্থের প্রায় সমান। পতাকার আয়তনের হার হবে ২ : ৩। জওহরলাল এই প্রস্তাব উত্থাপনকালে বললেন, "আমাদের অনেকেই অতীতে বহু বৎসর ধ'রে যে পতাকা ব্যবহার ক'রে এসেছি, এতে তারই ঈষৎ পরিবর্তন করা হয়েছে। রংগুলি একই আছে। পূর্বে

সাদা অংশে একটি চরকার প্রতীক ছিল; এ প্রতীক ছিল ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতীক, তাদের শ্রমের প্রতীক, এ প্রতীক আমাদের কাছে মহাত্মা গান্ধী দেশকে যে বাণী দিয়েছেন, তা থেকে এসেছিল।"

২৬শে জুলাই গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় বলেন, রাজেন্দ্র-প্রসাদ তাঁকে বলেছেন যে, তিনি ভারতীয় ইউনিয়নে গোহত্যা-নিবারণ দাবী ক'রে লেখা পঞ্চাশ হাজার পোস্টকার্ড, ত্রিশ হাজার চিঠি এবং কয়েক হাজার তারবার্তা পেয়েছেন। একটি তারবার্তা এসে পৌঁছেছে, তাতে জানানো হয়েছে এই নিয়ে কানপুরে একজন পণ্ডিত অনশন করেছেন। হিন্দুধর্মে গোহত্যা হিন্দুদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বিশ্বের সকলের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয় নি। ধর্মীয় বিধিনিষেধ ভেতর থেকেই আসে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ বাধ্য করা। এই ধরনের জুলুম ধর্মের বিরোধী। ভারত কেবল হিন্দুদের দেশ নয়, ভারত মুসলমান, শিখ, পার্শী, খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং যারাই নিজেদের ভারতবাসী ব'লে বলে ও ভারতের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, তাদেরই দেশ। ভারতে যদি ধর্মীয় কারণে গোহত্যা-নিবারণ করা হয়, তবে পাকিস্থান সরকার কেন পাকিস্থানে, ধরো, মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করতে পারবে না? যেমন শরিয়ত অমুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি হিন্দু আইনও অহিন্দুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তিনি শ্রোতাদের বলেন, অনেক হিন্দু দীর্ঘদিন ধ'রে গোরুকে নির্যাতন ক'রে গোহত্যার অপরাধী হন। হিন্দুরাই ভারতের বাইরে গোরু রপ্তানি করেন, তাঁরা ভালোভাবেই জানেন যে, সেগুলিকে গোমাংসের নির্যাস তৈরির জন্যে হত্যা করা হবে; এই নির্যাস আবার ভারতে আসে; তখন ডাক্তারদের পরামর্শমতো সনাতনী হিন্দু বাড়ির শিশুদের বিনা দ্বিধায় ঐ নির্যাস খেতে দেওয়া হয়। এঁরাও সকলে কি গো-হত্যার সহযোগী ও অংশীদার নন?

২৫শে জুলাই বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দেশীয় রাজাদের একটি সম্মেলন ডেকে তাতে দেশীয় রাজাদের ভারত বা পাকিস্থান যে কোনও একটি ডোমিনিয়নে যোগদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন। ২৭শে জুলাই গান্ধীজী উপাসনা-সভায় এ বিষয়ে বললেন, "বড়লাট দেশীয় রাজাদের অবস্থা কি হ'তে যাচ্ছে, তা তাঁদের বুঝিয়ে ভালোই করেছেন। এ পর্যন্ত দেশীয় রাজারা বৃটিশ শক্তির ছত্রচ্ছায়ায় নিরাপদে ছিলেন। বৃটিশ ছিল সর্বোচ্চ শক্তি এবং বৃটিশ দেশীয় রাজাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ। দেশীয় রাজাদের বৃটিশের হুকুম তামিল করতে হ'তো, এমন কি বৃটিশের অনুমতি ছাড়া তাঁরা নিজেদের দেওয়ানকেও নিযুক্ত করতে পারতেন না। এখন বৃটিশের সেই সর্বোচ্চ শক্তি চলে যাচ্ছে, দেশীয় রাজারা স্বাধীন হচ্ছেন, কারণ বৃটেনের যে সর্বোচ্চ শক্তি ছিল তা ভারত বা পাকিস্থানের ওপর বর্তাচ্ছে না। বড়লাট ভারত ও পাকিস্থানের যে কোনও একটিতে দেশীয় রাজ্যগুলিকে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, এখন এককভাবে থাকা তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। বৃটিশের সর্বোচ্চ শক্তি এখন চ'লে যাওয়ায় সে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত বা পাকিস্থানে যোগদান করতে বাধ্য করতে পারে না। তাই বড়লাট দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে ভারতে বা পাকিস্থানে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু বড়লাটের বক্তৃতায় একটি ত্রুটি রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে দেশীয় রাজ্যগুলি যখন স্বাধীনতা পাচ্ছে, তখন সর্বোচ্চ শক্তি প্রকৃত পক্ষে বর্তাচ্ছে প্রজাসাধারণের উপর। সুতরাং দেশীয় রাজাদের প্রজামণ্ডলের পরামর্শ অনুসারে চলা উচিত। প্রজামণ্ডলের সরকার চালাবার অভিজ্ঞতা নেই সত্যি, নেতাদেরও তো সে অভিজ্ঞতা নেই। তাই আস্থার সঙ্গে প্রজামণ্ডলের ওপর নির্ভর করা উচিত। দেশীয় রাজাদের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তাঁরা যে রাজকর পান, তা প্রজাদের স্বার্থে এমনভাবে ব্যয় করতে হবে,

যাতে তারা যা দেয়, তার দশগুণ পায়। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা হলেন সারা ভারতবর্ষের অধিবাসীর এক-চতুর্থাংশ। দেশীয় রাজ্যের এই দশকোটি মানুষ কি ১৫ই আগস্ট আনন্দ করতে পাবে না?

২৯শে জুলাই গান্ধীজী উপাসনা-সভায় ঘোষণা করলেন যে, তিনি পরদিন কাশ্মীর যাত্রা করছেন। কাশ্মীরের সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখবার জন্যে সকলেই কাশ্মীর যায়; কিন্তু কাশ্মীর যাওয়ার ব্যাপারে সেরকম কোন আগ্রহ নেই; তিনি জওহরলালের একটি প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্যেই কাশ্মীর যাচ্ছেন। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কাশ্মীরও একটি সমস্যা হয়ে দেখা দেবে, গান্ধীজী তা জানতেন। কাশ্মীরের রাজার সঙ্গে কাশ্মীরের প্রজাদের যে সংঘাত চলছিল, সে সম্পর্কে তিনি খুব উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

গান্ধীজী ১লা আগস্ট কাশ্মীরে পৌঁছলেন। কাশ্মীরে তিনি কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। ঐ সময় প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর জনপ্রতিনিধি, জননেতা ও ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ও আলোচনায় কাটলো। তাঁরা সকলেই গান্ধীজীকে কারারুদ্ধ শেখ আবদুল্লার মুক্তির জন্যে চেষ্টা করতে অনুরোধ জানালেন। গান্ধীজী বললেন, তিনি কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাশ্মীরে আসেন নি। সত্যাগ্রহীরা জেলে থাকলে তাতে সংগ্রামের শক্তিই বাড়ে। তাই তাঁদের জন্যে তিনি উদ্‌বিগ্ন নন। জম্মুতে ছাত্ররা তাঁকে প্রশ্ন করলো, ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা পাচ্ছে; কাশ্মীরের কি হবে? গান্ধীজী বললেন, তা কাশ্মীরীরাই নির্ধারণ করবেন। কাশ্মীর ভারতে না পাকিস্থানে যোগ দেবে এই প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বললেন, তা কাশ্মীরীদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করছে। গান্ধীজীর কাশ্মীরভ্রমণের ওপর যাতে কোন প্রকার রাজনৈতিক রং চড়ানো না হয়, সেজন্যে তিনি কোন জনসভা না করতে সংকল্প করেছিলেন। তাই তিনি প্রথম দিন তাঁর নিয়মিত উপাসনা বন্ধ রাখেন। কিন্তু রাজ্য সরকার তাঁকে জানালেন যে, গান্ধীজী তাঁর বাসভবনের

প্রাঙ্গণে উপাসনা-সভা করলে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। তাই গান্ধীজী ২রা আগস্ট তাঁর উপাসনা-সভা করলেন। তাতে তাঁকে দেখবার জন্যে হাজার হাজার লোক এসে সমবেত হ'লো।

পাঞ্জাবের দুর্গতদের জন্যে গান্ধীজীর মনে শান্তি ছিল না। তাই তিনি ৪ঠা আগস্ট জম্মু থেকে মোটরে করে পাঞ্জাবে গেলেন। সেখানে তিনি ওয়া শরণার্থী-শিবিরে শরণার্থীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালেন। ঐ সময় ঐ শিবিরে শরণার্থীর সংখ্যা চব্বিশ হাজারে পৌঁছেছিল। কিন্তু ১৫ই আগস্ট যতোই আসন্ন হয়েছিল, ততোই তারা পশ্চিম পাঞ্জাব ত্যাগ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। শরণার্থীরা বলছিল, ১৫ই আগস্টের পূর্বে যাতে তাদের শরণার্থী-শিবিরটি পূর্ব পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত করা হয়, তার ব্যবস্থা করা হ'ক। তাদের মুখে-চোখে সন্ত্রাসের ছায়া ফুটে উঠেছিল। তারা বলছিল, মুসলমানদের বিশ্বাস নেই। পশ্চিম পাঞ্জাবে থাকলে তাদের হয় মরতে হবে, নয় মুসলমান হ'তে হবে। গান্ধীজী তাদের বললেন, তাঁর কিন্তু সে রকম ভয় নেই। কারণ, মুসলমানরা তাদের পাকিস্থান পেয়েছে। তাদের এখন হিন্দু বা শিখদের সঙ্গে কলহের কোনও কারণ নেই। যদি সত্যই ঐ রকম ভয়ংকর কিছু ঘটে, তবে তাতে ইসলামের ধ্বংসের পথই প্রশস্ত হবে। মুসলিম নেতারা এই রকম কোনও আত্মঘাতী নীতি নিশ্চয় অনুসরণ করবেন না। গান্ধীজী বললেন, তাঁকে নোয়াখালি যেতে না হ'লে তিনি শরণার্থীদের সঙ্গে ১৫ই আগস্ট থাকতেন। ডাঃ সুশীলা নায়ার পশ্চিম পাঞ্জাবেরই মেয়ে। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালিতে ছিলেন এবং সেখানে তাঁর চিকিৎসা ও সেবার দ্বারা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজীর প্রতিনিধিরূপে ডাঃ সুশীলা নায়ারই শরণার্থীদের সঙ্গে থাকবেন।

৮ই আগস্ট গান্ধীজী বাংলাদেশে আবার ফিরে এলেন।

কলকাতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতাও বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সুনীল বসু গান্ধীজীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। তিনি বললেন, বর্ষার সময়ে নোয়াখালিতে যেরকম ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয়, তাতে গান্ধীজীর সেখানে বেশীদিন থাকা উচিত হবে না। সেই সঙ্গে তিনি বললেন, দীর্ঘ আট বছর বাদে তিনি গান্ধীজীকে পরীক্ষা ক'রে দেখছেন। ১৯৩৯ সাল থেকে গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং তাঁর মুখের চেহারা ও রং আশ্চর্য রকম ভালো হয়েছে। ১৯৩৯ সালে ওজন ছিল ১১২ থেকে ১১৪ পাউণ্ড। এখন তাঁর ওজন ১১৩ পাউণ্ড। তাঁর হার্ট ও ফুসফুস সুস্থ ও সবল। নাড়ীর বেগ সুস্থ ও স্বাভাবিক।

৯ই আগস্ট গান্ধীজী সোদপুরে তাঁর উপাসনা-সভায় কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে বললেন। তিনি বললেন, তিনি সারাদিন কলকাতার অসংখ্য বেদনাদায়ক কাহিনী শুনেছেন। তাঁর মুসলমান বন্ধুরা বলছেন যে, হিন্দুরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছে; তাঁর হিন্দু বন্ধুরাও বলছেন যে, মুসলমানদের বোধোদয় হয় নি। এখন মুসলমান পুলিশ ও পুলিশ কর্মচারীদের সরিয়ে নেওয়ার ফলে হিন্দুদের ধারণা হয়েছে তারা যা ইচ্ছা করতে পারে, যেমনটি মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলে মুসলমানরা মনে করেছিল। তাঁর জানতে ইচ্ছে করে, তাঁর সহকর্মী ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা কি করছে? সত্যিই কি এখনও মুসলমানরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে? তা যদি হয়ে থাকে, তবে তা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পক্ষে লজ্জাজনক ব্যাপার। নোয়াখালি যাওয়ার আগে তাঁকে কয়েকদিন কলকাতায় থেকে যেতে ও অগ্নিদগ্ধ কলকাতার ওপর এক ঘটি জল ঢেলে দিতে বলা হয়েছে। তিনি যদি প্রাণ দিয়েও জনতার উন্মত্ততা নিবারণে সমর্থ হন, তাও করতে প্রস্তুত। কলকাতায় যা ঘটছে, তা গুণ্ডাদের কাজ, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। বাইরের অমার্জিত গুণ্ডামি আমাদের অন্তরে যে গুণ্ডামি নিহিত রয়েছে, তারই

প্রতিফলন মাত্র। তাই সরকারের উচিত এইসব তথাকথিত গুণ্ডামির জন্যে দায়ী থাকা।

১০ই আগস্ট গান্ধীজীর উপাসনা-সভায় বিপুল লোকসমাগম হ'লো। তাদের জয়ধ্বনি থামাবার জন্যে গান্ধীজীকে কয়েক মিনিট বক্তৃতাও দিতে হ'লো। গান্ধীজী বললেন, পরদিন তিনি নোয়াখালি যাত্রা করবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বহু মুসলমান বন্ধু তাঁকে ভারতের বৃহত্তম শহর কলকাতায় শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে চেষ্টা করতে বলেছিলেন। তাঁরা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যদি নোয়াখালি না যান এবং সেখানে দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটে, তবে তাতেও তাঁর জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে ও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে ঐদিন দেখা করেছেন। যেসব জায়গায় হিন্দুরা ধ্বংসকর্ম করেছে, সেগুলি দেখার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি একথাও শুনেছেন যে, এমন অনেক মুসলিম-অধ্যুষিত স্থান রয়েছে, যেখানে হিন্দুরা যাঁরা ঐসব স্থান থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন, সেখানে ঢুকতেও পারছে না। হিন্দুপ্রধান স্থানগুলিতেও নাকি ঐ রকম ঘটছে। এইসব বর্বরতার কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁর মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেছে, তাঁর ইচ্ছে করে ঐসব জায়গায় ঘটনার সত্যাসত্য নিজের চোখে দেখতে। তাঁকে বলা হয়েছে, কলকাতার মুসলমানরা জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগের বেশী নয়। কিভাবে এই ধরনের সংখ্যালঘুরা সরকারের উৎসাহ বা অযোগ্যতা ছাড়া সংখ্যাগুরুদের বাধ্য করতে পারে, তা তাঁর বোধগম্য হয় নি। এ-কথাও তিনি বুঝতে পারেন না যে, যে সরকার শাসনব্যবস্থা চালাতে জানে, তার সমক্ষে কিভাবে সংখ্যাগুরুরাই বা সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম করে। একথাও তাঁকে বলা হয়েছে যে, পূর্বে মুসলিম পুলিস ও পুলিস কর্মচারী যা করেছিল, এখন তাই করছে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আমলে হিন্দু পুলিস ও পুলিস কর্মচারীরা। পুলিসের

ভেতরে যদি এই শোচনীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করে, তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি আশা করেন, পুলিস তাদের পদের মর্যাদা উপলব্ধি করবে।

গান্ধীজী এই সময়ে কলকাতার সর্বাধিক উপদ্রুত অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের একযোগে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে আরও সক্রিয় হ'তে বললেন। তিনি সুরাবর্দী সাহেবকে তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে শহরের উপদ্রুত অঞ্চলে থাকতে বললেন। সুরাবর্দী সাহেব এতে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাতে না পারলেও পরে সম্মত হলেন। ১৩ই আগস্ট বিকালে গান্ধীজী বেলিয়াঘাটায় একটি মুসলমানের ভগ্ন বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র ও মুসলিম লীগের জেলা কমিটির সম্পাদক মিঃ ওসমান, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, মানু গান্ধী ও আভা গান্ধী। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ঘোষ সাংবাদিকদের জানালেন যে, গান্ধীজী বিনা পুলিস বা সামরিক পাহারায় শহরের উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। গান্ধীজীর জন্যে না হ'লেও সুরাবর্দী সাহেবের নিরাপত্তার জন্যে সরকার পুলিস রাখতে বাধ্য।

বেলিয়াঘাটা ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের মিশ্র পল্লী। এখানেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা সর্বাধিক গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। বোমা, বন্দুক, অগ্নিসংযোগ, ছোরা, ছুরি, নারী অপহরণ, খুন, জখম সবই হয়েছিল এখানে। এই অঞ্চলটি গুণ্ডার আড্ডা ব'লেও সুপরিচিত ছিল। গান্ধীজী পৌঁছবার কিছু পরেই সুরাবর্দী এসে পৌঁছলেন। তাঁর গাড়ি আটকে জনতা "সুরাবর্দী ফিরে যাও" বলে চীৎকার করতে লাগলো। পুলিসের সাহায্যে সুরাবর্দীর গাড়ি বাড়ির উঠোনে এসে পৌঁছলো। সুরাবর্দী শান্তভাবে গাড়ি থেকে নেমে গান্ধীজী যে কক্ষে বসে চিঠিপত্র লিখছিলেন, তার বাইরে জুতো খুলে গান্ধীজীর পাশে এসে বসলেন। গান্ধীজী মৃদু হেসে তাঁকে সংবর্ধনা

জানালেন। বাইরে জনতা ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠলো। গান্ধীজীর সচিব অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ক্রুদ্ধ জনতার কাছে গিয়ে তাদের শান্ত হ'তে এবং তাদের কোন বক্তব্য থাকলে তা গান্ধীজীকে শান্তিপূর্ণভাবে গিয়ে জানাতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ জনতা চেঁচামেচি করতে লাগলো, তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। একদল ক্রুদ্ধ যুবক গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে চীৎকার ক'রে প্রশ্ন করলো, "গত বছর ১৬ই আগস্ট যখন হিন্দুর ঘরে ঘরে আগুন জ্বলছিল, তখন আসেন নি কেন? কলুটোলায় বা পার্ক সার্কাসে যেখানে শত শত হিন্দুর বাড়ি শূন্য ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে, সেখানে গিয়ে থাকছেন না কেন?"

গান্ধীজী তাদের বললেন, তাদের স্মরণ রাখা উচিত, গত বছর ১৬ই আগস্ট থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের সমগ্র রাজনৈতিক কাঠামো বদলে গেছে। পাছে নোয়াখালি জেলায় কিছু ঘটে, সেজন্যে তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দিল্লী থেকে সুরাবর্দী সাহেব বিমানে এসে তাঁকে জানালেন যে, কলকাতায় আগুন জ্বলছে, তিনি যদি তাতে কিছুটা শান্তিবারি সিঞ্চন করতে পারেন। সুরাবর্দী সাহেব বলেছেন, তিনি (গান্ধীজী) কলকাতায় থেকে এখানে শান্তি স্থাপন করতে পারলে তা নোয়াখালিতে হিন্দুদের শান্তি ও নিরাপত্তার সহায়ক হবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই গান্ধীজী তাঁর ভাই মনে করেন। তিনি চান, মুসলমান ও হিন্দু সকলেই তাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারুক।

পরদিন, ১৪ই আগস্ট, কলকাতায় দুঃখজনক কোনও ঘটনা ঘটলো না। পূর্বদিন বেলেঘাটায় গান্ধীজীর বাসা ঘিরে যে ক্রুদ্ধ জনতা দেখা দিয়েছিল, তা-ও ছিল না। গান্ধীজী স্থানীয় একটি পার্কে প্রকাশ্যে উপাসনা-সভা করলেন। হিন্দু ও মুসলিম নেতারা মিলিতভাবে "হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই", ভারত ও পাকিস্থান জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে উপদ্রুত অঞ্চলগুলি ঘুরে বেড়ালেন।

অনেক উপদ্রুত জায়গায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের যেন জোয়ার এলো, সন্ত্রাস ও সংশয়ের বাঁধ যেন কে হঠাৎ ভেঙে দিলো। ঐদিন করাচীতে পাকিস্থানের আগমন ঘোষণা ক'রে মিঃ জিন্না বললেন, "ছুই ভারত আজ বন্ধুর মতো পরস্পরের কাছে বিদায় নিচ্ছে ; তাদের এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হবে।" গান্ধীজী ১৪ই সন্ধ্যাবেলা মোটরে ক'রে বেলিয়াঘাটার উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরে হিন্দু-মুসলমানের স্বতঃস্ফূর্ত মিলনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন।

১৪ই তারিখে তাঁর উপাসনা-সভায় প্রায় দশ হাজার নরনারী সমবেত হ'লো। গান্ধীজী তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আগামীকালের দিনটি বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির দিন রূপে ধার্য হয়েছে। তাই ঐ দিনটি একটি চিরস্মরণীয় দিন। সুতরাং ঐ দিনটিকে সকলেরই উপযুক্তভাবে উদ্‌যাপন করা উচিত। ঐদিন ভারত ও পাকিস্থান, ছুই ডোমিনিয়নের উপরই কর্তব্যের গুরুভার ন্যস্ত হচ্ছে। তিনি প্রত্যেককে ঐদিন ভারতের মঙ্গলকামনা ক'রে উপবাস করতে এবং যথাসম্ভব সুতো কাটতে বললেন। তিনি বললেন, সুতো কাটাই আজ দরিদ্র ও ধনীকে মিলিত করেছে এবং অগণিত বেকার মানুষকে কাজ দিয়েছে। গান্ধীজী নোয়াখালির পরিবর্তে তাঁর কলকাতায় থাকবার কারণও আবার ব্যাখ্যা ক'রে বললেন। তিনি বললেন, কলকাতায় যদি প্রকৃতিস্থতা ফিরে আসে তবে নোয়াখালি এবং ভারতের অন্যান্য স্থানও নিরাপদ। গান্ধীজী বললেন, "কাল থেকে আমরা বৃটিশের পাশমুক্ত হব। কিন্তু আজ মধ্যরাত্রি থেকে ভারতবর্ষ বিভক্তও হবে। তাই আগামীকাল আমাদের যেমন আনন্দের দিন, তেমনি ছুঃখের দিন। আমাদের স্কন্ধে গুরু দায়িত্ব-ভারও ন্যস্ত হচ্ছে। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমরা যেন এই গুরুভার বহনের উপযুক্ত হ'তে পারি।"

১৪ই তারিখে দিল্লীতেও আনন্দ-উল্লাসের এক অভাবনীয় প্লাবন এলো। লক্ষ লক্ষ নরনারী সাংবিধানিক পরিষদের বাইরে সমবেত

হয়ে উল্লাসধ্বনিতে ও শঙ্খধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করলো, লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো "জয় মহাত্মাজী কী জয়!" সাংবিধানিক পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর ভাষণে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মদান এবং গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও ভূমিকার কথা বর্ণনা করলেন। রাত্রি ১২টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে একজন সদস্য শঙ্খধ্বনি ক'রে শুভ ১৫ই আগস্টের আগমন বার্তা ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসধ্বনিতে পরিষদ্‌গৃহ ফেটে পড়লো। রাজেন্দ্রপ্রসাদ গুরুগম্ভীর পরিবেশে শপথবাক্য উচ্চারণ করলেন এবং সদস্যরা সকলে দণ্ডায়মান থেকে শপথবাক্য উচ্চারণ করলেন। তারপর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষণা করলেন যে, "এখন ভারতের সাংবিধানিক পরিষদ্ ভারতশাসনের ক্ষমতা যে গ্রহণ করছে, তা বড়লাটকে জানিয়ে দেওয়া হ'ক।" জওহরলাল সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। পরদিন ১৫ আগস্ট সকালে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সাংবিধানিক পরিষদে ঘোষণা করলেন যে, তিনি স্বাধীন ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ সানন্দে গ্রহণ করছেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বললেন, "এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে অহিংসার মধ্য দিয়ে যিনি ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ গড়ে তুলেছেন, সেই মহাত্মা গান্ধীর কাছে ভারতের ঋণের কথা আমরা যেন ভুলে না যাই।"

ঐদিন ১৫ই আগস্ট কলকাতায় আনন্দ-সমারোহের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হ'লো হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের জোয়ার। লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'লো, হাতে রাখী বেঁধে দিলো, একদিন আগেও যে এরা শাণিত ছুরিকা নিয়ে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল, তা কল্পনাও করা গেল না। "হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই", "হিন্দু-মুসলমান এক হ'ক," "জয় হিন্দ" প্রভৃতি ধ্বনিতে কলকাতা মুখর হয়ে উঠলো। বেলিয়াঘাটায় গান্ধীজীর গৃহ কলকাতাবাসীদের তীর্থস্থানে পরিণত হ'লো।

সমগ্র দেশ যখন আনন্দে মগ্ন, তখন যে মানুষটি ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি এই আনন্দ-উন্মাদনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। ভারত সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগের একজন প্রতিনিধি তাঁর কাছে বাণী চাইতে গেলে তিনি বললেন, তিনি শুকিয়ে গেছেন। প্রতিনিধিটি বললেন, তিনি বাণী না দিলে খারাপ দেখাবে, তিনি বললেন, "কোন বাণীই নেই ; তা যদি খারাপ দেখায় দেখাক।" বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের একদল প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বাণী চাইলে তিনি বললেন, "আমি যে ইংরেজী জানি, তা ভুলে যান।"

ঐ দিন ছিল মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যু-দিবস। গান্ধীজী ভোরে উঠে উপাসনা করলেন এবং সমগ্র গীতা পাঠ ক'রে "মহাদেব দেশাই দিবস" পালন করলেন। তিনি স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করলেন ২৪ ঘণ্টা অনশন ক'রে ও চরকায় সুতো কেটে।

বেলিয়াঘাটা রাসবাগান ময়দানে উপাসনা-সভার আয়োজন হয়েছিল। গান্ধীজীর বাসা থেকে ময়দান মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। গান্ধীজী ঐ পথটুকু পায়ে হেঁটে যেতে চাইলেন। কিন্তু মাঠে অগণিত মানুষের ভীড় ঠেলে উপাসনা-সভায় পৌঁছতে তাঁর পঁচিশ মিনিট লাগলো। উপাসনা-সভায় ত্রিশ হাজারেরও বেশী লোক সমবেত হয়েছিল। হিন্দু ও মুসমানের জয়ধ্বনিতে সভাপ্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠলো। ঐ দিন হিন্দু-মুসলমান সকলেই মিলিতভাবে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড়ালো। উপাসনা-সভাশেষে গান্ধীজী তাঁর ২৪ ঘণ্টার উপবাস ভঙ্গ করলেন। তিনি পূর্বদিন সন্ধ্যা থেকে উপবাস শুরু করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ যখন তাঁকে সারা শহরে হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব মিলনের সংবাদ দিলেন, তখন আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রাত্রিতে গান্ধীজী শহরে ঘুরে স্বচক্ষে এই মিলনের দৃশ্য দেখলেন। ১৬ই

তারিখে তিনি "হরিজন" পত্রিকার জন্যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখলেন—"দৈবলীলা না আকস্মিক ঘটনা" (Miracle or Accident).

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দৈবলীলা ছিল না, আকস্মিক ঘটনাও ছিল না—ছিল মরীচিকা মাত্র। গান্ধীজী এর স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয়ী ছিলেন। তাই তিনি হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত ও সুস্থায়ী মিলন ও শান্তির জন্য একাগ্রভাবে কাজ ক'রে চললেন।

গান্ধীজী যখনই সুযোগ পেলেন হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখালেন। বললেন, মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ করছিল, সে লক্ষ্য ভারতবিভাগ ও পাকিস্থান। হিন্দু ও শিখরা একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ করছিল ভারতের অখণ্ডতা। মুসলিম লীগ এখন তার লক্ষ্যে পৌঁছেছে; কায়েদ-ই-আজম জিন্না ঘোষণা করেছেন, পাকিস্থানে মুসলিম ও সংখ্যালঘুরা সমান ব্যবহার পাবে। কংগ্রেসও তাই ঘোষণা করেছে। সুতরাং এখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জীইয়ে রাখার কারণ নেই। তা সত্ত্বেও ব্যারাকপুর কাঁচরাপাড়া প্রভৃতি স্থানে দু'একটি সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ঘটেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের যে জোয়ার দেখা দিয়েছে, তাতে সকলকে আত্মসন্তুষ্ট হ'তে গান্ধীজী নিষেধ করলেন। ২০শে আগস্ট তারিখে গান্ধীজী খোংরাপটিতে চার লক্ষাধিক নরনারীর এক সভায় ভাষণ দিলেন। এখানে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখে তিনি অভিভূত হলেন। গান্ধীজী বললেন, তিনি এই মর্মে কয়েকখানি পত্র পেয়েছেন যে, এখন কলকাতায় যখন শান্তি স্থাপিত হয়েছে, তখন তাঁর পাঞ্জাবে যাওয়া উচিত, সেখানে এখনও আগুন জ্বলছে। গান্ধীজী বললেন, কলকাতাও যেমন তাঁর আপনার, পাঞ্জাবও তেমনি তাঁর আপনার। প্রয়োজন হ'লেই তিনি পাঞ্জাবে যাবেন। কিন্তু ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীরা জানিয়েছেন

তাঁরা পাঞ্জাবে শান্তিস্থাপনের জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করেছেন, তাই তিনি আশা করতে পারেন কলকাতার মতো পাঞ্জাবেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

২৪শে আগস্ট ময়দানে গান্ধীজীকে কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে পৌর সংবর্ধনা জানানো হ'লো। কলকাতা এই নিয়ে তাঁকে তিনবার পৌর সংবর্ধনা জানালো।

কলকাতায় আপাতদৃষ্টিতে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। তাই গান্ধীজী সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে নোয়াখালি যাবেন স্থির করলেন। কিন্তু ৩১শে আগস্ট সন্ধ্যায় অকস্মাৎ একটি ঘটনা ঘটলো। পাঞ্জাবে যে দাঙ্গা বেধেছিল, তাতে বহুসংখ্যক শিখ ও হিন্দু নিহত ও সর্বস্বান্ত হয়েছিল। দলে দলে শিখ ও হিন্দুরা পশ্চিম পাঞ্জাব ছেড়ে পূর্ব পাঞ্জাবে পালিয়ে এসেছিল। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ পশ্চিম বঙ্গেও ক্রমাগত পৌঁছচ্ছিল। এখানকার শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে আবার উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। কয়েকদিন আগে যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের জোয়ার এসেছিল, তা কোথায় ভাটিয়ে গিয়েছিল। আবার বীভৎস সাম্প্রদায়িকতা কলকাতার শান্তির আকাশকে মসীলিপ্ত ক'রে দিয়েছিল। ৩১শে আগস্ট রবিবার সন্ধ্যায় গান্ধীজী সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে উঠলেন।

তখন প্রায় রাত দশটা। গান্ধীজী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর বাসভবনের বাইরে একদল যুবকের উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে কি ঘটছে, তা বুঝতে না পেরে গান্ধীজী কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে রইলেন। তাঁর কানে জানালার কাচগুলি ভেঙ্গে পড়বার শব্দ আসতে লাগলো। গান্ধীজীর দুই পাশে মাম্নু ও আভা গান্ধী শুয়েছিলেন। গান্ধীজী চোখ বুজে শুয়ে থাকায় বুঝতে পারলেন না যে, তাঁরা দুজনেই উঠে বাইরে গিয়ে উত্তেজিত যুবকদের শান্ত করবার চেষ্টা

করছিলেন। যুবকরা যে তাঁদের কোন লাঞ্ছনা করে নি তা সৌভাগ্যের বিষয়। একজন বৃদ্ধা মুসলিম মহিলা, বি আম্মা ও একজন তরুণ মুসলিম গান্ধীজীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। গান্ধীজীকে আঘাত থেকে সম্ভবতঃ রক্ষা করবার জন্যে।

চেঁচামেচি ক্রমেই বাড়তে লাগলো। অনেকে দালানে ঢুকে প'ড়ে গান্ধীজীর কক্ষের দরজায় ঘা দিতে লাগলো। গান্ধীজী এখন ক্রুদ্ধ জনতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। তিনি একটি চৌকাঠের কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে এগোতে না দেওয়ার জন্যে ঘিরে রইলেন। পুলিস কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হাতজোড় ক'রে জনতাকে শান্ত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। জনতার মধ্য থেকে একজন গান্ধীজীকে লক্ষ্য ক'রে লাঠি ছুঁড়ে মারলো। লাঠিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় গান্ধীজী বা তাঁর সঙ্গীদের কাউকে লাগলো না। গান্ধীজীকে লক্ষ্য ক'রে একটা ইঁট ছোঁড়া হয়েছিল। তা গান্ধীজীকে না লেগে তাঁর সঙ্গী একজন মুসলমান যুবককে এসে লাগলো। মানু ও আভা গান্ধীজীকে আড়াল ক'রে তাঁকে আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সময়ে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁর সহকর্মীরা এসে পড়লেন। তাঁরা জনতার উপর কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না ক'রে তাঁদের শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং গান্ধীজীকে ঘরের ভেতরে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। গান্ধীজী ও তাঁর সঙ্গীরা ঘরের ভেতরে গেলে পুলিস জনতাকে চলে যাওয়ার জন্যে বারবার অনুরোধ করলেন। তাতে কোনও সুফল না হওয়ায় পুলিস কাঁদানে বোমা ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করলো। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসে পড়লেন।

কলকাতায় যে আবার ব্যাপকভাবে আগুন জ্বলবে, সে বিষয়ে

গান্ধীজীর কোনও সংশয় রইলো না। প্যারেলাল নোয়াখালি থেকে গান্ধীজীকে নিয়ে যাওয়ার জন্মে এসেছিলেন। তাঁকে গান্ধীজী বললেন, "আজকের এই ঘটনার পর আমার নোয়াখালি যাওয়ার সংকল্প আর নেই। কলকাতায় যদি আগুন জ্বলতে থাকে, তবে আমার পক্ষে নোয়াখালি কেন, কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। আজকের এই ঘটনা আমার কাছে ভগবানের সতর্কবাণী বয়ে এনেছে।"

পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর ছিল গান্ধীজীর মৌন দিবস। ঐদিন নানা দুঃসংবাদ আসতে লাগলো। গান্ধীজী সর্দার প্যাটেলকে লিখলেন, "এখন সর্বত্রই যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখছি। আমি এখুনি দুজন মুসলমানের মৃতদেহ দেখে এলাম; তারা ছুরিকাহত হয়ে মরেছে। শুনছি অনেক জায়গায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, কলকাতায় যাকে দৈবলীলা ব'লে ভেবেছিলাম, তা অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এখন আমার কর্তব্য কি। জওহর তারবার্তা ক'রে জানিয়েছেন আমার পাঞ্জাব রওনা হওয়া উচিত। এই অবস্থায় কিভাবে যেতে পারি? আমি নিজের মধ্যে গভীরভাবে অনুসন্ধান করছি। এ ব্যাপারে নীরবতাই সহায়ক।"

এদিন কয়েকটি প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে জানতে চাইলো কিভাবে এই আগুন নেবানো যেতে পারে। গান্ধীজী তাদের বললেন, "যারা দাঙ্গাহাঙ্গামা করছে তাদের মধ্যে যাও, তাদের এই উন্মত্ততা থেকে বিরত করো, কিংবা বিরত করবার চেষ্টায় তাদের হাতে মরো। নিজেদের ব্যর্থতা জানাবার জন্মে এসো না। এখন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আত্মবলি দেওয়ার সময় এসেছে। এখন পর্যন্ত একমাত্র গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী ছাড়া সাধারণ কর্মীরাই এই ধ্বংসলীলার বলি হয়েছে।"

গান্ধীজী যখন এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন তিনি ভাবছিলেন, যে আদর্শের চিত্র তিনি এঁদের সামনে তুলে ধরছেন, তাতে

তাঁর নিজের স্থান কোথা? তিনি বললেন, "আমি যা করতে বলছি, আজ আমি নিজে তা পারি না। আমাকে তা করতে দেওয়া হবে না। কাল আমি তা দেখেছি। আমাকে রক্ষা করবার জন্যে সবাই ছুটে আসবে।" গান্ধীজী তাই অনশন করবেন স্থির করলেন।

সন্ধ্যায় পশ্চিম বঙ্গের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল রাজাগোপালাচারী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাঁর সংকল্পের কথা জানালেন। রাজাজী বললেন, "কার বিরুদ্ধে অনশন করবেন? গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে?" গান্ধীজী বললেন, "এই আগুন গুণ্ডারা জ্বালেনি, জ্বেলেছে যারা গুণ্ডা হয়েছে। আমরাই গুণ্ডা তৈরি করি; আমাদের সহানুভূতি ও নিষ্ক্রিয় সমর্থন ছাড়া গুণ্ডারা কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। যারা গুণ্ডাদের পেছনে আছে আমি তাদের হৃদয়স্পর্শ করতে চাই।" রাজাজী বললেন, "এখনই অনশন শুরু না ক'রে একটু অপেক্ষা ক'রে দেখলে ভালো হ'তো না?" গান্ধীজী বললেন, "খুব দেরি হয়ে যাবে। এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে আমি সংখ্যালঘু মুসলমানদের ছেড়ে দিতে পারি না। আমার অনশন হবে নিবর্তনমূলক। আমি জানি, আমি যদি কলকাতাকে আয়ত্তে আনতে পারি, তবে পাঞ্জাবকেও পারবো। কিন্তু আমি যদি ইতস্ততঃ করি, তবে শীঘ্রই দেখবে একাধিক শক্তি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং আমাদের স্বাধীনতার ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন ভেঙে গেছে।" রাজাজী বললেন, "ধরুন, আপনি মারা গেলেন, তাতে অবস্থা আরও খারাপ হবে।" গান্ধীজী বললেন, "অন্ততঃপক্ষে তা দেখবার জন্যে আমি থাকবো না, আমার কর্তব্যটুকু আমি ক'রে যাব।"

গান্ধীজী ঐ দিনই সন্ধ্যা আটটা পনেরো মিনিট থেকে অনশন শুরু করলেন। গান্ধীজী সংবাদপত্রে প্রদত্ত তাঁর বিবৃতিতে বললেন, "যে অস্ত্র আজ পর্যন্ত আমার পক্ষে অমোঘ প্রতিপন্ন হয়েছে, তা

অনশন। উন্মত্ত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে সব সময় কাজ হয় না। কাল রাত্রিতে নিশ্চয় তা ব্যর্থ হয়েছে, আমার উপস্থিতি ও কথা যে কাজ করতে পারেনি, তা আমার অনশন হয়তো পারবে। কলকাতায় যদি তা সমর্থ হয়, তবে পাঞ্জাবেও তা যুধ্যমান দুই দলের হৃদয়স্পর্শ করতে সমর্থ হবে। তাই আজ সন্ধ্যা সওয়া আটটায় আমি অনশন শুরু করেছি। কলকাতায় প্রকৃতিস্থতা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ অনশন চলবে।···কলকাতার জনসাধারণ যদি চান যে, আমি পাঞ্জাব গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের সাহায্য করি, তবে তাঁরা আমি যাতে যথাসম্ভব সত্বর অনশন ভঙ্গ করতে পারি, তার ব্যবস্থা যেন করেন।"

পরদিন সকালে গান্ধীজী কয়েকটি দুর্ঘটনার সংবাদ খবরের কাগজে পড়লেন এবং তাঁর সঙ্গীদের কয়েকজনকে প্রকৃত অবস্থা দেখবার জন্যে পাঠালেন। বিকালে হিন্দুমহাসভার কয়েকজন নেতা সহ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং তাঁরা গান্ধীজীকে অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ করলেন। গান্ধীজী বললেন, 'দুদিন আগেও যেমনটি ছিল সেইরকম স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই অনশন ভঙ্গ করব।"

২রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গান্ধীজীর অনশনের ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হলো। পরদিন মুসলিম লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা এসে গান্ধীজীকে অনশন ভঙ্গ করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বললেন, "আমাদের মধ্যে আপনার উপস্থিতিই একটা সম্পদ্। তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।" গান্ধীজী বললেন, "তাঁর উপস্থিতিতে ফল হয় নি, তাঁর কথাতেও কাজ হয় নি; তাঁর অনশনে কাজ হবে ব'লে তিনি আশা করেন। মুসলমানরা যদি তাঁর উপস্থিতিকে সম্পদ্ মনে করে, তবে কলকাতা উন্মত্ত হয়ে গেলেও তাদের প্রতিহিংসা থেকে বিরত থাকা উচিত। ইতিমধ্যে আমার অগ্নি-পরীক্ষা চলতে থাকবে।"

গান্ধীজীর অনশন সাধারণ মানুষ, কর্মী ও নেতাদের উদ্বিগ্ন ক'রে তুললো। শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে শচীন মিত্র ও স্মৃতীশ ব্যানার্জীর মতো ব্যক্তিরা গুণ্ডার হাতে প্রাণ দিলেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা দ্রুত কমে এলো। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সরকার ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গান্ধীজীকে জানালেন যে, গত ২৪ ঘণ্টায় কোনও বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে নি। গান্ধীজীর শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবু তিনি শহরের অবস্থার সংবাদ দিতে বা শান্তি স্থাপনের বিষয়ে আলাপ করতে যাঁরাই এলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন। ডঃ সুনীল বসু তাঁকে বিরত করতে চাইলে তিনি বললেন, অকারণ শক্তিক্ষয় করতে তিনি চান না, বাঁচতেও তাঁর ইচ্ছা আছে; কিন্তু যেজন্যে তাঁর বেঁচে থাকা তা তিনি ব্যাহত করতে পারবেন না। এই কাজে যদি তাঁর জীবনও যায়, তাতে তিনি সুখীই হবেন।

বেলিয়াঘাটার অধিবাসীরাও নিজেদের সদিচ্ছা ও সততা প্রমাণ করবার জন্যে মুসলিম বস্তিগুলিকে পুনরায় বাসযোগ্য ক'রে তুললেন, এবং মুসলমানদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সঙ্গে ফিরিয়ে আনবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন।

যতোই সময় যেতে লাগলো, ততোই গান্ধীজী আরও দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। এই মহামূল্য জীবনটিকে বাঁচাবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানরা মিলিতভাবে কলকাতার মহল্লায় মহল্লায় ফিরে দ্রুত শান্তি স্থাপন ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রায় পঞ্চাশজন লোক এসে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা ক'রে জানালো, তারা দুর্বৃত্তদের প্রায় সবাইকে আয়ত্তের মধ্যে এনেছে, তারা নিশ্চয়তা দিচ্ছে আর কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে না। ৩১শে আগস্ট রাত্রিতে যারা গান্ধীজীর বাসভবনে হামলা করেছিল, তাদেরও তারা খুঁজে বের করেছে; এমন কি, যে লোকটা

গান্ধীজীকে লক্ষ্য ক'রে লাঠি ছুঁড়েছিল তাকে পর্যন্ত। তারা গান্ধীজীকে অনশন ত্যাগ করতে বললো। সেই সঙ্গে বললো, গান্ধীজীর অনশন তাদের উপর দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠেছে। গান্ধীজী বললেন, তারা যদি অন্তর থেকে প্রকৃত সহানুভূতি বোধ না করে, তবে তাঁর অনশন তাদের উপর চাপসৃষ্টি করবে কেন? তিনি কারও ওপর চাপসৃষ্টির জন্যে অনশন করেন নি; তিনি সকলের চিত্তশুদ্ধির জন্যে অনশন করেছেন। গান্ধীজী কেবল প্রতিশ্রুতিতে যে অনশন ভঙ্গ করবেন না, তা জেনে তারা চ'লে গেল। ৩১শে আগস্ট তাঁর বাসভবনে যারা হামলা করেছিল, তাদের অনেকেই ঐদিন বিকালে গান্ধীজীর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করলো। সন্ধ্যার দিকে হিন্দুমহাসভার সভাপতি শ্রীনির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জী, দেশদর্পণের সম্পাদক সর্দার নিরঞ্জন সিং গালিব, মুসলিম লীগের ডাঃ জিলানি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসে জানালেন যে, শহরে সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং গান্ধীজীর এখন অনশন ভঙ্গ করা উচিত। রাজ্যপাল রাজাগোপালাচারী, আচার্য কৃপালনী, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ সুরাবর্দীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও গান্ধীজীকে অনশনভঙ্গের জন্য অনুরোধ করলেন।

গান্ধীজী তাঁদের বললেন, ১৫ই আগস্ট হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের যে বান ডেকেছিল তাতে তিনি সন্তুষ্ট হ'লেও তাকে সংশয় ও সতর্কতার সঙ্গেই লক্ষ্য করেছিলেন। যদি প্রকৃত মৈত্রীর মনোভাব থাকতো. তবে তার অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশ পেতো, যেমন, বিতাড়িত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সে রকম কিছু দেখা যায় নি; তাই আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিয়েছে।...গত চব্বিশ ঘণ্টায় যে প্রকৃতিস্থতা দেখা দিয়েছে, তা তাঁর কাছে যথেষ্ট নয়। যাঁরা তাঁকে অনশনভঙ্গের কথা বলছেন, তাঁরা যদি তাঁকে লিখিতভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'লে তাঁরা প্রাণ দিয়েও তা

রোধ করবেন, তবেই তিনি অনশন ভঙ্গ করতে পারেন। আবার যদি হাঙ্গামা দেখা দেয়, তবে তিনি আমরণ অনশন করবেন। গান্ধীজী কথাগুলি অত্যন্ত আবেগভরে বললেন। সুরাবর্দী এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করবার জন্যে পাশের ঘরে যাওয়ার প্রস্তাব করলে রাজাজী, কৃপালনী প্রভৃতি তাতে সম্মত হলেন। এই সময়ে কলকাতার বহু বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানের স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র এসে পৌঁছলো; তাতে তাঁরা কলকাতায় আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'লে তা প্রাণ দিয়ে নিরোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং গান্ধীজীকে অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ করেছেন। সুরাবর্দী আবেদনপত্রটি পড়ে শোনালেন। গান্ধীজীর খুব হিক্কা হ'তে থাকায় তাঁকে বিশ্রাম করতে দিয়ে সকলে পাশের ঘরে গেলেন। রাজাজী একটি অঙ্গীকারপত্র রচনা করলেন। তাতে এন. সি. চ্যাটার্জী, দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সুরাবর্দী, আর. কে. জইড, নিরঞ্জন সিং তালিব ও আরও অনেকে স্বাক্ষর দিলেন। ইতিমধ্যে একগাড়ি হাতবোমা ও অস্ত্রশস্ত্র গান্ধীজীর কাছে সমর্পণের জন্য এসে পৌঁছলো; এতেও দাঙ্গাকারীরা যে হিংসার পথ ত্যাগ ক'রে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর পথ গ্রহণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তা সূচিত হ'লো। গান্ধীজীকে স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার-পত্রটি দেওয়া হ'লে তিনি অনশন ভঙ্গ করতে রাজী হলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা সওয়া নটায় তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন।

পরদিন গান্ধীজী অত্যন্ত দুর্বল থাকায় উপাসনা-সভায় যোগ দিলেন না। পরদিন ৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে গান্ধীজীকে এক জনসভায় কৃতজ্ঞতা জানানো হ'লো। মুসলিম লীগের পত্রিকা "মর্নিং নিউজ" তাঁর উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জানালো। ইংলণ্ডের "দি টাইমস্" পত্রিকার সংবাদদাতা লিখে পাঠালেন, গান্ধীজী যা করেছেন, তা কয়েক ডিভিসন সৈন্যের

পক্ষেও অসাধ্য ছিল। রাজাগোপালাচারী বললেন, "গান্ধীজী বহু বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু কলকাতায় তিনি অশুভ শক্তিকে যেভাবে পরাভূত করলেন, তার তুলনা হয় না।"

স্বাধীন ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন জানালেন, "পাঞ্জাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন করতে তাঁরা পঞ্চান্ন হাজার সৈন্য নিয়োগ করেছেন। কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যাপকভাবেই চলছে। কলকাতায় আমাদের একজনমাত্র সৈনিক নিযুক্ত আছেন; কিন্তু সেখানে কোনও হাঙ্গামা নেই। একজন সৈনিক ও শাসক রূপে আমি এই এক-ব্যক্তিবিশিষ্ট বিপুল বাহিনীকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।"

অবশেষে কলকাতায় শান্তি স্থাপিত হ'লো। গান্ধীজীর একক আত্মিক শক্তি পরাভূত করলো বিশাল অশুভ শক্তিকে। গান্ধীজী পুরো একমাস কলকাতায় থাকার পর ৭ই সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব যাওয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন। সাংবাদিকরা তাঁকে বাণী দিতে অনুরোধ করলে তিনি বাংলায় লিখে দিলেন, "আমার জীবনই আমার বাণী।"

আটাশ

আত্মাহুতি

গান্ধীজী ৯ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে পৌঁছে রাজধানীতে ভয়ংকর দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনলেন। তিনি একটি বিবৃতিতে বললেন, "মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন আর, এই কথাটি অন্যের অনেকের মতোই আমার জীবনে বহুবার সত্য হয়েছে। আমি যখন গত রবিবার কলকাতা থেকে দিল্লী রওনা হয়েছিলাম, তখন দিল্লীতে হাঙ্গামার কথা কিছুই জানতাম না। দিল্লীতে পৌঁছে আমি সারাদিন অবিরাম বেদনার কাহিনী শুনছি, দিল্লী আজ যেন বেদনার মূর্তি হয়ে উঠেছে। কয়েকজন মুসলমান বন্ধু তাঁদের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দিল্লী যতোদিন না তার পূর্বাবস্থা ফিরে পায় ততোদিন পর্যন্ত আমার পাঞ্জাব রওনা হওয়া উচিত হবে না, এই বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিতে এসব কাহিনী যথেষ্ট।......"

গান্ধীজীর থাকবার জন্যে এবার বিড়লা-ভবনে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ, তাঁর চিরপ্রিয় ভাঙ্গীপল্লী ও বাল্মীকি মন্দির শরণার্থীতে ভ'রে গিয়েছিল। সেখানে তিলধারণের স্থান ছিল না। পরদিন গান্ধীজী চল্লিশ মাইল ঘুরে দিল্লী ও ওখলার শরণার্থী-শিবিরগুলি দেখলেন। গান্ধীজী হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের কাছে মুসলমান শরণার্থী-শিবিরেও গেলেন। তিনি ডঃ জাকির হোসেনের জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও গেলেন। সর্বত্রই একই বেদনার-কাহিনী, সর্বত্রই একই খাদ্যাভাব, একই জলাভাব, একই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুললো। তিনি হাসপাতালগুলি ও শরণার্থী-শিবিরগুলি ঘুরে ঘুরে হিন্দু-মুসলমান সকলকে সান্ত্বনার বাণী শোনালেন। জুম্মা মসজিদে প্রায় ত্রিশ হাজার ও পুরান কেল্লায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার মুসলমান শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল।

অন্যান্য অংশে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত হাজার হাজার

অমুসলমান আশ্রয় নিয়েছিল। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে প্রায় আট লক্ষ অমুসলমান শরণার্থী পূর্ব পাঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। গান্ধীজী দিল্লীর আকাশে বাতাসে পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ ও সন্দেহ ঘনীভূত দেখলেন। রাজধানীতে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী গ'ড়ে তোলাই তাঁর কাছে আশু করণীয় হয়ে উঠলো।

১৬ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী একটি শরণার্থী-শিবিরে তাঁর উপাসনা-সভা করছিলেন। এখানে কোরান-পাঠের বিরুদ্ধে কয়েকজন শিখ প্রতিবাদ করলে তিনি উপাসনা-সভা বন্ধ রাখলেন। পরদিন তিনি দিল্লীতে এক বিশাল শ্রমিক-সমাবেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, গত সন্ধ্যার পর তিনি শ্রোতারা সকলে না চাইলে আর উপাসনা-সভা করবেন না। কারণ কোন জিনিস তিনি কারও ওপর চাপিয়ে দিতে চান না। তিনি বললেন, তিনি তাঁদের ক্রোধ ও অধৈর্যের কারণ বোঝেন। কিন্তু তাঁরা যদি স্বাধীনতার যোগ্য হ'তে চান, তবে তাঁদের ক্রোধ দমন ক'রে তাঁদের সরকারের উপর আস্থা রাখতে শিখতে হবে। পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখদের উপর অত্যাচার হচ্ছে সত্য ; তবে এ-ও সত্য যে পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। কার দোষ কতখানি তা পরিমাপ করবার কোন উপায় নেই। এটাই যথেষ্ট যে দুই পক্ষই অপরাধী, উভয় সরকারেরই উচিত পরস্পরের দোষ অকপটে স্বীকার ক'রে মীমাংসায় আসা। অন্য পথ হ'লো যুদ্ধ। যা ভাবতেও তিনি শিউরে ওঠেন। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে ভারতের ধ্বংস দেখতে তিনি বেঁচে থাকতে চান না। হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকরা একযোগে কাজ করায় তিনি তাদের অভিনন্দন জানান। বলেন, তারা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে, তবে তারা একটি সুমহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

১৯শে তারিখে তিনি উপাসনা-সভায় বললেন, অনেকে তাঁকে বলেছেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের আনুগত্য ভারতের প্রতি নেই, আছে পাকিস্থানের প্রতি। তিনি এই অভিযোগ

অস্বীকার করেন। বহু মুসলমান তাঁকে বরং বিপরীত রকমই বলেছেন। যাই হ'ক, সংখ্যালঘুদের ভয় করবার কোন কারণ নেই ; সাড়ে চার কোটি মুসলমান সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। গ্রামের মুসলমানরা অত্যন্ত নিরীহ, পাকিস্থানের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের তাড়িয়ে দেবে কেন? তিনি হিন্দু ও শিখদের তাদের মন থেকে মুসলিমভীতি ত্যাগ করতে বললেন। তাতেই পাকিস্থানের মুসলমানদের কাছ থেকে বাঞ্ছিত সাড়া মিলবে। এই পথেই ভারতে শান্তি আসতে পারে। ভারত থেকে সব মুসলমানকে এবং পাকিস্থান থেকে সব হিন্দু ও শিখকে তাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হ'লো যুদ্ধ ও সারা দেশের ধ্বংস। যদি এই মারাত্মক নীতি দুই রাষ্ট্রই অনুসরণ করে, তবে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম দুই-ই ধ্বংস হবে।

গান্ধীজী দিল্লীতে শান্তিস্থাপনের জন্যে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। তাঁর উপস্থিতি বিশেষত মুসলিম শরণার্থী-শিবিরগুলিতে আশা ও সান্ত্বনা ব'য়ে আনলো। শান্তিস্থাপনায় গান্ধীজী ব্যস্ত থাকলেও তিনি রোজ অসংখ্য পত্রলেখকের পত্রের উত্তর দিলেন, "হরিজন" পত্রিকার জন্য নিয়মিত লেখা পাঠালেন, শিক্ষা-সম্মেলন প্রভৃতির মতো অসংখ্য আলোচনায় যোগ দিলেন, তাঁর কাছে যে অসংখ্য লোক বা সংস্থা পরামর্শের জন্যে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ দিলেন।

যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলিকে সংবাদপত্রে এমন বিকৃতভাবে পরিবেশন করা হ'লো যে, কলকাতা থেকে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালেন, তিনি শেষ পর্যন্ত সম্ভাবিত যুদ্ধের কথা ভাবছেন কিনা। ২৭শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় বললেন, তিনি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ; তিনি যুদ্ধের সমর্থন করতে পারেন না। তাঁর হাতে যদি ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনভার থাকতো, তবে তিনি পুলিস ও সামরিক ব্যবস্থা তুলে দিতেন। কিন্তু ভারতীয়

ইউনিয়নের পরিচালনভার তাঁর হাতে নেই। তাই তিনি এই অবস্থায় কেবল সম্ভাবনার কথা বলেছেন। ভারত ও পাকিস্থানের উচিত সমস্ত বিষয় নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা ক'রে নেওয়া; তা সম্ভব না হ'লে বিতর্কিত বিষয়গুলি সালিসে দেওয়া। কিন্তু কোন একপক্ষ তাতে রাজী না হ'লেই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ঘটবে।

ইংলণ্ডে চার্চিলও মন্তব্য করলেন যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিলে যে এই অবস্থা হবে, তিনি তা জানতেন। ভারতবর্ষের দুই অংশে যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চলছে, তা সূচনা মাত্র; শেষ পর্যন্ত এই দুই দেশ পরস্পর যুদ্ধে ধ্বংস হবে। গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় চার্চিলের এই অশুভ ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্যে ভারতবাসীকে আহ্বান জানালেন। যুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধীজীর মন্তব্যকে পাশ্চাত্যদেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছিল, তাতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন এমন একটা আভাস দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী তারও প্রতিবাদ করলেন।

হিংসার উন্মত্ততা চলতে লাগলো। গ্রাম থেকে লোক এসে দিল্লীর একটি হাসপাতাল আক্রমণ ক'রে সেখানে রোগীদের হত্যা করলো। নৈনিতাল থেকে এলাহাবাদগামী একটি ট্রেন থেকে মুসলিম যাত্রীদের বাইরে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হ'লো। সাম্প্রদায়িকতা যে তার হিংস্রবাহু সর্বত্র মেলে ধরেছে, তা দেখে গান্ধীজী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

২রা অক্টোবর গান্ধীজীর ৭৮-তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হ'লো। সারাদিন জনস্রোত গান্ধীজীকে অভিনন্দন ও প্রণাম জানাতে এলো। বিদেশী দূতাবাসের লোকেরা, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং লেডী মাউণ্টব্যাটেনও এলেন। দেশ-বিদেশ থেকে শত শত তারবার্তা এসে পৌছলো। শরণার্থীরা পর্যন্ত ফুল, এমন কি উপহার ও অর্থও, পাঠালো। গান্ধীজী বললেন, তিনি মনে মনে ভাবছেন, কেন

অভিনন্দন আসছে ; এর চেয়ে সান্ত্বনাবাণী আসাই তো স্বাভাবিক ছিল। তাঁর বুকে মর্মান্তিক বেদনা ছাড়া আর কিছু নেই। একদিন জনতা তাঁর কথা শুনতো। আজ তাঁর কথা কেউ শোনে না। তিনি কেবলই শুনছেন, ভারতীয় ইউনিয়নে মুসলমানদের থাকতে দেওয়া হবে না। আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে একথা বলা হচ্ছে ; কাল পার্শী, খ্রীষ্টান, এমন কি ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে কি বলা হবে ? তাঁর বন্ধুরা মনে করেন যে, তিনি ১২৫ বছর বাঁচবেন। ১২৫ বছর দূরের কথা, তাঁর একদিনও বেঁচে থাকতে ইচ্ছা নেই। তাঁর এইসব অভিনন্দন নেওয়ার আর অধিকার নেই। যখন ঘৃণা ও হত্যা আবহাওয়াকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে, তখন তিনি আর বেঁচে থাকতে চান না। তাই তিনি সকলকে এই উন্মত্ততা ত্যাগ করতে বলছেন। এক পক্ষ যদি নীচে নামে, তবে অন্য পক্ষকেও নামতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

ময়দানে এক বিশাল জনসভায় জওহরলাল ভারতবাসীকে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, "মহাত্মাজীকী জয়" ধ্বনি দেওয়া আর ভাইয়ের প্রতি হৃদয়ে ঘৃণা ও হিংসা পোষণ করা একসঙ্গে চলতে পারে না।

৩রা অক্টোবর গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় আসন্ন শীতে শরণার্থীদের জন্যে মুক্তহস্তে পোশাক ও কম্বল দানের জন্যে আবেদন জানালেন। ৭ই অক্টোবর তিনি বললেন যে, শরণার্থীদের দুর্দশা দেখে তাঁর দুঃখের সীমা নেই। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যে চার লক্ষ অমুসলমান ভারতে আসছে, তিনি তাদের দুরবস্থার কথাও উল্লেখ করলেন। ৯ই অক্টোবর তিনি বললেন, পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখদের অবস্থা শোচনীয়। ব্যাপকভাবে তাদের সরিয়ে আনাও কঠিন। পথেই বহু লোক মারা যাবে। ভারতীয় ইউনিয়নে আসবার পরও শরণার্থী-শিবিরগুলিতে তাদের অবস্থা লোভনীয় নয়। কুরুক্ষেত্রে শরণার্থী-শিবিরে হাজার হাজার মানুষ আকাশের নিচে

রয়েছে। খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা শোচনীয়। সরকারকে দোষ দিলে ভুল হবে। পূর্ববঙ্গ থেকেও দলে দলে লোক চলে আসবার সংবাদ আসছে। কারণ কি তিনি জানেন না। তাঁর সহকর্মীরা এখনও সেখানে আছেন। এখন যারা এক ডোমিনিয়ন থেকে অন্য ডোমিনিয়নে পালাচ্ছে, তাদের ধারণা অন্য ডোমিনিয়নে অবস্থা ভালো। তাদের ধারণা ভুল। যতোই ইচ্ছা থাকুক না কেন, কোনও সরকারের পক্ষে এতো শরণার্থীর সুব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাঁর একমাত্র পরামর্শ হ'লো, ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে নিজেদের বাস্তুতে যে কোনও উপায়ে থাকা। যদি মরতেই হয়, নিজের গৃহে বীরের মতোই মরা উচিত। এক সরকারের উচিত হবে অন্য সরকারের কাছে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দাবী করা। সেই দাবী যদি না মেটে, তবে অনিবার্য ফল হবে যুদ্ধ। তিনি যুদ্ধ সমর্থন করতে পারেন না। কিন্তু তিনি জানেন, যে সরকারের অস্ত্রবল সৈন্যবল আছে, তাদের কাছে ঐ একমাত্র পথ। ঐ পথের অর্থ সমূলে ধ্বংস। অধিবাসী-বিনিময়কালে মৃত্যুতেও কারও লাভ হবে না। অধিবাসী-বিনিময় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দুরূহ সব সমস্যার উদ্ভব করবে।

২৫শে অক্টোবর তারিখে দিল্লীর সেন্ট্রাল জেলে গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভা করলেন। জেলে তখন প্রায় তিন হাজার কয়েদী ছিল। জেলে তাঁকে উপাসনা-সভা করবার জন্যে আহ্বান করায় তিনি খুশী। তিনি নিজেও একজন প্রাক্তন কয়েদী। তিনি জেনেছেন যে, কয়েদীদের মধ্যে হিন্দু, শিখ ও মুসলমান রয়েছে। তারা যেন তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকতে না দেয়। তাদের উচিত ভাই ও বন্ধুর মতো থাকা। তা হ'লেই তারা যখন মুক্তি পাবে, তখন তারা বাইরে যে উন্মত্ততা চলছে তার প্রতিরোধ করতে পারবে। তিনি মুসলমান এবং হিন্দু কয়েদীদের পরস্পর ঈদ্ মুবারক জানাতে বললেন।

২৬শে তারিখে গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় কাশ্মীর সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, কাশ্মীরের ঘটনার কথা তিনি খবরের কাগজে পড়েছেন। খবরের কাগজের খবর যদি সত্যি হয়, তবে কাশ্মীরে যা ঘটছে, তা নিশ্চয় মন্দ। অভিযোগ হ'লো পাকিস্থান কাশ্মীরকে পাকিস্থানে যোগদানের জন্যে বলছে। কেউ কাশ্মীর বা হায়দরাবাদ বা ক্ষুদ্র জুনাগড়, কি অন্য কোনও দেশীয় রাজ্যকে কোনও ডোমিনিয়নে যোগ দিতে বাধ্য করতে পারে না। এই সমস্যার সমাধান কি? তিনি রাজা ও মহারাজাদের বলেছেন, তাঁরা তাঁদের রাজ্যের প্রকৃত শাসক নন। বর্তমান দেশীয় রাজারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। বৃটিশ শক্তি ভারতবর্ষ ছেড়েছে। রাজ্যগুলির প্রকৃত শাসক হ'লো প্রজারা; তাদের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। রাজা-মহারাজারা তাদেরই ন্যাসরক্ষক রূপে থাকবেন। কাশ্মীরবাসীরা ভেতরের বা বাইরের কোনরূপ চাপ ছাড়াই নিজেরা স্থির করবে, তারা কোন্ ডোমিনিয়নে থাকবে। এই নিয়মই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৭শে অক্টোবর কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিলো এবং হানাদারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউনিয়ন শ্রীনগরে সৈন্য পাঠালো। কাশ্মীরের রাজা ভারত সরকারের সাহায্য চাওয়ায় এবং কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ভারত সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। গান্ধীজী ভারত সরকারের এই কাজ সমর্থন করলেন। কারণ কাশ্মীরে জনসাধারণের নেতা শেখ আবদুল্লাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের জনসাধারণের নেতারূপে এই হানাদারি প্রতিরোধে এবং ভারতীয় ইউনিয়নের সাহায্যগ্রহণে অগ্রণী হয়েছিলেন।

ভারতীয় ইউনিয়নে কাশ্মীরের যোগদান এবং কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যপ্রেরণের কয়েক দিন বাদেই জুনাগড় রাজ্যেও ভারত

সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হ'লো। কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হিন্দু এবং প্রজাদের অধিকাংশ মুসলমান; অন্যপক্ষে জুনাগড়ের শাসক ছিলেন মুসলমান এবং প্রজাদের শতকরা ৮৫ জন ছিল হিন্দু। প্রজারা নিজেদের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং জুনাগড়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই অবস্থায় রাজ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে জুনাগড়ের নবাব ও তাঁর দেওয়ান ভারত সরকারের সাহায্য চেয়েছিলেন। ফলে ভারত-সরকার নবাব এবং জুনাগড়ের শাসন-পরিষদ্ ও প্রজাদের সম্মতিক্রমেই জুনাগড়ের শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে নিয়েছিল। জুনাগড়ের নবাব মুসলমান হওয়ায় এবং তিনি করাচীতে জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করায় এ বিষয়ে পাকিস্থানের আপত্তি থাকতে পারে, গান্ধীজী এমনটি মনে করেছিলেন। তাই তিনি ১০ই নভেম্বর তাঁর উপাসনা-সভায় বললেন যে, তিনি রাজকোট থেকে দুটি তারবার্তা পেয়েছেন। তা থেকে তিনি জেনেছেন যে, কাগজে বেরিয়েছে জুনাগড়ের ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির সময় জুনাগড়ের নবাবসাহেব ও তাঁর দেওয়ান মিঃ ভুট্টো করাচীতে ছিলেন। সহকারী দেওয়ান মেজর হার্ভে জোন্‌স্ ছিলেন জুনাগড়ে। জুনাগড়ের ভারতে অন্তর্ভুক্তিতে তাঁদের সকলের সম্মতি ছিল। তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, এই বিষয়ে কায়েদ-এ-আজমেরও সম্মতি ছিল। তা যদি সত্য হ'য়ে থাকে, তবে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হবে এমন আশা করা ভুল হবে না।

কিন্তু পরদিন উপাসনা-সভায় গান্ধীজী তাঁর গোড়ার আশঙ্কার কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে জানালেন। তিনি বললেন, এখন জানা গেছে, পাকিস্থান এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে, ভারতীয় সৈন্যদের সরিয়ে আনতে এবং শাসনাধিকার ত্যাগ করতে বলেছে। তারা বলেছে, ভারত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে এবং পাকিস্থানের ভূমিতে প্রবেশ করেছে। গান্ধীজী বললেন, সংবাদ

পত্রে যেসব বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে তিনি আন্তর্জাতিক আইনলঙ্ঘনের কিছু দেখেন নি; জুনাগড়ের শাসন-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ ক'রেও ভারত সরকার কোন অন্যায় করে নি; সমগ্র সৌরাষ্ট্রে শান্তিরক্ষার জন্যে সৌরাষ্ট্রের রাজন্যবর্গ সৈন্যপ্রেরণের জন্যে যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তার ফলেই ভারত সরকার জুনাগড়ে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে। জুনাগড়ের শতকরা ৮৫ ভাগ অধিবাসী হিন্দু। অধিবাসীদের বিনা সম্মতিতে তাই জুনাগড়ের নবাব-সাহেব জুনাগড়ের পাকিস্থানে অন্তর্ভুক্তিতে সম্মতি দিতে পারেন না। স্বাধীন ভারতে জুনাগড় অধিবাসীদের; নবাবসাহেব ন্যাসরক্ষক মাত্র। জুনাগড়ের ক্ষেত্রে যা সত্য, কাশ্মীর ও হায়দরা-বাদের ক্ষেত্রেও তাই সত্য। কাশ্মীরের মহারাজা বা হায়দরাবাদের নিজাম প্রজাদের বিনা সম্মতিতে কোনও ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারেন না। কাশ্মীরের মহারাজা যদি একাই ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদানের প্রস্তাব করতেন, তবে তিনি তা সমর্থন করতে পারতেন না। কাশ্মীরের মহারাজা এবং কাশ্মীরের অধিবাসীদের অবিসংবাদী নেতা শেখ আবদুল্লার প্রস্তাবক্রমেই ভারত সরকার ভারতীয় ইউনিয়নে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তিতে সম্মতি দিয়েছে। শেখ আবদুল্লা কেবল মুসলমানদের নয়, কাশ্মীরের সমস্ত প্রজার প্রতিনিধি। কাশ্মীরকে দুভাগ করবার কথাও তাঁর কানে এসেছে; জাম্মু যাবে হিন্দুদের হাতে ও কাশ্মীর মুসলমানদের হাতে। এ ধরনের ব্যবস্থার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না।

১৫ই নভেম্বর থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো। স্বাধীনতালাভের পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই প্রথম অধিবেশন। অধিবেশনের প্রথম দিনেই গান্ধীজীর উপস্থিতিতে কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী পদত্যাগ করলেন। তিনি জানালেন যে, সরকার কোনও বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন নি, সরকার কংগ্রেস পার্টিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা

ক'রে চলেছেন। এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে কংগ্রেসের সভাপতি থাকা সম্ভব নয়; গান্ধীজীও তাঁর এই মত সমর্থন করেন।

আচার্য কৃপালনী পদত্যাগ করায় সভাপতি-পদে নূতন প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। গান্ধীজীও এই বৈঠকে উপস্থিত রইলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আচার্য নরেন্দ্র দেব সভাপতি হোন। জওহরলালও নরেন্দ্র দেবের প্রার্থীপদ সমর্থন করলেন। অন্যান্যরা আপত্তি করলেন। শেষ পর্যন্ত প্যাটেল ও নেহরুর অনুরোধে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি হ'তে সম্মতি দিলেন। তিনি গান্ধীজীর মতামত চাইলে গান্ধীজী বললেন, তিনি এটা পছন্দ করেন না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি-পদ গ্রহণে অসম্মত হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে তিনিই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

গান্ধীজী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের একটি ঘরোয়া বৈঠকে বললেন যে, কংগ্রেস সমস্ত দেশের ও সকল সম্প্রদায়ের সেবক। ভারতীয় ইউনিয়নে যেন সব মুসলমানই নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে; যেসব মুসলমান বাস্তু ত্যাগ ক'রে পাকিস্থানে চ'লে গেছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। পাকিস্থান কি করছে না করছে সেদিকে লক্ষ্য না রেখেই ভারতীয় ইউনিয়নকে নিজ নীতি স্থির করতে হবে। ভারতীয় ইউনিয়ন যদি নিজের কর্তব্য ঠিকমতো ক'রে যায়, তবে তাকে অনুসরণ করতে পাকিস্থান বাধ্য হবে। তিনি সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলি সম্পর্কেও কংগ্রেসকে সতর্ক ক'রে দিলেন। বললেন, এগুলির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে প্রবল জনমত গ'ড়ে তুলতে হবে।

গান্ধীজীর পরামর্শমতোই কংগ্রেস প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলো। গান্ধীজী একটি পত্রে প্যারেলালকে লিখলেন, "এখন দেখছি দিল্লীতেই আমাকে লড়তে হবে এবং যুদ্ধে জিততে হবে। এখানে আমার প্রচুর কাজ আছে। এবারের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ছুটি

প্রস্তাবই কার্যত আমার রচনা। এখন দেখতে হবে এগুলি কিভাবে কার্যকর হয়।”

প্রথম প্রস্তাবটিতে মুসলমানদের প্রতি অন্যায় কিছু না করবার জন্যে অমুসলমানদের বলা হয়েছিল যাতে মুসলমানরা ভারতে নিজেদের নিরাপদ বোধ করতে পারে। সরকারকেও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যে যা কিছু করণীয় করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানরা যারা বাস্তু ও কাজকারবার ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনবার ও তাদের নিজ নিজ গৃহে ও কাজে পুনর্বাসনের জন্যে সরকার ও জনসাধারণকে সকল প্রকারে সাহায্য করতে বলা হ’লো।

দলে দলে শরণার্থী আসতে থাকায় তাদের জন্যে স্থান সংকুলানের জন্যে মুসলমানদের যে ব্যাপকভাবে বিতাড়নের চেষ্টা চলছিল, সে সম্পর্কে গান্ধীজী সকলকে সতর্ক ক’রে দিলেন। পানিপথে মুসলমান কারিগরদের উপর স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই এখানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। কিন্তু শরণার্থীরা এসে সমস্ত অবস্থার ওলটপালট ঘটিয়ে দিলো। শরণার্থীরা মুসলমানদের বিতাড়িত ক’রে তাদের গৃহগুলি অধিকার করলো। এমনি আরও অসংখ্য ঘটনা ঘটলো যা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবের বিপরীত।

১৯শে তারিখের উপাসনা-সভায় গান্ধীজী বললেন, তিনি আগের দিন যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব কার্যকর হওয়া সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই চাঁদনিচকে একটি ঘটনা ঘটেছিল। একজন মুসলমানের দোকান এক শরণার্থীকে দেওয়া হয়েছিল ; শর্ত ছিল দোকানের মালিক ফিরে এলে তাকে দোকানটি ফেরত দিতে হবে। মুসলমান মালিক এখন ফিরে এসেছে এবং তার দোকান ফিরে চেয়েছে। শরণার্থী লোকটি প্রথমে দোকানটি ফিরে দিতে রাজী হয়েছিল ; কিন্তু পরে সে তার বন্ধুদের খবর দিলে

প্রায় দুহাজার লোকের একটি জনতা এসে হাঙ্গামা বাধালো। পুলিস ফাঁকা আওয়াজ করলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং পথে একটি লোককে ছুরিকাঘাত করলো। এখনও মুসলমানটিকে তার দোকান ফিরে দেওয়া হয় নি। সরকারও সে ব্যবস্থা এখনও করতে পারে নি। গান্ধীজী বললেন, কেবল তাই নয়, শহরের আর একটি অঞ্চলে হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার জন্যে মুসলমানদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে গান্ধীজী সরকার ও জনসাধারণকে সদা সতর্ক হ'তে বললেন।

২৯শে নভেম্বর গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় বললেন যে, বহু মসজিদ হাঙ্গামার সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; অনেক মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করা হয়েছে। পুলিসের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিগ্রহগুলি সরিয়ে নেওয়া উচিত। তিনি বললেন, পাকিস্থানে বহু হিন্দু ও শিখ বালিকাকে অপহরণ করা হয়েছে, সেইসব হতভাগিনীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে কে জানে। ভারতেও বহু মুসলিম বালিকা অপহৃত হয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাব সরকার ও সরকারের কর্মচারীদের তিনি ঐসব হতভাগ্য বালিকাদের অবিলম্বে উদ্ধার করবার জন্যে অনুরোধ করেন। তিনি কাথিয়াবাড় ও রাজকোট থেকেও মুসলমানদের উপর অত্যাচারের বহু সংবাদ তারবার্তায় পেয়েছেন। বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘ ও হিন্দুমহাসভা এইসব আক্রমণের পেছনে রয়েছে। গান্ধীজী রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘ ও হিন্দুমহাসভার নেতা ও কর্মীদের কাছে আবেদন ক'রে বললেন, তাঁরা যেন এইসব কাজ থেকে বিরত থাকেন।

১০ই ডিসেম্বর উপাসনা-সভায় গান্ধীজী বললেন, তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে, আজমীড় থেকে মুসলমানদের ভয় দেখিয়ে বিতাড়িত করা হয়েছে; কয়েকজনকে হত্যাও করা হয়েছে। ২০শে ডিসেম্বর গান্ধীজী দিল্লীতে পুনরায় দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধায় দুঃখ প্রকাশ করলেন।

তিনি বললেন, দিল্লীর হিন্দু ও শিখরা যদি মনে করে যে, তারা মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে না, তবে তাতে সরকারের দেউলিয়াপনাই প্রকাশিত হবে।

ক্রমেই পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্তকর হয়ে উঠলো। কাশ্মীরে হানাদারি, রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্থানের মিথ্যার বেসাতি, পাকিস্থানে অমুসলমানদের উপর নির্মম নিপীড়ন ভারত সরকার ও ভারতীয় জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। এই উত্তেজনা যতোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তা সাম্প্রদায়িক শান্তিস্থাপনের পথে ততোই দুস্তর বাধা সৃষ্টি করছিল। সর্দার প্যাটেল একটি বিবৃতিতে পাকিস্থানকে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক হ'তে বললেন। ৬ই জানুয়ারি (১৯৪৮) গান্ধীজী তাঁর উপাসনা-সভায় বললেন, এখনও তিনি মুসলমানদের বাড়িতে শরণার্থীদের প্রবেশের চেষ্টা এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে পুলিসের কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগের সংবাদ পাচ্ছেন। শরণার্থীরা যে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তা তিনি জানেন। দিল্লীর এই শীতে তাদের খোলা আকাশের নীচে কাটাতে হচ্ছে; বৃষ্টির সময়ে তাদের তাঁবু তাদের রক্ষা করতে পারে না। তারা যদি মুসলমানদের গৃহগুলিকে লক্ষ্য না ক'রে গৃহের জন্যে দাবী জানাতো, তবে তার অর্থ তিনি বুঝতে পারতেন। তারা বিড়লা-ভবনে এসে তাঁকে সমেত বিড়লা-ভবনের বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে বের ক'রে দিতে পারতো। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত মুসলমানদের তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত করা ভালো নয়। তিনি শুনেছেন, সরকারী কর্তৃপক্ষ সেদিন শরণার্থীদের কিছু বাসস্থান দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শরণার্থীরা তা নিতে চায় নি, তারা মুসলমানদের বাড়িগুলিই দখল করতে চেয়েছিল। তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রয়োজনের জন্যেই মুসলমানদের বাড়িগুলি দখলের চেষ্টা হচ্ছে না; মুসলমানদের দিল্লী থেকে বিতাড়িত করবার জন্যেই এই

পথ নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ইউনিয়নের রাজধানীতে এইরকম কিছু করবার ফলাফল যে কি হ'তে পারে, তা সকলের বোঝা উচিত।

হিংসার এই দুর্বার স্রোতকে ঠেকাবার জন্যে গান্ধীজী ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু চারমাস ধ'রেও আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে তিনি তাতে সফল হলেন না। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী তাঁর শেষ অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। ১২ই জানুয়ারি তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি পরদিন, ১৩ই জানুয়ারি, থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরে না আসা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্যে অনশন শুরু করবেন।

১৩ই জানুয়ারি দুপুর থেকে তিনি অনশন শুরু করলেন। প্যাটেল, নেহ্‌রু ও আজাদ তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করলেন। বিড়লা-ভবনের প্রাঙ্গণে উপাসনার পর অনশন শুরু হ'লো। গান্ধীজীর পুত্র দেবদাস পিতাকে একটি পত্রে লিখলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতা অধৈর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন; তাঁর অক্লান্ত ও ধৈর্যপূর্ণ শ্রমের দ্বারা তিনি যে কি সাফল্য অর্জন করেছেন, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। তাঁর এই অক্লান্ত শ্রম ও ধৈর্য ইতিপূর্বেই লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচাতে পারতো। কিন্তু তাঁর ধৈর্য অকস্মাৎ বিনষ্ট হয়েছে। তিনি জীবন ধারণ ক'রে যা করেছেন, তা তিনি জীবন দান ক'রে কখনও করতে পারবেন না।

গান্ধীজী পুত্রের পত্রের উত্তরে লিখলেন, তাঁর এই অনশন আকস্মিক নয়, গত চারদিন ধরে তিনি গভীর আত্মজিজ্ঞাসা ও উপাসনা করেছেন। তারপরই তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঐদিন তিনি সান্ধ্য-উপাসনায় যথারীতি যোগ দিলেন। পরদিন তিনি জানালেন যে, তিনি দুর্বল, তাই উপাসনা-সভায় যোগ দিতে পারবেন না। তাঁকে প্রশ্ন করা হ'লো যে, তিনি কার বিরুদ্ধে

অনশন করছেন? তিনি জানালেন, কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি অনশন করছেন না। তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে, যদি হিন্দু ও শিখরা মুসলমানদের দিল্লী থেকে বিতাড়িত করতে চায়, তবে তারা ভারত ও তাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অনেকে বলছে যে, মুসলমানদের প্রতিই তাঁর দরদ, তাদের স্বার্থেই তিনি অনশন করছেন; তারা ঠিকই বলছে। তিনি সমস্ত জীবন, যারা সংখ্যালঘু, যারা নির্যাতিত, তাদেরই পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর অনশন এই অর্থে মুসলমানদেরও বিরুদ্ধে যে, এর দ্বারা মুসলমানরা তাদের হিন্দু ও শিখ ভাইদের সম্মুখে দাঁড়াতে সাহস পাবে। হিন্দু ও শিখদের মতো মুসলিমদেরও অনেক করণীয় আছে। তারা তাঁর ও জওহরলালের প্রশংসা করতে এবং সর্দার প্যাটেলের নিন্দা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। মনে রাখা দরকার, নেহ্‌রুজীর পদ্ধতি ও ব্যবহার সর্দার প্যাটেলের অনুরূপ না হ'লেও সর্দার নেহ্‌রুজীর সহকর্মী। সর্দারের কোনও কাজ নেহ্‌রুজীর মনঃপূত না হ'লে তিনি সর্দারকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে পারতেন। এক সময় সর্দারকে তাঁর (গান্ধীজীর) yes-man বা গোঁড়া সমর্থক বলা হতো। এখন তিনি তা না হ'লেও, তাঁর শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু। লোকের মন্ত্রিসভার চরিত্রটি বোঝা উচিত। মন্ত্রিসভার কোনও সদস্যের কোন সরকারী কাজের জন্যে সমগ্র মন্ত্রিসভাই দায়ী। প্রত্যেকেরই আত্মশুদ্ধি চাই। প্রত্যেকেই ভারতীয় ইউনিয়নের মানুষ, ভারতীয় ইউনিয়ন প্রত্যেকেরই। এর কম কিছুতে তিনি অনশন ত্যাগ করবেন না। হিন্দু ও শিখদের কর্তব্য কি? পাকিস্থানে যাই ঘটুক না কেন, তারা ভারতীয় ইউনিয়নে একটি মুসলমানেরও কেশস্পর্শ করবে না। যতোই প্ররোচনা থাক, তারা কখনই কাপুরুষের মতো কাজ করবে না। দিল্লী সত্যই শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠলে তবেই তিনি অনশন ভঙ্গ করবেন। দিল্লী ভারতীয় ইউনিয়নের রাজধানী। দিল্লীর পতনে

ভারত তথা পাকিস্থানের ধ্বংস অনিবার্য। আমি চাই দিল্লী মুসলমানদের পক্ষে, এমন কি যাঁকে গুণ্ডাদের সর্দার মনে করা হয় সেই শহীদ সুরাবর্দীর পক্ষেও, নিরাপদ হ'ক। প্রকৃত গুণ্ডাদের ধরা হ'ক। তিনি নিজেই কলকাতায় সুরাবর্দী সাহেবকে আন্তরিকভাবে শান্তির জন্যে কাজ করতে দেখেছেন। যেসব মুসলমান জোর ক'রে হিন্দুদের বাড়ি দখল করেছিল, তাদের সুরাবর্দী সাহেব বার ক'রে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করেছেন। তিনি এই উপাসনা-সভায় উপস্থিত থাকতেও পারেন। অবশ্য, তাঁকে তিনি অপমানিত হওয়ার ঝুঁকি নিতে দিতে পারেন না। শান্তি-প্রতিষ্ঠা হ'তে একদিন বা একমাস লাগুক কিছু বয়ে যায় না। তাঁর জীবনরক্ষাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ভারত ও তার মর্যাদা রক্ষা করা।

প্যাটেল সংবাদ পাঠালেন যে, গান্ধীজীর ইচ্ছাপূরণের জন্যে তিনি যা কিছু করতে প্রস্তুত। গান্ধীজী জবাবে ব'লে পাঠালেন যে, তাঁর ইচ্ছা ভারতীয় ইউনিয়ন পাকিস্থানের অংশরূপে প্রাপ্য যে টাকা আটকে রেখেছে, ভারত সরকার তা অবিলম্বে দিয়ে দিক্। অনশন শুরু হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে আগাগোড়া নূতন ক'রে বিবেচনা করবার জন্যে গান্ধীজীর শয্যাপার্শ্বে সমবেত হ'লো। গান্ধীজী মুসলমানদের রক্ষার জন্যে চেষ্টা করায় যারা তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিল, পাকিস্থানের প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে তারা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। একদল উগ্রপন্থী এখন থেকে গান্ধীজীকে হত্যা করবার জন্যে ষড়যন্ত্র শুরু করলো। রাত্রিতে একদল শিখ বিড়লা-ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রে "খুনের বদলা খুন চাই" "গান্ধীজীকে মরতে দাও" ইত্যাদি ধ্বনি দিতে লাগলো। গান্ধীজী অনশনের দ্বিতীয় দিনেও তাঁর অনশন-শয্যা থেকে "হরিজন" পত্রিকার জন্যে তাঁর নিয়মিত লেখা পাঠালেন। ঐদিনও তিনি ডাক্তারদের নিষেধ অমান্য ক'রে প্রার্থনা-

সভায় গেলেন এবং জানালেন সম্ভবত পরদিন থেকে তিনি আর আসতে পারবেন না।

উপাসনা-সভায় গান্ধীজী বললেন, দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য তারবার্তা তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে। কেউ কেউ ভগবানের হাতে তাঁর এই আত্মসমর্পণে তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন। আবার অনেকে তাঁকে অনশন ভঙ্গ করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। এদের মধ্যে হিন্দু, শিখ, মুসলমান, সকলেই আছেন। মৃদুলাবেন লাহোরে আছেন। সাধারণ মুসলমান ও পাকিস্থান সরকারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তিনি জানিয়েছেন, পাকিস্থানে তাঁর অনশনে বন্ধুরা সকলে উদ্বিগ্ন। এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক দল ও সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও অনেকে আছেন। তাঁরা জানতে চেয়েছেন, তাঁর অনশনভঙ্গের জন্যে পাকিস্থানের ওপারে তাঁরা কি করতে পারেন। পাকিস্থানেও তাঁর অনেক মুসলমান বন্ধু আছেন জেনে তিনি সুখী হয়েছেন। সকলেই করাচীতে শিখদের ওপর কাপুরুষোচিত আক্রমণের কথা শুনেছেন। নিরপরাধ শিশু ও নরনারীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে জিনিসপত্র সব লুণ্ঠিত হয়েছে, অন্যান্যরা পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছে। গুজরাটে একটি ট্রেনে শরণার্থীদের উপর নৃশংস আক্রমণের সংবাদ এসে পৌঁছেছে। ট্রেনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে অমুসলিম শরণার্থীরা আসছিল। এই আক্রমণে বহু লোক নিহত হয়েছে, বহু নারী অপহৃতা হয়েছে। এইসব ঘটনা তাঁকে অত্যন্ত বেদনা দিয়েছে। ভারতীয় ইউনিয়ন এই ধরনের ঘটনা আর কত সহ্য করবে? তাঁর অনশন সত্ত্বেও তিনি হিন্দু ও শিখদের ধৈর্যের উপর আর কতখানি নির্ভর করতে পারেন? পাকিস্থানের কর্তব্য এইসব ঘটনা বন্ধ করা। তাদের প্রত্যেকের অন্তরশুদ্ধি করা প্রয়োজন; তাদের নিজেদের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন যে, যতোদিন না পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখরা নিরাপদে থাকতে পারবে

বা সেখান থেকে নিরাপদে ফিরতে পারবে, ততোদিন তারা কেউ স্থির হবে না।

অনশনের তৃতীয় দিনে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে বুলেটিন প্রকাশিত হ'লো, তাতে বলা হ'লো গান্ধীজী খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর জড়িত হয়েছে এবং মূত্রে এসিটোন দেখা দিয়েছে। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। দিল্লীর পথে পথে শান্তি-মিছিল বেরুতে লাগলো। নেহরুজী দিল্লীতে এক জনসভায় বললেন, গান্ধীজীর মৃত্যুর অর্থ হ'লো ভারতের আত্মার মৃত্যু। তিনি সকলকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তুলে গান্ধীজীর জীবনরক্ষার জন্যে আবেদন জানালেন। তিনি সেই সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, অন্যান্য ত্রাণব্যবস্থা ছাড়াও একসপ্তাহের মধ্যে দিল্লীতে সকল শরণার্থীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। পাকিস্থানের ত্রাণ-মন্ত্রী বললেন যে, গান্ধীজীর এই অনশন কেবল ভারতের নয়, পাকিস্থানেরও সকল মানুষের চোখ খুলে দেবে, তারা নিজেদের ওপর যে লজ্জা-গ্লানি এনেছে সে সম্পর্কে সচেতন হবে। তিনি আরও বললেন যে, এখন ভারত ও পাকিস্থানের মিলিতভাবে একটি বৈঠকে বসা এবং নিজেদের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তা আপোসে মিটিয়ে ফেলা উচিত।

১৫ই জানুয়ারি অনশনের তৃতীয় দিনে গান্ধীজী উপাসনা-সভায় যেতে পারলেন না। তিনি অনশন-শয্যা থেকেই বেতার-মাইক্রোফোনযোগে ভাষণ দিলেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় ও লাউডস্পীকারের ব্যবস্থা না থাকায় তা শোনা গেল না। তাঁর ভাষণের একটি হিন্দী অনুবাদ পরে শোনানো হ'লো।

পাকিস্থানের সঙ্গে বিবাদের ফলে ভারত পাকিস্থানের অংশরূপে প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা আটকে রেখেছিল। গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে ভারত সরকার ঐদিন রাত্রিতে "ভারত ও

পাকিস্থানের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কে সন্দেহ ও বিদ্বেষ দূর করবার জন্যে" ঐ অর্থপ্রদান-সংক্রান্ত চুক্তি অবিলম্বে কার্যকর করবার সিদ্ধান্ত নিলো। মন্ত্রিসভার পূর্বসিদ্ধান্ত এইভাবে পরিবর্তন করায় সর্দার প্যাটেল কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন। মন্ত্রিসভার অনেক ব্যাপারে সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈত ছিল। তিনি জানতেন, অনেক বিষয়েই গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে একমত নন, যদিও গান্ধীজী তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সর্দার প্যাটেল ১৬ই জানুয়ারি সকালেই দিল্লী ত্যাগ ক'রে কাথিয়াবাড় চ'লে গেলেন। অবশ্য গান্ধীজীকে তিনি একটি পত্রে গান্ধীজী সম্পর্কে তাঁর গভীর উদ্বেগের কথা জানালেন।

১৬ই তারিখে, অনশনের চতুর্থ দিনেও গান্ধীজী উপাসনা-সভায় গেলেন না। তিনি তাঁর লিখিত ভাষণে বললেন, ভারত সরকার যে মহত্ত্বপূর্ণ কাজ করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে অনশনভঙ্গ করতে অনেকে অনুরোধ করেছেন। তা যদি তিনি পারতেন, তবে খুবই খুশী হতেন। ডাক্তাররাও ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। তিনি ডাক্তারদের পরামর্শ নেওয়ার জন্যে অনশন করেন না। তাঁর পরামর্শদাতা সর্বশক্তিমান্ সেই বিধাতা। তাঁরই হাতে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন। তবে দেশের মানুষ যদি মনে করে যে, তাঁকে তাদের প্রয়োজন আছে, তবে তারা ডাক্তারদের এই সতর্কবাণী শুনে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুলবে। যদি দিল্লীর হিন্দু, শিখ ও মুসলমানরা এমনভাবে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয় যে, ভারতের বা পাকিস্থানের যেখানেই তাদের ঘিরে আগুন জ্বলুক না কেন, সে বন্ধন কোনক্রমে ছিন্ন হবে না, তবেই তাঁর ব্রত পূর্ণ হবে। সুখের কথা, ভারত ও পাকিস্থানের জনসাধারণ বুঝতে শুরু করেছে যে, তাঁর এই অনশনের সদুত্তর হ'লো দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সম্প্রীতি গ'ড়ে তোলা। তবে ভারতের মানুষরা অতিমানব নয়। ভারতের জনসাধারণের নামে ভারত সরকার

ক্ষতি স্বীকার ক'রেও উদার মনোভাব দেখিয়েছেন। পাকিস্থান তার বিনিময়ে কি দেখাবে?

ডাক্তাররা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। প্রথম হুদিনে গান্ধীজীর ওজন রোজ হু পাউণ্ড ক'রে কমছিল। কিন্তু এখন ওজন কমা বন্ধ হয়ে গেল। এ থেকে বোঝা গেল, মূত্রাশয়ের কাজ ঠিক না হওয়ায় শরীরে জল জমে যাচ্ছে। ফলে চূড়ান্ত বিপদ যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে। গান্ধীজীর হৃৎপিণ্ডও খুবই হুর্বল হয়ে পড়েছে। গান্ধীজী কিন্তু অনশন ভঙ্গ করতে কোন রকমে রাজী হচ্ছেন না। তাই তাঁকে বলা হ'লো হিন্দু, শিখ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির কি পরীক্ষা তিনি চান। এই সময়ে করাচী থেকে হঠাৎ একটি তারবার্তা এসে পৌছলো। তাতে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, দিল্লী থেকে যেসব মুসলমানকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, তারা স্বগৃহে ফিরে আসতে পারে কিনা। তিনি তারবার্তাটি পড়েই বললেন, "ঐটিই পরীক্ষা।" রাত্রিতে এক হাজার শরণার্থীর স্বাক্ষরিত একটি পত্র এসে পৌছলো। তাতে তারা বলেছে, মুসলমানরা ফিরে এলে তারা তাদের স্বগৃহে বসবাসের সকল সুযোগ-সুবিধা ক'রে দেবে, তাতে যদি তাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদের নিয়ে দিল্লীর নিদারুণ শীতেও শরণার্থী শিবিরে গিয়ে থাকতে হয়।

ঐদিন সন্ধ্যার সময় গান্ধীজীর বমি-বমি ভাব খুব বৃদ্ধি পেল। ডাক্তাররা তাঁদের বুলেটিনে বললেন, "অবিলম্বে গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি করতে জনসাধারণকে বলা আমরা আমাদের কর্তব্য মনে করি।" মওলানা আজাদ একটি বিশাল শান্তি সমাবেশে ভাষণ দিয়ে বললেন, তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে বিকালে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর অনশনভঙ্গের শর্তগুলি কি, তা জেনে এসেছেন। তাতে গান্ধীজী সাতটি শর্তের কথা বলেছেন। যদি সকলে ঐ শর্তগুলি সম্পর্কে তাঁকে স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তিনি অনশন ভঙ্গ করতে পারেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে ১৩০ জন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় শান্তি-কমিটি গঠিত হয়েছিল। ঐ কমিটি ১৭ই জানুয়ারি তারিখে সন্ধ্যায় একটি সন্তোষজনক প্রস্তাব গ্রহণ করলো। যে অঙ্গীকার-পত্রটি দেবনাগরী ও উর্দু হরফে লিখিত হ'লো, তাতে বলা হ'লো— খাজা কুতবুদ্দিন মাজারের বার্ষিক মেলা এবছরও নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হবে; সবজিমণ্ডি, করোল বাগ, পাহাড়গাঁও ও অন্যান্য স্থানে মুসলমানরা পূর্বে যেমন নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতো, তেমনি করতে পারবে; মুসলমানরা ছেড়ে যাওয়ায় এখন যেসব মন্দির হিন্দু ও শিখদের দখলে আছে, সেগুলি মুসলমানদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে; মুসলমানরা যারা এখান থেকে চলে গেছে তারা ফিরে এলে তাদের থাকতে ও কাজকারবার করতে দেওয়া হবে: এই সমস্ত কাজ পুলিস বা সৈন্যের সাহায্যে নয় স্বাক্ষরকারীদের নিজ নিজ চেষ্টায় করা হবে। গান্ধীজীকে স্বাক্ষরকারীদের বিশ্বাস ক'রে অনশনভঙ্গ করতে এবং তাঁদের নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করা হ'লো।

এই অঙ্গীকারপত্রে মুসলমান ও শিখ-সংস্থাগুলি, হিন্দুমহাসভা, রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘ প্রভৃতির প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরাও স্বাক্ষর দিলেন। কংগ্রেসের সভাপতিরূপে রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বাক্ষর করলেন। সরকারের পক্ষ থেকে চীফ কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার স্বাক্ষর দিলেন। এই স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্র দিয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, তাঁরা আশা করেন, এবার গান্ধীজী তাঁর অনশন ভঙ্গ করবেন। গান্ধীজী সকলের আন্তরিকতায় অভিভূত হলেন। তবু তিনি বললেন, এই অঙ্গীকারপত্রে হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘের প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রকৃত আন্তরিকতা থাকলে দিল্লীর বাইরে যেসব উন্মত্ততা ঘটছে, সে সম্পর্কেও তাঁরা সাবধান হতেন। তাঁদের যদি প্রকৃত আন্তরিকতা না থাকে, তবে তাঁরা ভগবানকেই প্রতারণা করছেন। গান্ধীজী সকলকে আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্মশুদ্ধি করতে বললেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধীজীকে অনশন ভঙ্গ করবার জন্তে পুনরায় অনুরোধ করলেন। হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের প্রতিনিধিরা তাঁদের আন্তরিকতার কথা ঘোষণা ক'রে গান্ধীজীকে অনশন ভঙ্গ করতে বললেন। পাকিস্থানের হাই-কমিশনার মিঃ জাহিদ হোসেনও গান্ধীজীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন, তাঁর অনশনে পাকিস্থানের জনগণ কিভাবে উদ্বিগ্ন তা প্রকাশের জন্যেই তিনি এসেছেন। শিখদের পক্ষ থেকে সর্দার হরবংশ সিংও গান্ধীজীকে অনুরোধ জানালেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী অনশন ভঙ্গে সম্মত হলেন এবং ১৮ই জানুয়ারি বেলা পৌনে একটায় অনশন ভঙ্গ করলেন। এইটিই গান্ধীজীর জীবনের শেষ অনশন।

অনশনভঙ্গ অনুষ্ঠানের পর সকলে চলে গেলে নেহরুজী বললেন, তিনিও পূর্বদিন থেকে অনশন করছেন। গান্ধীজী তা শুনে অত্যন্ত অভিভূত হলেন এবং নেহ্রুজীকে অনশন ভঙ্গ করতে বললেন।

বংশীধ্বনিতে বিষধর সর্প সাময়িকভাবে মুগ্ধ হ'লেও দংশনের সুযোগ খুঁজতে থাকে। সাম্প্রদায়িকতার বিষধর সর্পও তা-ই করলো। এখন মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ সংহত হয়ে গান্ধীজীর বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হ'লো। অনশনভঙ্গের দুদিন বাদে ২০শে জানুয়ারি তারিখে গান্ধীজীর উপাসনা-সভায় তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বোমা নিক্ষিপ্ত হ'লো। বোমাটি গান্ধীজীর কাছ থেকে প্রায় পঁচিশ গজ দূরে ফাটলো এবং কেউ হতাহত হ'লো না। মদনলাল নামে পশ্চিম পাঞ্জাবের একজন হিন্দু শরণার্থীকে এজন্য গ্রেপ্তার করা হ'লো। বোমার প্রচণ্ড শব্দ বিড়লা-ভবনের প্রাঙ্গণ থেকে বহু দূরেও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজীকে আদৌ বিচলিত হ'তে দেখা গেল না। তিনি বললেন, শোন! শোন! কিছুই ঘটে নি। তিনি দুর্বলকণ্ঠে তাঁর ভাষণে বললেন, দিল্লী একটি 'সুমহৎ কাজ

করেছে। তিনি আশা করেন, স্বাক্ষরকারীরা তাঁদের সত্য রক্ষা করবেন।

২১শে জানুয়ারি তিনি উপাসনা-সভায় পূর্বদিনের বোমা বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বললেন, তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, যুবকটি বাস-স্থানের অভাবে একটি মসজিদ দখল ক'রে ছিল; পুলিস মসজিদগুলি খালি ক'রে দেওয়ায় সে ক্রুদ্ধ হয়। ঐ যুবকের পশ্চাতে যারা আছে, তাদের তিনি এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানালেন। ২২শে তিনি আবার হেঁটেই উপাসনা-সভায় গেলেন। ২৩শে জানুয়ারি ছিল নেতাজীর জন্মদিন। গান্ধীজী উপাসনা-সভায় সে সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। গান্ধীজীর উপাসনা-সভায় ক্রমেই জনসমাগম বাড়তে লাগলো। ২৫শে জানুয়ারি রবিবার তা অস্বাভাবিক আকার ধারণ করলো। গান্ধীজী বললেন, দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি খুবই আনন্দিত। যদি প্রত্যেকটি হিন্দু ও প্রত্যেকটি শিখ একজন ক'রে মুসলমানকে নিজের সঙ্গে উপাসনা-সভায় আনেন, তবে তিনি আরও আনন্দিত হবেন। গান্ধীজী ঐদিন তাঁর ওয়ার্ধা যাওয়ার ইচ্ছার কথা বললেন। তিনি পাকিস্থানেও যেতে চান। তবে পাকিস্থান এখন বিদেশ; সেখানকার সরকারের সম্মতি ছাড়া তিনি যেতে পারেন না। ঐ সময় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন চলছিল, সে সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করলেন। কংগ্রেস যে পঞ্চায়েতরাজের এবং ভাষাভিত্তিক প্রদেশগুলির বিন্যাসের কথা ভাবছে সে সম্পর্কেও তিনি বললেন।

২৬শে জানুয়ারি ছিল স্বাধীনতা-দিবস। ঐদিন তিনি উপাসনা-সভায় গ্রামে গ্রামে দরিদ্রতম মানুষটির কাছেও স্বাধীনতার আস্বাদ পৌঁছে দেওয়ার কথা বললেন। বললেন, ভারতবর্ষ আজ দ্বিধাবিভক্ত; এই সত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়েই আমাদের ভাই ও বন্ধুর মতো বাস করতে হবে এবং বাইরের জগতের কাছে আমরা যে এক ও অভিন্ন তা প্রমাণ করতে হবে।

২৭শে জানুয়ারি বিখ্যাত সাংবাদিক কিংসলি মার্টিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে পুঞ্চ্ প্রভৃতির মতো পাকিস্থান-সংলগ্ন মুসলিমপ্রধান অঞ্চল পাকিস্থানকে ছেড়ে দিয়ে কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান করতে বললেন। গান্ধীজী বললেন, তাতে ভারত খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়বে; আরও জটিলতার সৃষ্টি হবে; পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ মুসলমানপ্রধান; তাও তবে পাকিস্থানকে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে।

গান্ধীজী তাঁর দুর্বল অবসন্ন দেহ সত্ত্বেও কংগ্রেসের জন্য একটি নূতন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করবার কাজে হাত দিলেন। ২৭শে তারিখে তিনি মেহ্‌রাউলিতে কুতবুদ্দিন মাজারের দরগায় গেলেন। সেখানে তাঁকে দরগার একেবারে অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হ'লো। হাঙ্গামার সময়ে দরগাটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা দেখে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

২৮শে জানুয়ারি তারিখে কুমারী অমৃত কাউর তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ঐদিন তাঁর উপসনা-সভায় কোনও গোলমাল হয়েছিল কিনা। গান্ধীজী বললেন, "না। কিন্তু তোমার এই প্রশ্নের অর্থ কি এই যে তুমি আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছ? যদি কোনও উন্মাদের গুলিতে আমি মরি, তবে হাসিমুখেই মরব। আমার মধ্যে লেশমাত্র ক্রোধ থাকবে না। ভগবান্ আমার অন্তরে ও ওষ্ঠে থাকবেন। যদি এরকম কিছু ঘটে, তুমি এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলতে পাবে না!"

২৯শে জানুয়ারি উপাসনা-সভায় তিনি বললেন, বান্নু থেকে আগতপ্রায় ৪০জন শরণার্থীর একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারা দুঃস্থ ও দুখী। তাদের একজন বললো, তাদের এই দুঃখদুর্দশার জন্যে তিনিই দায়ী; তাঁর উচিত তাদের রেহাই দিয়ে হিমালয়ে যাওয়া। কয়েকজন শরণার্থী তার ওপর বিরক্ত হ'লো এবং তাকে তিরস্কার করলো। তিনি তাদের বললেন, কার

নির্দেশে তিনি হিমালয়ে যাবেন? মানুষের অভ্যন্তরের অন্তঃস্থলে যিনি আছেন, তাঁর নির্দেশে তিনি তা করতে পারেন।

২৯শে জানুয়ারি সারাদিন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকায় রাত্রিতে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। তবু তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জন্যে কংগ্রেসের সংবিধানের খসড়া রচনা শেষ করলেন। সওয়া নটায় তিনি শুতে গেলেন।

৩০শে জানুয়ারি। শুক্রবার। এই বারেই যিশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ঘটেছিল। গান্ধীজীরও জীবনের শেষ দিন।

ভোর সাড়ে তিনটেয় গান্ধীজী ঘুম থেকে উঠলেন। উপাসনা সেরে কাজে বসলেন; তারপর একটু জিরিয়ে নিলেন। আটটার সময় তিনি সংবাহনের জন্যে প্রস্তুত হলেন। তিনি ঘর দিয়ে যাওয়ার সময়ে সংবিধানের পাণ্ডুলিপিটি দেখার জন্যে প্যারেলালের হাতে দিলেন। সংবাহন সেরে ফিরবার সময়ে তিনি খাদ্যসংকট সম্পর্কে প্যারেলালকে নোট দিলেন। তারপর স্নান করতে গেলেন। কিছুক্ষণ তিনি তাঁর নিয়মিত বাংলা শেখার কাজ সেরে নটার সময় সকালের আহার শেষ করলেন।

দুপুরের বিশ্রামের পর তিনি সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে দেখা করলেন। দিল্লীর কয়েকজন মৌলবী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন; তিনি কিছু অঘটন না ঘটলে শীঘ্রই ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মৌলবীদের কাছে ওয়ার্ধা যাওয়ার অনুমতি নিলেন। তারপর তাঁর অনুচর বিষণকে ডেকে বললেন, "জরুরী চিঠিপত্রগুলি আনো। আজই আমি ওগুলোর জবাব দিতে চাই। কাল তো আমি না-ও থাকতে পারি।"

সিন্ধিদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি কথাপ্রসঙ্গে তাদের পূর্বদিন একজন শরণার্থী যে তাঁকে হিমালয়ে যেতে বলেছিল, তার উল্লেখ করলেন। হেসে বললেন,

"এক দিক থেকে দেখলে তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। আমি একেবারে ডবল মহাত্মা হয়ে যেতাম।"

বিকাল ৪টায় সর্দার প্যাটেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। উপাসনা-সভার পর নেহরুজী ও মওলানা আজাদের আসবার কথা। কিছুদিন যাবৎ নেহরু ও প্যাটেলের মধ্যে মতদ্বৈধ চলছে, গান্ধীজী তা জানতেন। যাতে এই মতদ্বৈধ দূর করা যায়, তাই গান্ধীজী প্যাটেলের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করলেন। ৫টার সময় তিনি ঘড়ি বার ক'রে বললেন, "উপাসনার সময় হয়েছে।" ৫টা ১০ মিনিটের সময় তিনি তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে বিড়লা-ভবনের প্রাঙ্গণে উপাসনা-সভায় হেঁটে গেলেন। দুদিকে ভীড় সরিয়ে যে পথ করা হয়েছিল, তারই মধ্য দিয়ে তিনি মানু গান্ধী ও আভা গান্ধীর কাঁধে ভর ক'রে সভামঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন। দর্শকরা নমস্কার করতে থাকলে তিনি মানু ও আভার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে প্রতিনমস্কার করতে করতে এগোতে লাগলেন।

হঠাৎ নাথুরাম গড্‌সে নামে একটি লোক ভীড় ঠেলে গান্ধীজীর দিকে এগিয়ে এলো। লোকটা বাপুজীকে প্রণাম করতে আসছে ভেবে মানু গান্ধী তাকে বাধা দিলেন। লোকটা মানুকে সজোরে সরিয়ে দিয়ে গান্ধীজীর সামনে এসে দাঁড়ালো এবং নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে ও হাত তুলে একটা সাতঘরা রিভলভার থেকে গান্ধীজীর বুক লক্ষ্য ক'রে পর পর তিনবার গুলী ছুঁড়লো। প্রত্যেকটা গুলীই গান্ধীজীর বুকের দক্ষিণাংশ বিদ্ধ করলো। দুটি বুলেট বুক ভেদ ক'রে বেরিয়ে গেল। একটি ফুসফুসে রয়ে গেল। প্রথম গুলী লাগায় গান্ধীজী থমকে গেলেন এবং নমস্কারের ভঙ্গিতে তোলা তাঁর হাত দুটি ঝুলে পড়লো। তখনও তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি "হে রাম!" উচ্চারণ ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হ'লো।

জওহরলাল সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন এবং বাপুজীর দেহের উপর লুটিয়ে পড়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। সত্যই, তিনি এতোদিনে পিতৃহীন হলেন।

কেবল জওহরলাল নয়, সমস্ত জাতিই নিজেকে পিতৃহীন ও অনাথ বোধ করলো। এই দুঃসংবাদের প্রচণ্ডতা এমনই ছিল যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই সংবাদ শুনেই প্রায় পনেরজন নরনারী প্রাণত্যাগ করলো। সমগ্র দেশ শোকে অভিভূত হয়ে পড়লো।

গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদ তড়িৎগতিতে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো।

বেতারে জওহরলাল ঘোষণা করলেন, "আমাদের জীবন থেকে আলো নিভে গেছে।...না, আমি ভুল বলছি; এই দেশে যে আলো জ্বলেছিল, তা কোনও সাধারণ আলো ছিল না...হাজার বছর পরেও সে আলো এই দেশে দেখা যাবে এবং সারা বিশ্ব তা দেখবে। কারণ, সে আলো ছিল সত্যের জীবন্ত মূর্তি।"

গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদে বিশ্বের সকল দেশের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেল। যিনি সর্পকেও শত্রু মনে করতেন না, সাম্প্রদায়িকতার সর্প যে তাঁকে এইভাবে দংশন করতে পারে, তা ছিল সকলের কল্পনারও অতীত। গান্ধীজীর হত্যাসংবাদ শুনে জর্জ বার্নার্ড শ বললেন, "অতিবেশী ভালো হওয়া যে কতো বিপজ্জনক, এতে তা-ই প্রমাণিত হয়েছে।" বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক টমাস মান বললেন, "তাঁকে যারা হত্যা করেছে, তারা ভারতবাসী নয়। এইসব বর্বর মানুষ কোন দেশেরই নয়। তবে এরা আমাদের একটি জিনিস দেখিয়েছে—তাঁকে স্পর্শ করে এমন সাধ্য কারো নেই। এখনকার মতো আর কখনও গান্ধীজীর আদর্শ এত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয় নি।" তাঁর দীর্ঘকালের প্রতিপক্ষ চার্চিল বললেন, "এই ঘৃণিত অপরাধে আমি স্তম্ভিত।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বললেন, "তাঁর জীবন ও কর্মধারা তাঁর জীবনের কীর্তিস্তম্ভ হয়ে থাকবে। তিনি ভারতের নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আদর্শ

ও কর্ম বিশ্ববাসীর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। যে শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্য তিনি প্রাণপাত করলেন, তা অগণিত বিশ্ববাসীকে প্রেরণা দেবে।" ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এটলি বললেন, "গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদে আমরা অত্যন্ত অভিভূত হয়েছি। তাঁর প্রতি নতমস্তকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।" ভারতকে সান্ত্বনা জানিয়ে অসংখ্য শোকবার্তা আসতে লাগলো। কিন্তু ভারতের সান্ত্বনা কই?

৩১শে জনুয়ারি গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'লো। সারা দিল্লী জনারণ্যে পরিণত হয়েছে; বিড়লা-ভবন থেকে যমুনার তীর অবধি শোকার্ত মানুষের দুর্বার স্রোত।

বেলা পৌনে বারোটায় গান্ধীজীর মরদেহ সেনাবিভাগের একটি পুষ্পসজ্জিত শকটে স্থাপন করা হ'লো। জনসমুদ্র মুহুর্মুহু মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়ধ্বনিতে কল্লোলিত হয়ে উঠলো। শোকযাত্রা সাড়ে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সওয়া চারটেয় যমুনাতীরে রাজঘাটে এসে পৌঁছলো। চন্দনকাঠের চিতায় গান্ধীজীর দেহ স্থাপিত হ'লে বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও জয়ধ্বনির মধ্যে পুত্র রামদাস পিতার মুখাগ্নি করলেন। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই গান্ধীজীর মরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল।

প্রয়াগে ত্রিবেণীসংগমে জওহরলাল গান্ধীজীর চিতাভস্মের একাংশ বিসর্জন দিলেন। ভারতের তীর্থে তীর্থে তাঁর চিতাভস্ম প্রেরিত হ'লো—গঙ্গা, ভাগীরথী, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, গণ্ডক, যমুনা, সরযূ, গোমতী, গোদাবরী, সবরমতী, তাপ্তী, কৃষ্ণা, কাবেরী, শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী প্রভৃতি নদনদীতেও বিসর্জিত হ'লো। ভারতের মাটি, জল, আকাশ তার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে আপন বক্ষে ফিরিয়ে নিলো।

ঘটনাপঞ্জী

১৮৬৯ খ্রীঃ অঃ (২রা অক্টোবর)	পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ।
১৮৭৬	রাজকোটে গমন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ।
১৮৮১	আলফ্রেড হাই স্কুলে প্রবেশ, কস্তুরবাঈয়ের সঙ্গে বিবাহ।
১৮৮৭	প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্য, ভাবনগরে শ্যামলদাস কলেজে প্রবেশ।
১৮৮৮	ইংলণ্ড গমন; ব্যারিস্টার হবার জন্য ইনার টেম্পলে প্রবেশ।
১৮৯০	লণ্ডন ভেজিটারিয়ান সোসাইটিতে যোগদান।
১৮৯১	ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় সাফল্য; স্বদেশে প্রত্যাবর্তন; বোম্বাইয়ে প্র্যাকটিস শুরু।
১৮৯৩, এপ্রিল	আফ্রিকা যাত্রা; শেঠ আবদুল্লার মামলার নিষ্পত্তিসাধন; নাটালে ভোটাধিকার বিলের বিরুদ্ধে আবেদন ও আন্দোলন।
১৮৯৪	উপনিবেশ সচিব লর্ড রিপনের নিকট ভারতীয়দের আবেদন-পত্র পেশ।
১৮৯৬	পরিবার আনবার জন্যে ভারতযাত্রা; পুনায় ভাণ্ডারকরের সভাপতিত্বে সভায় ভাষণদান; স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক ভাগিনেয়কে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা।
১৮৯৭	দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন; শেতাঙ্গদের হামলা; নাটাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা; সেবাধর্মের অনুশীলন।
১৮৯৯	বুয়ার যুদ্ধ; ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স কোর গঠন।
১৯০১	ভারতে প্রত্যাবর্তন; স্যার ফিরোজ শাহ্ মেটা, তিলক প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎকার; কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রশ্ন উত্থাপনের চেষ্টা; গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎকার; ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ।
১৯০২	ভারতভ্রমণ; পুত্র মণিলালের টাইফয়েড রোগে গান্ধীজীর জলচিকিৎসা ও সাফল্য; পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা।
১৯০৩	দক্ষিণ আফ্রিকায় মিঃ চেম্বারলেনের সহিত সাক্ষাৎকার।
১৯০৪	জোহানেসবার্গে প্লেগের মহামারী; গান্ধীজীর সেবাধর্ম, জলচিকিৎসা; ফিনিক্স খামার প্রতিষ্ঠা; ফিনিক্সে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রকাশ।

১৯০৫ জোহানেস্‌বার্গে আইনজীবীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ; মিঃ পোলকের সাহচর্য; ভারত থেকে কস্তুরবাঈ এবং তিন পুত্র মণিলাল, রামদাস ও দেবদাসের আগমন; বাপুজী নামের সূচনা।

১৯০৬ তথাকথিত জুলু বিদ্রোহ; গান্ধীজীর অ্যাম্বুল্যান্স বাহিনী গঠন ও আহত জুলুদের সেবা; ফিনিক্সে আগমন; ব্রহ্মচর্য পালন শুরু; জোহানেসবার্গে প্রত্যাবর্তন; রেজিস্ট্রেশনের প্রতিবাদে আন্দোলন; নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সূত্রপাত; ভারতীয়দের প্রতিনিধিদলের নেতারূপে লণ্ডন গমন।

১৯০৭ এশিয়াটিক বিল কার্যকর ঘোষণা; প্যাসিভ রেজিস্টেন্স সংস্থার প্রতিষ্ঠা; "সত্যাগ্রহ" নামকরণ; ট্রান্সভালে ইমিগ্রেশন রেস্‌ট্রিকশন অ্যাক্ট্‌ পাস; গান্ধীজীর গ্রেপ্তার; পরে মুক্তিলাভ; জেনারেল স্মাটসের প্রতিশ্রুতি অনুসারে গান্ধীজীর রেজিস্ট্রেশনে সম্মতি; গান্ধীজীর উপর ক্রুদ্ধ পাঠানের আক্রমণ; জেনারেল স্মাট্‌সের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ফলে পুনরায় সত্যাগ্রহ; এশিয়াটিক বিল ও রেজিস্ট্রেশনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন; গান্ধীজীর কারাদণ্ড।

১৯০৮ গান্ধীজীর ট্রান্সভালে প্রত্যাবর্তন; রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেখাতে না পারায় কারাদণ্ড; পুনরায় ভারতীয়দের প্রতিনিধিদলের নেতারূপে লণ্ডনগমন; 'হিন্দ্‌ স্বরাজ' রচনা।

১৯১০ বহিরাগত নিরোধক আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন; টলস্টয় ফার্মের প্রতিষ্ঠা।

১৯১১-১৩ গোখেলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর; এশিয়াটিক বিবাহ আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন।

১৯১৪ খনি এলাকায় ধর্মঘট; গান্ধীজীর কারাদণ্ড; মুক্তিলাভ; রেলে ইউরোপীয়দের ধর্মঘট; গান্ধী-স্মাট্‌স্‌ চুক্তি; ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে লণ্ডনে গমন; বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ; লণ্ডনে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন; প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত; ভারত যাত্রা।

১৯১৫ বোম্বাইয়ে অবতরণ; রাজকোট ও পোরবন্দর গমন; শান্তিনিকেতনে আগমন; পুনরায় ভারত-পরিক্রমা শুরু;

রেঙ্গুনগমন; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার; কোচরাবে সত্যাগ্রহ আশ্রমস্থাপন; কাইজার-ই-হিন্দ্ পদকলাভ।

১৯১৬ ভারত-পরিক্রমার এক বৎসর পূর্ণ; কংগ্রেসে যোগদান।

১৯১৭ চম্পারণ সত্যাগ্রহ; সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা; আমেদাবাদে শ্রমিক-ধর্মঘটে নেতৃত্বদান; গান্ধীজীর অনশন; মালিক-শ্রমিক মীমাংসা।

১৯১৮ খেদায় কৃষক আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ; যুদ্ধ-সম্মেলনে যোগদান; সৈন্যসংগ্রহে আত্মনিয়োগ; কঠিন আমাশা রোগে আক্রান্ত; মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট ও রাওলাট কমিটির সুপারিশ প্রকাশ।

১৯১৯ গান্ধীজীর রাওলাট কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের শপথপত্র রচনা, সত্যাগ্রহ সংস্থার প্রতিষ্ঠা; রাওলাট বিল-গুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু; সমগ্র ভারতে ৬ই এপ্রিল হরতাল আহ্বান, ৩০শে মার্চ দিল্লীতে পুলিসের গুলীচালনা; বোম্বাইয়ে বিশাল জনসভায় গান্ধীজীর ভাষণ; "সত্যাগ্রহ" সাপ্তাহিক প্রকাশ (৭ই এপ্রিল); পাঞ্জাবে সরকারের চণ্ডনীতি; গান্ধীজীর পাঞ্জাব ও দিল্লী প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ; গান্ধীজীকে পালোয়াল স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার ক'রে বোম্বাইয়ে আনয়ন ও মুক্তিদান; গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে আমেদাবাদে হাঙ্গামা; জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (১২ই এপ্রিল); সাপ্তাহিক 'নবজীবন' (৭ই অক্টোবর) ও সাপ্তাহিক 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' (৮ইঅক্টোবর) প্রথম প্রকাশ; অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন (ডিসেম্বর); মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার বিল পাস; খিলাফত দাবিতে মুসলমানদের বিক্ষোভ; গান্ধীজীর খিলাফতের প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানকে এক হ'তে আহ্বান।

১৯২০ মীরাটে খিলাফত সম্মেলনে গান্ধীজী কর্তৃক অসহযোগের প্রস্তাব পেশ; মার্চ মাসে গান্ধীজী কর্তৃক পাঞ্জাবে সরকারী অত্যাচারের বিবরণী রচনা ও প্রকাশ; রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; অসহযোগের কর্মসূচী গ্রহণ; ১লা আগস্ট

	অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার কথা ঘোষণা; ১লা আগস্ট তিলকের মৃত্যু; গান্ধীজীর নেতৃত্বগ্রহণ; ভারত পরিক্রমা ও প্রচার; নাগপুর কংগ্রেস।
১৯২১	পূর্ণোদ্যমে অসহযোগ আন্দোলন; বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব; মোপলা বিদ্রোহ; প্রিন্স অব ওএলসের ভারত সফর; বোম্বাইয়ে হাঙ্গামা; গান্ধীজীর অনশন; বারদৌলি অভিযান স্থগিত; প্রিন্স অব ওএলস্ বয়কট; ব্যাপক গ্রেপ্তার; কংগ্রেস ও খিলাফতের স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনসমূহ নিষিদ্ধ; সরকারের দমননীতি; আমেদাবাদ কংগ্রেস।
১৯২২	চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনা; আইন অমান্য অভিযানের কর্মসূচী বাতিল; গান্ধীজীর পাঁচদিনব্যাপী অনশন; গান্ধীজীর গ্রেপ্তার, বিচার ও কারাদণ্ড।
১৯২৩	স্বরাজ দলের উদ্ভব; সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা।
১৯২৪	গান্ধীজী কারাগারে অ্যাপিণ্ডিসাইটিস রোগে আক্রান্ত; হাসপাতালে স্থানান্তরিত ও অপারেশন; গান্ধীজীর মুক্তিলাভ; সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর তিন সপ্তাহব্যাপী অনশন; বেলগাঁও কংগ্রেস—গান্ধীজীর সভাপতিত্ব; গান্ধী-মতিলাল-দেশবন্ধু চুক্তি।
১৯২৫	গান্ধীজীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন; গান্ধীজীর ভারতের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সফর; বাংলাদেশ ভ্রমণ; দেশবন্ধুর মৃত্যু; স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ; নিখিল ভারত কাটুনি-সংঘের প্রতিষ্ঠা; আত্মজীবনী রচনারম্ভ; কানপুর কংগ্রেস।
১৯২৬	"নীরবতার বৎসর"; ডিসেম্বরে কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশন; গান্ধীজীর কংগ্রেসে পুনরায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।
১৯২৭	বাংলাদেশ সফর—কুমিল্লা, সোদপুর, কলকাতা; পুনরায় ভারত সফর; স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য নন্দী পর্বতে গমন; বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার; সাইমন কমিশনের আগমন ঘোষণা; সিংহল ভ্রমণ; মাদ্রাজ কংগ্রেস।
১৯২৮	রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন; শ্রমিক ও কৃষক বিক্ষোভ; বারদৌলিতে কৃষকদের সত্যাগ্রহ; সাইমন

কমিশন বয়কট ; লালা লজপত রায়ের মৃত্যু ; নেহরু রিপোর্ট ; কলকাতা কংগ্রেস—১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস না দিলে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তাব।

১৯২৯ কলকাতায় খাদি ভাণ্ডারের উদ্বোধন ; আমেদাবাদ ও সিন্ধু সফর ; ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্য দিল্লী গমন ; বিদেশী বস্ত্র বয়কট কমিটি গঠন ; কলকাতায় আগমন ; শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গান্ধীজীর নেতৃত্বে বহ্নুৎসব ; গান্ধীজী গ্রেপ্তার ; গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মামলা মুলতুবি ; গান্ধীজীর রেঙ্গুন সফর ; মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ; কলকাতায় বহ্নুৎসবের মামলায় গান্ধীজীর একটাকা অর্থদণ্ড—গান্ধীজীর অজ্ঞাতে জরিমানা দিয়ে দেওয়ায় গান্ধীজীর মুক্তিলাভ ; সন্ত্রাসবাদীদের সক্রিয়তা ; গান্ধীজীর অন্ধ্রসফর ; কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্বের জন্য গান্ধীজী কর্তৃক জওহরলালের নাম সুপারিশ ; জওহরলালের সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেস ; ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা।

১৯৩০ ২৬শে জানুয়ারি সারা দেশে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ; ডাণ্ডি অভিযান (১২ই মার্চ) ; লবণ সত্যাগ্রহ ; সরকারের চণ্ডনীতি ; চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ; গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ; পুনায় গান্ধীজী অন্তরীণ ; সারা ভারতে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি ; উদারনৈতিক নেতাদের কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে আপোস চেষ্টা ; কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা।

১৯৩১ বড়লাট লর্ড আরুইনের বিবৃতি ; গান্ধীজী সহ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তিলাভ ; মতিলাল নেহরুর মৃত্যু ; গান্ধী-আরুইন চুক্তি ; গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রা ; ফ্রান্সে গান্ধীজীর অভ্যর্থনা ও বিরূপ সমালোচনা ; গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান (১৪ই সেপ্টেম্বর) ; গোল টেবিল বৈঠকে দীর্ঘ বক্তৃতাদান (২৮শে নভেম্বর) ; শূন্যহস্তে ভারতে প্রত্যাবর্তন (২৮শে ডিসেম্বর)।

১৯৩২ পুনরায় আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু; গান্ধীজীর গ্রেপ্তার; ভারতের সর্বত্র ব্যাপক ধরপাকড়; বৃটিশ সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা; সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গান্ধীজীর আমৃত্যু অনশন (২০শে সেপ্টেম্বর); পুনা চুক্তি; বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঐ চুক্তিকে স্বীকৃতিদান; ২৬শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর অনশনভঙ্গ; ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে অস্পৃশ্যতাবর্জন সপ্তাহপালন।

১৯৩৩ আইন অমান্ত আন্দোলনের বার্ষিকী পালন (৪ঠা জানুয়ারি) দেশব্যাপী গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ; 'হরিজন' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ (১১ই ফেব্রুয়ারি); অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ২১ দিন ব্যাপী অনশন শুরু (৮ই মে); গান্ধীজীকে সরকার কর্তৃক মুক্তিদান; একমাসের জন্য আইন অমান্ত স্থগিত; গান্ধীজীর আপোস-প্রচেষ্টা ব্যর্থ; ওয়ার্ধা সত্যাগ্রহ আশ্রম; গ্রামে গ্রামে অভিযান; গান্ধীজী, কস্তুরবাঈ, মহাদেব দেশাই প্রভৃতি গ্রেপ্তার; মুক্তিলাভ; গান্ধীজী পুনায় অন্তরীণ অন্তরীণ আদেশ লঙ্ঘন করায় গ্রেপ্তার, এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত; ব্যক্তিগত আইন অমান্ত শুরু; যারবেদা জেলে হরিজন-সংক্রান্ত কাজ করতে না দেওয়ায় গান্ধীজীর অনশন; জীবনসংশয় ও মুক্তিলাভ; এক বৎসর আইন অমান্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা; 'হরিজন সফর'।

১৯৩৪ 'হরিজন সফর'; বিহারে ভূমিকম্প; বিহার ত্রাণ তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহ; বিহার আগমন; আসাম সফর; উড়িষ্যা সফর—পদব্রজে পরিক্রমা শুরু; কংগ্রেসের পাটনা অধিবেশনে যোগদান; ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন; পুনায় পৌর সংবর্ধনা; সনাতনপন্থীদের আন্দোলন; সনাতনপন্থী নেতা পণ্ডিত লালনাথের উপর গান্ধীজীর সভায় আক্রমণ গান্ধীজীর সপ্তাহব্যাপী অনশন; গ্রামীণ শিল্প পুনরুজ্জীবনের সংকল্প; কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ।

১৯৩৫ বরসাদ তালুকে প্লেগের বিরুদ্ধে অভিযান ও সেবাকার্য সবরমতী জেলে খান আবদুর গফর খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার রক্তের চাপবৃদ্ধি।

১৯৩৬	সেগাঁওয়ে সেবাগ্রাম প্রতিষ্ঠা; গান্ধীজীর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিলালের ইসলামগ্রহণ; ডাঃ আনসারি ও আব্বাস তায়েবজীর মৃত্যু; গ্রামোন্নয়নে আত্মনিয়োগ; গান্ধীজীর প্রস্তাবানুসারে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন—ফৈজপুর কংগ্রেস; ফৈজপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীর ভাষণ।
১৯৩৭	গ্রামোন্নয়ন ও হরিজনদের মন্দিরপ্রবেশের অধিকার-প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ; কংগ্রেসের বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ; ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান; দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদান; মাদ্রাজ হিন্দী সম্মেলনে যোগদান; কংগ্রেসের বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন; 'হরিজন' পত্রিকায় কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণের সমর্থনে মতপ্রকাশ; ওয়ার্ধায় শিক্ষা-সম্মেলন; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্য কলকাতা আগমন; অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার; রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে গভর্নর এণ্ডারসন ও মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের সঙ্গে আলোচনা; জুহুতে বায়ুপরিবর্তন।
১৯৩৮	জুহু থেকে সেবাগ্রামে প্রত্যাবর্তন; হরিপুরা কংগ্রেসে গ্রামীণ শিল্প ও খাদি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী ভাষণ; বন্দী-মুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য কলকাতা আগমন; উড়িষ্যার দেলাংয়ে গান্ধী সেবাসংঘের অধিবেশনে যোগদান; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্য কলকাতা আগমন; উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ভ্রমণ; স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি; অনির্দিষ্ট কালের জন্য মৌন অবলম্বন।
১৯৩৯	কংগ্রেস সভাপতি-নির্বাচন সমস্যা—ডাঃ সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা; ডাঃ সীতারামাইয়াকে গান্ধীজীর সমর্থন; সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ; রাজকোটে প্রজা-আন্দোলন; কস্তুরবাঈয়ের গ্রেপ্তারবরণ; গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার—ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগ; গান্ধীজীর রাজকোটে গমন ও অনশন; বড়লাট রাজকোটের ব্যাপারে ভারতের প্রধান বিচারপতি মরিস

গায়ারকে সালিস নিয়োগ করায় গান্ধীজীর অনশনভঙ্গ; ত্রিপুরী কংগ্রেস; গান্ধীজীর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে যোগদানের জন্য কলকাতা গমন; সুভাষচন্দ্রের সভাপতি-পদ ত্যাগ, গান্ধী সেবাসংঘের অধিবেশনে যোগদানের জন্যে বৃন্দাবনযাত্রা; বৃন্দাবন থেকে রাজকোটে গমন; রাজকোট সমস্যার মীমাংসা; পানবর্জন-বিরোধীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার; উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ সফর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু (৩রা সেপ্টেম্বর); কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগ।

১৯৪০ মুসলিম লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনা; যুদ্ধে বৃটেনের বার-বার বিপর্যয়; ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার বিনিময়ে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দাবী; যুদ্ধে সশস্ত্র অংশ গ্রহণ সম্পর্কে কংগ্রেসে মতভেদ, কংগ্রেসের প্রস্তাব সরকার গ্রহণ না করায় কংগ্রেসের সংগ্রাম শুরু করবার সংকল্প ও গান্ধীজীকে নেতৃত্বদানের জন্য আহ্বান; গান্ধীজীর নেতৃত্বগ্রহণ; ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ; বহু কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার।

১৯৪১ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ব্যাপকতা; যুদ্ধে মিত্রপক্ষের অবস্থা সংকটজনক; বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়ায় সমস্যার জটিলতা; জাপানের দ্রুত অগ্রগতি।

১৯৪২ গান্ধীজীর সঙ্গে মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাইশেকের সাক্ষাৎকার; রেঙ্গুনের পতন; স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের দৌত্য; দৌত্য ব্যর্থ; বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, গান্ধীজীর "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত; ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণসহ গান্ধীজী গ্রেপ্তার (৯ই আগস্ট); গান্ধীজী ও তাঁর অনুচরবর্গ পুনায় আগা খাঁ প্রাসাদে অন্তরীণ; আগস্ট আন্দোলন; অর্ডিন্যান্সের রাজত্ব; সরকারের চণ্ডনীতি; বহু লোক গ্রেপ্তার, হতাহত; আগা খাঁ প্রাসাদে মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যু; গান্ধী-লিনলিথগো পত্রালাপ।

১৯৪৩ গান্ধীজীর ত্রিসপ্তাহব্যাপী অনশন; গান্ধীজীকে মুক্তি-

দানের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন; গান্ধীজীর অনশনব্রত সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপন; বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর।

১৯৪৪ কস্তুরবাঈয়ের মৃত্যু (২২শে ফেব্রুয়ারি); গান্ধীজী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি, অনুচরবর্গসহ গান্ধীজীকে মুক্তিদান (৫ই মে); জুহুতে বিশ্রাম; গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার; ৭৫ বৎসরে পদার্পণ।

১৯৪৫ রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন; জার্মানির ও জাপানের আত্মসমর্পণ; ইংলণ্ডে নির্বাচনে শ্রমিকদলের জয়লাভ; ভারতে সাধারণ নির্বাচন; পুনায় নেচার ক্লিনিকে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, কলকাতা আগমন; গভর্নর কেসির সঙ্গে সাক্ষাৎকার; সোদপুরে অবস্থান; শান্তিনিকেতনে গমন; মহিষাদল ও কাঁথি যাত্রা; গৌহাটি গমন।

১৯৪৬ আসাম থেকে মাদ্রাজ গমন; দুমাস সফরশেষে সেবাগ্রামে প্রত্যাবর্তন; নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ; ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্য বোম্বাই গমন; উরুলিতে স্বভাব-চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন; এপ্রিল মাসে দিল্লীগমন; ভাঙ্গি-পল্লীতে অবস্থান; কেবিনেট মিশনের আগমন; কেবিনেট মিশন ও কংগ্রেসের অনুরোধে সিমলা গমন; সিমলা সম্মেলন; দিল্লী থেকে গান্ধীজীর পুনা গমন; পথে রেলদুর্ঘটনা; ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন, কলকাতায় ভয়ংকর দাঙ্গাহাঙ্গামা; গান্ধীজীর শান্তি অভিযান-শুরু, সেবাগ্রাম ত্যাগ (২৪শে আগস্ট); জওহরলাল কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন (২৪শে আগস্ট); গান্ধী-লর্ড ওয়াভেল সাক্ষাৎকার; কলিকাতায় শান্তি-প্রচেষ্টা; নোয়াখালি গমন (৬ই নভেম্বর); নোয়াখালিতে শান্তি-সফর।

১৯৪৭ নোয়াখালিতে শান্তি-সফর; বিহার-যাত্রা (৩রা মার্চ); বিহার সফর; দিল্লী যাত্রা; এশিয়ান রিলেশন্‌স্ কনফারেন্সে ভাষণদান; দিল্লীতে গান্ধীজীর উপাসনা-সভায় কোরান-পাঠের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; ভারতকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন

মাসের মধ্যে বৃটেনের স্বাধীনতাদানের কথা লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন কর্তৃক ঘোষণা; পুনরায় গান্ধীজীর বিহার আগমন; পক্ষকাল বিহারে থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তন; জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎকার; কলিকাতায় পুনরায় দাঙ্গা; ৭ই মে দিল্লী থেকে রওনা হয়ে কলকাতা আগমন, শান্তি-প্রচেষ্টা; ১৪ই মে বিহার থেকে ২৫শে মে দিল্লী-যাত্রা; দেশবিভাগের কথা বড়লাট কর্তৃক ঘোষণা; ভারতবিভাগের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর মতপ্রকাশ; অখণ্ড বাংলার আন্দোলন সমর্থন; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ওয়ার্কিং কমিটির ভারতবিভাগ সমর্থনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে মতবিরোধ; ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ করতে গান্ধীজীর পরামর্শদান; বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা-বিল গৃহীত; ভারত ও পাকিস্থান সৃষ্টির কথা ঘোষণা; দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে কোন নির্দেশ না থাকায় গান্ধীজী কর্তৃক সমালোচনা; লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদে মনোনীত করায় গান্ধীজীর সমর্থন; পুনরায় কলিকাতা আগমন; শান্তি-প্রচেষ্টা; ১৪ই আগস্ট হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর বন্যা; এর স্থায়িত্ব সম্পর্কে গান্ধীজীর সংশয়; পুনরায় স্থানে স্থানে হাঙ্গামা; গান্ধীজীর শেষ পর্যন্ত অনশন; কলিকাতায় স্থায়ী শান্তিস্থাপন; ৯ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন; দিল্লীতে ভয়াবহ দাঙ্গার কথা শ্রবণ; শান্তিস্থাপনের প্রয়াস।

১৯৪৮ পুনরায় অনশন; দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে অনশনভঙ্গ; গান্ধীজীর উপাসনা-সভায় বোমা-বিস্ফোরণ (২০শে জানুয়ারি); উপাসনা-সভায় গমনকালে আততায়ীর গুলীতে জীবনবিসর্জন (৩০শে জানুয়ারি)।